







পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডিয়ান মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী  
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য লিখিত ।

# গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা

॥ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ॥

[ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ]

ডঃ নারায়ণী বসু, এম. এ., ডি. ফিল.,

অধ্যাপিকা, সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ,  
ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, হাওড়া গার্লস কলেজ, বিশ্বভারতীয় পরীক্ষক ।

মাধ্যমিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (IX & X), খাদ্য ও পুষ্টি (XI & XII)

প্রকৃতি পুস্তক লেখিকা ।

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭০



প্রকাশক :

ত্ৰিপুৰেশচন্দ্র ভাণ্ডাৰ

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

"Paper used for printing of this book was made available  
by the Govt. of India at a concessional rate."

পৰিষ্কাৰ দত্ত

প্ৰিন্টাৰ

১০১, বৈষ্ণবখানা রোড

কলিকাতা-৭০০০০২

গোপাল বায়

লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

## ভূমিকা

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে এই নতুন পুস্তক প্রণয়ন করা হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের জ্ঞান প্রস্তুত করা এবং সুগৃহিণীরূপে গড়িয়া তোলা। জ্ঞানের দিক হইতে নারীর শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা একরূপ হইতে বাধা নাই কিন্তু মেয়েদের আবার ঘর সামলাইতে হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তাঁহারাষ্ট মাহুষ করেন। তাই উহার জ্ঞান বিশেষ শিক্ষার দরকার একথা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সাধারণ পাঠ্যসূচির অন্তর্গত হইলেও এই বিষয়টি অধ্যয়ন করিয়া মেয়েরা যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-উন্নয়নের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আমার অগ্রান্ত পুস্তকের জায়... এই পুস্তকে প্রণয়নেও অধ্যাপক ডাঃ মনোরঞ্জন দে'র সাহায্য পাইয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভুল-ত্রুটি থাকিা অসম্ভব নয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনা করা হইল তাহারা উপরূত হইলে সর্বশ্রম সার্থক হইবে।

মহালয়া, ১৯৩৯

নারায়ণী বসু



**E. Elementary Anatomy and Physiology of Human Body :**

1. Elementary knowledge of the structure and functions of different systems of the human body.
2. Hygiene : (a) Air—its composition, impurities, ventilation. (b) Water—its sources, pollution and purification.

**F. Care of the Child :**

1. Place of a child in the house.
2. General management of the baby. Elementary aspects of growth and development of children.

**G. Care of the Sick at Home :**

1. Basic Principles of Home Nursing.
2. General care of the patient :
  - (a) Selection of sick room and its other requirements.
  - (b) Nursing of the patient at different age levels—child, adult and old.
  - (c) Sponging the patient.
  - (d) Taking temperature and maintaining record charts.
  - (e) Giving bed pan and changing bed.
  - (f) Administration of food and drugs to patient.

**H. Common Infectious Diseases :**

1. Common childhood diseases.
2. Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases.
3. Preventive measures :
  - (a) Early diagnosis, (b) Isolation, (c) Notification,
  - (d) Quarantine, (e) Disinfection ( concurrent, terminal ) (f) Immunisation, (g) Health education.

**I. Providing First Aid at Home :**

1. What is First Aid and where it is applied.
2. Simple bandaging.
3. Storage of poisonous medicines at home.
4. Maintaining a First Aid Box.

**Paper II ( Marks : 100 )**

**A. Effective Management of a Home :**

1. Role of planning, co-operation, guidance and evaluation in the field of home management.
2. Human factors in home management.

**B. An Ideal Home Maker :**

1. Her personality and behaviour pattern.
2. Management and use of different resources including material, human and financial resources.

**C. Operation of Family Finance :**

1. Family budgeting and income management.
2. Maintaining household accounts.
3. Understanding the concept of standard of living and family credit.
4. Investing family funds :
  - (a) Operation of (i) Bank and fixed deposit, (ii) Post Office accounts, (iii) Savings Bank accounts, (iv) National Savings Certificates, (v) Insurance, (vi) Shares in companies.

**D. Selecting Fibres for the Family :**

1. Knowledge of fabrics.
2. Management responsibilities in clothing a family.
3. Different methods of washing and cleaning of clothing including dry cleaning and removal of stains.

**E. Home maker as a Home Nurse :**

1. Qualifications of a good nurse and her duties.
2. The sick-room—choice of the room and its arrangement.
3. Bed making with and without the patient.
4. Home management and family health :
  - (i) Medical care for mothers and infants. (ii) Immunisation and dental care for children. (iii) Recognising symptoms of illness at home. (iv) Care of the old and infirm at home.
5. Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and fainting.

**F. Child Development and Guidance Programme :**

1. Study and care of children :  
(a) Staying healthy and attractive through the years. (b) Birth, infancy and maturation : The first dozen years. (c) Puberty and growth. (d) Problems of adolescents and delinquents. (e) Mental hygiene and principles of child guidance.

**G. Familylife Education for Future Home Makers :**

1. Preparation for marital life.
  2. Responsibility of parenthood.
  3. Beginning of a family.
  4. Interpersonal relationship in family life.
  5. Concept of family planning and personal health.
-

## সূচীপত্র

### ॥ প্রথম পত্র ॥

প্রথম অধ্যায় : A. গৃহ-সংক্রান্ত আলোচনা ... ১

1. পরিবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা, (২) বাসস্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা, [\*3. বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কক্ষের ব্যবহার], (৪) গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ-পরিকল্পনা : আলপনা, পুষ্পবিজ্ঞান।

দ্বিতীয় অধ্যায় : B. সুগৃহিণী ... ৩৩

- (1. গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, 2. গৃহের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা, ধাতু : তামা, পিতল, লোহা, রূপা, আয়ুর্ষ্মিনিয়ম, এনামেল পাত্রগুলি পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ও উপায়, (3. অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ—উহাদের বিনাশ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় : মশা, ছারপোকা, উকুন, মাছি, ইঁদুর, আরশোলা, ধাড়ি মাছি, উই।

তৃতীয় অধ্যায় : C. দেহসৌষ্ঠব বাড়াইবার কৌশল এবং গৃহিণী ... ৫৭

- (1. পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য, [\*2 পোশাক পরিধানে ত্রুটি], (3. স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বয়স, পেশা এবং ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন, 4. পোশাকের নকশা এবং পোশাক প্রস্তুতির মূলনীতি, (5. পোশাকের উপাদান নির্বাচন, [\*6. জীর্ণবস্ত্র সংস্কার এবং নব কলেবর প্রাপ্তি : রিফ্র, তালি] 7. পোশাকের যত্ন (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

চতুর্থ অধ্যায় : D. পরিবারের উপযোগী তত্ত্ব-সংক্রান্ত জ্ঞান ... ৬৯

1. বিভিন্ন তত্ত্ব এবং সাংস্কেয়িক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা : (ক) অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তত্ত্ব, (খ) প্রাণিজ তত্ত্ব, (গ) কৃত্রিম তত্ত্ব, খনিজ তত্ত্ব, (2. বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন তত্ত্বের বজ্রধৌতি : সাদা সূতি ও লিনেনের বজ্র ধুইবার প্রণালী, সূতি এবং লিনেনের ছাপা, রঙিন বজ্রাদি ধুইবার পদ্ধতি, সাদা পশমের বজ্র ধুইবার

\* তারকা চিহ্নিত অংশগুলি নূতন পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত।

পদ্ধতি, সাদা বেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি, কৃত্রিম বেশমের বস্ত্র  
ধুইবার প্রণালী, সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা ।

**শব্দভাণ্ডার :** E. দেহতত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

**সাধারণ জ্ঞান**

... ১১১

1. দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান : নরকঙ্কালের  
গঠন, করোটি, মেরুদণ্ড, পঞ্জরাস্থি, স্কন্ধ ও বাহু, শ্রোণীচক্র, পেশী,  
রক্ত সংবহন তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র বা নার্ডতন্ত্র, মস্তিষ্ক, অন্তঃক্ষরা  
গ্রন্থি, পিটুইটারি গ্রন্থি, গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি, কটি গ্রন্থি বা  
এড্রিনাল গ্রন্থি, যৌন গ্রন্থি, কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি,
2. স্বাস্থ্য : বায়ু—উহার গঠন, অণুগুণ ও বায়ু সঞ্চালন,  
জল : উহার উৎপত্তি, অণুগুণ এবং জল বিশোধন ।

**ষষ্ঠ অধ্যায় :** F. শিশুর যত্ন

... ২০৬

1. গৃহে শিশুর স্থান, শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা, [\*2. শিশুর  
বুদ্ধি ও বিকাশের সাধারণ দিক : দৈহিক বিকাশ, মানসিক  
বিকাশ, ভাষার ক্রমবিকাশ, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক  
বিকাশের ধারা], 3. শিশুদের বুদ্ধি ও বিকাশের ধারা,  
4. শিশুর ক্রমবিকাশের উপাদান ( পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )]

**সপ্তম অধ্যায় :** G. গৃহে অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন

... ২২২

1. গৃহ-শুশ্রূষার মূলনীতি, 2. রোগীর সাধারণ যত্ন : রোগিকক্ষ  
নির্বাসন, আসবাবপত্রের সংস্থান, আলো ও বন্দোবস্ত, রোগিকক্ষে  
বায়ু সঞ্চালন, শিশু, প্রাপ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শুশ্রূষা, রোগীর  
ঔষধ, রোগীর পথ্য ।

**অষ্টম অধ্যায় :** সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ

... ২৩২

1. শিশুদের সাধারণ রোগসমূহ : অপুষ্টিজনিত রোগ, কোষ্ঠ-  
কাঠিগ্র, উদরাময়, আমাশয়, মর্দিকাশি, টেনসিফাইটিস, থোস-  
পাঁচড়া, কুমি, 2. সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান :  
আমাশয়, উদরাময়, কলেরা, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথেরিয়া,  
যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত, 3. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : প্রাথমিক  
অবস্থায় রোগ নির্ণয়, স্বতন্ত্রীকরণ, প্রজ্ঞাপন, নিরোধন, প্রতিরোধ,  
অনাক্রম্যতা, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা ।

\* তারকা চিহ্নিত অংশ নূতন পাঠ্যমুদ্রী-বহির্ভূত ।



নবম অধ্যায় : গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ... ২৫৪

1. প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয় ? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তব্য, 2. ব্যাণ্ডেজ : গুটান ব্যাণ্ডেজ, ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ. মেনি-টেল ও টি-ব্যাণ্ডেজ, 3. গৃহে বিষাক্ত ঔষধ সংরক্ষণ, 4. প্রাথমিক প্রতিবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম।

অমূল্যলীলা

... ২৬০—২৬৪

## ॥ দ্বিতীয় পত্র ॥

প্রথম অধ্যায় : A. সার্থক গৃহ-পরিচালনা .... ১

1. গৃহ-পরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং সমীক্ষার ভূমিকা, 2. গৃহ-পরিচালনায় স্থানভেদে ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : B. আদর্শ গৃহ-পরিচালিকা ... ১০

1. গৃহ-পরিচালিকার গুণ ও ব্যবহার, পার্শ্বিক, মানব ও অর্থ প্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পরিচালনা ও উহাদের ব্যবহার, সময় পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশ, কাজের পরিকল্পনার স্তর বিভাগ, তাপ ও শক্তি সংরক্ষণের উপায়, অঙ্গ-সঞ্চালন হ্রাস করিবার উপায়, অর্থ সম্পদের পরিচালনা ও ব্যয়।

তৃতীয় অধ্যায় : C. পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ... ২৩

1. পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পরিচালনা, 2. জীবনকে যেভাবে গড়িতে চাই তার পদ্ধতি, 3. জীবনযাত্রার মান ও পারিবারিক ঋণ, 4. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ, 5. জীবন-বীমা : মেয়াদী বীমা, আজীবন বীমা, বীমা করিবার সুবিধা, প্রিমিয়াম রেট কীভাবে স্থির হয় ? বিবাহ বীমা, শিক্ষা-বীমা, বৃত্তি-বীমা, কোম্পানীর শেয়ার।

চতুর্থ অধ্যায় : D. পরিবারের জন্ম ও মৃত্যু নির্বাচন ... ৪১

1. তত্ত্ব সহকারী জ্ঞান, 2. পোশাক প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব, বস্ত্রাদি ধোওয়া ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি, গুরু ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা।

**পঞ্চম অধ্যায় : E. গৃহ-গুপ্তাধিকারিণীকে**

**গৃহ-পরিচালিকা**

...

৮১

1. উত্তম গুপ্তাধিকারিণীর গুণাবলী, গুপ্তাধিকারিণীর কর্তব্য,
2. রোগি-কক্ষ, 3. রোগীর শয্যা, 4. গৃহ-পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য, 5. ছুটিচনা, মচকানো, অস্থিভঙ্গ, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রক্তপাত, দহন, বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ, দংশন, ছলবিদ্ধ করা, মূর্ছা ও অজ্ঞান অবস্থার প্রাথমিক প্রতিবিধান।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : F. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা**

**সংক্রান্ত কার্যসূচী**

..

১১৬

1. শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন নেওয়া, শিশুর খাওয়া, জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ক কাল : জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর, শিশুর যৌন চেতনা, যৌবনোদগম ও বৃদ্ধি, কিশোর ও অপরাধ প্রবণদের সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূল নীতি।

**সপ্তম অধ্যায় : G. ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক**

**জীবন সংক্রান্ত শিক্ষা**

..

১৩৭

- ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশ্য. 1. বিবাহের প্রস্তুতি, 2. পারিবারিক জীবন শুরু, 3. জনিতাদের দায়িত্ব, 4. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক। 5. পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য।

**অনুশীলনী**

...

১৪৬—১৫০

**পরিশিষ্ট ( নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ) :**

**খাতকে দেহের কাজে লাগান : পাচকতন্ত্র পরিপাক**

**ও মেটাবলিজম**

...

১—২

পাচকতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া : মুখগহ্বরে পরিপাক, পাকস্থলীতে পরিপাক, ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক, প্রোটিনের পরিপাক, পরিপাকের সহায়ক এনজাইমসমূহ।

**পোশাকের যত্ন**

...

..

১০

**শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান**

...

.

১২

# **Revised Syllabus for Home Management & Home Nursing**

**[ July 1978 ]**

**( Elective )**

**Full Marks : 200**

**Paper I ( Marks : 100 )**

## **Home Organisation and Community Concept**

### **A. Study of the House :**

1. The family and its housing needs.
2. Selection and planning of a residential accommodation for different socio-economic levels.
3. Interior decoration and colour schemes.

### **B. A Good Home Maker :**

1. Planning and processing of daily duties of a home maker.
2. Household clearing including furniture and equipment.
3. Study of household pests --their prevention and control measures.

### **C. The Art of Good Grooming and the Home Maker :**

1. Clothing—its need and purpose.
2. Choice of clothes for different occasions according to age, sex, occupation and seasonal variations.
3. Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, washability, durability and ease of handling.
4. Care of clothes.

### **D. Knowing the Fibres for the Family :**

1. Study of different kinds of textile fibres.
2. Different methods of washing and finishing materials of different fibres.

### **E. Physiology of Human Body and Hygiene :**

1. Elementary knowledge of human body systems.
2. Hygiene : (a) Air—its composition, impurities and ventilation. (b) Water—its sources, pollution and purification.

**F. Care of the Child :**

1. Place of a child in a house.
2. General management of the baby.
3. Factors and process of growth and development of children.

**G. Care of the Sick at Home :**

1. Basic Principles of Home Nursing.
2. General care of the patient :
  - (a) Selection and care of a sick room.
  - (b) Nursing of the patient at different age levels—Child, adult and old.
  - (c) Administration of food and drugs to patient.

**H. Common Infectious Diseases :**

1. Common childhood diseases.
2. Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases.
3. Preventive measures :
  - (a) Early diagnosis, (b) Isolation, (c) Notification, (d) Quarantine, (e) Disinfection (concurrent, terminal) (f) Immunisation, (g) Health education.

**I. Providing First Aid at Home :**

1. What is First Aid and where is it applied.
2. Simple bandaging.
3. Storage of poisonous medicines at home.
4. Maintaining a First Aid Box.

Paper II ( Marks : 100 )

**A. Effective Management of a Home :**

1. Role of planning, co-operation, guidance and evaluation in the field of home management.

**B. An Ideal Home Maker :**

1. Her personality and behaviour pattern.
2. Management and use of different resources including material, human and financial resources.

**C. Operation of Family Finance :**

1. Family budgeting and income management.
2. Maintaining household accounts.

3. Family finance : Family credit and investment of (i) Bank and fixed deposit, (ii) Post Office accounts, (iii) Savings Bank accounts, (iv) National Savings Certificates, (v) Insurance, (vi) Shares in companies.

**D. Selecting Fibres for the Family :**

1. Knowledge of fabrics.
2. Management responsibilities in clothing a family.
3. Different methods of washing and cleaning of clothing including dry cleaning and removal of stains.

**E. Home Maker as a Home Nurse :**

1. Qualification of a good nurse and her duties.
2. The sick-room—choice of the room and its arrangement.
3. Bed making with and without the patient.
4. Home management and family health :
  - (i) Medical care for mothers and infants. (ii) Immunisation and dental care for children. (iii) Recognising symptoms of illness at home. (iv) Care of the old and infirm at home.
5. Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and fainting.

**F. Child Development and Guidance Programme :**

1. Study and care of children :
  - (a) Staying healthy and attractive through the years.
  - (b) Birth, infancy and maturation : The first dozen years.
  - (c) Puberty and growth.
  - (d) Problems of adolescents and delinquents.
  - (e) Mental hygiene and principles of child guidance.

**G. Family life Education for Future Home Makers :**

1. Preparation for marital life.
2. Responsibility of parenthood.
3. Beginning of a family.
4. Interpersonal relationship in family life.
5. Concept of family planning and personal health.



**ଗୃହ-ପରିଚାଳନା ଓ ଗୃହ-ନୁରସା**  
**Home Mangement & Home Nursing**

**ଅଥବା ପଢ଼**

.

.

.

.



## 1. পরিবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা ( Family and its Housing needs )

খাদ্য এবং বস্ত্রের পরেই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আদিম মানুষ ছিল চরমান। প্রকৃতির পীড়নে, হিংস্র স্থাপনের অভাবের কারণে এবং শিকারের সন্ধানে তাকে বারবার বসতি তুলিতে হইয়াছে। চরৈব চরৈব—কোথাও স্থিতির হইয়া বসার উপায় নাই। অগ্নি ও পশু তাহার ঘাঘাবর জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন আনিয়া দিল। শিকারের অনিশ্চিত আহাৰের বদলে সে পালিত পশুর মাংস এবং ছুঙ্কের উপর নির্ভর করিতে শিখিল। ধীরে ধীরে চাষবাসও আয়ত্ত হইল। অরণ্য সমতল করিয়া বসতি স্থাপিত হইল। এইভাবে গৃহনিৰ্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল।

**গৃহের প্রয়োজনীয়তা :** প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ব্যক্তিগত এবং কতগুলি সামাজিক কারণে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহ মানুষের অভাব-অভিযোগ মিটায়। তাহার আত্ম রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহার কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজন তৃপ্ত করে। তাছাড়া গৃহ ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়ায়। তাহার বিবাহ ও পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ভার্জিনিয়া কাটলারের (Virginia Cutler)\* মতে কতকগুলি মূল্যবোধ (values) ব্যক্তি তথা পারিবারিক জীবনকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে। উপযুক্ত বাসগৃহের মধ্য দিয়া ঐসব মূল্যবোধ তৃপ্ত হয় তাই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহের মাধ্যমে যেসব মূল্যবোধ (home values) তৃপ্ত হয় কাটলার উহাদের দশটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ; যথা— সৌন্দর্য (beauty), আরাম (comfort), সুবিধা (convenience), অবস্থান (location), স্বাস্থ্য (health), ব্যক্তিগত আগ্রহ (personal interests), নিরাপত্তা (safety), আত্ম রক্ষা (privacy), সৌহার্দসূচক কাজকর্ম (friendship activities) এবং ব্যয়হীন (economy)।

\* Virginia F. Cutler, (1) Personal and Family values in the choice of a Home, Cornell Univ. Bul 840, 1947, P. 6, (2) A Technique for improving Family Housing, Journal of Home Econom'cs, Vol. 9, March 1947, Pp. 141-147.

## গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-ভূত্ব

(১) **সৌন্দর্য** : মাহুকের মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্যপিপাসা আছে। সে সর্বদা তাহার পরিবেশকে সুন্দর করিয়া রাখিতে চায়। মাহুকের পরিবেশের মধ্যে গৃহই হইল সবচেয়ে নিকটতম বস্তু। তাই উহাকে সাজাইয়া সে তাহার সৌন্দর্যের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করে।

(২) **আরাম** (comfort) : আরামলাভের জন্য মাহুয় বিশেষভাবে গৃহের প্রয়োজন অনুভব করে।

(৩) **সুবিধা** (convenience) : গৃহে আমরা নানারকম সুবিধা পাইয়া থাকি। প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ প্রয়োজনমত খাচ্চ, বস্ত্র ও বিশ্রামের সুবিধা লাভ করি। তাছাড়া সন্তানদের মাহুয় করা, রোগী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা গৃহেই সুবিধাজনক।

(৪) **অবস্থান** (location) : গৃহের অবস্থানের উপর গৃহের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। ভাড়াটে বাড়ি হউক আর নিজ বাড়ি হইক গৃহনির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়—

- (ক) চারিপাশের পরিবেশ কিরূপ ?
- (খ) প্রতিবেশীদের সাহচর্য কাম্য কিনা ?
- (গ) কর্মক্ষেত্র কতটা দূরে ?
- (ঘ) স্কুল-কলেজ ও হাটবাজারের কি সুবিধা আছে ? নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের সময় আবার জানিতে হয়—

- (ঙ) বাড়ির ট্যাক্সের পরিমাণ কত ?
- (চ) ভবিষ্যতে উন্নয়নের কতটা সম্ভাবনা আছে ?

(৫) **স্বাস্থ্য** (health) : ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের প্রয়োজন। মাহুয় এখানে পুষ্টিকর খাদ্য এবং উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ পায়। পরিবেশও স্বাস্থ্যের অসুস্থ হওয়া উচিত।

(৬) **ব্যক্তিগত আগ্রহ** (personal interests) : প্রত্যেক মাহুকেরই কিছু-না-কিছু ব্যাপারে শখ থাকে। গৃহের অসুস্থ পরিবেশে এইসব শখের চর্চা করা সম্ভব হয়।

**নিরাপত্তা** (safety) : গৃহ আমাদের সকলের মনে একটা নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। গৃহের নিশ্চিত পরিবেশে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে এবং এখানে তাহাদের স্বস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব হয়। রোগী এবং বৃদ্ধেরাও গৃহেই নিজেকে নিরাপদ বোধ করে।

(৭) **আত্ম রক্ষা কল্প** (privacy) : গৃহ সকলের আত্ম রক্ষার সাহায্য করে।

(২) সৌহার্দ্যসূচক কাজকর্ম (friendship activities) : মাহুবমাজই অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্বাভাবের আকাজক্ষা করে। পরিবারের লোকেরা যখন একটি গৃহে একসঙ্গে বসবাস করে তখন সকলের মধ্যে একটা আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সৌহার্দ্য গড়িয়া ওঠে। গৃহে এইভাবে নানা সৌহার্দ্য সূচক কাজকর্ম চলে।

(১০) ব্যয় হ্রাস (economy) : গৃহে বাস করিলে স্বভাবতঃই পরিবারের ব্যয় হ্রাস পায়।

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ খাচ্চ-বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং জাপানে বাসস্থানের উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে :

- (১) জনসাধারণের সামাজিক সন্তোষবিধান ঘটয়াছে ;
- (২) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ;
- (৩) জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে ;
- (৪) সাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে

সকল উন্নতিশীল দেশগুলির মতই আমাদের দেশও জনসাধারণের বাসগৃহের প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ এবং সাধ্যমত এই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

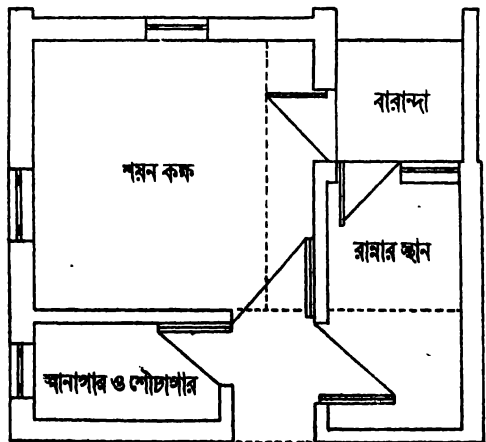
২. বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার ব্যক্তিগণের জন্য বাসস্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা (Selection and planning of a residential accommodation for different socio-economic levels)

সরকারী প্রচেষ্টা : জীবনযাত্রার মান অল্পস্বারে আমরা জন সাধারণকে

নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি। সরকার-প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে বাৎসরিক

(১) ৭২০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের লোকেরা নিম্নবিত্ত,

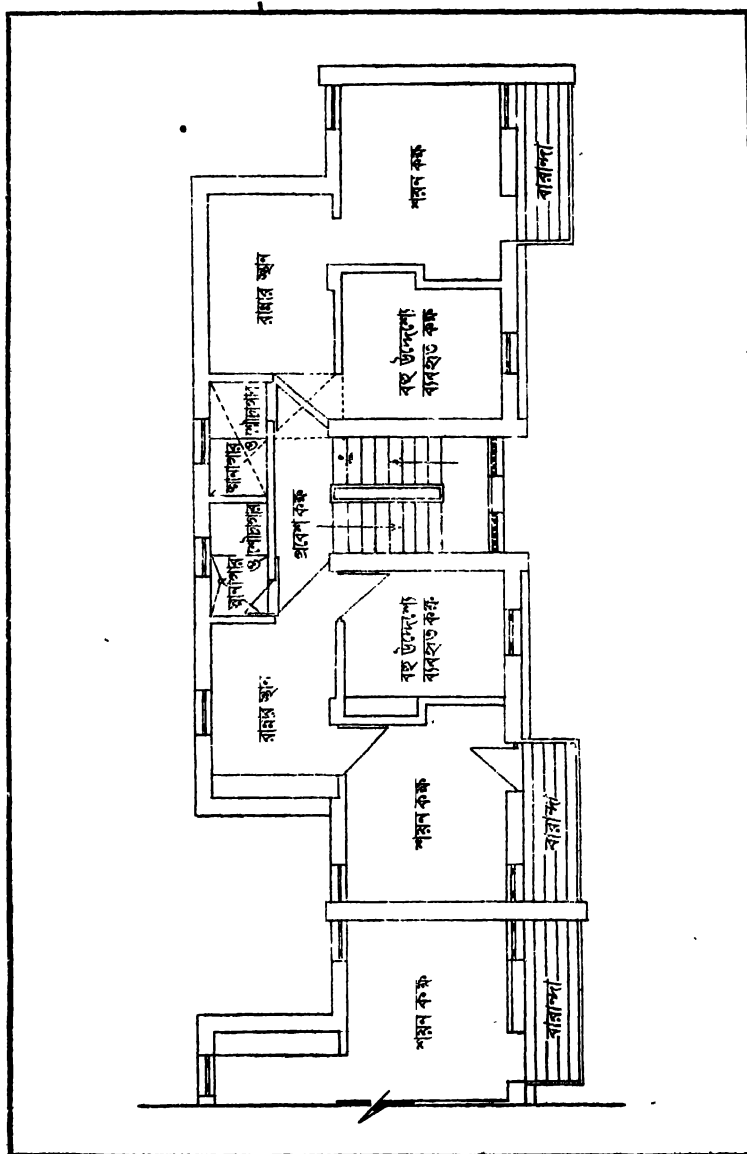
(২) ৭২০০ হইতে ১৮০০০ হাজার পর্যন্ত আয়ের লোকেরা মধ্যবিত্ত এবং



‘গ’ শ্রেণীর ফ্ল্যাট

(৩) তাহার উদ্দেশ্য বাহাদেব আর তাহার উচ্চবিত্ত।

১২৫৪ সাল হইতে সরকার কলিকাতার মত বড় বড় শহরগুলিতে



খ' শ্রেণীর  
ঘর

নিম্নবিস্তারের জন্য এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।  
এইসব ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে একটিমাত্র শয়ন কক্ষ, একটি বাগান এবং একত্রে

একটি স্নানাগার ও শৌচাগার আছে। স্থানের পরিমাণ ২৪০ বর্গফুট। এইরূপ ফ্ল্যাটগুলি 'গ' শ্রেণীভুক্ত ('C' category)।

১৯৫২ সাল হইতে মধ্যবিত্তদের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় একটু উন্নত ধরনের ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। এই ফ্ল্যাটগুলি বিভিন্ন আয়তনের এবং বিভিন্ন মূল্যের। নিম্নে উহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল :

কক্ষের সংখ্যা	স্থানের পরিমাণ ( বর্গফুট )	মূল্য ( হাজারে )
২ কক্ষবিশিষ্ট	৩২৪।৪১৮।৭৪৩	২১ হইতে ৫৩র মধ্যে
২ কক্ষবিশিষ্ট	৩৩৫।৪২৪	২২।৩২
২।৩ কক্ষবিশিষ্ট	৪২৪।৬০০।৮০০	৩০ হইতে ৬৭র মধ্যে

এইসব ফ্ল্যাটগুলি 'খ' শ্রেণীভুক্ত ('B' category)। ইহাতে ১টি বা ২টি শয়নকক্ষ, একটি বহুউদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্মিত কক্ষ (multipurpose room), রান্নাঘর ও খাবার জায়গা এবং স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে।

উচ্চবিত্তদের জন্য আবার বিলাস কক্ষ (luxury apartment) নির্মাণ করা হইতেছে। এইসব ফ্ল্যাটগুলি 'ক' শ্রেণীভুক্ত ('A' category)। ইহাতে গ্যারাজ ও ভৃত্যদেরও থাকার ব্যবস্থা থাকিবে।

### ‘ক’ শ্রেণীভুক্ত ফ্ল্যাট

কক্ষের সংখ্যা	স্থানের পরিমাণ ( বর্গফুট )	মূল্য
২ কক্ষবিশিষ্ট	১০৮০	১,২৫,০০০ টাকা
৩ কক্ষবিশিষ্ট	১২৭৫	২,৩০,০০০ টাকা

বাসগৃহ নির্বাচন : আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাসগৃহ নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির কথা চিন্তা করে—

(ক) সাধারণের ব্যবহার্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (Public Utilities) যথা

- (১) বিদ্যুতের সুবিধা আছে কিনা।
- (২) পানীয় জলের সুবিধা কিরূপ ?
- (৩) নর্দমা এবং অনারম্য ব্যবস্থা (sanitation) উন্নত কিনা।

(খ) সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সমূহ (services) কতটা ?

(১) পথঘাটের সুবিধা কিরূপ ?

(২) দোকান-বাজারের সুবিধা কতটা ?

(৩) শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা। [নিম্নবিস্তৃত লোকেরা স্কুলের শিক্ষার উপর জোর দেয়, পরন্তু মধ্যবিস্তৃতরা কলেজীয় শিক্ষা এবং অন্তান্ত বৃত্তি শিক্ষার কথাও চিন্তা করে।]

(৪) চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে কিনা অর্থাৎ ডাক্তার ও মনুষ্যের দোকান, হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগসুবিধা আছে কিনা।

(গ) উপরোক্ত সুবিধাগুলি ছাড়া মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর লোকেরা গৃহ নির্বাচনের সময় আবার কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের (amenities) কথাও চিন্তা করে, যেমন—

(১) বাড়িটি কোন্ মূখী ? আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ব ও দক্ষিণ দুয়ারী বাড়িই সবচেয়ে ভাল।

(২) নিকটে কোন খেলার মাঠ, খোলা জায়গা অথবা পার্ক আছে কিনা ?

(৩) দিনেমার, বিয়েটার অথবা অন্ত কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের সুবিধা আছে কিনা ?

উচ্চবিস্তৃত পরিবারের লোকেরা গৃহের স্থান নির্বাচনের সময় যেসব বিষয় চিন্তা করেন সেগুলি এই :

(১) জমির পরিমাণ যথেষ্ট কিনা এবং উহার আকৃতিটি সুন্দর কিনা ?

(২) জমিটি কোন্ দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত ?

(৩) জমি উন্নয়নে কিরূপ খরচ পড়িবে ?

(৪) জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে কিনা ?

(৫) জমিটি কি ভরাট ?

(৬) রাস্তাঘাটের দূরত্ব কতটা ? পথঘাট মোটর চলাচলের উপযোগী কিনা ?

(৭) জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, জলবাহিত প্রণালী এবং টেলিফোনের সুবিধা পাওয়া যাইবে কিনা ?

(৮) নিকটে পেট্রোল পাম্প আছে কিনা ?

(৯) প্রতিবেশীরা কোন্ শ্রেণীর ? তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক মান কিরূপ ?

(১০) ঐতিহ্যবাহী সকল বরকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তাহারা চিন্তা করেন।

বাসস্থান পরিকল্পনার মূল নীতি : মানুষ যখন একটি বাসস্থানের নকশা (design) বা পরিকল্পনা (planning) গ্রহণ করে তখন সে তাহার কতগুলি

আকাঙ্ক্ষা বা মূল্যবোধ পরিতৃপ্ত করিতে চায়। বেয়ারের (Beyer)\*-মতে এই মূল্যবোধ হইল নয়টি। গুরুত্ব অনুসারে সাজাইলে উহার। হইল অর্থ বাঁচান (economy), পরিবার কেন্দ্রিকতা (family centrism), দৈহিক স্বাস্থ্য (physical health), সৌন্দর্য (aesthetics), অবসর (leisure), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom), মানসিক স্বাস্থ্য (mental health) এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা (social establishment)। অর্থ বাঁচাইবার জন্ত জমির দাম এবং নির্মাণ খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রত্যেক পরিবারই আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে গৃহ নির্বাচন করিবেন।

নিম্নবিত্তদের আর্থিক আয় এতই নীমাবদ্ধ যে গৃহের নকশা রচনার সময় তাহারা কেবল কোন মতে দিন যাপনের জন্ত একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি মাত্র কক্ষ থাকে এবং উহাকে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে রান্নার একটু জায়গা এবং স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে।

মধ্যবিত্তরা পরিবারকেন্দ্রিক গৃহপরিকল্পনার চেষ্টা করেন। গৃহের প্রত্যেকের জন্ত স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে তবে সকলেই ঘাছাতে আরামে বসিয়া নিজ নিজ কাজ করিতে পারে এবং একত্রে গল্পগুজব করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইরূপ গৃহে অন্ততঃ একটি বা দুইটি শয়ন কক্ষ, একটি বসার ঘর, রান্না ও খাবার জায়গা, স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে।

পরিতৃপ্ত বিন্ধবানরা গৃহপরিকল্পনার সময় পরিবারের প্রয়োজন এবং আরামের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া বেয়ারের (Beyer) নয়টি মূল্যবোধও তাহাদের পরিকল্পনায় কমবেশী প্রাধান্য পায়। প্রথমেই তাহারা সমস্ত গৃহকর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তালিকায় যেসব কাজ স্থান পায় তাহা এই :

- (১) আমোদ-প্রমোদজনিত কাজ ;
- (২) গৃহকর্ম, যেমন—রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ধোওয়া ও ইত্ৰি করা, সেলাই করা ইত্যাদি কাজ ;
- (৩) ব্যক্তিগত কাজ, বিশ্রাম ও নিদ্রা ;
- (৪) উপাসনা ;
- (৫) জিনিদপত্র মজুত করা।

উপরোক্ত সমস্ত কাজের জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্থান থাকে।

## বিভিন্ন কক্ষের আয়তন :

বৈঠকখানার আয়তন—

$$\left\{ \begin{array}{l} ১২' \times ১৬' \\ ১৪' \times ২১' \\ ১৪' \times ২৪' \end{array} \right.$$

শয়নকক্ষের আয়তন—

$$\left\{ \begin{array}{l} ১০' \times ১২' \\ ১২' \times ১৪' \end{array} \right.$$

খাবার ঘরের আয়তন—

$$১২' \times ১২'$$

বসার ঘরে খাবার জায়গার

আয়তন—

$$৮' \times ১২'$$

রান্নাঘরের আয়তন—

$$৮' \times ১২'$$

ভাঁড়ার ঘরের আয়তন—

$$১০' \times ১২'$$

একাধিক স্নানাগার ও—

শৌচাগার

$$\left\{ \begin{array}{l} ৫' \times ৭' \\ ৭' \times ৮' \end{array} \right.$$

ভৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের গৃহের স্থান নির্বাচন : গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত: স্থল, হাসপাতাল, পুলিশ ফাঁড়ি, রাস্তাঘাট, বাস চলাচল, খেলার মাঠ, খোলা জায়গা এবং কমিউনিটি সেন্টারের সন্নিবিষ্ট দেখিয়া বাসস্থান নির্বাচন করেন।

তাহাদের গৃহপরিকল্পনায় বসার ঘর, শয়ন কক্ষ, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি ব্যতীত বারান্দা, খানিকটা খোলা জায়গা, গোশালা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে।

সরকারী সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যেসব গৃহ মজবুত, স্বাস্থ্যপ্রদ, আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে তৈরী করা সম্ভব, নিরাপদ ও বাড়ির লোকেদের আত্ম রক্ষা করে, ধর্ম বিশ্বাসে বাধা দেয় না সেই সব বাসস্থানই গ্রামবাসীদের নিকট গ্রহণ যোগ্য।

## ৩. বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিবিধ কক্ষের ব্যবহার

( Allocating rooms for different purposes )

একটি পরিবারের লোকেদের কি ধরনের অথবা কতগুলি কক্ষবিশিষ্ট গৃহের প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ভর করে প্রধানত:

- (১) পরিবারের আকৃতি বা আয়তনের উপর ;
- (২) পরিবারের লোকেদের অভ্যাস, রুচি ও সামর্থ্যের উপর ;
- (৩) গৃহে কি ধরনের এবং কতখানি কাজ অহুষ্ঠিত হইবে তাহার উপর।

মোটকথা একটি সুপরিকল্পিত গৃহের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া পরিবারের



লোকেদের অভ্যাস, কুচি এবং চরিত্র প্রতিকলিত হয়। তবে সাধারণতঃ আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে প্রয়োজন অস্থায়ী একাধিক শয়ন ঘর, একটি বৈঠকখানা, রান্নাঘর ও খাবার জন্ত একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। তদুপরি অনেক গৃহে পড়ার ঘর ও পূজার ঘর থাকে। সাধ্য থাকিলে একটি শিশু কক্ষও রাখা উচিত। এখানে বিভিন্ন কক্ষের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(১) শয়ন কক্ষ ( Bed room ) : গৃহে অন্ত্যন্ত সমস্ত কক্ষের তুলনায় শয়নকক্ষের গুরুত্ব অনেক বেশী। শয়নকক্ষটি আমাদের নিজা, বিশ্রাম ও মানসিক শান্তিলাভের জন্ত একান্ত প্রয়োজন। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিজস্ব শয়নকক্ষ মাহুষের বিশ্রামলাভে সাহায্য করে, মনের শান্তি ও আনন্দ গভীর করে এবং বাস্তব জীবনেও তাহার কর্মক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে। বাড়িতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত উপযুক্ত শয়নকক্ষ থাকা দরকার।

বাড়িতে কতগুলি শয়নকক্ষ থাকিবে উহা নির্ভর করে পরিবারের লোকসংখ্যা, সম্ভাবনা কোন্ বয়সের, তাহার ছেলে না মেয়ে এই সবের উপর। সাধারণতঃ একজন লোকের পক্ষে একটি ১০ ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ঘর হইলেই চলে। একাধিক ব্যক্তি একটি কক্ষ ব্যবহার করিলে কক্ষগুলি আয়তনে বড় হইবে নতুবা পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হইবে এবং লোকেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইবে।

শয়নকক্ষটি প্রশস্ত হইলে প্রয়োজন মত অল্প কাজেও ব্যবহার করা চলে, যেমন,

- (১) বসার ঘর হিসাবে ;
- (২) পড়ার ঘর হিসাবে ;
- (৩) শিশুদের খেলার ঘররূপে ;
- (৪) সাজ-পোশাক করার জন্ত ;
- (৫) আবার কখনো বা ব্যক্তিগত শখের কাজও এখানে বসিয়া করা চলে।

শয়নকক্ষে প্রত্যেকের পোশাক রাখার জন্ত আলমারি, আলনা কিংবা বইয়ের তাক ইত্যাদি রাখা যায়।

বৈঠকখানা ( Living room ) : সামাজিক মেলামেশা এবং বাড়ির সকলে মিলিয়া অবসর যাপনের জন্ত একটি বৈঠকখানার প্রয়োজন অহুত্বত হয়। বাড়িতে যাহাদের লোক সমাগম বেশী হয় কিংবা যাহাদের অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার দরকার তাহাদের বৈঠকখানা ঘরটি প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজকাল অনেক গৃহেই বৈঠকখানার মধ্যে খাবারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূপ লিভিং-কাম-ডাইনিং রুমগুলি (Living-cum-dining room) আরতনে বেশ প্রশস্ত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র বাড়িতেও একটু খোলামেলা ভাব সৃষ্টি করে। প্রয়োজনে খাবার টেবিলটি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া এইরূপ কক্ষকে অস্ত্রান্ত উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যায়, যেমন,

- (১) শিশুদের খেলার ঘররূপে,
- (২) ছেলেদের পড়ার ঘর হিসাবে,
- (৩) গৃহিণীর সেলাই-কক্ষরূপে,
- (৪) সাময়িক অতিথির শয়ন কক্ষরূপে।

**শিশুকক্ষ (Nursery) :** জীবনযাত্রার সর্বত্র বয়স্ক ব্যক্তির প্রাধান্য। আমরা বয়স্কদের শ্রম, বিশ্রাম এবং চিন্তাবিনোদনের যেরূপ গুরুত্ব দিয়া থাকি শিশুদের জীবনের প্রয়োজনগুলির সেরূপ গুরুত্ব দিই না। অথচ শিশুদেরও খেলাধুলা এবং অস্ত্রান্ত কাজের প্রয়োজন আছে কারণ এইরূপ খেলাধুলার মধ্য দিয়াই সে আত্মবিকাশের সুযোগ পায়, স্বাবলম্বী হইতে শেখে এবং প্রকৃত সামাজিক হইয়া ওঠে। প্রত্যেক বাড়িতে তাই খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং শিশুর উপযোগী কিছু আসবাব থাকা দরকার। সম্ভব হইলে এইসব সরঞ্জাম দিয়া একটি শিশুকক্ষের ব্যবস্থা করা উচিত। ধনীগৃহে একটি শিশুগৃহের ব্যবস্থা করা কঠিন নয়।

**আসবাব :** আসবাবের মধ্যে শিশুদের ক্ষুদ্র দেহের উপযোগী একটি ছোট খাট, ছোট চেয়ার, নীচু টেবিল, আলমারি এবং সিঁচ ইত্যাদি থাকিবে যেগুলি বড়দের সাহায্য ছাড়া নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই ধরনের সামগ্রী শিশুকে যেমন স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দিবে তেমনি নিজের কাজ নিজে করিতে পারিয়া শিশু আনন্দলাভ করিবে।

**খেলনা ও অস্ত্রান্ত সরঞ্জাম :** নার্সারী বা শিশুকক্ষের প্রধান উপকরণ হইবে কিছু খেলনা। শিশুর জন্ম কোন দামী খেলনা কিনিবার প্রয়োজন নাই। দামী জিনিসের মূল্য শিশু বোঝে না, সে চায় কিছু 'কাজের জিনিস'। তাহার প্রয়োজনোপযোগী কিছু সুলভ সাধারণ খেলনা দিলেই সে তৃপ্ত হয়। বয়স্কদের প্রত্যেকেরই যেমন কাজের কিছু-না-কিছু উপকরণ থাকে শিশুদের জীবনেও তেমনি কাজের উপকরণ চাই। শিশুর প্রধান কাজই হইল খেলা। খেলার মধ্য দিয়া সে এক গোপন কর্মপ্রবাহের সন্ধান পায় এবং খেলনাই শিশুর কাজের উপকরণ। শিশুর জীবনে তাই খেলনার গুরুত্ব খুব বেশী। উপযুক্ত খেলনা পাইলে (১) শিশুর দেহ সুগঠিত হয়। (২) জগৎ সম্বন্ধে

তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে। (৩) তাহার স্বজনস্পর্শা তৃপ্ত হয় এবং (৪) কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। তাই শিশুর জ্ঞান নিম্নলিখিত খেলনা রাখিতে হইবে :

(১) **পেশী সঞ্চালক খেলনা :** শিশুর প্রথম প্রয়োজন তাহার দৈহিক বিকাশ। তাহার ক্ষুদ্র দেহের পেশীগুলি যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হইতে পারে এইজন্ত তাহার কিছু পেশী সঞ্চালক বা দৌড়ঝাপের খেলা দরকার। একটি ছোট সাইকেল, কাঠের দোলনা, চাকা লাগান কাঠের বাক্স ও পিপে শিশুর উপযুক্ত খেলনা। সম্ভব হইলে বাড়িতে একটি স্লাইডও রাখা চলে।

(২) **পরীক্ষামূলক খেলনা :** সব শিশুই নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। তাই হাতের কাছে যাহা পায় তাহা লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিতে ভালবাসে। জল, বালি, কাদামাটি সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ খুব বেশী। শিশুর জ্ঞান কিছু বালি এবং কাদামাটির ব্যবস্থা করা সব বাড়িতে সম্ভব। তাছাড়া তাহার উপযোগী ছোট বালতি, কোদাল, ঝারি, রবারের নল, নানা আকারের শিশি-বোতল, জলে ভাসান যায় সেলুলয়েডের এইরূপ কিছু খেলনা রাখিলে শিশু ঐগুলির প্রকৃতি ও ব্যবহার জানিয়া আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করে।

(৩) **স্বজনমূলক খেলনা :** বয়স্কদের মতই শিশুও নতুন কিছু করিয়া আনন্দ পায় এবং তাহার মধ্যে স্বজনের একটি ইচ্ছা তৃপ্ত রহিয়াছে। খুব সাধারণ জিনিস দিয়া সে 'রেলগাড়ি', 'বাড়ি বাড়ি' খেলা শুরু করিয়া দেয়। তাহার জ্ঞান কিছু খালি দেশলাইএর বাক্স, নানা রকমের গাছ, রঙ, খড়ি, তুলি, বুরুশ, কাঁচি, তাছাড়া কিছুক, হুড়ি, তেঁতুলবীচি ইত্যাদি রাখিয়া দিলে সে নানা জিনিস তৈয়ারী করিয়া হাতের কাছে দক্ষতালাভ করিতে পারে।

(৪) **কল্পনাবিকাশী খেলনা :** অহুকরণপ্রিয়তা শিশুদের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। বড়দের অহুকরণ করিয়া ছোটরা রান্নাবান্ন করে, কেউবা ভাস্কর, শিক্ষক, রেলগাড়ির ড্রাইভার ইত্যাদি সাজিয়া বসে। শিশুদের নাসার্গীয় কক্ষে তাহাদের স্বভাব অহুযায়ী কিছু রান্নার সরঞ্জাম, রঙিন ছবির বই এবং অস্ত্রাস্ত্র উপকরণও রাখিতে হয়।

জন্মের পর প্রথম ২৩ মাস বয়স হইতেই শিশুকে তাহার নিজস্ব কক্ষে রাখার অভ্যাস করান যাইতে পারে। বড় হইয়াও সে তাহার নিজের কক্ষটিই ব্যবহার করিবে।

গৃহে কোন সাময়িক অতিথি আসিলে শিশুকক্ষটিকে অতিথি-কক্ষরূপে ব্যবহার করা যায়।

**রান্নাঘর (Kitchen) :** প্রত্যেক বাড়িতেই একটি রান্নাঘর থাকে। রান্নাঘরের পরিকল্পনা এবং জিনিসপত্র যেন গৃহিণীর শ্রম বাঁচাইতে সাহায্য করে। স্বতন্ত্র ভাঁড়ার ঘর না থাকিলে রান্নাঘরের মধ্যেই যথেষ্ট তাক, সম্ভব হইলে আলমারি প্রস্তুত করাইয়া বাসনকোসন ও ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়।

রান্নাঘর ও খাবার ঘর পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে একুপ দুইটি পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে রান্নাঘরেরই একটি প্রশস্ত কোণ বাড়িয়া লইয়া খাবার জায়গা করিতে হয়। প্রয়োজনে রান্নাঘরকে অন্ত উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যায়, যেমন—

- (১) খাবার ঘর হিসাবে ;
- (২) ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ;
- (৩) ইঞ্জি করার জন্ত ;
- (৪) প্রশস্ত হইলে এবং অন্ত কোন ব্যবস্থা না থাকিলে ভূতোর শয়নকক্ষ-রূপে।

**ভাঁড়ার ঘর (Store room) :** রান্নাঘরের পাশেই ভাঁড়ার ঘরটি থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাঁড়ার ঘরটিতে ভাঁড়ারের জিনিসপত্রই সাধারণতঃ রাখা হয়, তবে অল্পভাবেও ব্যবহার করা চলে, যেমন—বাড়ির বাড়তি জিনিসপত্র যথা, বাগানের সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, অতিরিক্ত বাসনকোসন ইত্যাদি এখানে সংরক্ষণ করা যায়।

**পড়ার ঘর (Study) :** প্রত্যেক বাড়িতেই দুই একটি ছেলেমেয়ে থাকে। অনেক বাড়িতে তাহাদের পড়াশুনার জন্ত একটি পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা থাকে। পড়ার ঘরে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় বই ও খাতাপত্র, ম্যাপ, গ্লোব ও অন্যান্য সরঞ্জাম থাকিবে। প্রয়োজনে পড়ার ঘরটিকে অন্ত উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা চলে, যেমন—

- (১) খাবার ঘর হিসাবে,
- (২) খেলার জায়গা হিসাবে,
- (৩) অতিথিকক্ষরূপে।
- (৪) গৃহের কোন ব্যক্তির সাময়িক বিশ্রামকক্ষরূপে।

**স্নানাগার (Bathroom) :** প্রত্যেক বাড়িতেই একটি কিংবা একাধিক স্নানাগার থাকে। প্রয়োজন মত স্নানাগারটি ধোঁতাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

#### ৪. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ-পরিকল্পনা

(Interior decoration and colour schemes)

শিল্প-সৃষ্টি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ হাতের কাছে যা যা পায় তাহাকেই সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কুস্তকার মাটির গায়ে কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া সুন্দর ঘট-পট তৈয়ারী করে, চিত্রকর কাগজের গায়ে রেখা টানিয়া দৃষ্টিমধুর চিত্রাঙ্কন করে, ছুতোয় কাঁচ কাটিয়া চমৎকার আসবাব তৈয়ারী করে, স্থপতি পাথর খুঁদিয়া মূর্তি গড়ে, মানুষের স্বভাবই হইল অতি সাধারণ জিনিসকে সুন্দর করিয়া তোলা। যে গৃহে আমরা বাস করি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল সবচেয়ে পরিচিত এবং নিকটতম বস্তু। একটুখানি প্রসাধনের সাহায্যে উহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিলে সমস্ত জীবনযাত্রা মনোরম হইয়া ওঠে।

গৃহসজ্জা কারুশিল্পের ( fine arts ) অন্তর্গত নয়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত কিংবা সাহিত্য রচনা, স্থাপত্য বিজ্ঞা ইত্যাদি সকলই কারুশিল্পের অন্তর্গত কেননা এই সব ক্ষেত্রে শিল্প শিল্পীর অন্তরের অহুপম সৃষ্টি। পরন্তু গৃহসজ্জা আলঙ্কারিক শিল্প ( decorative art ) বলিয়া গণ্য। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পবস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহা আপনাতে আপনি পূর্ণ। দর্শকের লক্ষ্যস্থল ঐ শিল্পদ্রব্যটি। আলঙ্কারিক শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শিল্পী এখানে নতুন জিনিস সৃষ্টি করেন না, অপরের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহাতে কতকগুলি আলঙ্কারিক বস্তু সংযোগ করেন মাত্র। এই বস্তুগুলি সুন্দর বটে তবে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তুর সৌন্দর্য বাড়ান। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে একজন চিত্রকর অনেক চিত্র আঁকিতে পারেন এবং প্রত্যেকটি চিত্রেই হয়ত শিল্প হিসাবে অতুলনীয় কিন্তু তাই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ঐরূপ অনেক চিত্র রাখিলে স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে। শুধু চিত্র সন্নিবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপত্রের নির্বাচন, পুষ্পবিজ্ঞাস, পর্দার রং নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই গৃহ-প্রসাধনকারীর নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্তু এবং গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহার। সর্বদাই গোণ ভূমিকা অবলম্বন করিবে।

**আলঙ্কারিক শিল্পের মূল নীতি :** কারুশিল্পের সঙ্গে প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পের একটি ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মূল নীতিগুলিই এক। কারুশিল্পের মতই অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতি হইল পাঁচটি—সঙ্গতি ( proportion ), সামঞ্জস্য ( balance ), সমন্বয় ( harmony ), ছন্দ

(rhythm) ও গুরুত্ব (emphasis)। এই পাঁচটির সমাবেশ না ঘটিলে প্রত্যেক শিল্পসম্প্রদায় ব্যর্থ হইয়া যায়।

(১) সঙ্গতি (Proportion): দুইটি জিনিসের পারস্পরিক সম্বন্ধের মিজতা বা মিলনের নামই সঙ্গতি। এই মিজতা পূর্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে অংশের মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রসাধনে এই সঙ্গতি বা মিজতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

(২) সামঞ্জস্য (Balance): কাকশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংবা আলংকারিক শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক শিল্পবস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকিলে সমস্ত জিনিসটির সৌন্দর্য যথার্থ ক্ষুণ্ণিত হয়। গৃহ-প্রসাধনের সময় যখন আসবাব বা অন্যান্য বস্তু সমাবেশের বাহুল্যে সমস্ত মনটা একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তখন তাহার বিপরীত অংশে কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সর্বদা যে দুই দিকে একই মূল্যের বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে এইরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। দুই দিকে জটিল মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একদিকে ভারী বস্তু এবং বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ করিয়াও এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। সামঞ্জস্য রক্ষার দুই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

(ক) চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য (formal balance)

(খ) অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (informal balance)

চাক্ষুষ সামঞ্জস্য (Formal balance): কেন্দ্র স্থির রাখিয়া দুই দিকেই যদি সমান গুরুত্বের জিনিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য। যেমন একটি টেবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক করিয়া সমান দূরত্ব বজায় রাখিয়া যদি একই নকশার সমান মাপের সমান ওজনের দুইটি ফুলদানী সাজান হয় তবে উহাদের আমরা চাক্ষুষ সামঞ্জস্য বলিব। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই দিককার বস্তুর গুরুত্ব সমান দেওয়া হইয়াছে।

অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য (Informal balance): গৃহ প্রসাধনের বেলায় যখন সমান গুরুত্বের জিনিস দিয়া ঘর না সাজাইয়া একদিককার প্রসাধনে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি ঐ দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অন্তরিক্তে সাদামাটা কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা হয় তখন তাহাকে বলে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য। গৃহ-প্রসাধনে যদিও প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য রক্ষার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে তবু এই প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্যের নীতি যদি সমস্ত বাড়িটিতে মানিয়া চলা হয় তবে তাহা নিতান্তই হাচে ঢালা সাজ বলিয়া

প্রতিভাত হয়। হাঁচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন সজ্জা একঘেয়ে খাত্তের মতই বিরক্তিকর।

(৩) **সমন্বয় (Harmony)** : সমন্বয় শিল্পতত্ত্বের অগ্রতম মূলনীতি। গৃহে শুধুমাত্র কতকগুলি দামি দামি জিনিস জড় করিলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল। আলঙ্কারিক শিল্পের আসল কৃতিত্ব যাবতীয় সামগ্রীর একত্র সন্নিবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় বা এক্য সাধনে।

(৪) **ছন্দ (Rhythm)** : গৃহসজ্জার আর একটি লক্ষ্য হইল ছন্দ রক্ষা। এই ছন্দগতি বা ছন্দলীলা ঠিক কি জিনিস তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। নঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে, নানা তাল এবং বিরামের মধ্য দিয়া ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। ছন্দের এই উচ্চ-নীচ গতি, এই নতুনত্বই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ। গতি (movement) এবং পুনরাবৃত্তি (repetition) হইল ছন্দের প্রাণ।

চলিতে চলিতে ছন্দের গতি স্থির হইয়া যায়। ইহার নাম যতি। যতির শেষে আবার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ গতির শেষে কিছুকণ বিরাম, আবার গতি। গতি এবং যতি উভয়ে মিলিয়া ছন্দ। এই ছন্দ কারুশিল্পে এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পেই অনুভূত হয়। গৃহ-প্রসাধনের বেলাতেও উহার চিত্রসন্নিবেশে, আসবাবপত্র সংস্থানে এই ছন্দ মানিয়া চলা দরকার। সমস্ত কক্ষে যতগুলি বস্তু সাজান হইবে একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে পরিমিত ব্যবধান রাখিয়া চল। এই যতির নিয়ম মানিয়া চলিলে গৃহের কোন এক স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না। সমস্ত কক্ষটি যেন একটি ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচিয়া বেড়াইবে। প্রত্যেক বার যতির পরেই একটি নতুন কিছু দেখার জন্ত মন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝখানের এই যতি বা বিরাম না থাকিলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য অনুভব করা যায় না এবং সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। যতি আছে বলিয়াই বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপভোগ করা যায়।

(৫) **গুরুত্ব (Emphasis)** : গৃহ-প্রসাধনের অগ্রতম মূলনীতি হইল গুরুত্ব। প্রতি কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখা প্রয়োজন, যেমন বসার ঘরে একটি কার্পেট কিংবা ডিভান, শয়নকক্ষে একটি সুদৃশ্য আসবাব বা একটি তৈলচিত্র, খাবার ঘরের টেবিলে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখিলে গৃহে প্রবেশ করিবার পরে দৃষ্টি গিয়া ঐখানে নিবদ্ধ হয় এবং মন-কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পথের

এইভাবে প্রতি কক্ষই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সংযোগ করিলে গৃহে একটি স্বন্দর গভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং গৃহ প্রসাধন সার্থক হইয়া ওঠে।

অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতিগুলি আলোচিত হইল। এইবার গৃহপ্রসাধনের কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

উপরোক্ত নীতিগুলি কারুশিল্প এবং আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। ইহাদের স্বরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত দিতে হয়। তবে গৃহপ্রসাধনের আবার নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে। সেগুলি হইল বর্জন (elimination), পুনর্বিন্যাস (rearrangement) ও গোপন (concealment)।

**বর্জন :** গৃহ প্রসাধনের প্রথম সূত্র হইল বর্জন। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু-না-কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক জিনিস থাকে যাহার সঙ্গে বাড়ির লোকদের একটা আবেগ জড়িত থাকে। ঘর সাজাইবার সময় তাহারা সচরাচর এইসব জিনিসগুলি বাদ দিতে চান না। কিন্তু উহারা যদি কক্ষের সৌন্দর্যবুদ্ধির সহায়ক না হয় তবে নির্মম হস্তে এইসব জিনিসকে বর্জন করিতে হয়।

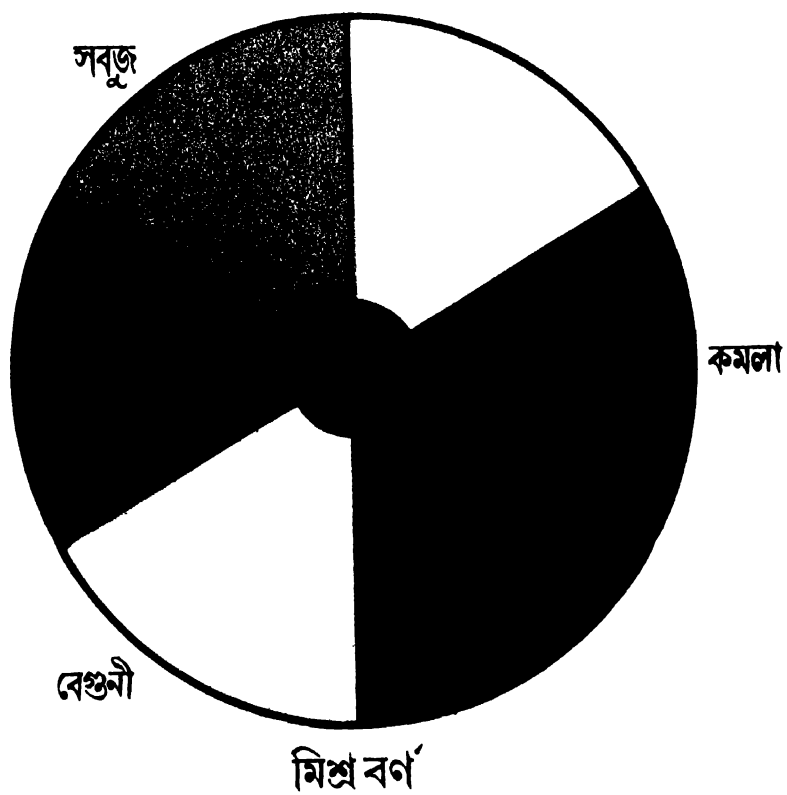
**পুনর্বিন্যাস :** বরাবর একভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন এক্ষেত্রে বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়ির জিনিসপত্র অদলবদল করিয়া সাজাইলে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হইয়া ওঠে।

**গোপন :** গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন। গৃহের কোন গঠনগত ত্রুটি কিংবা দৈন্ত গোপন করা প্রসাধনকারীর অঙ্গতম দায়িত্ব। যেমন, ঘরে ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওয়ালপেপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, পুরাতন কিংবা বাড়তি জিনিসগুলি পর্দা দিয়া আড়াল করিয়া গৃহে অনাড়ম্বর সৌন্দর্য ফুটান যায়। বস্তুতঃ কি বর্জন করিব, কি গোপন করিব এবং হাতের কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রী রহিল উহাদের কিভাবে পুনর্বিন্যাস করিব তাহারই উপর নির্ভর করে গৃহপ্রসাধনের সাক্ষ্য।

**বর্ণ-পরিষ্কারণ (Colour Scheme) :** গৃহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রঙ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ যে কোন প্রসাধনের মূল্য নির্ণয়ের পূর্বে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। শিশুরা অল্প বয়সেই বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মানুষের উপর বর্ণের প্রভাব খুব বেশী। গানে স্বর সংযোগ করিলে যেমন নতুন মূল্য পাইয়া উহা উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, গৃহ-প্রসাধনে তেমনি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাস করিতে পারিলে উহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, চিস্তাকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে। কক্ষের মেঝে, দেওয়াল হইতে শুরু করিয়া আসবাবপত্র, পর্দা, বাতি প্রভৃতির রঙ নির্বাচনে মূল্যায়নের দরকার।







**উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ (Warm colour) :** শুদ্ধ বর্ণগুলির মধ্যে লাল ও হলুদ এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণগুলি উষ্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। পরন্তু নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণগুলি শীতল বা শিথল বর্ণ (cool colour) নামে পরিচিত। শুদ্ধ নীল এবং নীলাভ-সবুজ (নীল ও

সামান্য হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন) বর্ণ দুইটি সবচেয়ে স্নিগ্ধ। কিন্তু নীলের সঙ্গেই যদি আবার হলুদের পরিমাণ বেশী দিয়া হরিত্রাভ-সবুজ বর্ণ প্রস্তুত করা হয় তবে উহা উজ্জল বর্ণে পর্যবসিত হইবে। সাধারণতঃ উজ্জল বর্ণ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া চক্ষুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং স্নিগ্ধ বর্ণ আমাদের চক্ষু জুড়ায়, অন্তর ভৃগু করে।

বিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা থাকে। বস্তু যে বর্ণটি আত্মসাৎ করিতে পারে না সেই বর্ণই বস্তুর দেহে প্রতিফলিত হয়। গাঁদাফুল সমস্ত বর্ণ পরিপাক করিয়া ফেলে কেবল হরিত্রা বর্ণটি পরিপাক করিবার ক্ষমতা উহার নাই। তাই গাঁদাফুল আমাদের চোখে হলুদ দেখায়। যে বস্তু কোন বর্ণই আত্মসাৎ করিতে পারে না উহাকে সাদা দেখায় এবং যে বস্তু সব বর্ণ আত্মসাৎ করিয়া বসে উহাকে আমরা কালো দেখি। শুদ্ধ, মিশ্র এবং প্রাস্তিক বর্ণের নানা অল্পপাতের মিশ্রণে আমরা শতশত বর্ণ দেখি।

**মিত্র ও বিবাদী বর্ণ :** বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নানা জাতীয় সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি বর্ণের মধ্যে মিত্রতার ( harmony ) সম্পর্ক এবং কতকগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের ( contrast ) সম্পর্ক বিद्यমান। এই সম্পর্ক অনেকটা সঙ্গীত শাস্ত্রের বাদী-বিবাদী সুরের মত। মিত্রভাবাপন্ন বর্ণগুলি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, আর বিপরীত বর্ণগুলি একে অপরকে বিদ্বেষ করে, একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিবাদী বর্ণগুলি পরস্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী বর্ণের সমন্বয়ে ও সম্মিলনে পরস্পরের বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহার। একে অপরের পরিপূরক বলিয়া গণ্য হয়।

বর্ণচক্রে মাত্র বায়োটি পরিপূরক বর্ণ দেখানো হইল। বিচক্ষণ শিল্পীরা বর্ণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার কচিমত গৃহ প্রসাধন করিবেন। গৃহপ্রসাধনে রঙের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

**মনের উপর বর্ণের প্রতিক্রিয়া ;** মনের সঙ্গে বর্ণের একটি নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। একেকটি বর্ণ আমাদের মনে একেকটি ভাব জাগায়। নীচে কয়েকটি বিশেষ বর্ণের প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছি।

**সাদা রঙ :** পবিত্রতাবের প্রতীক। মনে নির্মল ও শুচিভাব আনে। সরস্বতী স্বেতবর্ণা ও স্বেতবসনা—কারণ তিনি অজ্ঞান দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালান।

**লাল রঙ :** রক্ত ও আগুনের বর্ণ। উভয়ই আমাদের জীবনস্বরূপ। লাল রঙ মনে শক্তি সঞ্চার করে ও কর্মে উদ্বীপনা জাগায়। তবে টকটকে লাল রঙটি খুব উজ্জ্বল বলিয়া গৃহসজ্জায় উহার বহুল ব্যবহার চলে না।

**হলুদ রঙ :** অনেক বাড়ির দরজা-জানালা এবং দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই রঙটি দেখা যায়। সূর্যরশ্মির সোনালী রঙটি হলুদেরই একটি মিশ্র বর্ণ। যে কক্ষে সূর্যালোক প্রবেশ করে না সেখানে হলুদ রঙের ফুল কিংবা পর্দা দিয়া সূর্যালোকের ছটা আনা যায়।

**নীল রঙ :** আকাশ ও সমুদ্রের রঙ। মনকে সতেজ, স্নিগ্ধ ও নির্মল রাখিতে সাহায্য করে। অনেকেই শয়ন কক্ষের পর্দা ও বাতিতে নীল রঙটি পছন্দ করেন।

**কমলা রঙ :** নীল ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ। মনে আশা, উৎসাহ ও সৌহার্দের ভাব জাগায়। বসন্ত ঋতুর উপযোগী এই রঙটি।

**বেগুনী রঙ :** লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন। বেগুনী রঙ মনের উপর একটি স্নিগ্ধ প্রতিক্রিয়া করে। গৃহসজ্জায় উহার সীমিত ব্যবহার চলে।

**সবুজ রঙ :** হলুদ ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন। মনকে সরস, সতেজ ও নবীন রাখে। অতিশয় স্নিগ্ধ বর্ণ তবে সবুজের মধ্যে হলুদের ভাগ বেশী হইলে সবুজ রঙ উগ্র হইয়া পড়ে।

## আলপনা

বাংলার পল্লীজীবনে একদিন যখন প্রাচুর্য ছিল তখন ব্রত এবং পূজা-অর্চনা লইয়া মেয়েদের দিনগুলি কাটিত। আলপনা প্রথমে ব্রতেরই একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল এবং লক্ষ্মীব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারাব্রত ইত্যাদি সকল ব্রতেই আলপনা দিবার প্রচলন ছিল। আজকাল উৎসবে-অনুষ্ঠানেও আলপনা দিতে দেখা যায় এবং ইহা ক্রমশঃ গৃহসজ্জার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলপনা শিল্পটি এক সময়ে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তারপর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুর চেষ্টায় উহা পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে।

**আলপনা কাহাকে বলে ?** সংস্কৃত ‘আলিমপন্’ শব্দ হইতে আলপনা কথাটির উৎপত্তি। মূল ধাতু ‘লিপ’ কথার অর্থ ‘চিত্রণ’ ( to paint ) নয়, উহার অর্থ ‘লেপন’ ( to plaster )।

আলপনার উপকরণ বড় সামান্য। খানিকটা ভিজা আতপ চাউলের পিটুলি হইল আলপনার প্রধান উপকরণ। পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড আঙ্গুলে জড়াইয়া লইয়া পিটুলির সাহায্যে মেয়েরা মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে ছবি আঁকে তাহারই নাম আলপনা।

**আলপনার উপকরণ :** চাউলের পিটুলিই হইল আলপনার প্রধান উপকরণ এবং মেয়েদের আলপনে অড়ান বস্ত্রখণ্ডটি তুলির কাজ করে। চালের পরিবর্তে চকের গুঁড়া কিংবা জিংক অক্সাইডের সঙ্গে গদ মিশাইয়া লইয়া চমৎকার আলপনা দেওয়া যায় এবং ঐ আলপনা পিটুলির আলপনার তুলনায় স্থায়ী এবং উজ্জ্বল হয়।

**আলপনার রঙের ব্যবহার :** অনেকে আলপনায় বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করেন। কালো রঙের জন্ত কাঠ কয়লার গুঁড়া, লাল রঙের জন্ত লাল আবির, সবুজ রঙের জন্ত পাতার রস—সাধারণতঃ শিম পাতার রস এবং বাদামী রঙের জন্ত ইটের গুঁড়া ব্যবহার করা চলিতে পারে।

**বিভিন্ন দেশের আলপনা :** আলপনা বাংলাদেশের কোন নিজস্ব শিল্প নয়। বাংলা দেশেই এই শিল্পটির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। বস্তুতঃ ভারতের সর্বত্রই আলপনার প্রচলন আছে এবং বাংলা দেশ হইতে শুরু করিয়া উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কেরল ইত্যাদি সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলিতেই এই শিল্পটি বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

**বাংলাদেশ :** সাধারণতঃ ব্রত, বিবাহাদি মঙ্গলকর্ম ও অগ্রাশ্র আচার-



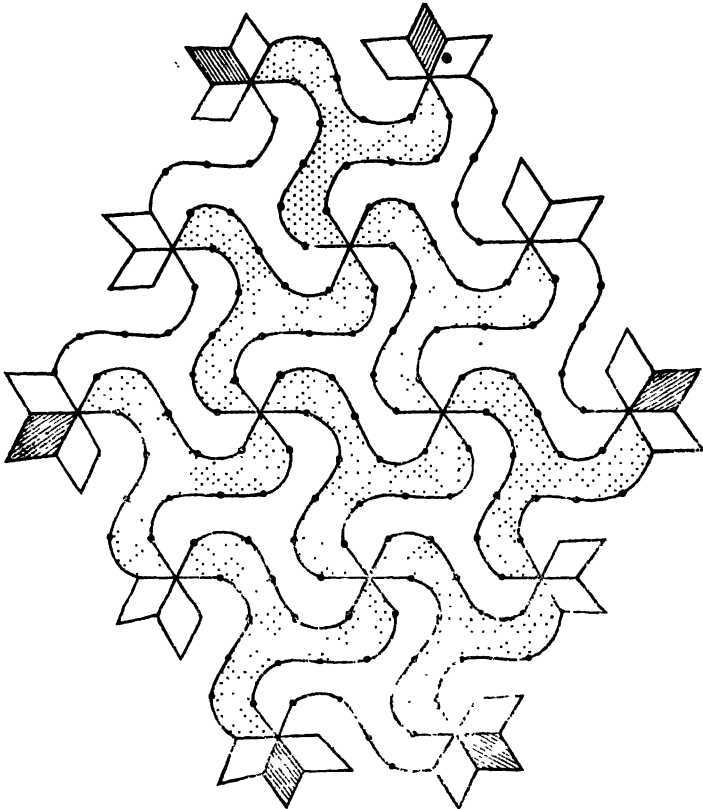
অহুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলা দেশে তরল ও শুষ্ক উভয় প্রকার আলপনা দিবার রীতি আছে। পিটুলি গোলা দিয়া সচরাচর তরল

আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়া শুকনো গুঁড়ো, যেমন কাঠকয়লার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, চাল ও খড়ির গুঁড়ো, আবির ইত্যাদি দিয়া শুক আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। তাছাড়া ফস কাটিয়া রেকাবিতে ফলের আলপনা ও বিভিন্ন ফলের আলপনা বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

**উড়িষ্যা :** উড়িষ্যা অঞ্চলে ধুলি ও কাদামাটির সাহায্যে আলপনা দিবার প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার এই আলপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুৎশিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের অন্তর্গত। উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে ঐ রাজ্যের আলপনার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

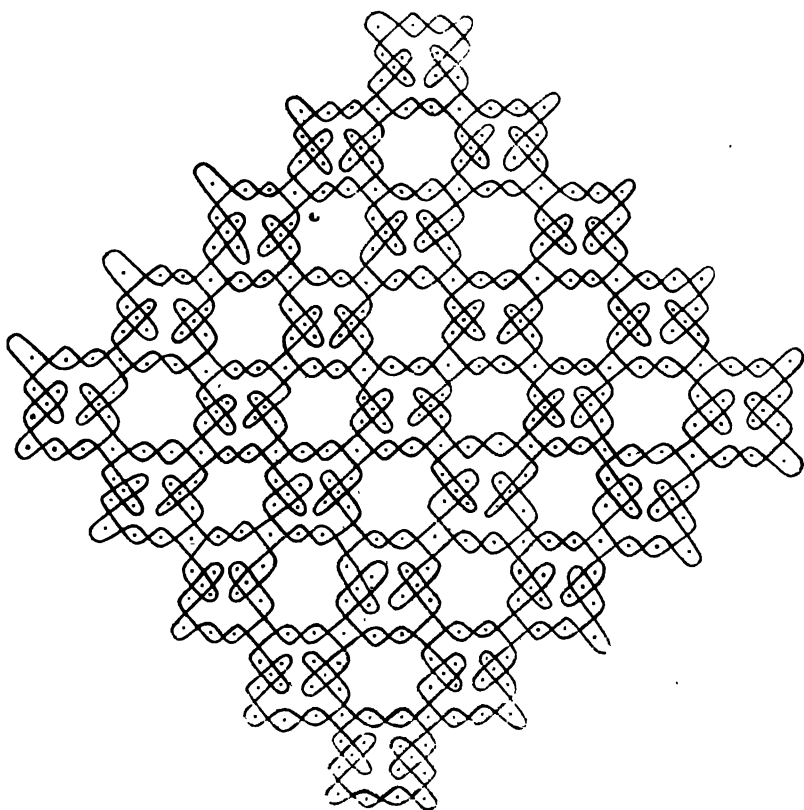
**গুজরাট :** গুজরাট অঞ্চলে অতিথির সম্মানার্থে ভোজনের স্থানে আলপনা দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে রঙ্গোলি বা রঙ্গরেখাবলি বলা হয়।

**দক্ষিণ ভারত :** দক্ষিণ ভারতে পিটুলি ব্যতীত অগাধ কতকগুলি শুকনো উপাদান, যেমন চাল, ডাল, বিভিন্ন মশলা ও শস্ত আলপনায় ব্যবহার করা



দক্ষিণ ভারতে: আলপনা (ক)

হয়। প্রথমে লোহার পাত কিংবা ডাইস কাটিয়া বিভিন্ন নকশা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। আলপনার স্থানে ঐ ডাইস বসাইয়া বং মিলাইয়া বিভিন্ন বং অথবা শস্ত ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর ঐ ডাইসটি তুলিয়া নিলেই স্বন্দর আলপনা অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ ভারতে আলপনা দৈনন্দিন গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপাদান। প্রতিদিন প্রভাতে গোবরমাটি দিয়া আঙিনা নিকাইয়া পিটুলি গোলা জল দিয়া দক্ষিণী মেয়েরা সাধারণতঃ জ্যামিতিক নকশার আলপনা



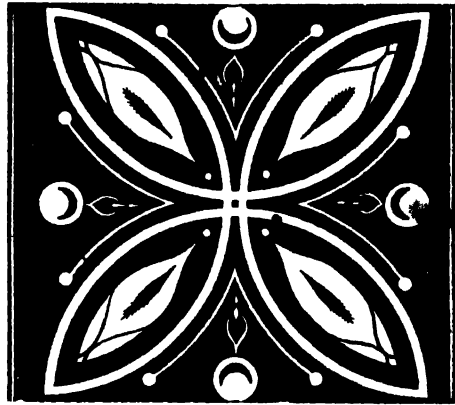
দক্ষিণ ভারতের আলপনা (খ)

আঁকে। আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের দাক্ষ্যপ্রদীপ জালার মতই আলপনা আঁকা দক্ষিণী মেয়েদের নিত্যকর্মের অন্তর্গত।



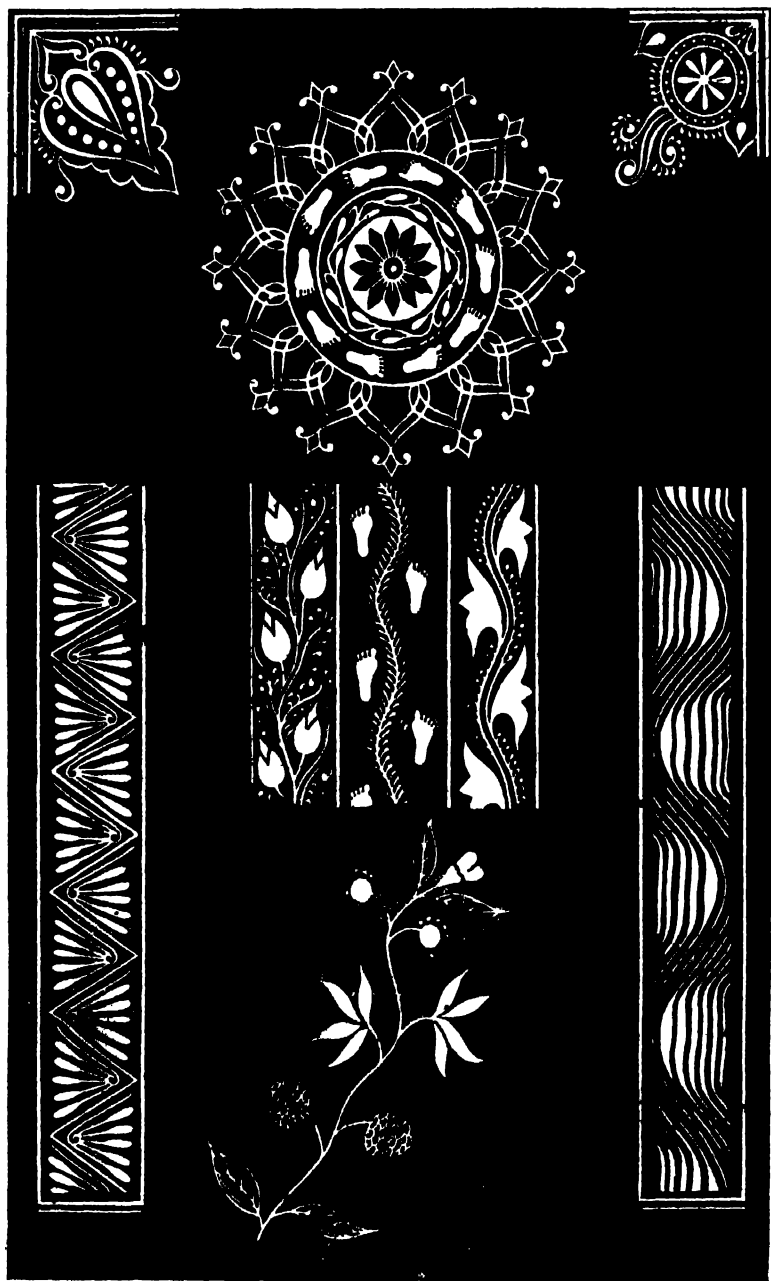
**আলপনার বিভিন্ন স্তর :** আলপনার দুইটি স্তর রহিয়াছে—(১) একটি ব্রতের অঙ্গ হিসাবে, (২) আরেকটি মণ্ডল শিল্পরূপে ।

(১) **ব্রতের অঙ্গ হিসাবে আলপনা :** ব্রতের সঙ্গে আলপনার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে । কিছু কামনা করিয়া সমাজে যে অস্থান চলে তাহারই নাম ব্রত । মানুষ কিছু কামনা করে এবং আলপনার মধ্য দিয়া সেই কামনার ছবি আঁকে । নীচে এইরূপ কয়েকটি ব্রত এবং উহার আলপনার উল্লেখ করিতেছি । যেমন,



**ভাটুলি ব্রত :** আমাদের দেশের একটি মেয়েলী ব্রত ভাটুলি । আত্মীয়-স্বজনেরা জলপথে বিদেশে যায় । তাহাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা করিয়া মেয়েরা ভাটুলি ব্রত করে । ব্রতস্থানে ভাটুলির মূর্তি স্থাপন করিয়া চারিপাশে জোড়া নৌকা, নদী, সমুদ্র, কাঁটাবন, নানা হিংস্র জন্তু ইত্যাদি আলপনায় আঁকা হয় । এইভাবে নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া জলপথে নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা আলপনায় ব্যক্ত হয় ।

**লক্ষ্মী ব্রতটি** মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত । আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হেমন্তের শস্য ঘরে আসে তখন এই ব্রতটি উদ্‌ঘাপন করা হয় । লক্ষ্মী হইলেন সম্পদ, কল্যাণ ও শ্রীর দেবতা । লক্ষ্মীর ব্রতের মধ্য দিয়া মেয়েরা শস্য কামনা করে । লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পদ এবং ধানছড়া তাই আলপনার প্রধান অঙ্গ । শ্রী ও সম্পদ বাতীত মেয়েদের মনে থাকে অলঙ্কার, আয়না, চিকুনি ইত্যাদির কামনা । লক্ষ্মীব্রতের আলপনায় এইগুলিও দেখা যায় ।



লক্ষ্মীর ব্রতের আলপনা এবং চারিপাশে আলপনার বিভিন্ন নকশা

**মাঘমণ্ডলের ব্রত :** পৌষের সংক্রান্তি হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরিয়া এই ব্রতটি চলে। মাঘমণ্ডলের ব্রতের মধ্য দিয়া সূর্যের অভ্যুদয় এবং আলোকলমল বসন্ত দিনগুলিকে কামনা করা হয়। ব্রতকথায়, চাঁদের



মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনা

সঙ্গে সূর্যের পরিণয় এবং অবশেষে পুত্ররূপে ঋতুরাজ বসন্তকে লাভের গল্প আছে। পৃথিবীর সঙ্গে বসন্তের পরিণয়ের কাহিনী দিয়া ব্রত শেষ করা হয়। মাঘমণ্ডলের ব্রত বসন্ত: সূর্যলাভের উপাসনা। সূর্য ভারতের সর্বত্র নানাভাবে পূজিত। বৈদিক ঋষিরাও আলো চাহিয়া এই আলোর দেবতাকে উপাসনা করিয়াছেন।

এই মেয়েলী ব্রতটিতেও দেখি একই কামনা। শীতের কুয়াসা যখন সূর্যকে আবৃত করিয়া রাখে মেয়েরা তখন সূর্যলাভের জন্য মার্ঘমণ্ডলের ব্রত করে। সূর্য গোলাকার বলিয়া সূর্যের প্রতীক হইল মণ্ডলাকার রেখাচিত্র।

(২) **মণ্ডনশিল্প হিসাবে আলপনা :** ব্রতের কামনা আলপনার ছবিতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু আলপনা ক্রমশঃ ব্রত অমুষ্ঠানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিল্পকাজ হিসাবে গৃহসজ্জার বিশিষ্ট উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এখনকার উৎসবে-অমুষ্ঠানে আলপনা না হইলেই চলে না।

আলপনা যদি শুধুমাত্র কামনার প্রকাশ হইত তবে অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে যেমন তেমন করিয়া অন্নের ঘটি-বাটিগুলি আঁকিয়া দিলেই কামনা সফল হইতে পারিত ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখি নানা লতাপাতা, পদ্ম, সূর্যোদয়ের বিভিন্ন রূপক ইত্যাদি। এই সবের মধ্য দিয়া একটি শিল্প রচনার চেষ্টা প্রকাশ পায়। সমস্ত রকমের আলপনাকে মোট আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) প্রথমে পদ্ম ; (২) লতামণ্ডন বা পাড়। পাড়ের মধ্যে মোচালতা, খুস্তিলতা, কঙ্কালতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ; (৩) গাছ, ফুল ইত্যাদি ; (৪) নদনদী, পল্লীজীবনের নানাদৃশ্য ; (৫) পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জীবজন্তু ; (৬) চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, (৭) নানা অলঙ্কার ও আসবাব ; (৮) পিঁড়িচিত্র।

আলপনার এই সমস্ত পদ্ম কিংবা লতা ইত্যাদির সঙ্গে বাস্তবের পদ্ম ও লতার কোন মিল নাই। নারীহৃদয়ের মধ্যে যে রসসঙ্গতির অনন্ত ভাণ্ডার জমা রহিয়াছে সেখান হইতে এই শিল্পটি যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা নিজ নিজ কল্পনা হইতে দেওয়ালে মেঝেতে এবং পিঁড়িতে এইসব ছবি আঁকিয়া যায়।

**আলপনার বৈশিষ্ট্য :** আলপনা কিছু কখনও নিখুঁত হয় না। অবনীন্দ্রনাথের মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন মায়ের মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, উহা কখনও বাকরণ কিংবা ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না, আলপনাও তেমনি মেয়েদের কাঁচা হাতের আঁকা-বাকা রেখার একটি চিত্রমাত্র, উহা কখনও জ্যামিতিক নকশার মত নিভুল নয়। তবে এই অপটু শিল্পীদের হাতের আঁকা-বাকা আলপনায় যে স্বাভাবিক শ্রী ও সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে তাহা সত্যই অতুলনীয়।

## পুষ্পবিজ্ঞান ( Flower arrangement )

পৃথিবীর মধ্যে ফুলকে আমরা সবচেয়ে পবিত্র জিনিস বলিয়া মনে করি। রূপ এবং গন্ধ—ফুলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ, পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের জন্য ইহাকে আমরা দেবপূজার প্রধান উপকরণ করিয়াছি।

**ফুলের ব্যবহার :** বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে ফুল দিয়া প্রধানত পূজা হইত। তবে মেয়েরা আবার অনেকে ফুলের গহনা করিয়া পরিত। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবেও ফুলের ব্যবহার ছিল। তাছাড়া ঝরাফুল দিয়া ঘর সাজানো হইত। তোমরা জান যে গাছ হইতে অনেক ফুল করিয়া পড়ে। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে অনেক ফুল নষ্ট হয় এবং ডালপালা ভাঙ্গিয়া গিয়া ফুলগাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ফুল পাতা নষ্ট না করিয়া গৃহসজ্জার কাজে উহাদের ব্যবহার করা হইত। তারপর ফুলের আদর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে ফুল তুলিয়া ঘর সাজান হইতে লাগিল। আজকাল বিবাহে, জন্মদিনে, শ্রাদ্ধ-বাসরে, এমন কি সাধারণ সভায় ফুল চাই। অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেকেই বাড়িতে একটু ফুলের বাগান করেন এবং সুবিধা না থাকিলে বাজার হইতে ফুল কিনিয়া আনিয়া ঘর সাজান। পুষ্পবিজ্ঞান আজ **আলঙ্কারিক শিল্পের ( decorative )** অন্তর্গত। আলঙ্কারিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা অপরের সৌন্দর্য বাড়ায়। সামান্য পুষ্পবিজ্ঞানের দ্বারা বাস্তবিকই আমরা একটি কক্ষের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়াইয়া তুলিতে পারি।

**পুষ্পবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম ( General principles of flower arrangement ) :** ছবির মত ফুলেরও রঙ (colour), রেখা বা গড়ন (line), ছন্দ (rhythm) ও সমন্বয়ের (balance) দিক আছে।

(১) প্রথমেই ধর রঙের কথা। পুষ্পবিজ্ঞানের সময় খেয়াল রাখিবে যে ফুলের রঙটি যেন সকলের চোখে পড়ে। সমস্ত কক্ষটি আবার উহার চারি দেওয়াল, পর্দা, আসবাব ইত্যাদি লইয়া পুষ্পবিজ্ঞানের পশ্চাদ্ভূমি বচনা করিতেছে। এই পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে মিল রাখিয়া ফুলের রঙ নির্বাচন করা যায়, কিংবা উহাদের কোন বিপরীত রঙের ফুলও নির্বাচন করা যায়। মোটের উপর **পুষ্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দৃশ্য কিংবা সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিতে পারি।**

(২) ফুলের অন্ততম বৈশিষ্ট্য উহার রেখা। সব ফুলেরই রেখা অর্থাৎ একটি বিশেষ আকৃতি রহিয়াছে। তবে কোন কোন ফুল—যেমন ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলা, ডালিয়া, প্রকাণ্ড সূর্যমুখী, জলপদ্ম ইত্যাদির আকৃতি অতি সুন্দর। সাজাইবার সময় উহাদের আকৃতির প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

গুচ্ছাকারে না সাজাইয়া ফুলদানিতে এই জাতীয় দুই চারিটি ফুল আলগাভাবে রাখিয়া দিলে উহাদের আকৃতি বেশ উপভোগ করা যায়। পরন্তু গাঁদা, ককস, ডায়ানথাস ইত্যাদি ফুল স্তবকাকারে সাজানোর উপযোগী।

(৩) ফুলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল উহার ছন্দ। **পুষ্পবিজ্ঞানের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ** বজায় রাখিতে হইল অর্থাৎ গাছে উহার যেভাবে ফুটিয়া থাকে সেইভাবে উহাদের সাজান উচিত। অবশ্য সুদক্ষ শিল্পীর হাতে অনেক ক্রটিই চাপা পড়িয়া যায়। যেমন, লম্বাবৃন্তের ফুলের জন্ত চাই লম্বা গড়নের পুষ্পাধার, কিন্তু নীচু পুষ্পাধারও যদি প্রশস্ত হয় তবে তাহাতে গ্যাভিওলাস, রজনীগন্ধা কিংবা লিলি সাজান চলে।

বেল, যুঁই, অপরািজিতা, শিউলী প্রভৃতি ফুল জলে ভাসাইয়া সাজাইতে হয়। জলপদ্ম কিংবা শালুক জাতীয় যেসব ফুল জলে ফোটে তাহাদের জলে ভাসাইয়া রাখিলে একদিকে যেমন টাটকা থাকে অত্রদিকে তেমনি ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখা যায়।

(৪) ছন্দের মতই **পুষ্পবিজ্ঞানে সামঞ্জস্যের নীতি** প্রতিফলিত হওয়া উচিত। উজ্জ্বলতম, উচ্চতম কিংবা দীর্ঘতম অর্থাৎ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া উহার চারিপাশে অগ্রাগ্র ফুলগুলি বিস্তৃত করিলে সামঞ্জস্যের নীতি রক্ষা করা সহজ হয়।

(৫) সবশেষে স্মরণ রাখিবে যে **পুষ্পবিজ্ঞানে সারল্যের নীতি** অমূল্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগেই বলিয়াছি পুষ্পবিজ্ঞান একটি আলঙ্কারিক শিল্পবিশেষ। অপরের সৌন্দর্য বাড়ানোতেই উহার সার্থকতা। ফুলদানিতে ফুল ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিলে সমস্ত কক্ষটি ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ হয় এবং পুষ্পবিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

**স্থান অনুযায়ী পুষ্পবিজ্ঞান :** আমরা বাড়িতে সচরাচর ঠাকুরঘরে, বৈঠকখানা ঘরে, শয়ন কক্ষে টেবিলে ও বারান্দার কার্ণিসে পুষ্পবিজ্ঞান করিয়া থাকি।

**ঠাকুর ঘর :** পূজার প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলের বর্ণ আমাদের মনে একটি গভীর রেখাপাত করে। যেমন সাদা রঙটি পবিত্রতার ভাব জাগায়, লাল রঙটি জাগায় কর্মে উদ্দীপনা, হলুদ রঙটি একাধারে জাগায় জ্ঞানার ইচ্ছা (জ্ঞান) এবং কর্মে প্রবৃত্তি। এইভাবে একেকটি রঙ একেকটি ভাবের প্রতীক হইয়া আছে। দেবতারাও আবার নানা ধরনের। মায়ের শক্তিতে জগৎ চলে, মায়ের পূজায় তাই রাঙা জবা দরকার। শিব আবার ভোলানাথ—সমস্ত জগতের মালিক হইয়াও তিনি নিজে কিছু করেন না। তাঁহার জন্ত চাই সাদা

জ্যোৎস্না ফুল। সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী—জগতে জ্ঞান বিতরণ করাই তাঁহার কাজ। তাই সরস্বতী পূজায় আমরা দিই পলাশ, গাঁদা এবং হলুদ বঙের যাবতীয় ফুল। সর্বদা সাদা ফুল দিয়াই পূজার ঘরটি সাজান যায়। তবে কোন দেবতার পূজা হইতেছে জানিয়া লইয়া দেবতার প্রতীক ফুলটি আগে দিতে হয়। পূজার বেদীতে ফুল সাজান যায়, আবার মাটিতে ফুলের আলপনাও খুব সুন্দর হয়।

**বৈঠকখানা :** বৈঠকখানাই পুষ্পবিজ্ঞানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থান বলিয়া গণ্য হয়, কারণ এখানেই আমরা অতিথি-অভাগতদের আপ্যায়ন করিয়া থাকি। পুষ্পবিজ্ঞান স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য বাড়াইতে সাহায্য করে। শীতের সময় নানা মরসুমী ফুল, বর্ষায় জলপদ্ম, রজনীগন্ধা, গ্যাডিওলাস কিংবা লিলি এবং গ্রীষ্মে হুগন্ধ ফুল দিয়া বৈঠকখানা সাজাইবে।

সাধারণতঃ কক্ষের মাঝখানে কিংবা সুন্দর একটি কোণ বাছিয়া লইয়া ফুলদানিতে ফুল সাজান যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে ফুলদানী টাঙাইয়া তাহাতে ফুল ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। নীচু আধারে ফুল ভাসাইয়া রাখাও মন্দ নয়।

**শয়ন কক্ষ :** শয়নকক্ষে ব্যক্তিগত কুচিই প্রাধান্য পাইবে। এখানে কোন সার্বজনীন নিয়ম থাকে না। তবে উগ্রগন্ধের ফুল বর্জন করিয়া বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, শিউলি ইত্যাদি মুছ হুগন্ধি ফুলই শয়নকক্ষের উপযোগী।

**খাবার ঘরের পুষ্পবিজ্ঞান :** খাবার ঘরে পুষ্পবিজ্ঞানের গুরুত্ব খুব বেশী। প্রথমতঃ টেবিলের উপরে এক ওচ্চ ফুল সাজাইয়া রাখিলে কক্ষটির শোভা বাড়ে, উপরন্তু উহা অস্বস্তির ভিত্তি দখল করিয়া ভোজনকে আরও আনন্দদায়ক করিয়া তোলে। খাবার ঘরে পুষ্পবিজ্ঞানের নিয়মগুলি মোটামুটি এই :—

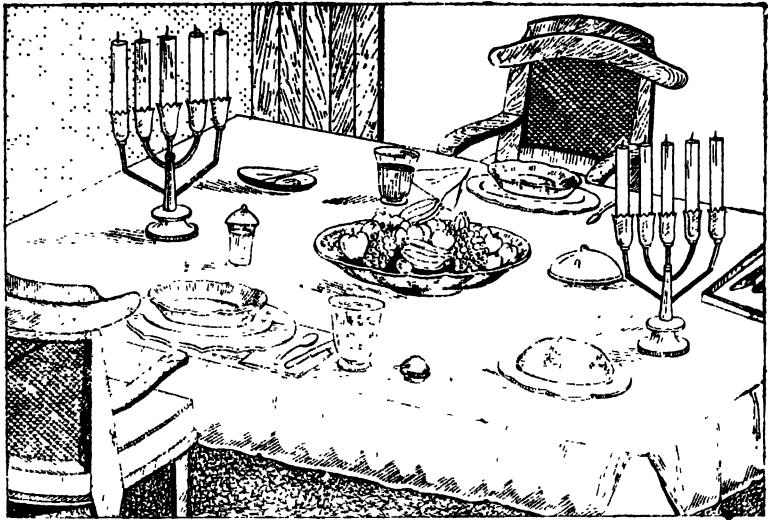
(১) এমনভাবে ফুল সাজাইবে যেন আহ্বারের সময় টেবিলে মুখোমুখি বসিয়া কথাবার্তা বলিতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

(২) নীচু পুষ্পাধারে ছোট ছোট ফুল সাজাইয়া কিংবা ভাসাইয়া রাখাই খাবার ঘরের পক্ষে আদর্শ পুষ্পবিজ্ঞান, কারণ এইভাবে ফুল রাখিলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারে।

(৩) টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে ফুলদানি রাখিবে, যাহাতে উহা প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়।

(৪) খুব বড় টেবিলে কোন ভোজের আয়োজন করিলে উল্লিখিত নিয়মগুলি পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে

আলাপ-আলোচনা না চালাইয়া সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের সঙ্গেই গল্প-শুভব করে। স্ততরাং বড় টেবিলে কচিমত ফুল সাজানো যায়।



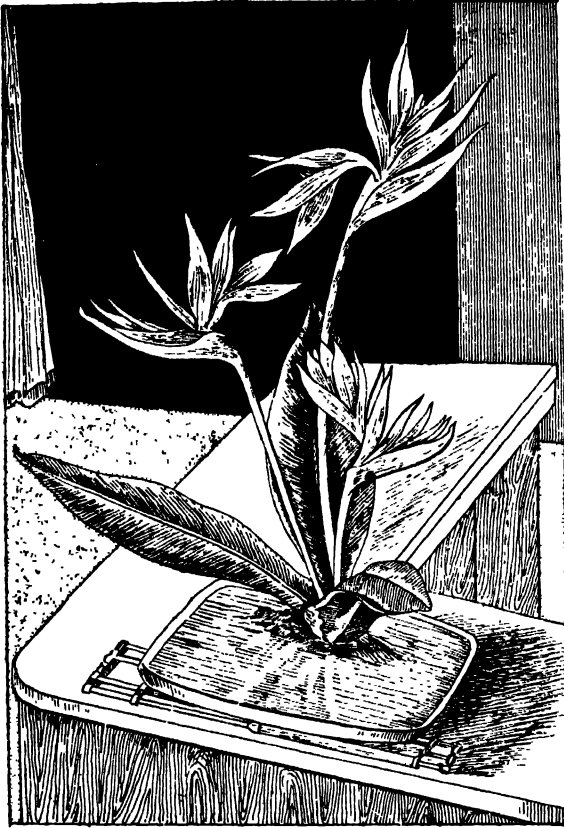
দুইপাশে ক্যান্ডেল দিয়া ফুলের অভাব পূরণ করা হইতেছে

**ফুলের বদলি জিনিস (Substitutes) :** ফুল কম থাকিলে ফুলের বদলে অন্য জিনিস দিয়া অনায়াসে ফুলের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ফুলের বদলি হিসাবে প্রথমেই পাতার নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মোমবাতি, নানা স্বকন্মের মাটির ফল কিংবা সুন্দর খেলনা ফুলের সঙ্গে সাজাইয়া দেওয়া চলে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুল রাখিয়া দুই পাশে দুইটি সুন্দর মোমবাতি কিংবা একদিকে ফুল অন্যদিকে একটি ঝুড়িতে কুম্বনগরের তৈয়ারী কিছু মাটির ফল রাখিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। ফুলের বদলি হিসাবে কাগজ কিংবা প্লাস্টিকের ফুলের ব্যবহারও আজকাল বাড়িয়া গিয়াছে। তবে উহারা প্রকৃত ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম নয়।

**জাপানী প্রথায় পুষ্পবিজ্ঞান :** জাপানীদের পুষ্পবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা পুষ্পাধারে তিনটি স্তর রচনা করিয়া ফুল সাজায়। সবচেয়ে দীর্ঘতম ফুলটিকে তাহারা কেন্দ্রে স্থাপন করে। এই সর্বোচ্চ ফুলটি হইল স্বর্গের প্রতীক। দ্বিতীয় স্তরটির উচ্চতা সর্বোচ্চ ফুলের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত। এইটি হইল মানুষের প্রতীক। তৃতীয় বা সর্বনিম্ন ধাপটি দ্বিতীয় ধাপের ঠিক অর্ধেক পর্যন্ত উচু। এই শেবোক্ত স্তরটি ধরিত্রীর প্রতীক। জাপানীরা ফুল সাজাইবার



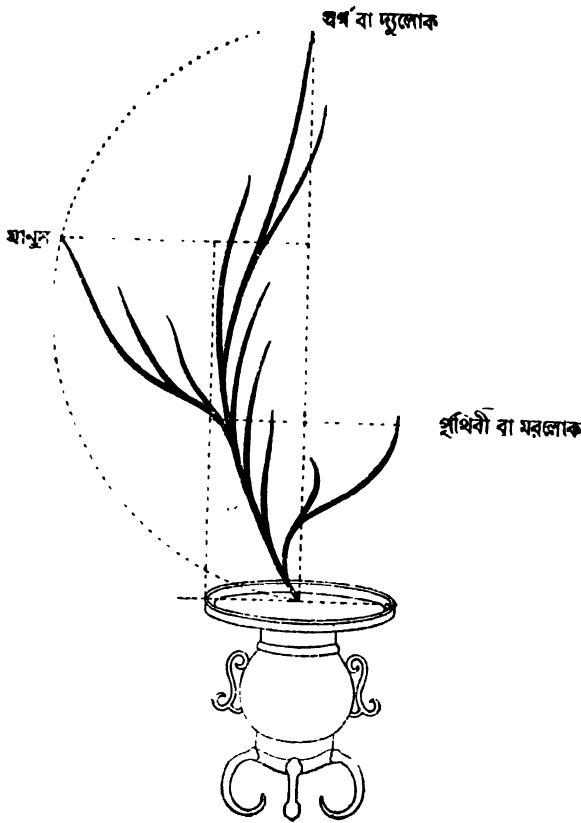
সময় এইভাবে মাটি, মাহুষ ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ রাখে। জাপানীদের পুষ্পবিজ্ঞানের এই স্তরবিভাগের সঙ্গে আমাদের উপনিষদের লোকসংস্থানের মিল



নীচু আধারে লাজান লিলি

দেখা যায়। উপনিষদের ভাষায় সৃষ্টির সর্বপ্রথমে জড়ের প্রকাশ অর্থাৎ মর্ত্য পৃথিবী বা মরলোক। তাহাতে দেখা দিল প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণলোক। প্রাণের দেবতা মাহুষ, তাহার প্রতিষ্ঠা এই মর্ত্য পৃথিবীতে। কিন্তু মাহুষের আকাজক্ষা পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহার অভীক্ষা ছুটিয়াছে দ্ব্যলোক অর্থাৎ অমৃতের পানে। উপনিষদের এই তত্ত্বকেই জাপানীরা তাহাদের পুষ্পবিজ্ঞানের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু জাপান নয় সমস্ত প্রাচ্যদেশ জুড়িয়া এইভাবে শিল্পসাধনার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে গভীর আধ্যাত্মিক অন্বেষণমূহ। রূপ-সাধনার ভিতর দিয়া আমাদের শিল্পীরা অরূপের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মনীষীরাও আজকাল স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন যে সমস্ত শিল্পের প্রেরণা আসে অতীন্দ্রিয়ের আভাস হইতে। এই আভাস যে পায় নাই



জাপানীদের পুষ্পবিজ্ঞানের স্তর

সে শিল্পের টেকনিক আয়ত্ত করিতে পারে কিন্তু তাহার হাতে প্রকৃত শিল্প ফোটে না।

# 1. গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি (Planning and processing of daily duties of a home maker ) :

গৃহকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য দুটি জিনিস দরকার—একটি সময় পরিকল্পনা এবং অপরটি ঐ পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করা। সময় পরিকল্পনা দেখিয়া আন্দাজ করা যায় এক ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সমাধা করিতে চায় যেমন সকালে কতটা, বিকালে কতটা সারাদিন অথবা সপ্তাহে কতটা। দ্বিতীয়তঃ, সময় পরিকল্পনায় কার্যপদম্পরারও ঈদ্রিত পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন কাজের পরে কোন কাজ করা হইবে তাহা জানা যায়। কাজের একটি পরিকল্পনা থাকিলে সময় এবং শ্রম বাঁচান যায় এবং নানা অনিশ্চয়তা ও অযথা উদ্বেগের হাত হইতে মানুষ মুক্তি পায়। \*

**সময় পরিকল্পনার সুবিধা :** সময় পরিকল্পনা থাকার কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন :

- (১) অনেক সমস্তা সম্বন্ধে অনেক আগে হইতে ভাবা যায় ;
- (২) বিভিন্ন সমস্তাগুলি সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ থাকে এবং প্রতিদিন যে নিতানতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে সহজেই সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় !
- (৩) প্রত্যহের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেই অনুসারে কাজ করাটা অভ্যাসে পরিণত হয়।
- (৪) পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস থাকিলে কাজে বেগ আসে এবং সহজেই দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং অল্প কাজের জন্য যথেষ্ট ফাঁকা সময় পাওয়া যায়।

**সময় পরিকল্পনার ভিত্তি :** একটি উপযুক্ত এবং কার্যকরী সময় পরিকল্পনা করার সময় প্রত্যেক গৃহিণীকে স্থির করিতে হয় :

- (১) দিনে কতটা এবং কি কি কাজ করা হইবে ?
- (২) সপ্তাহে কতটা এবং কি কি কাজ করা হইবে।
- (৩) বিশেষ এবং ঋতুর কাজগুলি দিন অথবা সপ্তাহের কাজের মধ্যে কিভাবে খাপ খাওয়ান সম্ভব।

\* সময় পরিকল্পনা সম্বন্ধে হাংশ জেদার পার্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪) কোন্ কাজ করার পক্ষে কোন্ সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট? কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজ আছে যেগুলি ঠিক বছরের পর বছর একইভাবে চলিতে থাকে কিন্তু ঋতুর বিশেষ কাজ অথবা বাৎসরিক কাজের বহু অদলবদল হয়, যেমন কোন বৎসর বাড়ি চুনকামের পরিকল্পনা করা, কোন বৎসর শীতের গরম জামা-কাপড় বোনা কিংবা সেলাই করা হয়। এসব কাজ করিতে ঠিক একরকম পরিশ্রম কিংবা সময় প্রয়োজন হয় না এবং উহাদের সম্পন্ন করিতে গেলে অল্প পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করিতে হয়।

প্রত্যেক বাড়িতেই সময় পরিকল্পনা কতকগুলি বাইরের কাজ অথবা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেমন গৃহকর্তার অফিস কয়টায়, ছেলেমেয়েরা কখন স্কুলে যাইবে, এইসবের উপর নির্ভর করে সকালবেলার জলখাবারের সময় ও ধরন। তেমনি গৃহিণী বাহিরে কোথাও কর্মরত, না সর্বদা গৃহেই থাকেন তাহার উপর তাঁহার কাজের সময় ও ধারা নির্ভর করে। কতকগুলি কাজের জন্য অবশ্য নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার কিন্তু কতকগুলি কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখার প্রয়োজন নাই, সুবিধামত যে কোন সময়ে করিলেই চলে।

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কতকগুলি কাজের সময় থাকে এবং ঐ সময়ের নড়চড় করা সম্ভব নয়। যেমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, টিউটোরিয়াল ক্লাশ করা, সাপ্তাহিক নাচ বা গানের ক্লাশ করা, স্বামীজীর অফিসে যাওয়া ইত্যাদি। সময় পরিকল্পনার সময় এই সব কাজের প্রাধান্য দিতে হয় এবং গৃহিণীর সমস্ত কাজও এই ক্রটিন অনুসারে বাঁধা থাকে।

কোন কাজে যখন অপরের সহযোগিতা দরকার তখন ঐ ব্যক্তির অবসর সময় দেখিয়া কাজের সময় স্থির করিতে হয়। বাড়ির কোন কাজে যদি আবার বাইরের কোন লোকের সাহায্য দরকার হয় তখন সময় অনুযায়ী তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে হয়।

সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে দিনে, সপ্তাহে এবং বৎসরে নিম্নলিখিত কাজ অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে :

### প্রত্যহের কাজ

শিশুদের যত্ন ;  
খাশ্ত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও  
পরিবেশন, টিফিন তৈরী করা ;  
বাসন মাজা ও কাপড় কাচা ;  
গৃহের যত্ন ;  
বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত কাজ ;  
সামাজিক কর্তব্য যদি কিছু থাকে ;  
আকস্মিক কাজ ।

### সাপ্তাহিক কাজ

কাপড় কাচা-ধোওয়া ;  
ইঙ্গি করা ;  
সপ্তাহের বিশেষ সাফাইএর কাজ ;  
ভাল রান্না বা খাবার তৈরী করা ।  
সাপ্তাহিক ;  
বাগানের কাজ ;  
অন্ত কোন কাজ যদি কিছু থাকে ।

### ঋতুর অথবা বৎসরের কাজ

শিশুদের ছুটির কাজের পরিকল্পনা  
করা ;  
ছুটিতে কোথাও ভ্রমণ পরিকল্পনা  
করা ।  
বৎসরের খাশ্ত সংরক্ষণ করা ;  
পোশাক অথবা শয্যা প্রস্তুত করা,  
ফুল ও সবজি বাগান করা, অন্তান্ত  
কাজ ।

বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা,  
শীতবস্ত্র ধোওয়া ও সংরক্ষণের  
ব্যবস্থা করা ।

বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, শাশুড়ি আছেন । গৃহিণী বাহিরে কাজ করেন না এবং বাড়িতে একজন কিয়ের সাহায্য পান, গৃহের অন্তান্ত লোকেরাও সাধ্যমত কাজে সাহায্য করেন । নিম্নে এইরূপ একটি পরিবারের দিন ও সাপ্তাহের কাজের একটি পরিকল্পনা দেওয়া হইল ।

দৈনন্দিন সময় পরিকল্পনা	গৃহিণী	কৰ্তা	কৰ্তব্য মা	পুত্ৰ	কন্যা	বি
5-5-30 শয্যা ত্যাগ, বিছানা তোলা, প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও পূজা	✓			✓	✓	
5-30-6-30 জলখাবার প্রস্তুত, পরিবেশন ও বাজার	✓	✓				
6-30-10-30 রান্নার কাজ, কাচা, ধোওয়া	✓					✓
10-30-12 সাপ্তাহিক কাজ	✓					✓
12-1 স্নানাহার	✓					
1-2 বিশ্রাম	✓					
2-4-30 সাপ্তাহিক কাজ	✓					
4-30-5-30 বিকালের জল-খাবার পর্ব	✓					
5-30-7 ফাঁকা সময়	✓					
7-9-30 সপ্তাহের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান, নৈশভোজন প্রস্তুত করণ	✓	✓				
9-30-10-30 নৈশ আহার ও রান্নাঘরের কাজ চুকান	✓					✓

### সাপ্তাহিক কাজ : সময়-সকাল 10-12

সোম—সপ্তাহের কাচা
মঙ্গল—ইন্দ্রি ও বিছানা বোত্রে দেওয়া
বুধ—সাপ্তাহিক সাফাই
বৃহ—লক্ষ্মী পূজার কাজ
শুক্র—ব্যাঙ্ক/ডাক্তারের কাছে যাওয়া
শনি—ভাল খাবার তৈরী করা
রবি—ছেলেমেয়েদের কাজে সাহায্য করা

### সাপ্তাহিক কাজ : সময়-দুপুর 2-4-30

সোম—রিফু
মঙ্গল—বিছানা তোলা
বুধ—সেলাই
বৃহ—অন্ন কোন বিশেষ কাজ করা
শুক্র—প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করা
শনি—ফাঁকা সময়
রবি—বেড়ান

## ২. গৃহের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা

**আসবাব ও অজ্ঞাত গৃহসরঞ্জাম পরিস্কার রাখার উপায় ( Care of a household cleaning—cleaning of furniture and household equipment )**

**গৃহের যত্ন :** উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার উপরেই নির্ভর করে, গৃহের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব। ঠিকভাবে যত্ন নিলে একটি বাড়ি বছরদিন পর্যন্ত মজবুত থাকে এবং বংশানুক্রমে মানুষ ঐ গৃহে বসবাস করিতে পারে। তবে ইহার জ্ঞাত প্রতিটি জিনিস উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনমত মেরামত করা দরকার। গৃহের গরম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাড়তি পোশাকগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়, আসবাবপত্র ও বাসনকোসন পালিশ করাইতে হয়, বৈদ্যুতিক পাষ্প ও সেলাইএর কলে তেল দিতে হয়, মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক তারগুলি ঠিক আছে কিনা মিস্ত্রি দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়, তাছাড়া বাড়িঘর চুনকাম ও মেরামত করিতে হয়।

**গৃহের পরিচ্ছন্নতা :** গৃহের যত্ন লইতে হইলে গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। গৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা গৃহপরিচালনার একটি প্রধান অঙ্গ। খালি হাতে কখনও গৃহ পরিস্কার করা সম্ভব নয়। ইহার জ্ঞাত সর্বদাই কতকগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন।

**গৃহ পরিস্কার রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :** গৃহ পরিস্কারের জ্ঞাত ফ্লুইড, শক্ত স্টাটা, ঝাড়ন, ব্রাশ, মপ ( mop ), লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ, কার্পেট ঝাড়িবার ঝাড়ন ইত্যাদি জিনিসেব প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত বালতি, মগ, ঘাতা ইত্যাদিও দরকার।

**গৃহ পরিস্কারের পরিকল্পনা :** প্রত্যেক গৃহিণীই কিছুটা প্রাত্যহিক ধোয়া-মোছার কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে গৃহের সমস্ত ময়লা অপসারিত হয় না এবং গৃহের প্রত্যেকটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি পরিস্কৃত হয় না। গৃহের সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার জ্ঞাত তাঁহাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়।

**দৈনিক পরিচ্ছন্নতা :** শয়নকক্ষ : প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা বলিতে শুধু-মাত্র কক্ষগুলির উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতাই বোঝায়। প্রতিদিন গৃহে যে ধূলাবালি সঞ্চিত হয় উহা অপসারণ করাই দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। প্রথমেই ঘরের দরজা-জানালাগুলিকে খুলিয়া দাও। পাটি, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি ঘরের বাহিরে নিয়া ঝাড়িয়া ফেল। বিছানা গুটাইয়া রাখিয়া সমস্ত

কক্ষের ধূলা ঝাঁটাইয়া ফেল এবং একটা ঝাড়ুন দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগুলি ঝাড়িয়া লও। এইবার ভিজা জ্বাতা দিয়া সমস্ত কক্ষ মুছিয়া ফেলিয়া বিছানা পাতিয়া রাখ।

**বৈঠকখানা :** দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাড়িয়া ফেল। শয়নকক্ষের মতই বসিবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছা করা উচিত। বাহির হইতে বহু লোক জুতার সঙ্গে ধূলাবালি ও রোগজীবাণু নিয়া আসে। প্রতিদিন বৈঠকখানা না হইলে ঐ ধূলা কক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বৈঠকখানা ঘর মুছিবার পূর্বে সমস্ত আসবাব ঝাড়ুন দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ফুলদানির জল ও বাসি ফুল বদলাইয়া নতুন ফুল সাজাইয়া রাখিবে।

**রান্নাঘর :** গৃহের সমস্ত কক্ষের তুলনায় রান্নাঘর ও খাবার ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। রান্নাঘরের সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বাসনকোসন প্রতিদিন মাজিয়া ফেলিবে। রান্নাঘরের মেঝেতে প্রত্যহ যে সকল তেল কালি পড়ে তাহাও ভাল করিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং খাবার টেবিল প্রত্যহ দুই বেলা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

**পায়খানা ও স্নানাগার :** পায়খানা ও স্নানাগার পরিষ্কার করাও প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত। মেথর আসিলে জল ঢালিয়া দিয়া প্রত্যহ পায়খানা পরিষ্কার করাইবে। শহরে জলবাহিত প্রণালীর ব্যবস্থা থাকিলে পায়খানা প্রশ্রাবাগারে জলের সঙ্গে নির্বীজক ঔষধ ঢালিয়া দিবে। তবে মলশোধনী পায়খানা হইলে এইরূপ নির্বীজক ঔষধ ঢালিতে নাই। অনবরত জল পড়িতে পড়িতে স্নানাগার পিচ্ছিল হইয়া পড়ে। তাই প্রতিদিন স্নানাগার ধৌত করিয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, শিশুদের জামাকাপড় এবং অন্তর্বাস প্রতিদিন স্নানের সময় কাটিয়া ফেলিবে। ইহাও প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত।

**সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা :** দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার তুলনায় সাপ্তাহিক ধোয়া-মোছার কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়, ইহা আরও বেশী খুটিয়া করিতে হয়। যেমন ধর প্রাত্যহিক ধোয়ামোছার কাজ করিবার সময় আমরা সাধারণতঃ চারি দেওয়ালের ঝুল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া ফেলি না। স্ত্রীই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সকল ঝুল ঝাড়া উচিত। বিছানাপত্র সপ্তাহে একদিন রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লইবে। এইরূপ রৌদ্রদগ্ধ শয্যার ছারপোকায় উৎপাত থাকে না। এতদ্ব্যতীত বাড়ির সমস্ত আবর্জনা স্তুপাকার করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নির্বীজক ঔষধ দিয়া ঘরের



মেঝে ধুইয়া ফেলিবে। দরজা-জানালায় পর্দা, বিছানা ইত্যাদি সপ্তাহে একবার করিয়া কাচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইঞ্জি করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রাখিবে।

**বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতা :** প্রতিদিন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়িঘর পরিষ্কার করিলেও সমস্ত বাড়ি জঞ্জালমুক্ত হয় না, কারণ আলমারির কোণে, দেওয়ালে টাঙানো ছবির গায় এত ধূলাবালি জমিয়া থাকে, পুরাতন বাসনকোসন ও আসবাবের এমনভাবে পালিশ নষ্ট হইয়া যায় ও রং চটিয়া যায় যে বৎসরে অন্ততঃ একবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বাছিয়া ফেলিয়া বাড়িঘর জঞ্জালমুক্ত করিতে হয় এবং আসবাবপত্র মেঝামত ও পালিশ করিতে হয়। সাধারণতঃ বাড়ি চুনকাম করাইবার সময় ঘরের জিনিসপত্র বাহির করিতে হয় বলিয়া বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজটাও অনেকে একই সঙ্গে চুকাইয়া ফেলেন। শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও শয্যাভব্য প্রস্তুত করা এবং বাড়ীর যাবতীয় রেশমী পশমী বস্ত্রাদি একবার রৌদ্রে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই বাৎসরিক কাজের অন্তর্গত। বাৎসরিক পরিচ্ছন্নতার কাজকে দুই পর্যায়ে, ভাগ করিতে পারি—(১) ধূলাবালির অপসারণ ও জঞ্জালমুক্তি করা, (২) গৃহের মেঝে, দেওয়াল, বস্ত্রাদি, বাসনকোসন ও আসবাবের পরিচ্ছন্নতা ও ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করা।

**ধূলাবালি অপসারণ :** ধূলি সাধারণতঃ দুই প্রকার—জৈব ধূলি ও অজৈব ধূলি। ছেঁড়া চুল, হাতের নখ, নিষ্ঠীবন ও মলমূত্রাদি অর্থাৎ মানুষ কিংবা অপর প্রাণীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া যে সকল পদার্থ ধূলিতে পরিণত হইয়াছে তাহা সমস্তই জৈব ধূলির অন্তর্গত। মাটি, বালুকণা অথবা অপর কোন ধাতব পদার্থ চূর্ণকে অজৈব ধূলি বলে।

ধূলির মত ক্ষতিকর বস্তু কমই আছে। ধূলিকণার সঙ্গে রোগের জীবাণু মিশ্রিত থাকে। মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল রোগজীবাণু নির্গত হয় উহার ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে এবং প্রাণসের সঙ্গে আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অদৃশ্যভাবে ধূলিকণা সর্বদা আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কোন সঁায়াতালো জায়গায় কিংবা তেলের উপরে ধূলি পড়িয়া কালো চটচটে হইয়া যায়। এই কারণে বাড়ির অন্ত কক্ষের মধ্যে রান্নাঘরটি সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়। আবার মন্ডন স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার না করিলে উহা শীঘ্রই বাসের অসুপযুক্ত হইয়া ওঠে। তবে আমরা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পরিষ্কার করি তাহাতে গৃহের

উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপত্র, আলমারি, ঘরের কোণ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই বৎসরে অন্তত একবার বাড়ির চুনকাম করাইবে, দরজা-জানালা ঝুঁকরাইবে এবং সমস্ত গৃহের জঞ্জাল দূর করিবে।

**বাড়ির মেঝে, আসবাবপত্র ও বাসনকোসনের পরিচ্ছন্নতা :** ধূসিকণা ও জঞ্জাল অপসারণ করা ব্যতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন আছে। গৃহস্থালীর স্রবাদি পালিশ করাইবার উদ্দেশ্য একাধারে উহাদের পরিষ্কার করা এবং বস্তুগুলির ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখা। ধাতবপাত্রাদি, কাচের বাসন, বেত ও কাঠের আসবাব, চামড়ার জিনিস ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার উপাদান ও পদ্ধতি এক নয়। কোন্ বস্তু কি উপায়ে রাখিতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

**বিভিন্ন আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় :** আমাদের দেশের অধিকাংশ আসবাবই বেত, কাঠ, চামড়া কিংবা স্টীল নির্মিত। উহাদের পরিষ্কার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হইল :

**বেতের ব্যবহার :** গৃহস্থালীর নানা কাজে বেতের প্রয়োজন হয় : ঝুড়ি, হাতব্যাগ বিশেষতঃ আসবাব প্রস্তুতিতে আমরা বেত ব্যবহার করি। থাকি। বেতের আসবাবে সুবিধা এই যে উহা অত্যন্ত হালকা এবং সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।

**বেতের আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় :** ঝাড়ন কিংবা লম্বা দাঁড়ওয়ালা ব্রাশ দিয়া প্রত্যহ বেতের আসবাব ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে সাবান গুলিয়া লইয়া বেতের সামগ্রী ধুইয়া ফেলিলেই উহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বেতের পালিশ উঠিয়া গেলে তেলের চুই প্রস্থ পাতলা পেইন্ট লাগাইয়া দিলেই ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

**কাঠের ব্যবহার :** গৃহস্থালীর সঙ্গে কাঠের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। আমাদের গৃহনির্মাণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ। আমাদের আসবাবপত্রও প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারী। সামান্য যত্ন নিলেই এইসব আসবাব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**কাঠের আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় :** কাঠের আসবাব পরিষ্কার রাখিতে হইলে প্রত্যহ সমস্ত আসবাবের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং মাঝে মাঝে উহার গায়ে নিম্নলিখিত যে কোন সলিউশান মাখাইয়া দিবে :

- (ক) ১। ১ পাউণ্ড মৌমাছির মোম
- ২। ১ পাউন্ড তার্পিন তেল
- ৩। ২ পাউন্ড অ্যালকোহল

অথবা

(খ) তার্পিন তেল ১ : ভিনিগার ১ : মসিনা বীজের তেল ১ ।

কাঠের রঙ নষ্ট হইলে খুব মসৃণ ব্রাশ বা তুলি দিয়া পারম্যাঙ্কানেট সলিউশান লাগাইয়া দিবে। কাঠের গায় কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলে মসিনার তেল ১ : তার্পিন তেল ১ : হোয়াইটিং অথবা কর্ণফ্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছিদ্রটি বুজাইয়া দিবে এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে। কাঠের উপর জলের দাগ পড়িলে মেথিলেটেড স্পিরিট কিংবা অ্যামোনিয়া সলিউশান ঘষিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে।

**চামড়ার ব্যবহার :** কাঠ, বেত প্রভৃতির মত চামড়াও একটি নিত্যব্যবহার্য অতি আবশ্যক সামগ্রী। মৃত পশুর দেহ হইতে চামড়া খুলিয়া নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ চামড়াকে মসৃণ, নমনীয় ও টেকসই করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। চামড়ার বস্তু দামী হইলে সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া লোকে চামড়ার জিনিস যেমন জুতা, স্যাককেশ, আসবাব ইত্যাদি কেনা পছন্দ করে।

**চামড়ার আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় :** প্রত্যহ ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিবে। ময়লা হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া উহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আসবাব মুছিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত ময়লা হইলে মসিনা বীজের তেলে ( linseed oil ) ভিনিগার ( ২ তেল : ১ ভিনিগার ) মিশ্রিত করিয়া চামড়ার গায়ে খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া ময়লা তুলিয়া ফেলিবে। তারপর যে কোন একটি পালিশ লাগাইবে :

(ক) চামড়া পালিশের ক্রীম।

(খ) জুতার কালি।

(গ) মোমাছির মোম ও তার্পিন তেল।

(ঘ) ভেসিলিন।

**স্টীলের আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় :** প্রতিদিন আসবাবের ধুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয়। মাঝে মাঝে ভেসিলিন মাখাইয়া পালিশ করিয়া লইলে স্টীলের আসবাব অত্যন্ত চকচকে ও উজ্জ্বল থাকে।

**গৃহের সরঞ্জাম :** গৃহে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলি প্রধানতঃ কাচ কিংবা নানারকম ধাতু দিয়া প্রস্তুত। এইসব কাচের পাত্র এবং ধাতব দ্রব্য পরিষ্কার রাখার উপায় বর্ণিত হইল।

**কাচ ( Glass ) :** আমরা সাধারণতঃ কাচের জগ, জার, শিশি, বোতল, গ্লাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলে কাচিয়া যায় বলিয়া

কাচের বাসন রন্ধনের অল্পপয়স্কা। তবে অধুনা রন্ধনের উপযোগী কাচও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে ইহাতে সাধারণতঃ জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিসই রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ঘি, মাখন, মধু, মশলা, আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি বস্তুও কাচের বোতলে কিংবা জারে রাখা যায়। ঠাণ্ডা যে-কোন দ্রব্য কাচের পাত্রে ভাল থাকে। স্বচ্ছ বলিয়া ঔষধপত্র কাচের পাত্রেই রাখিবার নিয়ম। কাচের মধ্য দিয়া ঔষধের রঙ এবং পরিমাণ সহজেই দেখা যায়।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** ঈষদুষ্ণ সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান গুলিয়া লইয়া কাচের পাত্রগুলি ডুবাইয়া রাখ। এইবার একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা খবরের কাগজ দিয়া পাত্রগুলি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেল। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নাও। জল শুকাইয়া গেলে পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া পাত্রগুলি মুছিয়া ফেল।

পরিষ্কার করিবার জন্য অত্র কোন বস্তু না পাইলে শুধু লবণ ঘষিয়া কাচের পাত্র পরিষ্কার করা যায়।

## ধাতু

ধাতু আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি যে সকল ধাতু আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি উহাদের কোনটিই ধাতু হিসাবে পাওয়া যায় না। মাটির অনেক নীচে উহাদের খনিজ পাওয়া যায়। ঐ খনিজ তুলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহাদের নিষ্কাশন করা হয়। কোন কোন ধাতু, যেমন—লোহা, সোনা ইত্যাদি এত নরম থাকে যে বিস্তৃত অবস্থায় উহাদের ব্যবহার করা চলে না। তখন আবার কোন ধাতু মিশাইলে উহারা মজবুত ও ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ ধাতুকে বলে সংকর ধাতু। দৈনন্দিন কাজে সংকর ধাতুই ব্যবহার বেশী।

**উপযোগিতার দিক হইতে ধাতু দুই শ্রেণীর :**

(ক) আলঙ্কারিক ধাতু, যেমন—সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। এইসব ধাতু দিয়া আমরা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকি।

(খ) উপযোগী ধাতু, যেমন—লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। রান্নাঘরের কাজেই এই ধাতুগুলির ব্যবহার বেশী।

**রঙ-এর দিক হইতেও ধাতুগুলি দুই শ্রেণীর :**

(ক) সাদা ধাতু, যেমন—রূপা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

(খ) রঙিন ধাতু যেমন—সোনা, তামা, কঁসা ও পিত্তল।

আমরা বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার এবং উহাদের পরিষ্কার রাখার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

**তাম্র (Copper) :** আমরা পূজার বাসনকোসনের জন্তই বেশীর ভাগ তাম্র পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। পানীয় জল সংরক্ষণের জন্তও তাম্র পাত্র বেশী উপযোগী।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** গরম জল, হোয়াইটিং, তেঁতুল কিংবা লেবু।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** প্রথমে তাম্র বাসনগুলি গরম জলে ডুবাইয়া রাখ। তারপর জলের সঙ্গে কিছুটা হোয়াইটিং গুলিয়া লইবে। গরম জলে ডুবান বাসনগুলি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছিয়া লইয়া হোয়াইটিং মাখাও এবং গরম জলে পুনর্বার ধুইয়া ফেল।

তাম্র বাসনে তেলকালি লাগিয়া থাকিলে লেবু কিংবা তেঁতুল মাখাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া ফেল। তারপর জলে ধুইয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া রাখ।

**পিতল (Brass) :** দুই ভাগ তাম্র সঙ্গে একভাগ দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। পিতলের বাসন দামে সস্তা অথচ মজবুত বলিয়া অনেকে পিতলের ইঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি ব্যবহার করা পছন্দ করেন। রান্নার কাজে পিতলের বাসন অবশ্য ব্যবহার করা চলে কিন্তু পিতলের 'কল' উঠিয়া খাণ্ডদ্রব্যকে বিধাক্ত করিয়া ফেলে বলিয়া রান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খাণ্ডদ্রব্যকে বাসন হইতে নামাইয়া ফেলা উচিত। তাছাড়া পিতলের খালাতে কখনও কোন অল্পদ্রব্য রাখা চলে না।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** জল, তেঁতুল কিংবা লেবু, লবণ, ছাই ও ব্রাসো।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** বাসনগুলিতে অল্পক্ষণ একটু তেঁতুল কিংবা লেবু ও লবণ মাখাইয়া রাখ। তারপর ছাই দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া জল মুছিয়া ফেল। এইবার বাসনগুলিতে সামান্য ব্রাসো মাখাইয়া রোদ্রে রাখিয়া পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া ঘষিয়া ফেলিলেই বাসনের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

**লোহা (Iron) :** লোহা আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য ধাতু। লোহা পিটাইয়া কড়াই, খুন্তি, চাটু, বটি ইত্যাদি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হয়। লোহার সঙ্গে অল্প ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে ইস্পাত বা স্টীল। লোহার সঙ্গে শতকরা ১৫ কিংবা ১৬ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করিয়া স্টেনলেস স্টীল প্রস্তুত হয়। উহা সর্বদা ঝকঝকে থাকে এবং উহাতে কখনও মরিচা পড়ে না।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** জল, সোডা, ছাই, ঝামা, তেল কিংবা ভেনিলিন।

স্টেনলেস স্টিলের বাসনের জন্ত চাই গুঁড়া সাবান কিংবা ভীম।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** গরম জলে সোডা মিশাইয়া লোহার পাত্রগুলি উহাতে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। তারপর পাতলা মিহি ছাই দিয়া মাজিয়া পাত্রগুলি আবার গরম জলে ধুইয়া ফেল। মরিচা থাকিলে ঝামা দিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। তারপর ধুইয়া জল মুছিয়া ফেলিয়া তেল কিংবা ভেনিলিন মাখাইয়া রাখিবে।

স্টেনলেস স্টিলের পাত্রে ভীম কিংবা গুঁড়া সাবান মাখাইয়া ধুইলেই পরিষ্কার হইবে।

**বিশেষ নির্দেশ :** লোহার পাত্র সর্বদা জল মুছিয়া শুষ্ক অবস্থায় রাখিবে, নতুবা মরিচা পড়িবে।

**কাঁসা ( Bell metal ) :** কাঁসা একটি মিশ্র ধাতু। তামা, টিন ও দস্তা মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসা খুব মজবুত তবে স্টেনলেস স্টিল আসিয়া ক্রমশঃ উহার স্থান দখল করিয়া লইতেছে। কাঁসার পাত্রের একটি অসুবিধা যে উহাতে কোন অম্লদ্রব্য রাখা চলে না। অধিক উত্তাপ পাইলে কিংবা কঠিন জিনিসের উপর পড়িলে কাঁসা ফাটিয়া যাইতে পারে।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** জল, তেঁতুল কিংবা লেবু ও ছাই।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** তেঁতুল কিংবা লেবু মাখাইয়া লইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া ফেলিলেই চলে। বাসনগুলি ধুইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া রাখিবে।

**রূপা ( Silver ) :** রূপা একটি মূল্যবান ধাতু। আলঙ্কারিক ধাতুরূপেই রূপা বেশী আদৃত, তবে ইহার ব্যবহারিক মূল্যও আছে। ধনীর গৃহে রূপার বাসনের প্রচলন আছে, তাছাড়া মেডেল, কাপ ইত্যাদিতেও কিছুটা রূপা ব্যবহার হয়। তবে দামী ধাতু বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে রূপার ব্যবহার খুবই কমিয়া আসিতেছে।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** (১) সিলভো, অথবা, (২) মেথিলেটেড স্পিরিট, সাধারণ পাত্রের জন্ত শুধু গরম সাবান জল, কারুকার্যখচিত পাত্রের জন্ত সিলভো অথবা স্পিরিট, হোয়াইটিং, অ্যাামোনিয়া ও উষ্ণ জল।

রৌপ্যপাত্রগুলি গরম সাবান জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। তারপর তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া লও। কারুকার্যখচিত বাসনে

অনেক সময় ময়লা পড়ে। ময়লা বাসন Silvo দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া ফেলিলেই চকচকে দেখায়।

**অন্ত উপায় :** হোয়াইটিং ও মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইয়া মৃদু বস্ত্রখণ্ডায়া ধীরে ধীরে বাসনের গায় মাখাও। সমস্ত পাত্রগুলি মাখান হইলে গরম জলে দুই এক ফোটা অ্যামোনিয়া ফেলিয়া দিয়া রূপার বাসনগুলি তাহাতে ধুইয়া লও। তারপর শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া ফেল।

**বিশেষ নির্দেশ :** রূপার বাসনে কখনও অ্যাসিড লাগাইবে না।

**অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) :** ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। বর্তমান যুগের জীবনযাত্রায় লোহার পরেই অ্যালুমিনিয়ামের স্থান। সব রকমের খাত্ত ইহাতে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। হাঙ্কা, টেকসই ও তাপস্থপরিবাহী বলিয়া রান্নার কাজে এই ধাতুটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** গরম জল, ছাই ও স্ট্রীলউল।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** ছাই দিয়া মাজিয়া লইয়া গরম জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। পাত্রে কোন দাগ থাকিলে স্ট্রীলউল দিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে।

**বিশেষ নির্দেশ :** সোডা কিংবা কোন প্রকার ক্ষারজব্য ব্যবহার করা চলিবে না।

**এনামেল (Enamel) :** সস্তা বলিয়া এনামেল পাত্রের প্রচলন বাড়িতেছে। রান্নার পক্ষে অবশ্য ইহা উপযোগী নয়। তবে খাত্তজব্য ঠাণ্ডা কিংবা গরম যে কোন অবস্থায় ইহাতে ঢালিয়া রাখা যায়। এনামেলের পাত্রে খাত্তবস্ত্র স্বাদ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তবে লেপ উঠিয়া গেলে পাত্রের গায় সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়। তাই লেপ-ওঠার পাত্র কদাপি ব্যবহার করিবে না।

**পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম :** সাবান কিংবা সোডা ও গরম জল।

**পরিষ্কার রাখার উপায় :** সাবান কিংবা সোডা মাখাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই চলে।

ধাতু	পরিষ্কার করার সরঞ্জাম	দাগ তোলা	বিশেষ নির্দেশ
তাম্র	গরম জল, হোয়াইটিং, লেবু কিংবা তেঁতুল	লেবু কিংবা তেঁতুল।	টক মাখাইয়া ফেলিয়া রাখিবে না।
পিভল	জল, তেঁতুল বা লেবু এবং লবণ, ছাই ও ব্রাসো।	ঐ	ঐ
লোহা	জল, সোডা, ছাই, ঝামা, তেল ও ভেসিলিন।	ঝামা	সর্বদা শুষ্ক রাখিবে এবং তেল বা ভেসিলিন মাখাইয়া রাখিবে
কাঁসা	জল, তেঁতুল কিংবা লেবু ও ছাই।	লেবু কিংবা তেঁতুল	টক মাখাইয়া রাখিবে না।
কপা	গরম সাবান জল ও বস্ত্রখণ্ড, কারুকার্যখচিত পাত্রের জল (১) সিলভো বা (২) স্পিরিট, হোয়াইটিং, অ্যামোনিয়া ও জল।		অ্যাসিড লাগাইবে না
অ্যালুমিনিয়াম এনামেল	গরম জল, ছাই, স্ট্রলউল সাবান কিংবা সোডা, ছাই ও গরম জল।	স্ট্রলউল	কখনও সোডা ব্যবহার করিবে না।

### ৩. অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ—উহাদের বিনাশ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় ( Study of household pests—their prevention and control measures )

স্বাস্থ্য প্যাট্রিক ম্যান্সন সর্বপ্রকার কীটপতঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহারা নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায়। ম্যালেরিয়া, পীডজর, ডেঙ্গু, মেনগ, কাইলেরিয়া কালাজর প্রভৃতি



রোগ ছড়ায় কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গের সঙ্গে বাস্তবিক আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। গৃহপালিত পশু বাদ দিলে কীটপতঙ্গের মত আর অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা নাই। উহারা আমাদেরই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আমাদের খাত্ত, বস্ত্র ও আসবাবপত্র খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমরাও অনেক কীটের দেহ দিয়া আমাদের বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া থাকি। সব পতঙ্গই যে মানুষের অনিষ্ট করে তাহা নয়, অনেকে আবার আমাদের উপকারও করিয়া থাকে। তবে অধিকাংশ পতঙ্গই অত্যন্ত বিপজ্জনক। উহারা রোগজীবাণু বহিয়া আনিয়া নানাভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রধানতঃ মশা ও ইঁদুর-মাছি (Rat-fleas) বলিয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিকা ম্যালেরিয়া ও প্লেগের বীজ ছড়াইয়া যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতকগুলি কীটপতঙ্গ রোগের নিজস্ব বাহক মাত্র (passive agents)। ইহারা রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু ইত্যাদিতে বসিয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাত্ত দূষিত করে। তারপর ঐ খাত্ত গ্রহণ করিয়া আমরা ঐ সব রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। কোন কোন কীটপতঙ্গ আবার সক্রিয়ভাবে রোগ ছড়ায়। ইহাদের বলে সক্রিয় বাহক (active agents)। ইহারা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিয়া আপনাদের দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং স্বস্থ ব্যক্তির দেহে দংশন করিবার সময় ঐ জীবাণু ঢালিয়া দেয়। রোগ-সংক্রমণ করা ব্যতীত অনেক কীটপতঙ্গ আমাদের আসবাবপত্র, পুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করে।

### কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ :

উপরোক্ত তিন উপায়ে কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া কীটপতঙ্গের আমরা তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। নিম্নে এই শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল :

(১) রক্ত চুষিয়া যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট করে :

(ক) মশা : মশা আমাদের রক্ত পান করিবার সময় আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাড়ির আশেপাশে যেখানেই জলাভূমি কিংবা একটু স্নাতসৈতে জায়গা পায় সেখানেই ডিম পাড়িয়া বসে।

(খ) বালু-মক্ষিকা : ভারতের কোথাও কোথাও বালু-মক্ষিকা দেখা যায়। এই পতঙ্গ কামড়াইলে জ্বর হয়।

(গ) ছারপোকা ও মক্ষিকা : ইহারা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসগৃহেই ঘুমাইয়া থাকে এবং আমাদের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও বিভিন্ন রোগ ছড়ায়।

(ঘ) উকুন : মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচে এবং নানাক্রম রোগ ছড়ায়।

(২) আমাদের খাত্তের মধ্য দিয়া যেসব কীটপতঙ্গ রোগের জীবাণু ছড়ায় :

(ক) মাছি : সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে মাছির মত বোধহয় মানুষের আর দ্বিতীয় শত্রু নাই। সব বকমের পেটের পীড়া সংক্রামিত হয় মাছির সাহায্যে।

(খ) পিপীলিকা : কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায়। আমাদের খাত্তে বসিয়া খাত্ত ধ্বংস করা ছাড়া ইহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে না।

(গ) আরশোলা (cockroach) : মাছির মতই আরশোলা উহার দেহে রোগের জীবাণু লইয়া আমাদের খাত্তের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় এবং খাত্ত দূষিত করে।

(ঘ) ইঁদুর : ইঁদুর প্লেগ ছড়াইতে সাহায্য করে।

(৩) যে সমস্ত কীটপতঙ্গ আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করে :

(ক) ঘূণ (moth) : ঘূণ আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

(খ) সিলভার ফিস : রুজিন রেশমী কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়া বস্ত্র এবং কাগজ নষ্ট করে।

(গ) বইএর উকুন (book lice) : বই কাটে।

(ঘ) আরশোলা : আমাদের বই, ছবি, রেশমী বস্ত্র ও চামড়ার জিনিস নষ্ট করে।

(ঙ) ইঁদুর : বস্ত্রাদি ও আসবাব কাটিয়া নষ্ট করে।

(চ) ক্রিকিট (cricket), বোলভা (wasp) ও উই (white ant) : আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে।

**কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট্য :**

কীটপতঙ্গের দেহে একটি কঠিন আবরণ থাকে এবং সমস্ত শরীরটি তিন ভাগে বিভক্ত—(১) দুইটি শুণ্ডবিশিষ্ট মস্তিষ্ক। (২) তিন ভাগে বিভক্ত বক্ষঃস্থল। বক্ষঃস্থলে তিন জোড়া পা ও এক কিংবা দুই জোড়া ডানা থাকে। (৩) উদর

সাধারণতঃ নয় বা দশ ভাগে বিভক্ত। মাছের মত কীটপতঙ্গের কোন ফুসফুস নাই। উহার ফুসফুসের বদলে অল্প একটি অঙ্গ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সমাধা করে। কীটপতঙ্গের মধ্যে নারী ও পুরুষের ভেদ স্পষ্ট। ডিম হইতে ইহাদের জন্ম হয়। কোন কীটপতঙ্গ কি কি রোগ ছড়ায় নিয়ে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল :

- (১) মশা ( mosquito ) : ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর ও ডেঙ্গু।
- (২) উপমক্ষিকা ( fleas ) : বিউবোনিক প্রেগ, টাইফাস ও কালাজ্বর।
- (৩) উকুন ( lice ) : টাইফাস জ্বর ও ট্রেঞ্চ জ্বর।
- (৪) গৃহমক্ষিকা ( house flies ) : টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয়।
- (৫) বালু-মক্ষিকা ( sand flies ) : বালু-মক্ষিকা জ্বর ও কালাজ্বর।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিবে :

- (১) বাসগৃহ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পারচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখবে।
- (২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না। নিকটেই যদি পুকুরিণী থাকে তবে উহাতে মশার ডিম ( larvae ) ধ্বংসকারী মাছ রাখিবে। যদি খানা, ডোবা কিংবা এঁদো পুকুর থাকে তবে উহাতে প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন কিংবা ডি.ডি.টি. ছড়াইবে।
- (৩) যেখানেই ভাঙা শিশি, কাচের বোতল ইত্যাদি পাইবে তাহা দূরে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ ফেলিবে, কারণ, এই সব ভাঙা শিশি-বোতলেও বৃষ্টির জল জমিয়া মশার সৃষ্টি হইতে পারে।
- (৪) খাটাল, গোশালা ও আস্তাবল পরিষ্কার ঝকঝকে রাখিবে।
- (৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল কিংবা ছাতে কোথাও যদি কোন ফাটল কিংবা গর্ত থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিবে। ইঁদুর, আরশোলা ও ছারপোকাকার বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল।
- (৬) মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইবে।
- (৭) মাঝে মাঝে সমস্ত আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোথাও ছারপোকা জন্মিয়াছে কিনা। এতদ্ব্যতীত আলমারির পশ্চাৎ ও ঘরের অন্ধকার কোণগুলি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া কাঁট দিবে। দিনের বেলায় মশা ও আরশোলা ঐসব স্থানে লুকাইয়া থাকে।

(৮) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, ওরকারির খোশা, মাছের আশ, ডিমের খোলা একটি ঢাকনাওয়ালা পাত্রে মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাখিবে। তারপর ঐগুলি একসঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৯) ঘরের জানালায়, অন্ততঃ রান্নাঘরের দরজা ও জানালায় মশা মাছি প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ সূক্ষ্ম জাল আঁটিয়া দিবে।

(১০) কোন খাণ্ডই না ঢাকিয়া রাখিবে না।

(১১) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসী গাছ পুঁতিয়া দিলে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। তামাক গাছও রোগের জীবাণু ধ্বংস করে।

(১২) বাড়িতে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধূপধুনা জ্বালাইলেও কীটপতঙ্গ দূর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে শুকনো নিম পাতা ও তামাক পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাটিতে পারে না। কর্পূর অথবা নেপথ্যালিন, ইউক্যালিপটাস তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া দিলে অথবা পোকামাকড়ের সম্ভাব্য বাসস্থানে পাইরেথ্রাম, সালফার, বোরাক্স, ফটকিরি কিংবা লঙ্কার গুঁড়া ছিটাইয়া দিলেও উহার ধ্বংস হয়।

(১৩) জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমালডি-হাইড ; কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল তেলও কার্যকরী।

সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেলের মিশ্রণে এক প্রকার জীবাণুনাশক লোশন তৈয়ারী হয়। এই লোশন তৈয়ারীর উপাদান নিম্নরূপ :

সাবান ... ৩ ভাগ

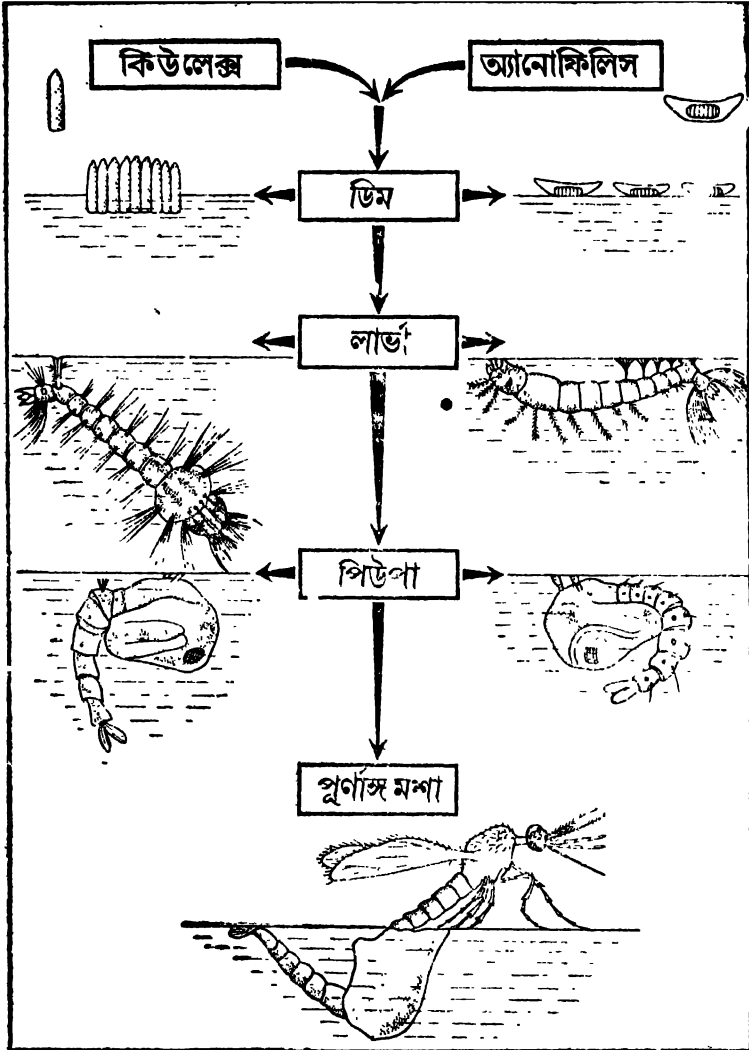
গরম জল ... ১৫ ভাগ

কেরোসিন ... ৮২ ভাগ

প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল করিয়া গুলিয়া নাও। তারপর একটি গরম জলের পাত্রে মধ্যে কেরোসিনের বোতলটি রাখিয়া কেরোসিন উদ্ভুত করিয়া নাও। মনে রাখিবে আঙনের কাছে রাখিয়া কেরোসিন গরম করিতে নাই। এইবার উদ্ভুত কেরোসিন সাবান মিশ্রিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া নাও। যে লোশন তৈয়ারী হইল উহা কোন বোতলে পুরিয়া রাখিবে। তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে ( লোশন ১ : জল ১০ ) মিশাইয়া ঘরে স্প্রে কর। ইহা অত্যন্ত সস্তা এবং কার্যকরী।

## মশা

মশা আমাদের পরম শত্রু। ভারতের প্রায় সর্বত্রই মশার উপদ্রব দেখা যায়।  
 ---মশার অভাব ও জীবন-চক্র : ইহা একপ্রকার ডানাবৃত্ত স্ত্রী পতঙ্গ  
 বিশেষ। পুরুষ মশা সাধারণতঃ ঘাসপাতার রস খাইয়া জীবনধারণ করে কিন্তু



ক্রীমশার ডিমের পরিপুষ্টির জন্য মানুষের রক্ত না হইলে চলে না। বহু জলাশয়  
 পাইলে উহারা ডিম পাড়িয়া রাখে। চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়া মশার  
 পরিণতি ঘটে—ডিম, শূককীট বা লার্ভা, মুককীট অর্থাৎ পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশক।

মশার ডিমগুলি প্রথমে জলে ভাসিয়া বেড়ায়। তারপর প্রায় ২০ ঘণ্টা পরে উহাদের শূককীট বাহির হয়। বায়ু গ্রহণ করিবার সময় শূককীটগুলি কিছুক্ষণ পর পরই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। ৭ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে শূককীটগুলি মুককীটে পরিণত হয় এবং তিন চারদিন পরে খোলস বদলাইয়া ডানায়ুক্ত পূর্ণাঙ্গ মশা বাহির হইয়া আসে।

**মশার প্রকারভেদ :** মশা সাধারণতঃ তিন প্রকার : অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও স্টেগোমায়া। উহারা যথাক্রমে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এবং ডেঙ্গুর ছড়াইয়া থাকে।

**মশা নিবারণ :** (১) যে সমস্ত স্থানে মশার ডিম পাড়িবার সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত গর্ত, খানা, ডোবা, এঁদো পুকুর ইত্যাদি ভরাট করিয়া ফেলিবে এবং বাড়ির আশেপাশে কোন জঙ্গল জমিতে দিবে না।

(২) শূককীট অবস্থায় মশা নিধন করা সহজ। শূককীটগুলি বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। কাজেই যে জলে মশা ডিম পাড়িয়াছে ঐ জলে কিছু কেরোসিন ঢালিয়া দিলে জলের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে। শূককীটগুলি তখন ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না এবং বায়ুর অভাবে শীঘ্র মরিয়া যায়।

পুকুরীতে মাছ রাখিলে মাছও মশার শূককীট খাইয়া ফেলে।

(৩) রাজে সর্বদা মশারি খাটাইয়া শুইবে।

(৪) অন্ধকার না হইলে অ্যানোফিলিস মশা বাহির হয় না। সুতরাং অন্ধকার হইবার পূর্বেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিবে।

(৫) ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন স্প্রে করিলেও মশা ধ্বংস হয়। ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইলে মশা দূর হয়।

### ছারপোকা

**প্রকৃতি :** ছারপোকা অতিশয় বিরক্তিকর ও ঘৃণ্য জীব। মানুষের রক্ত পান করিয়াই উহারা বাঁচিয়া থাকে। প্রতি পাঁচদিন অন্তর উহাদের একবার করিয়া আহার দরকার। তবে খাওয়া পাইলেও উহারা একনাগাড়ে কয়েক মাস মরার মত থাকিতে পারে।



ছারপোকা

**বালস্থান :** ঘরের ফাটলে, মেঝেতে, খাটে, বিছানা ও আসবাবপত্রে ছারপোকা লুকাইয়া থাকে।

**ছারপোকা নিবারণ :** (১) বিছানাপত্র নিয়মিত ধোঁজে দিলে এবং বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে ছারপোকা জন্মিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(২) ছারপোকা জন্মাইলে আসবাবে ফুটন্ত জল ঢালা সঙ্গত কারণ ইহাতে তাহাদের বংশ হ্রাস পায়।

(৩) কেরোসিন তেলের সঙ্গে ডি. ডি. টি. কিংবা গ্যামাল্লিন স্প্রে করিয়া দিলে ছারপোকা নষ্ট হয়।

(৪) বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে দেওয়ালের ফাটলে আর ছারপোকা জন্মিতে পারে না।

### উকুন

**প্রকৃতি :** উকুন একপ্রকার ডাণ্ডাবিহীন ক্ষুদ্র পতঙ্গ। ইহারা মানুষের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সাধারণতঃ উকুনের সান্নিধ্যে না আসিলে উকুন জন্মায় না। সাধারণতঃ মাথায় ও গায়ই উকুন জন্মায়। তবে নোংরা দেহে আশ্রয় পাইলে সহজেই উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে।

**রোগ সংক্রমণ :** উকুন টাইফাস জ্বর সংক্রামিত করে। টাইফাস রোগীর রক্ত পান করিবার সময় ঐ রোগের জীবাণু উকুনের পেটে চলিয়া যায় এবং সেখানেই বাড়িতে থাকে। প্রায় ৭ দিন পরে কোন স্তম্ভ ব্যক্তির রক্ত পান করিবার সময় ঐ জীবাণু ঢালিয়া দেয়।

**উকুন নিবারণ :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই উকুন প্রতিরোধের সর্বপ্রধান উপায়। উকুন আছে একপ লোকের সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। মাথায় উকুন জন্মাইলে ডি. ডি. টি. ( ৫% ভাগ ) জলে গুলিয়া মাথা ঘষিয়া ফেলিবে। উকুন দূর করা হুঃসাধ্য হইলে মাথা গুঁড়া করাই সঙ্গত।

মশা, ছারপোকা এবং উকুন এই পতঙ্গগুলি রোগের সক্রিয় বাহক।

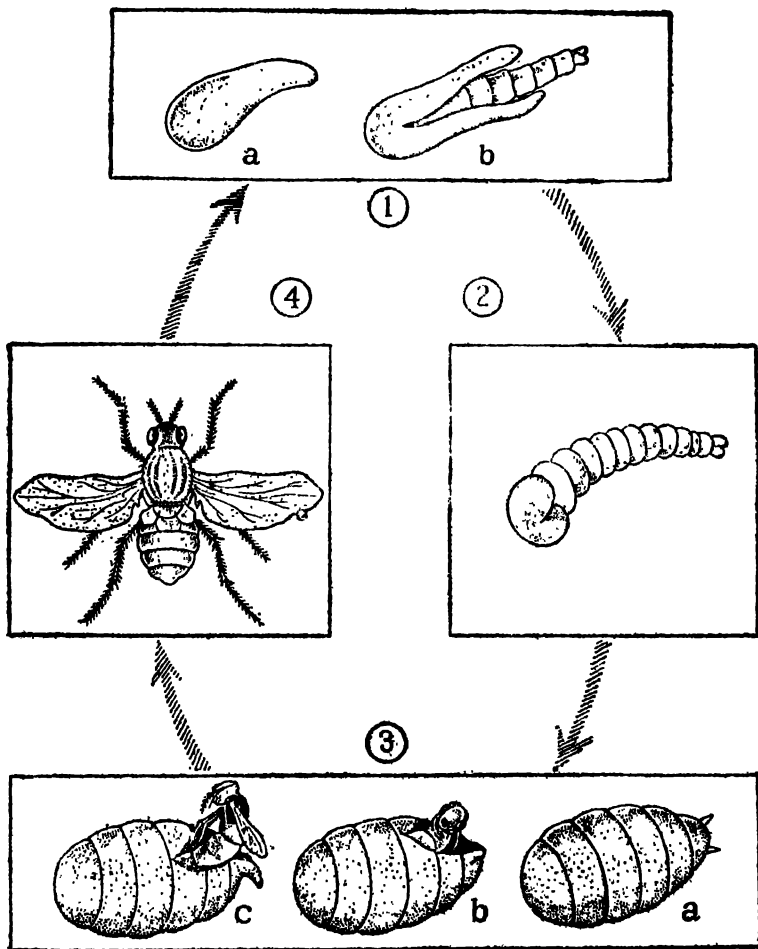
### মাছি

মাছি আমাদের পরম শত্রু। ইহারা মল, মূত্র, গয়ের ইত্যাদির উপর বসিয়া সমস্ত দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং তারপর আমাদের খাত-দ্রব্যে বসিয়া খাতদ্রব্য দূষিত করে। এইভাবে মাছির দ্বারা টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত হয়। এতদ্ব্যতীত ক্ষতস্থানে বসিয়া ডিম পাড়িয়া ক্ষত বিধাক্ত করিয়া তোলে।

**জীবন-বৃত্তান্ত :** মশার মতই মাছিরও চারিটি অবস্থা—(১) ডিম, (২) শূককীট, (৩) মুককীট ও (৪) পূর্ণাঙ্গ মাছি।

(১) **ডিম :** মাছির ডিমগুলি দেখিতে চকচকে সাদা। ডিমগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সাধারণতঃ উপযুপরি সাজান থাকে।

(২) **শুককীট** : একদিনের মধ্যে ডিমগুলি শুককীটে পরিণত হয়। আমরা ময়লার মধ্যে যে পোকা দেখি সেগুলি মাছির শুককীট।



(৩) **মুককীট** : প্রায় এক সপ্তাহ পরে শুককীটগুলি মুককীটে পরিণত হয়। ইহারা দেখিতে গুটির আকার। মুককীটগুলির কোন খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(৪) **পূর্ণাঙ্গ মাছি** : সাধারণত: চার পাঁচদিন পরে মুককীটগুলির খোলস ফাটিয়া যায় এবং ভানাযুক্ত ক্ষুদ্র মাছি বাহির হইয়া আসে।

**মাছি নিবারণ** : (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মাছির বংশবৃদ্ধি নিবারণ করিতে সাহায্য করে। বাড়ির ভিতর গোশালা, পায়খানা, নর্দমা সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে। গৃহের সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া নিয়মিত পুড়াইয়া ফেলিবে



(২) যেখানে সেখানে থুঁথু কিংবা গয়ের ফেলিবে না। এইসব জিনিসে বসিয়া মাছি যাহাতে রোগবিস্তার করিতে না পারে সেইজন্ত উহাদের সর্বদা মাটিচাপা দিয়া ফেলিবে।

(৩) বাড়ি হইতে অনেক দূরে খাটা-পায়খানা রাখিবে।

(৪) খাদ্যদ্রব্য কদাপি অনাবৃত রাখিবে না।

**বাড়ি মাছির উচ্ছেদ :** সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও মাছি জন্মিতে পারে। তখন ফর্মালিন ডি. ডি. টি. ও পাইরেথ্রাম পাউডার ছড়াইয়া দিলে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্লাই-ট্র্যাপের সাহায্যে মাছি মারিয়া ফেলিবে। বেড়ির তেল পাঁচ ভাগ ও রজন ৮ ভাগ একত্রে ফুটাইয়া আঠা তৈয়ারী করিয়া কাগজে ছড়াইয়া রাখিলে মাছির পা আটকাইয়া যায়। তারপর ঐ কাগজগুলি জড়াইয়া ফেলিবে।

**আরশোলা :** আরশোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক পতঙ্গ। প্রথমতঃ ইহার আমাদের বইপত্র, কাপড়চোপড় এবং চামড়ার জিনিসপত্র খায়। উপরন্তু ইহার নানা রোগের বাহকও বটে।

আরশোলা নর্দমার নোংরা এবং সবরকমের আবর্জনা ঘাটিয়া বেড়ায়। তারপর সেখান হইতে জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাঞ্চে বসে। আরশোলা এইভাবে এমিবা জনিত আমাশয়, পোলিওমাইলিটিস এবং ডিপথেরিয়া ছড়াইতে সাহায্য করে।

**আরশোলা প্রতিরোধ :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই আরশোলা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইলেও আরশোলার উপদ্রব এড়ান যায়। বাড়িতে আরশোলা জন্মিলে খাবারের সঙ্গে বিষ মাখাইয়া দিলে আরশোলা ঐ বিষাক্ত খাবার খাইয়া মরিয়া যাইবে।

**ইঁদুর :** কাপড়-চোপড়, বই ও মূল্যবান আসবাব কাটিয়া ইঁদুর আমাদের ক্ষতি করে। ইঁদুরের দংশনে একপ্রকার জ্বর ( Rat Bite fever ) হয়। সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে ইঁদুর প্লেগ রোগের বাহক উপমক্ষিকাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইসব উপমক্ষিকা ইঁদুরের রক্ত পান করে এবং প্রথমে ইঁদুরের মধ্যে প্লেগ ছড়ায়। পরে ইঁদুরের অভাবে ভূষণ্ত হইয়া মানুষের রক্ত পান করে। দংশনকালে মানুষের দেহে প্লেগের জীবাণু সংক্রামিত করে।

**নিবারণ :** (১) ইঁদুর খাঞ্চের লোভেই বাড়িতে উৎপাত করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সতর্কতার সঙ্গে ইঁদুরের নাগালের বাহিরে রাখিবে।

(২) বাড়িতে বিড়াল পুখিলেও ইঁদুরের উপদ্রব থাকে না।

(৩) ইঁদুর ধরা ফাঁদও ব্যবহার করা চলে।

(৪) আটা কিংবা ময়দার সঙ্গে ইঁদুর মারা বিষ বাড়ির চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে ইঁদুর ঐ বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে।

মাছি, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গগুলি রোগের নিষ্ক্রিয় বাহক।

**রূপালী পোকা ( Silver fish ) :** এই কীটগুলির গায়ের বর্ণ রূপালী। আকৃতি ঠিক মাছের মত এবং দেহ অতিশয় মৃদু। এইজন্য ইহাদের silver fish বা রূপালী পোকা বলা হয়। ইহারা মাছি কিংবা পোকার মত উড়িতে পারে না, তবে আকিয়া ঝিকিয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম রেশম বস্ত্র ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং মাড়, বার্নিশ অথবা আঠা লাগানো জিনিস ইহারা খায়। আলমারির ভিতরে বই থাকিলে রূপালী পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

**নিবারণ :** বায়ু-সঞ্চালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইহাদের দমন রাখে। মাঝে মাঝে বই, কাপড়চোপড় কাড়িয়া ফেলিলে বা পোশাক-পরিচ্ছদ রৌদ্রে দিলে ইহাদের উপদ্রব কমিয়া যায়। টাটকা পাইরেথ্রাম পাউডার ছিটাইয়া দিলে, ইহাদের উপদ্রব কমে। তাছাড়া ঘরে পাইরেথ্রাম কিংবা গন্ধক পোড়াইলেও রূপালী পোকা ধ্বংস হয়।

**উই :** উই পিপীলিকার মত পতঙ্গ নয়, তবে উহাদের মতই স্তম্ভবৎ। কাঠই ইহাদের প্রধান খাদ্য। উহারা তাই গাছের শূঁড়ি কিংবা কাঠের স্তম্ভের ভিতরটা এমনভাবে খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে যে বাহিরের কেবল কাঠের ফাণ্ডা খোলাটি দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর একদিন ধীরে ধীরে গাছটি আপনার ভারে ভাঙিয়া পড়ে।

**উই প্রতিরোধের উপায় :** বাড়িতে উইএর বাসা থাকিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া ফেলিবে। বাড়িতে ফাটল দেখিলে তৎক্ষণাৎ ভরাট করিয়া দিবে।

গাছে উই দেখিলে কেরোসিন তেলের লোশন স্প্রে করিয়া দিবে। বাজারে পোকামাকড় ধ্বংস করিবার যেসব ঔষধ পাওয়া যায় তাহাও মাঝে মাঝে স্প্রে করিবে।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করা উচিত :

- (১) বসতবাটি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখিবে।
- (২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিতে দিবে না ; কারণ জল জমিয়া থাকিলে মশা সৃষ্টি হয়।
- (৩) বাড়িতে কোথাও ফাটল কিংবা গর্ত থাকিলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিবে, নতুবা ইঁদুর, আরশোলা ও ছারপোকার উৎপাত বাড়িবে।
- (৪) মাঝে মাঝে চুনকাম করাইবে এবং সেইসঙ্গে আসবাবপত্রগুলিও পালিশ করাইয়া লইবে।
- (৫) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারির খোসা মাটি চাপা দিয়া দিবে। নতুবা নিয়মিত পোড়াইয়া ফেলিবে।
- (৬) খাদ্যদ্রব্য সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে।
- (৭) প্রতিদিন বাড়িতে ধূপধূনা দিবে এবং কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে গুপথালিন কিংবা নিমপাতা দিয়া রাখিবে।

C. দেহসৌষ্ঠব বাড়াইবার  
কৌশল এবং সুগৃহিণী  
( The Art of Good Grooming  
and the Home Maker )

১. পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব ( Importance of Clothing )

নিম্নলিখিত চারিটি কারণে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তা অমুভব করিয়া আসিতেছি।

(১) শালীনতা রক্ষার জন্ত : আদিম যুগের মানুষ উল্লঙ্গ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষের মনে লজ্জার উদয় হইল সেদিন হইতে সে লজ্জানিবারণের জন্ত বস্ত্রাদির গুরুত্ব অমুভব করিল। এক সময় বস্ত্র হিসাবে গাছের পাতা, বাকল, বস্ত্র পশুর চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন তন্তুর বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

(২) শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্তও আমরা বস্ত্রাদির গুরুত্ব অমুভব করিয়া থাকি। শীতের সময় দেহের তাপ বজায় রাখিতে আমরা পশমের বস্ত্রাদি ব্যবহার করি। পশমের বস্ত্রাদি অনেক দামী। এইজন্ত দরিদ্র জনসাধারণ পশমের পরিবর্তে স্থতির মোটা বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। ঋতুভেদে বস্ত্রের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। যে সকল বস্ত্র জলে নষ্ট হয় না এবং সহজেই জলে ধোওয়া যায় সেইরূপ বস্ত্রাদি বর্ষাকালের উপযোগী। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচুর ঘাম হয়। সুতরাং যে সকল তন্তু সহজেই ঘাম শুষিয়া লইতে পারে এবং যাহা দেহের উত্তাপ দ্রুত বায়ুতে সঞ্চালিত করিয়া দেহকে শীতল রাখিতে পারে সেইরূপ বস্ত্রাদিই গ্রীষ্মকালের উপযোগী। এইজন্ত স্থি ও লিনেন বস্ত্রাদি এই সময় বিশেষ উপযোগী।

(৩) দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্তও আমরা পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব অমুভব করিয়া থাকি। সৌন্দর্যের আকাজক্ষা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সৌন্দর্যচর্চার জন্ত আমরা কত রকমের জিনিস ব্যবহার করি। ঐ সকল উপকরণের মধ্যে পোশাকের স্থান সকলের উর্ধ্বে।

(৪) রোগ-জীবাণু, আণ্ডন এবং অগ্ন্যাদি অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার সময় চিকিৎসকগণ হাতে দস্তানা পরিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে মুখেও অমুরূপ কোনো বস্ত্রাদির

আবরণ ব্যবহার করেন। আবার রসায়নাগারে বিজ্ঞানীরা অ্যাসিড বা অল্প কোন মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ‘অ্যাপ্রন’ ব্যবহার করেন। ফ্যাব্রিক ত্রিগেণ্ডের কর্মচারীরা আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত অ্যাসবেস্টসের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের একটি কাজ।

## ২. পোশাক পরিধানে ত্রুটি ( Errors in Clothing )

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার সম্বন্ধে সূচু জ্ঞান থাকিলে পোশাক পরিধানের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সহজেই নজরে পড়ে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে এই ত্রুটি ঘটিতে পারে :

(১) **আঙ্গিক ত্রুটি :** দেহসৌষ্ঠব পরিস্ফুট করা পরিচ্ছদের একটি প্রধান কাজ। পরিচ্ছদ নির্বাচনকালে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহা ব্যক্তিত্বকে কতখানি বিকশিত করিল। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের মার্ককতা। পরিচ্ছদ নির্বাচনের সময় তাই গায়ের রঙ, দেহের আকৃতি অর্থাৎ দীর্ঘাকী কিংবা খর্বাকৃতি, ক্ষীণাকী কিংবা স্থূলকায় ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথাযথ পোশাক নির্বাচনের দ্বারা স্থূলকায়াদের কিছুটা ক্ষীণাকী এবং ক্ষীণাকীদের অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় প্রতীয়মান করানো যাইতে পারে। এইভাবে অঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলির সহিত মিলাইয়া পোশাক পরিধান করিতে না পারিলে উহা পরিচ্ছদের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) **বয়সজনিত ত্রুটি :** নারী এবং পুরুষমাত্রেই বয়স অনুযায়ী পোশাক পরিধান করিবেন। শৈশবের পোশাক হইবে হাল্কা রঙের, ঢিলাঢালা ও নরম অর্থাৎ স্নখকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কৈশোরে ও যৌবনে চেহারায়া লাবণ্যের ছাপ পড়ে। সুতরাং যৌবনের পোশাক উজ্জ্বল, সুন্দর এবং একেবারে মাপসই হওয়া উচিত। বার্ধক্যের পোশাক আবার অনাড়ম্বর অথচ খুব পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুবক-যুবতীদের পোশাক যদি অনাড়ম্বর হয় কিংবা বৃদ্ধের পোশাকে অতিশয় উগ্রতা বা বাহুল্য দেখা যায় তবে তাহা পোশাকের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(৩) **ব্যক্তিগত রুচিজনিত ত্রুটি :** আজকাল অনেক মেয়েদের বিকৃত রুচির জন্ত পোশাক পরিধানে ত্রুটি দেখা যায়। তাহাদের ব্লাউজের ছাটকাট এবং শাড়ি পরার ধরন-ধারণ স্বাভাবিক শিষ্টাচার ও শালীনতা লঙ্ঘন করে এবং অপরের চোখ ও মনকে পীড়িত করে।

(৪) **স্ত্রী-পুরুষজনিত ত্রুটি :** ছোট ছোট ছেলেদের শার্ট-প্যান্ট, ছোট ছোট মেয়েদের ব্রক-ইজার, ছেলেদের ধুতি-পাঞ্জাবী অথবা শার্ট-প্যান্ট, মেয়েদের শাড়ি ইত্যাদি পোশাক পরিধানের রীতি আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মেয়েরা আজকাল পুরুষের অনুকরণে অনেকেই পাতলুন ও পাজামা ব্যবহার করিতেছে, চুল ছাটিয়া ছোট করিতেছে এবং ছেলেরা আবার মেয়েদের অনুকরণে লম্বা চুল রাখিতেছে, ব্লাউজের অমুরূপ জামা ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের এইরূপ পোশাক মেয়েদের সৌন্দর্য বিকাশের কিংবা ছেলেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হইতেছে না। ফলে উহা পরিচ্ছদের ভুল ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইতেছে।

(৫) **স্থানকালজনিত ত্রুটি :** স্থান, কাল অনুযায়ীও পোশাক পরিবর্তন করিতে হয়। বিবাহ কিংবা কোনো আনন্দ অকুণ্ঠনে উজ্জ্বল জাঁকজমকপূর্ণ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ম্যাজেন্টা, আগুনে রঙ, গাঢ় নীল অথবা বেগুনী রঙগুলি উৎসবের উপযুক্ত। আবার সাদা জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন ও শুভ্রতার প্রতীক। এইজন্ত প্রার্থনা কিংবা শোকমন্ডায় তৈলকে সাদা দামী কাপড় পড়ে। রুদ্রিম আলো পোশাকের রঙের তারতম্য ঘটায়। তাই দিনের পোশাকের রঙ রাত্রে পোশাকের রঙ হইতে পৃথক হইবে। উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম পোশাকের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(৬) **পেশাজনিত ত্রুটি :** কিছু কিছু কাজ আছে যাহা যে কোন পোশাক পরিয়াই করা চলে। কিন্তু কতকগুলি কাজে নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক না পরিলে কাজের অসুবিধা ত হইই এমন কি জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে। একজন রাগীর পক্ষে ধুতি-পাঞ্জাবী বা কোট-প্যান্ট উভয়ই সমান। কিন্তু একজন মূলমঞ্জুরের পক্ষে ধুতি-পাঞ্জাবী বিপজ্জনক। ধুতি-পাঞ্জাবী যে কোন সময়ে মেনিনে জড়াইয়া গিয়া তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। যাহারা মেনিন ও যন্ত্রপাতির কাজ করে তাহাদের টিলে জামাকাপড়ের পরিবর্তে আটসাঁট জামাকাপড় পরিতে হয়। ইহাতে কাজের অসুবিধা হয় এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকটিক্যাল ক্লাশে আটসাঁট জামাকাপড় পরিতে হয়। ইহাতে কাজের অসুবিধা হয় এবং বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। তাছাড়া আগুনের সামনে কাজ করিতে হইলে কোন সহজসাধ্য তত্ত্বের জামাকাপড় পরিধান করা উচিত নয়।

(৭) **ঋতুজনিত ত্রুটি :** ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। শীতকালে সূতি অপেক্ষা পশমের পোশাক অধিক উপযোগী। পশমের বস্ত্র দেহের তাপ অপসারণ রোধ করিয়া শরীর উষ্ণ রাখে। সূতির বস্ত্রাদির এই

গুণ নাই। আবার গ্রীষ্মকালে সূতির বস্ত্রাদিই অধিক উপযোগী। গ্রীষ্মকালে পশমের বস্ত্র পরিধান করিলে গরমে শরীর অস্বস্থ হইয়া পড়িতে পারে।

(৮) **ভৌগোলিক পরিবেশজনিত ক্রটি :** আমাদের দেশ প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান। এই আবহাওয়ার পক্ষে সূতির বস্ত্রাদিই অধিক উপযোগী। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পক্ষে আবার পশমের বস্ত্রাদি অধিক উপযোগী। সুতরাং একজন ব্রিটেনবাসীর পক্ষে সূতির পোশাক পরিধান যেমন ক্রটিপূর্ণ তেমনি একজন ভারতবাসীর পক্ষে সব সময় পশমের পোশাক পরিধানও ক্রটিপূর্ণ।

(৩) **বয়স, স্ত্রীপুরুষ ভেদে, পেশা এবং ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন** ( Choice of clothes for different occasion according to age, sex, occupation and seasonal variations )

**বয়স অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন :** মানুষের জীবনকে আমরা শৈশব, কৈশোর ও যৌবন ও বার্ধক্য—প্রধানতঃ এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি। জীবনের এই তিনটি প্রধান ঠিকরে মানুষের প্রয়োজন এবং রুচির পার্থক্য দেখা যায়। তাই পোশাক নির্বাচনের সময় প্রথমেই বয়সের কথা বিবেচনা করা দরকার। প্রথমেই শিশুর পোশাক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

(১) শিশুর পোশাক নির্বাচনে দৈহিক প্রয়োজনীয়তার দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। পোশাক পরিধানের জগৎ দুইটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শালীনতা এবং সৌন্দর্য রক্ষার প্রয়োগ শিশুর নিজের কাছে আবাস্তর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঐ দুইটি দিকও বিবেচনা করিতে হয়। তবে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন স্বাস্থ্য। শিশুর জগৎ চাই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক।

যে পোশাক শিশুর দেহের তাপ-সংরক্ষণে এবং তাহাকে আরাম দিতে সমর্থ তাহাই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক। সূতির তন্তু তাপ-সুপরিবাহী বলিয়া গ্রীষ্মকালে শিশুকে আরাম দেয়, পরন্তু রেশম, পশম, কটনউল, ফ্লানেল প্রভৃতি তন্তুর পোশাক তাপ-কুপরিবাহী বলিয়া শীতকালে শিশুর দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। ঐ সব তন্তুর মধ্যে আবার পশমই হইল সবচেয়ে বেশী তাপ-কুপরিবাহী। এইজন্য গ্রীষ্মকালে সূতির এবং শীতকালে পশমের পোশাকই শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত।

(২) শিশুর অগ্রতম প্রয়োজন **পরিচ্ছন্নতা**। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক কম। শিশুর বস্ত্রের উপাদান এইরূপ হওয়া চাই যাহা সহজেই কাচা এবং শুকানো যায়। এই হিসাবে সূতির তন্তুই আমাদের দেশের শিশুদের উপযোগী।

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া শিশুর পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিবে। বয়স্কদের দিনে বারবার পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নানা কারণে শিশুর ঘন ঘন পোশাক বদলান দরকার। এইজন্য ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া শিশুর পোশাক নির্বাচন করিবে।

(৪) শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য ঢিলাঢালা পোশাকই স্বাস্থ্যসম্মত।

(৫) শিশুর পোশাকের রঙ উজ্জ্বল ও পাকা হওয়া চাই। ছোট শিশুরা উজ্জ্বল বর্ণই পছন্দ করে এবং উহা শিশুর মনও প্রফুল্ল রাখে।

(৬) সবচেয়ে শেষের কথা হইল শিশুর পোশাক হইবে স্বাস্থ্য, নরম, বাহ্যল্যবর্জিত ও সস্তা।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

“শিশুরা যাহারা ধূলিমাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্র-বৃষ্টি-বায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়াবোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের স্নেহ, নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মত অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব……” (শিক্ষাসমস্তা)।

“অভিভাবকদের লজ্জা নিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা সীংকার শব্দে বধির বিচারকদের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। বস্তুতঃ এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে।”

“ইহার সঙ্গে আসিল শিশুকে অকালে দৈহিক লজ্জা শিখান, ‘অর্থহীন ভদ্রতাবোধ ও বাবুগিরি শিখান’, আর নির্ধাতন — ‘এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন স্নন্দর জামা করাইয়া দিলাম লক্ষ্মীছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিলা।’ এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা ও সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী করিয়া খাতির করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখান হইয়া থাকে।”

( আচরণ )

রবীন্দ্রনাথ সাত বৎসর পর্যন্ত শিশুকে উলঙ্গ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যাপারে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে বলা যায় মহার্য বা জমকালো পোশাকের তুলনায় বেশী পরিমাণে নরম, পরিষ্কার এবং সাদাসিধা জামাকাপড়ই শিশুর পক্ষে উপযুক্ত। শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া জামাকাপড়

জোগাইয়া চলা কঠিন। তাই যেসব কাপড় সহজে কাচা যায় বারবার বদলান যায়, তুলভ অথচ যা কচিসক্ত এবং স্ত্রী শিশুর পক্ষে তাহাই প্রশস্ত।

**কৈশোর ও যৌবনের পোশাক :** কৈশোর বিশেষতঃ যৌবনের পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আপন আপন সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তোলা। তাছাড়া তাহাদের পোশাকও শিশুর পোশাকের মতই স্বাস্থ্যসম্মত হইবে। অতিরিক্ত আঁটসাঁট ব্লাউজ অথবা কর্सेট তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

পোশাকের রঙ, কিশোরী মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে। যেমন একটি কালে। মেয়ে বিরোধী (contrast) বর্ণের পোশাক পরিধান করিতে পারে কিন্তু গভীরভাবে বিরোধী (sharp contrast) বর্ণের পোশাক তাহার পক্ষে বেমানান।

উৎসব এবং বিবাহাদি অতুষ্ঠানে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের পোশাক হইবে উজ্জ্বল এবং সময় বিশেষে জমকালো। সাধারণতঃ লাল, কমলা, হলুদ বা গাঢ় অঙ্গ কোন রঙের-পোশাক উৎসবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে গাত্রবর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎসবের দিনের পোশাকের রঙও নির্বাচিত হওয়া উচিত।

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রায়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যয়বহুল ও কদর্য পোশাক দেখিয়া সমাজবেত্তা ভেবলেন কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘ফ্যান্সি মানেই ব্যয়বাহুল্য এবং কদর্যতা’। ব্যয়বহুল এবং কদর্য পোশাক পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য-সম্মত রুচিকর পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

**বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী পোশাক :** বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষায়ও পরিবর্তন আনা দরকার। বাহ্যল্যবজিত সাদামাটা পোশাকই বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত। তবে শিশুর মতই বৃদ্ধের পোশাকও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যের অহুকুল বিশেষতঃ ঋতুর উপযোগী হওয়া চাই।

**স্ত্রীপুরুষভেদে পোশাকের বিভিন্নতা :** প্রত্যেক দেশেই স্ত্রীলোক এবং পুরুষের জগ্ন নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সাধারণতঃ ছোট ছোট বালকদের জগ্ন শার্ট-প্যান্ট, বালিকাদের জগ্ন আবার ক্রক, ইজার, পুরুষদের জগ্ন ধুতি-পাঞ্জাবী, শার্ট-প্যান্ট, স্ত্রীলোকের জগ্ন শাড়ি-ব্লাউজ নির্ধারিত রহিয়াছে।

**পেশা অনুযায়ী পোশাক :** নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের পোশাক পরিধান করা উচিত। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপযোগী পোশাক হইল ধুতি ও পাঞ্জাবী। ঐরূপ বৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদেরও অতিরিক্ত জমকালে



পোশাক বেমানান। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেয়ে তাহাদের পোশাক যেন মানুষের মনে সস্তম্ভ জাগায়। পরন্তু একজন এয়ার হস্টেসের (air hostess) পোশাক হইবে বাহারে এবং উজ্জ্বল কিংবা একটি মেয়ের পোশাক যদিও শাড়ি এবং ব্লাউজ তথাপি একটি মেয়ে পাইলটের পোশাক হইবে শার্ট-প্যান্ট নতুবা তাহার কাজে অসুবিধা ঘটবে।

অনেক বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আবার নির্দিষ্ট পোশাক আছে। ভারতের জাতীয় পোশাক ধুতি এবং কুর্তা তথাপি চিকিৎসক, সৈনিক, বিমানচালক, কারখানার ফোরম্যানদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করিতে হয় নতুবা তাহাদের কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়, অনেকের আবার জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে। এই জগতই বৃত্তি বা কর্ম অনুসারে পোশাক পরিধান করা উচিত।

**ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন :** পোশাক প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী হওয়া চাই।

দেহের তাপ সংরক্ষণ বস্ত্রের সর্বপ্রধান গুণ। যে তত্ত্বের তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতা যত বেশী সেই তত্ত্বের পোশাক দেহকে উত্তম রাখিতে তত বেশী সমর্থ। উত্তাপ-সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়ী বস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি : তাপ-সুপরিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপরিবাহী তত্ত্ব দেহের উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং ঐ তত্ত্বের দ্বারা প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু উত্তম থাকিয়া দেহ গরম রাখে। রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহী তত্ত্ব, তবে উভয়ের মধ্যে পশমের দেহকে উত্তম রাখিবার ক্ষমতা বেশী কারণ একদিকে যেমন তাপের কুপরিবাহী তেমনি অগ্নিদিকে ইহা নিজের মধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ রাখিতে পারে। তাপ সুপরিবাহী তত্ত্বের জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে সহজেই পরিবাহিত করিতে পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে। সকল বস্তু তত্ত্বের মধ্যে স্নতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-সুপরিবাহী।

আমাদের দেহের তাপমাত্রা হইল ৯৮ ডিগ্রী। বায়ুর তাপমাত্রা সর্বদা ৯৮ ডিগ্রী থাকে না। আবহাওয়া অনুযায়ী উহা ওঠানামা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতা যখন বেশী থাকে তখন বস্ত্রের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু হইতে তাপ পরিবাহিত হইতে না পারিলে গরম লাগে ও ঘাম হয়। এইজন্য গ্রীষ্মকালের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত পোশাকের উপাদান হইল তাপ-সুপরিবাহী স্নতির তত্ত্ব। শীতের সময় আবার তাপ-কুপরিবাহী তত্ত্ব যেমন কটনউল, ফ্লানেল, রেশম, পশম ইত্যাদির পোশাক দেহ উত্তম রাখিতে পারে। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে আবার পশমই সর্বাপেক্ষা বেশী তাপ-কুপরিবাহী। তাছাড়া পশমের অন্তঃস্থ গুণও আছে, যেমন—

(ক) পশমে ধূলাবালি লাগিলে সহজেই ঝাড়িয়া ফেলা যায়।

(খ) পশম তন্তুগুলি আঁকাবাঁকা এবং খাঁজ খাঁজ বনিয়া উহা অগ্নাত তন্তুর তুলনায় গরম।

(গ) অগ্নাত তন্তুর তুলনায় অধিক জল শোষণ করিয়াও ইহা আপনার শুষ্কতা বজায় রাখিতে পারে। বর্ষার ফলে কিংবা শীতের সময় কুয়াশা লাগিয়া পশমের জামা ভিজিয়া যায় না। তাছাড়া পশমের জামা পরিয়া যদি ঘাম হয় তবে পশম ঐ ঘাম শুষিয়া লইবার পরেও নিজের শুষ্কতা বজায় রাখে।

এই সকল কারণে শীতকালে পশমের পোশাকই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। গ্রীষ্ম এবং শীত ঋতুর উপযোগী পোশাকের কথা আলোচনা করা হইল। অগ্নাত ঋতুতে বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের তন্তু নির্বাচন করিবে।

#### 4. পোশাকের নকশা এবং পোশাক প্রস্তুতির মূলনীতি ( Dress designing and principles of clothing construction )

পোশাক প্রস্তুতির সময় কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। এই নিয়মগুলি আলোচনা করা হইল :

(১) প্রথমতঃ যে ব্যক্তির পোশাক প্রস্তুত করা হইবে কাপড়মাপা ফিতা দিয়া সঠিকভাবে তাহার দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ লইতে হইবে।

(২) শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ লইবারও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যেমন প্রথমে বুল, তারপর যথাক্রমে ছাতি, পুট, হাতা, গলা ও কাফের মাপ লইতে হয়।

(৩) মাপ লইবার পরে সঠিক মাপ অনুযায়ী কাগজের উপর একটি ড্রইং আঁকিয়া লইবে।

(৪) কাপড় কাটার সময় কাপড়টি লম্বা দিকে ভাঁজ করিয়া লইয়া কাপড়ের উপর কাগজের কাটিংটা পিন দিয়া আটকাইয়া লইতে হয়। তারপর ঐ কাটিং অনুসারে কাপড়ের উপর পেন্সিলের ড্রইং করিয়া যাইতে হয়।

(৫) যেখানে যেরূপ সেলাই পড়িবে সেলাইএর জগ্ন প্রয়োজনমত বাড়তি কাপড় ছাড়া হইবে। ঐ ছাড়ের উপর আবার পেন্সিল দিয়া দাগ দিতে হইবে। কাপড় কাটার সময় ঐ মার্জিন লাইনের উপর কাচি চালাইতে হইবে। সেলাই করার সময় সঠিক মাপ অনুযায়ী সেলাই করিতে হইবে।

পোশাকের বিভিন্ন নকশা ( design ) প্রস্তুত করার সময় প্রথমে সঠিক মাপমত প্রকৃত পোশাকটি কাগজে ড্রইং করিয়া লইতে হয়। তারপর ড্রইংএর

উপরেই আবার নকশা কাটিয়া লইতে হয় অর্থাৎ পোশাকের মূল কাঠামো বজায় রাখিয়া তাহার উপর যত রকম নকশা করিতে হয়।

যে কোন পোশাক প্রস্তুত করিতে হইলে দেহের গঠন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া কাপড় কাটার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যেমন :

- (১) শরীরের কোন অংশকে কি বলে ?
- (২) কিভাবে কিতার সাহায্যে মাপ নিতে হয় ?
- (৩) জামার মাপ অনুযায়ী কোথায় কতটা কাপড় ছাড়া দরকার।
- (৪) ডুইং অনুসারে এবং বয়স অনুসারে কতটা কাপড় প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তির যদি উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকে এবং পোশাক প্রস্তুতির সাধারণ নিয়মগুলি ঠিক ঠিক প্রয়োগ করে তবে তাহার পক্ষে সুন্দর পোশাক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

**৫. পোশাকের উপাদান নির্বাচন** ( Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, washability, durability and ease of handling ) : দেশ, কাল, আবহাওয়া, ঋতু এবং সর্বোপরি কৃতি অনুযায়ী মানুষ পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিয়া থাকে।

**মৌসুমবোধ :** পোশাক নির্বাচনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির দৈহিক মৌসুম বাড়ানো। অবশ্য মৌসুমের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়া উহা যেন কখনই মানুষের আর্থিক সীমা অতিক্রম না করে।

**আরাম :** তত্ত্ব প্রধান গুণ হইল দেহের তাপ সংরক্ষণ। যে তত্ত্ব তাপ সংরক্ষণের ক্ষমতা যত বেশী সেই তত্ত্ব পোশাক দেহকে উত্তম রাখিতে তত বেশী সমর্থ। উত্তাপ সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়ী বস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—তাপ-সুপরিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপরিবাহী তত্ত্ব দেহের উত্তাপ বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং ঐ তত্ত্ব দ্বারা প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু উত্তম থাকিয়া দেহকে গরম রাখে। রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহী তত্ত্ব। তাই শীতের সময় এসব উপাদানে নির্মিত পোশাক আমাদের আরাম দেয়। তাপ-সুপরিবাহী তত্ত্ব জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে। সকল রকম তত্ত্ব মধ্যে স্নতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-সুপরিবাহী। গ্রীষ্মকালে তাই স্নতির পোশাক সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক। মোটের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তত্ত্ব বিভিন্ন ঋতুতে আরামদায়ক।

তাই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিতে হয়।

**কাচার সূবিধা :** কাচার সূবিধা দেখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচিত হওয়া উচিত। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামাকাপড় ধুলাবালি এবং ঘামে সহজেই নোংরা হইয়া যায়। যেসব কাপড় নিয়মিত ধোয়া যায় না তাহা ঠিক আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী নয়। ধোয়া-কাচার সূবিধার জন্য আজকাল আমাদের দেশে নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তুগুলি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে এসব তন্তুগুলি ঠিক সকল ঋতুর উপযোগী নয়।

**স্থায়িত্ব :** পোশাকের অপর গুণ হইল উহার স্থায়িত্ব। যেসব কাপড় সহজেই ফালিয়া যায়, কিংবা রঙ চটিয়া যায় উহা ব্যবহারের উপযোগী নয়।

**ব্যবহারের সূবিধা :** ব্যবহারের সূবিধা দেখিয়া সর্বদা পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিবে। সূতির তন্তু যদিও আরামদায়ক তথাপি উহা কাচা, কলপ দেওয়া, ইঞ্জি করা অভ্যস্ত সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই যাহাদের প্রতিদিন কাজে ছুটিতে হইতেছে তাহারা অনেকেই সূতির তন্তু পরিত্যাগ করিয়া নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তুর দিকে ঝুঁকিতেছেন। একই কারণে জরিব কাজ করা শাড়ি ইত্যাদিও দৈনন্দিন ব্যবহারের অনুপযোগী।

মোটের উপর যাহা সুন্দর ও স্থায়ী, আরামদায়ক, সহজেই কাচা যায় তাহাই পোশাকের আদর্শ উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়।

## 6. জীর্ণবস্ত্র সংস্কার এবং নব কলেবর প্রাপ্তি (Renovation and remodelling of old clothes)

বস্ত্রাদি পুরাতন হইলেই ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। অনেক বাড়িতে পুরাতন কাপড়চোপড়ের বিনিময়ে বাসনপত্র কিনিবার প্রচলন আছে। তবে পুরাতন শক্ত কাপড়জামা সংস্কার করিয়া লইলে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা যাইতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে একটি গরম কোট কাটিয়া ছোটদের উপযোগী আরেকটি কোট তৈরী করান যায়। অল্পরূপে ভাবে একটি গরম প্যাণ্ট কাটিয়া অনায়াসে ছোটদের উপযোগী আরেকটি প্যাণ্ট অথবা মেয়েদের ঘরে পরার উপযোগী একটি ব্লাউজ বানান যাইতে পারে। পুরাতন হামি শাড়ি কাটিয়া ব্লাউজ, ছোটদের ফ্রক, পর্দা কিংবা প্রয়োজনমত ট্রাঙ্কের ঢাকনা ইত্যাদি তৈরী করান যায়।

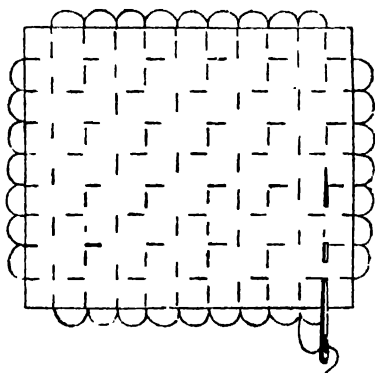
অনেক জামাকাপড় যখন ছিঁড়িয়া গিয়া ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে তখন উহা দিয়া কাঁথা সেলাই করার রীতি আবহমানকাল হইতে চলিয়া

আনিতেছে। তাছাড়া পুরান অল্প ছেড়া কাপড় দিয়া তোশক কিংবা লেপের ওয়াড় দেওয়া যায়। পুরাতন শাড়ির শক্ত পাড় ছিঁড়িয়া লম্বালম্বি জোড়া দিয়া ভাল কাঁথা, টেবিল ক্লথ, ট্রান্সের ঢাকনা প্রভৃতি তৈরী করা যায়। শাড়ির শক্ত আঁচল দিয়া ব্যাগ বানাইলে বেশন আনা, বাজার করার কাজ চলিতে পারে।

যেসব কাপড়চোপড় অনাবধানে ছিঁড়িয়া কিংবা ফাসিয়া গিয়াছে অথচ সমস্ত জিনিসটি ব্যবহারের বেশ উপযুক্ত আছে প্রয়োজনমত রিফু করিয়া কিংবা একটি তালি মারিয়া লইলে আবার অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

### ( Darning )

কাপড় হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেলে যদি রিফু করা যায় তবে ঐ স্থানটি কাপড়ের জমির সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে ছেড়া স্থানটি সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ছেড়া স্থানটির ভিতরদিক হইতে সেলাইটি আরম্ভ করিতে হইবে। এইস্থানে রান্ ফৌড় দিতে হইবে। ছেড়া স্থানের একদিকে রান্ সেলাই করিয়া ছেড়ার উপর সূতাটিকে টান করিয়া রাখিয়া অল্পদিকেও অল্প করিয়া রান্ সেলাই দিতে হইবে। এইভাবে বারবার এদিক ওদিক করিয়া সেলাই করিবার পর ছেড়া অংশের উপর সূতার টানা পড়িয়া যাইবে। পুনরায় কাপড়ের বিপরীত দিক হইতে ঐ টানা সূতার মধ্য দিয়া একটা উপরে ও একটা নীচে এই ভাবে সেলাই করিলে ছেড়াটি বন্ধ



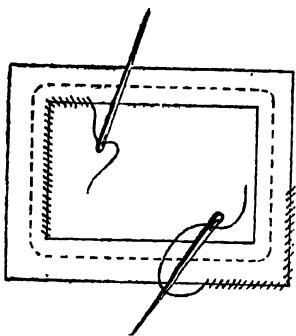
হইয়া যাইবে। ইহা করিবার পূর্বে ছেড়ার দুই পাশে ভাল কাপড়ের উপর তিন চার লাইন করিয়া রান্ সেলাই দিয়া তবে ছেড়ার উপরের টান দেওয়া সূতাগুলিকে উপর-নীচ করিয়া সেলাই দিতে হইবে। রিফু করিতে হইলে যে কাপড়টি ছিঁড়িয়াছে তাহা হইতে সূতা তুলিয়া ঐ সূতার দ্বারা সেলাই করিলে কাপড়ের জমির বুননের সঙ্গে সেলাই মিশিয়া যায়। যে জিনিসটি রিফু করা হইবে তাহাকে ফ্রেম আটকাইয়া লইলে রিফু করিতে সুবিধা হইবে।

অনেক সময় নতুন কাপড়চোপড় কিংবা অল্প ব্যবহৃত পোশাক অসাবধানে ছিঁড়িয়া গেলে রিফু করিয়া আবার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

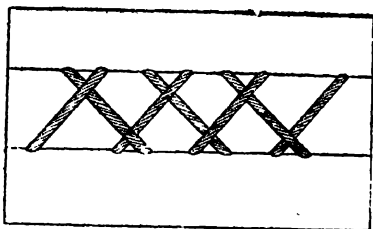
### তালি ( Patching )

আমাদের নিত্যব্যবহার্য জামা-কাপড় অনেকদিন ব্যবহারের ফলে ছিঁড়িয়া যায়। আবার অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ খোঁচা লাগে অথবা পোকায় কাটিয়া দেয়। যে জিনিসটি ছিঁড়িয়া যায় তাহাতে যদি ঐ রং-এর কাপড় দিয়া তালি দেওয়া যায় তবে জিনিসটি অনেকদিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

**ঠাণ্ডা তালি :** প্রথমতঃ যে স্থানটি ছিঁড়িয়া যায় সেই স্থান অপেক্ষা বড় আর এক টুকরা কাপড় চৌকোনা করিয়া কাটিয়া লইয়া উক্ত ছেঁড়া স্থানের উপর টাকিয়া আলগা ভাবে চৌকোনা কাপড়টির ধার দিয়া হেমিং দিতে হইবে। তারপর উহার বিপরীত দিকে কাপড়ের ছেঁড়া অংশটিতে সৰু মুড়ি করিয়া নীচের কাপড়ের সহিত অর্থাৎ যে আলগা চৌকোনা কাপড়টি লাগানো হইয়াছে উহার সহিত হেমিং দিতে হইবে।



ঠাণ্ডা তালি



গরম তালি

**গরম তালি :** ঠাণ্ডা কাপড়ে তালি দিতে যে ফোড় ব্যবহৃত হয় গরম কাপড়ে সেই ফোড় চলে না। তবে ঠাণ্ডা কাপড়ের স্তায় ইহারও ছেঁড়া স্থান চৌকোনা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। তাহার উপর আর এক টুকরা কাপড় চৌকোনা করিয়া কাটিয়া ইহার সহিত টাকিয়া দিতে হইবে। তারপর উহার পাশ দিয়া হেরিংবোন সেলাই দিতে হইবে এবং উহার বিপরীত দিকেও ছেঁড়া অংশটিতে সৰু করিয়া মুড়িয়া হেরিংবোন সেলাই দিতে হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

### পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ( Knowing the Fibres of the family )

#### 1. বিভিন্ন তন্তু এবং সাংশ্লেষিক তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা ( Study of different textiles including synthetic fibres )

সৃষ্টির আদিতে অসভ্য বর্বর মানুষের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পোশাক-পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত কৃচির পরিবর্তন হওয়ায় পোশাক-পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। প্রথমে এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রকৃতিজাত সূতি, লিনেন, রেশম ও পশম। আজকাল মানুষ তাহার প্রয়োজন মত আরো অনেক বকমের তন্তু আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত এই সকল তন্তুর ভিতর রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

#### কিরূপ তন্তু দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব ?

বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন কাপড়-জামা ইত্যাদি সূতা হইতেই বোনা হইয়া থাকে। এই সূতা আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বা তন্তুর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগুণের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। এইজন্য সকল বস্তুর আঁশ বা তন্তু হইতে আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায় না। যেমন, তুলা ও পাটের আঁশের মধ্যে প্রথমটি অনেক সরু, মসৃণ, নরম ও নমনীয় বলিয়া তুলা হইতেই কাপড় প্রস্তুত হয়। পাটের আঁশ অনেক মোটা, খসখসে বলিয়া ঐ আঁশ হইতে সাধারণতঃ কাপড় প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকিলে আঁশ বা তন্তুকে কাপড় বুনিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) সূতা যত শক্ত হইবে কাপড় তত টেকসই হইবে। আঁশগুলিকে লম্বালম্বি জোড়া দিয়াই সূতা প্রস্তুত করা হয়। আঁশ লম্বা হইলে এই জোড়াও শক্ত হয়। সুতরাং লম্বা আঁশ বা তন্তু কাপড় বুনিবার পক্ষে উপযুক্ত। আঁশগুলি ছোট হইলেও যদি ঐ আঁশের মধ্যে ভাঁজ থাকে তবে উহা দ্বারা শক্ত সূতা প্রস্তুত

করা যায়। যেমন, তুলার আঁশগুলি লম্বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাঁজ থাকায় তুলা হইতে টেকসই কাপড় প্রস্তুত হয়।

(২) আঁশগুলি শুধু শক্ত হইলেই চলিবে না। স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তাও উৎকৃষ্ট আঁশের বিশেষ গুণ। আঁশকে ছমড়াইলে বা মোচড়াইলে যদি ভাঙিয়া যায় তবে তাহা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না।

(৩) কাপড়কে যাহাতে বিভিন্ন রঙে রঙিন করা যায় সেইজন্য বিভিন্ন রঙ ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকা আঁশ বা তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। আঁশে ট্যানিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকিলে বা মোম জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে রং তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার প্রকৃতিজাত রেশম তন্তু (wild silk) এবং অ্যানিটেট রেয়ন দ্বারা রঙিন বস্ত্র প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

(৪) আঁশের চাকচিক্য বা গুঞ্জল্য একটি আবশ্যিক গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের জন্ম অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা সূতির বস্ত্র অপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া আসিতেছে। সূতির বস্ত্রেও আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চাকচিক্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাকেই ‘মারসেরাইজড্ কাপড়’ (mercerized cloth) বলে।

(৫) প্রত্যেক আঁশই প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, পেকটিন ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার সময় এই সকল ময়লা দূর করিয়া লওয়া হয়। যে আঁশ হইতে যত সহজে এই ময়লা দূর করা যায়, তাহা বস্ত্র তৈয়ারী করিতে তত বেশী উপযোগী। পাট, দেশম ইত্যাদি তন্তুর অগ্নাগ্ন গুণ থাকিলেও ইহাদের ময়লা বিশেষতঃ আঁশের উপরের শক্ত গাম সহজে দূর করা যায় না বলিয়া ইহারা তুলা বা লিনেন আঁশের তুলনায় নিকৃষ্ট।

(৬) বিভিন্ন আঁশের ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিভিন্ন। পশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এইজন্য উহা পোকায় কাটিয়া সহজেই নষ্ট করিয়া দেয়। পশমের স্থায় লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশমকে অত সহজেই পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। অতএব লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশম এক্ষেত্রে পশম হইতে শ্রেষ্ঠ।

(৭) এতদ্ব্যতীত যে সকল আঁশ স্বাভাবিক তাপে, মুহূক্ষার বা অ্যানিডে নষ্ট হইয়া যায় না তাহাই বস্ত্রশিল্পে বিশেষ উপযোগী।

**তন্তুর শ্রেণীবিভাগ :** প্রাচীনকালে বস্ত্র শিল্পে সাধারণতঃ রেশম, পশম, সূতি ও লিনেন এই চারি প্রকারের তন্তুই ব্যবহার করা হইত। আধুনিক



যুগে বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট তত্ত্বও বস্ত্র-শিল্পে প্রচুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তত্ত্ব।

(২) কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তত্ত্ব।

অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তত্ত্বগুলিকে আবার তাহাদের উৎপত্তি অনুসারে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন,

(ক) উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব : উদ্ভিদ জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব বলে। সূতি, লিনেন, রায়ী, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি তত্ত্বগুলি উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব।

(খ) প্রাণিজ তত্ত্ব : যে সকল তত্ত্ব প্রাণিজগৎ হইতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রাণিজ তত্ত্ব বলে। এই জাতীয় তত্ত্বের মধ্যে রেশম ও পশমের নাম উল্লেখযোগ্য।

(গ) খনিজ তত্ত্ব : এই জাতীয় তত্ত্ব বিভিন্ন আকরিক হইতে পাওয়া যায়। এস্বেস্টস্ (Asbestos), গ্রাস ও বাতব তত্ত্ব এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট তত্ত্বগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(ক) রেয়ন তত্ত্ব

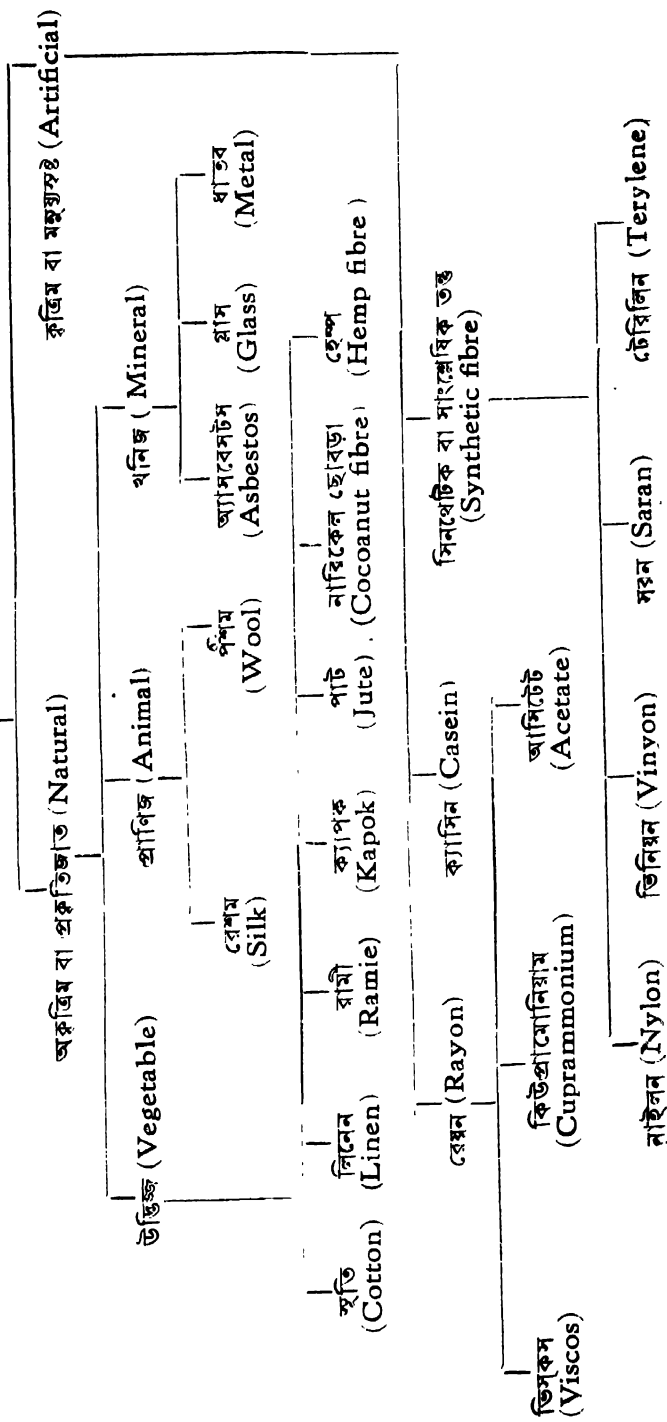
(খ) ক্যানিন

(গ) সিনথেটিক (synthetic) বা সাংশ্লেথিক তত্ত্ব।

রেয়ন তত্ত্বকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন—ভিসকস্ রেয়ন, কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, অ্যাসিটেট রেয়ন। এই সকল রেয়ন উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্ত ইহারা সাংশ্লেথিক তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সিনথেটিক বা সাংশ্লেথিক তত্ত্বগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহারা জল, বায়ু এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এইজন্ত ইহারা সাংশ্লেথিক তত্ত্ব। নাইলন, ভিনিয়ন, সরন এবং টেরিলিন এই জাতীয় তত্ত্ব।

**নিম্নের চার্টখানিতে তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখান হইল**  
তত্ত্ব বা ধাঁশ



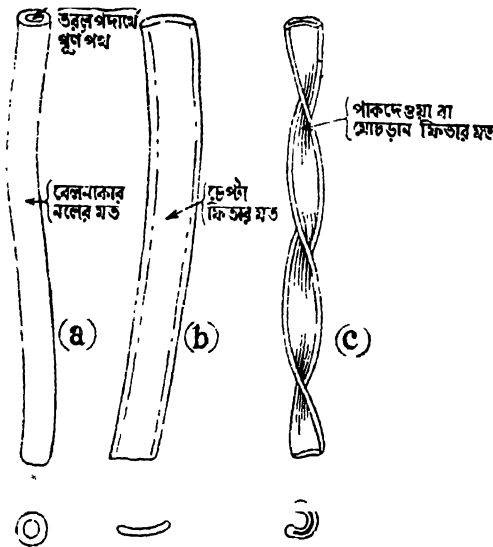
## অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্তু ( Natural Fibres )

### (ক) উদ্ভিজ্জ তন্তু

সূতি, লিনেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় আঁশ সেলুলোস (Cellulose) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। (সেলুলোসের রাসায়নিক সংকেত ( chemical formula ),  $(C_6H_{10}O_5)_n$ , অর্থাৎ  $C_6H_{10}O_5$ , এই সংকেতটিকে  $n$ -সংখ্যক বার (  $n$ -এর অর্থ অসংখ্য ) লম্বালম্বি ভাবে সাজাইয়া একটি সেলুলোসের অণু ( Molecule ) পাওয়া যায়। এইরূপ অসংখ্য সেলুলোসের অণু একত্রিত হইয়া একটি তন্তু বা আঁশের সৃষ্টি হয়।) সেলুলোস আবার কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে কোন একটি উদ্ভিজ্জ তন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত।

### সূতি

**উৎপত্তি :** সূতি কাপড়ের তন্তুগুলি তুলা হইতেই আসে। তুলা গাছ নাধারণতঃ ২ মিটার হইতে ১'৫ মিটার লম্বা হয়। প্রথমে ঈষৎ পীতবর্ণের ফুল ফোটে। পরে ঐ ফুল হইতে তুলা ফলের সৃষ্টি হয়। তুলা ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং তুলার নান্দা আঁশগুলি বাহিরে আশিয়া বাতাসের সহিত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আঁশগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে বীচি হইতে পৃথক করিয়া গাঁট বাঁধিয়া সূতা এবং কাপড় বুনবার জগু চালান করা হয়।



আভ্যন্তরীণভাবে কঠিন অংশের চিত্র

প্রথম অবস্থায় তুলার এক একটি আঁশকে অণুবীক্ষণ ( Microscope ) যন্ত্রের তলায় দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের জায় দেখা যাইবে। ইহার

আগা এবং গোড়া প্রায় সমান মোটা। এই বেলনাকার নলের ঠিক মধ্য দিয়া একটি সরু পথ আছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই পথটি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। আঁশগুলি যখন ফল হইতে বাহির হইয়া আসে তখন রোজের প্রভাবে ঐ রস শুকাইয়া যায় এবং আঁশটিও ধীরে ধীরে বেলনাকার হইতে চেপ্টা হইয়া ক্রমে একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে। দেখিতে ফিতার মত হইলেও আঁশগুলি ঠিক ফিতার মত সোজা নহে; উহারা অনেকটা পাক দেওয়া বা মোচড়ান ফিতার মত। সাধারণতঃ তুলার আঁশে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই পাক বা মোচড় থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আঁশে প্রতি ইঞ্চিতে ২৫০টি পাকও দেখা যায়।

তুলার আঁশগুলি সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি লম্বা হয়। আঁশগুলি যত লম্বা ও সরু হয় কাপড়ও তত সূক্ষ্ম ও মিহি হয়। মোটা ও ছোট আঁশ হইতে সাধারণতঃ মোটা ও নিকৃষ্ট জাতীয় কাপড় তৈয়ারী হয়। অত্যধিক ছোট আঁশ কাপড় বুনিবার অল্পপযুক্ত। ইহা রেয়ন নামক কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

**সরবরাহ :** পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তুলা কম বেশী জন্মিয়া থাকে। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকা হইতেই আসে। তুলা উৎপাদনে আমেরিকার পরই ভারতের নাম করা যাইতে পারে। আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইত্যাদি দেশও কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতের মধ্যে বাংলা দেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমুক্তিকা অঞ্চলেই প্রধানতঃ তুলা জন্মে। বঙ্গদেশের তুলা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর। আমেরিকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্রেণীর। ভারতের স্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন তুলাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

**প্রকৃতি :** ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগে তুলার আঁশের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য সাবান, সোড়া ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যাদি দ্বারা সূতি কাপড় পরিষ্কার করা যায়। প্রয়োজন হইলে সোড়া ইত্যাদি দ্বারা সূতির কাপড় ফুটানও চলিতে পারে। রঙিন কাপড় হইলে ক্ষার-দ্রব্যের সংস্পর্শে ঐ রং চটিয়া যাইতে পারে।

তুলার আঁশ অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও সূতি কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অক্সালিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় কাপড়খানি তৎক্ষণাৎ প্রচুর পরিমাণে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। যদি সামান্য অ্যাসিডও কাপড়ে লাগিয়া থাকে তবে শুকাইবার পর কাপড়ের ঐ স্থান ফাশিয়া যাইবে। সূতির কাপড় কোন অবস্থাতেই গাঢ় অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনিতে নাই।

ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড এই দুইটি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা তুলার আঁশ নষ্ট হয় না। রঙিন কাপড়-চোপড় সাদা করিতে হইলে ক্লোরিন,

ব্লিচিং পাউডার বা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাধারণ উত্তাপে স্থতির কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য স্থতির কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে পারা যায় এবং গরম ইজি ব্যবহার করা যায়। তবে খুব বেশী গরম ইজি ব্যবহার করিলে স্থতি পুড়িয়া লালচে দাগ পড়িবে। তুলার আশ উত্তাপ-স্বসঞ্চালক। কাচিবার সময় রগড়াইলে স্থতির কাপড়ের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। স্থতির কাপড়ে রঙ ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও খুব কঠিন কাজ নহে।

### ✓ লিনেন (Linen)

**উৎপত্তি :** তিসি ও মসিনা গাছ (Flax) হইতেই এই তন্তুটির উৎপত্তি। ইহা একটি স্বজ্ঞ এবং সরু গাছ—প্রায় ২১ই সে. মি. হইতে ১০১ই সে. মি. লম্বা হয়। লিনেন তন্তুটি মসিনা গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। মসিনা গাছের উপরের ছালটি সরাইয়া লইলে এই তন্তুটি গাছের মাথা হইতে শিকড় পর্যন্ত ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রথমে মসিনা গাছটি কাটিয়া উহার বিচিগুলি বাহির করিয়া লওয়া হয়। পরে গাছটিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; কিছুদিন পরে তন্তুগুলি নরম হইলে কাণ্ড হইতে উহা পৃথক্ করা হয়।



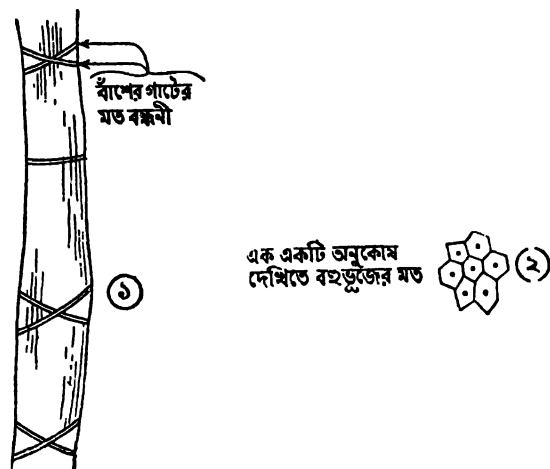
মসিনা গাছ

**সরবরাহ :** সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে মসিনা গাছের চাষ করা হয়। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকাতেও মসিনার চাষ করা হয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট লিনেন তন্তু বেলজিয়ামেই উৎপন্ন হয়।

**প্রকৃতি :** লিনেন তন্তুগুলি তুলার তন্তুর ত্রায় সেলুলোস নামক একই উপাদানে গঠিত। দৈর্ঘ্যে এই সকল তন্তু প্রায় এক ইঞ্চি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুগুলি লম্বালম্বি জোড়া লাগিয়া সাধারণতঃ ২৩ সে. মি. হইতে কয়েক মিটার লম্বা আশের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তন্তু কতকগুলি অণুকোষের (Cell) সমষ্টিমাত্র।

তন্তুগুলি সোজা ও সরল হইলেও নলের মত বেলনাকৃতি নহে। একটি ক্ষুদ্র তন্তুকে আড়াআড়িভাবে কাটিলে (Cross section) উহা দেখিতে একটি

বহুভুজের মত হইবে। প্রত্যেকটি তন্তুর গারে মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। আঁশগুলির বহির্ভাগ খুব মন্থণ। এইজন্ত লিনেন বস্ত্রের এত চাকচিক্য।



লিনেন তন্তুর গুণাগুণ অনেকটা স্থতির গুণাগুণের অনুরূপ। স্থতির মত লিনেন বস্ত্রও সাবান, মোড়া ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যে পরিষ্কার করা যায়। ক্ষার-দ্রব্যে ফুটাইলে বা আছড়াইয়া কাচিলে এই তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। স্থতির মত লিনেনও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি দ্বারা লিনেন বস্ত্রের রং দূর করা যায়। স্থতির মত এই তন্তুও সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না।

স্থতি হইতে লিনেনের আঁশগুলি অধিকতর শক্ত। এইজন্ত স্থতির বস্ত্র অপেক্ষা লিনেনের বস্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়। স্থতির বস্ত্রে সাধারণতঃ কোন ঔজ্জ্বল্য থাকে না। কিন্তু লিনেনের বস্ত্র খুব চকচকে এবং জ্বলজ্বল করে। এই বস্ত্র স্থতির বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লইতে পারে। উত্তাপ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাও ইহার স্থিতি অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার রং ধারণ করিবার ক্ষমতা সাধারণ স্থিতি অপেক্ষা অনেক কম।

### র‍্যামি ( Ramie )

লিনেনের ন্যায় র‍্যামিও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এশিয়া ও আমেরিকায় সাধারণতঃ এই গাছের চাষ করা হয়। র‍্যামির আঁশগুলি সাধারণতঃ ১৫ই—২৬ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। কখনও কখনও ৬১ সেন্টিমিটার

পূর্বস্থ ইহাদের লম্বা হইতে দেখা যায়। এই তন্তুর মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। তন্তুগুলি দেখিতে অনেকটা চুলের মত এবং মাঝখানটা কাঁপা। তুলা এবং লিনেনের মত ইহাও সেলুলোস হইতে উৎপন্ন। লিনেনের মত র্যামির আঁশগুলিও চকচকে।

### পাট ( Jute )

ভারতই পাটের প্রধান উৎপত্তিস্থল। লিনেন এবং র্যামির মত পাটের আঁশ বা তন্তুও পাট গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। পাট গাছ সাধারণতঃ ৩-৩'৬ মিটার লম্বা হয়। পাতাগুলি পৃথক করিয়া পাটগাছ কিছুদিন মাঠের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। পরে গাছগুলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে আঁশগুলি নরম ও আলাগা হইয়া যায়। এইবার আঁশগুলি কাণ্ড হইতে সহজেই পৃথক করিয়া লওয়া যায়।

পাটের আঁশ সাধারণতঃ ১'২ মি. হইতে ২'৪ মি. লম্বা হইতে পারে। সেলুলোস হইতেই পাটের উৎপত্তি। তুলা, লিনেন এবং র্যামি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে পাটের উপাদানে লিগনো সেলুলোস ( Ligno Cellulose ) নামে সেলুলোসের এক প্রকার যৌগ (Compound) দেখা যায়। ইহার সাহায্যেই পাট প্রথম তিন শ্রেণীর আঁশ হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়।

পাট দিয়া সাধারণতঃ থলে প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে কার্পেট ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

### হেম্প ( Hemp )

এই তন্তুও র্যামির মত একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। রাশিয়া, চীন, জাপান, ইটালী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এই তন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আঁশগুলি সাধারণতঃ ১'২ মিটার হইতে ২'৪ মিটার লম্বা হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা লিনেনের আঁশের মতই। কিন্তু লিনেনের আঁশ হইতে এই আঁশ অনেক বেগী মোটা। আঁশগুলির প্রান্ত ভাগ সক্ষ এবং দ্বিধাবিভক্ত। লিনেন তন্তুর প্রান্তভাগ কখনও দ্বিধাবিভক্ত হয় না। সুতরাং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে লিনেন তন্তু ও হেম্প তন্তুর এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। এই তন্তু জলে বা বুড়িতে সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্ত ইহা দ্বারা দড়ি এবং নৌকা ও জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই আঁশগুলিরও মূল উপাদান সেলুলোস।

## ক্যাপক ( Kapok )

এই তন্তু অনেকটা তুলার তন্তুর আয়। বেলনাকৃতি এই আঁশগুলির একপ্রান্ত ক্ষীত, দেখিতে অনেকটা বালুকের মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই আকৃতি দেখিয়া ইহা অত্যন্ত তন্তু হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়। ইহা নরম এবং দেখিতে চকচকে। ক্যাপক আঁশের মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ গর্ত থাকে এবং ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেলুলোজই এই তন্তুর মূল উপাদান।

এই সকল বিভিন্ন তন্তুর মধ্যে সূতি এবং লিনেনই সাধারণতঃ কাপড়, জামা ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রায়ি, পাট, ক্যাপক ইত্যাদি নিকট শ্রেণীর তন্তু। এইগুলি সাধারণতঃ থলে, কার্পেট, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

## (৪) প্রাণিজ তন্তু

## রেশম ও পশম প্রাণিজ তন্তু

**রেশম ( Silk ) :** গুটিপোকা হইতে রেশম তন্তু উৎপন্ন হয়। রেশম দুই শ্রেণীর—(১) বন্য ( wild ) ও কৃষিজ ( cultivated )। গুটিপোকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনে বাদাড়ে যে রেশম তন্তু সৃষ্টি করে তাহাকে বন্য রেশম বলে। পরন্তু গুটিপোকা চাষ করিয়া যে রেশম পাওয়া যায় তাহাই কৃষিজ রেশম নামে পরিচিত। বন্য রেশম অপেক্ষা কৃষিজ রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। সকল প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে দীর্ঘ।

**প্রকৃতি :** গুটিপোকার মুখ হইতে যে লাল নিঃসৃত হয় তাহা এক শ্রেণীর প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিন ৩ : ১ অনুপাতে থাকে। ফাইব্রয়েনের উপর সেরিসিনের একটি আবরণ পড়ে। ফাইব্রয়েনের মৌল ( ingredients ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। পশমের আয় ইহাতে কোন সালফার থাকে না। ইহার ফর্মুলা নিম্নরূপ :—

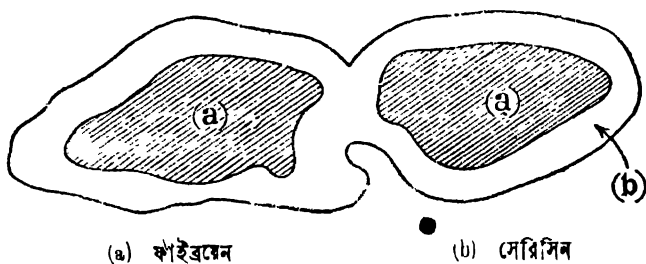


ফাইব্রয়েন রসের ঘনত্ব ১.২৫ হইতে ১.৩ পর্যন্ত হয়। এখানে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিনের আকার দেখান হইল। রেশমী তন্তুগুলি খুব সূক্ষ্ম হয় বলিয়া সাধারণতঃ ছয় হইতে আটটি তন্তু লইয়া এক একটি সূতা প্রস্তুত করা হয়। পশমের তন্তুগুলির আয় রেশম তন্তুগুলির ব্যাস সর্বত্র সমান নহে। প্রায়শঃই



দেখা যায় যে একটি রেশম তন্তুর একপ্রান্ত যতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা মোটা নয়। সাধারণতঃ উহা অন্তিম প্রান্তে সরু হইয়া যায়। এইজন্য রেশম বস্ত্রে বুনন ( spinning ) সর্বত্র সমান ( uniform ) হয় না। রঙ করার পর উহা ধরা পড়ে।

রেশম কমনীয় এবং খুবই দৃঢ়। ইহার তন্তু পশম তন্তু অপেক্ষা দৃঢ়তর কিন্তু স্থিতি হইতে কম দৃঢ়। ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (Lustrous) এবং তাপ সংরক্ষক বলিয়া শীতকালেও রেশমী পোশাক পরিধানযোগ্য। ইহার নমনীয়তা অসাধারণ।



(a) ফাইব্রেন

(b) সেরিসিন

অধিকাংশ রেশমের বর্ণই প্রথমাবস্থায় সামান্য হলুদ থাকে কিন্তু পরে নানা প্রকারে ইচ্ছামত রঙ করা হয়। চৈনিক রেশম প্রায়ই সাদা হয়। রেশমের ১১% জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা আছে। ঠাণ্ডা জলে রেশম ম্যাটিয়াটে হইয়া যায় এবং গরম জলে ইহা চকচক করিতে থাকে। রেশমের বুনন খুব পাতলা বলিয়া ইহাকে সর্বদা মতর্কভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

লবু কষ্টিক সোডার দ্রবণে রেশম দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় তসরের এই দিক হইতে সর্বাধিক সুবিধা আছে। ক্ষার ইহার উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। রেশমের অ্যাসিড প্রতিরোধের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

**রেশম চিনিবার উপায় (Identification of Silk) :** রেশম চিনিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ সালফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ রেশমকে খয়েরী রঙের থকথকে পদার্থে রূপান্তরিত করে। তারপর ইহাতে অল্প ট্যানিক অ্যাসিড ঢালিলে উহা কঠিন আকারে পৃথকীকৃত হয় ( precipitates out )।

দ্বিতীয়তঃ কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে বলা হয় সুইটজার দ্রবণ (schweitzer's solution) ; ইহা কপার হাইড্রেটকে অ্যামোনিয়াম দ্রবীভূত করিয়া পাওয়া যায়। এই দ্রবণ সকল রেশমকেই দ্রবীভূত করে। রেশম চিনিবার পক্ষে এই দ্বিতীয় উপায়টিই শ্রেষ্ঠ।

### পশম (Wool)

মাসুকের ব্যবহার্য আধুনিক নীতবস্ত্রাদির তালিকায় পশম অপরিহার্য। মাসুকের আচ্ছাদন সমস্ত সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি, প্রাণিজগতের অবদান যে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে পশমই তাহার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ। প্রাণিজ তন্তু হইতেই পশমের উদ্ভব। ইহাই পশমের মূল কথা। দেশ বিদেশে বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবরণ তথা লোম হইতেই পশম সৃষ্টি হয়।

**পশমের প্রকৃতি ও স্বরূপ :** মাসুকের কেশের ত্রায় পশুর লোমও ক্রমবর্ধমান। কাজেই লোম যতই কাটা হয় ততই উহা আবার সৃষ্টি হয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই। ভেড়ার লোম হইতে পশম তন্তু প্রস্তুত হয়।

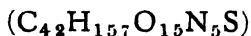
পশমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নমনীয়তা। সাধারণ গুটানো অবস্থায় উহাকে টানিলে পশম লম্বা হয় আবার ছাড়িয়া দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। তবে এই নমনীয়তার পরিমাণ নির্ভর করে পশম কতখানি নরম (soft) তাহার উপর। পশমকে উত্তমরূপে ধুলি ময়লা তৈলাদি হইতে বাষ্প-ধোতি (steam-wash) পদ্ধতিতে মুক্ত করা হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনীয়তা বাড়ে। পশমের এক একটি তন্তু বা Fibreএর দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ তিন ইঞ্চি হইতে এক ফুট পর্যন্ত হয়। পশমের প্রাকৃতিক বর্ণ সাদা, ক্রীম, ঈষৎ হলুদ, লালচে, বাদামী প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তবে যত সাদা হয় ততই উহার প্রকৃতি (quality) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছামত পশম রং করা হয়।

পশম তন্তু তাপ ও জলীয় বাষ্প দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে উহাকে ভূমড়াইয়া বা মোচড়াইয়া দিলে, তাপের প্রভাবে পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার ক্ষেত্রে শীতল জল অপেক্ষা সামান্য উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে উহার ময়লা কাটিয়া যায় এবং উহার আকৃতি নষ্ট হইবার কিছুমাত্র ভয় থাকে না।

পশম তন্তুর ঘাত সহিবার ক্ষমতা অল্প। তাই পশমের পোশাকাদি যত্ন করিয়া রাখা বিধেয়। অত্যধিক চাপে, গ্যাম্প লাগিলে পশমের তন্তুগুলি উহাদের স্বাভাবিক গুণ হারািয়া ফেলে। ফলে বস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়। অত্যধিক চাপে কোন কোন পশম জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার নমনীয়তা (Elasticity) হারািয়া ফেলে। ভিজা অবস্থায় রাখিলে ছাতা (Fungus) পড়িয়া যায়, কড়া রোজে রঙ জলিয়া যায় এবং উপযুক্তরূপে রক্ষণের অভাবে পোকায় কাটিয়া ফেলে। পশম আগুনে পুড়িয়া যায়। পশম পোড়া গন্ধ অনেকটা শিং বা পালক পোড়া গন্ধের মত।

কঠিক সোডার মৃদু ভাবেই পশম সম্পূর্ণরূপে ভ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই কঠিক সোডা বা পটাশ লইয়া কাজ করিতে গেলে পশমের জামা ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পশমকে শুধু বিকৃত করিয়া দেয় (swells up), ভ্রবীভূত করে না। সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডে শুধু পশমের রং চটিয়া যায় এবং একটি হলুদ রঙের আবরণ পড়ে।

**পশম তন্তুর গঠন (Fibre structure) :** পশম তন্তুতে ‘কেরাটিন’ (Keratin) নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে। অত্যান্ত জৈব পদার্থের জায় ইহারও অনেকগুলি অণু একত্রে সম্ভবতঃ আকারে থাকে। এই অবস্থায় ‘কেরাটিন’ অণুর নাম ‘মিসেলে’ (Micellae)। কেরাটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার বিद्यমান। এইগুলি কতকগুলি কাঠির গুচ্ছের আকারে (Bundles of sticks) থাকে। কেরাটিনের ফর্মুলা ও গঠন নিম্নরূপ :—



তোমরা সকলে ভুট্টা দেখিয়াছ। ভুট্টার গায়ে একপ্রকার আঁশের মত আবরণ থাকে। পশম তন্তুও ঠিক সেইরূপ এক সৰু আঁশে ঢাকা থাকে। আবার কোন কোন তন্তুর মাছের আঁশের মত সুবিভক্ত খোলস থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় কাচের স্লাইডে পশম তন্তু টান করিয়া ধরিলে উহার গঠন দেখা যায়। এখানে একটি চিত্র দেওয়া হইল।



অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি পশম তন্তুর আকৃতি

**পশম চিনিবার উপায় (Identification of Wool) :** কোন বস্তু পশমের কিনা জানিতে হইলে উহার তন্তুকে পটাশিয়াম প্রায়মেটের ( $K_2PbO_2$ ) লঘু ভাবে এক মিনিট ধরিয়া ফুটাইতে হয়। পশম থাকিলে উহার বর্ণ গাঢ় খয়েরী হইয়া যায়।

**পশমের সম্বন্ধ :** ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করিতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মেষ পালিত হয় বলিয়া উৎপন্ন পশমের প্রকৃতিও বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশের পশমের এই স্বকীয়তার জন্যই উহারা পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া নিজের নিজের চাহিদাকে সমানভাবে বাড়াইতে সমর্থ হইতেছে, ফলে কোন একটি দেশে পশমের বাজার স্থাপিত না হইয়া কয়েকটি দেশে উহা ছড়াইয়া আছে।

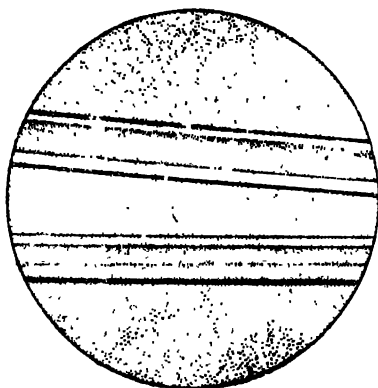
### কৃত্রিম তন্তু ( Artificial Fibres )

তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রকৃতিজাত তন্তু হইতেই আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইত। আজকাল কিন্তু এই সকল প্রকৃতিজাত তন্তু ছাড়াও অসংখ্য বহু প্রকারের তন্তুদ্বারা প্রস্তুত কাপড় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন নূতন এই সকল তন্তু মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করিয়াছে। মনুষ্য-নির্মিত এই সকল তন্তুকেই কৃত্রিম তন্তু (Artificial fibres) বলে। যেমন—নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কৃত্রিম তন্তু। এই সকল তন্তুর মধ্যে নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদিকে **সাংশ্লেষিক তন্তু (Synthetic Fibres)** বলা হয়, কারণ গবেষণাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি (Laboratory chemicals) হইতেই এই সকল তন্তু নির্মিত হইয়া থাকে। রেয়নকে ঠিক সাংশ্লেষিক তন্তু বলা চলে না; কারণ উহা প্রকৃতিজাত সেলুলোজ হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

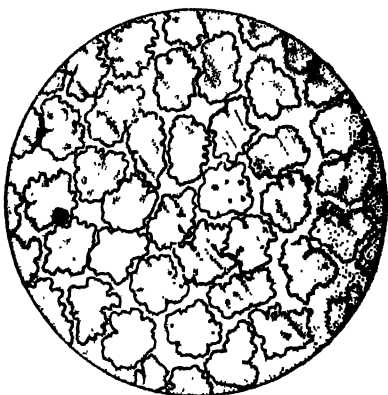
**রেয়ন (Rayon) :** রেয়নই মনুষ্য-নির্মিত সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্তু। উজ্জল্যে এবং চাকচিক্যে ইহা প্রায় প্রকৃতিজাত রেশম তন্তুর মতই। এইজন্যই রেয়নকে কৃত্রিম রেশম (Artificial silk) বা 'আর্ট সিল্ক' বলা হয়। তুলার সকল আশের দৈর্ঘ্য সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় আঁশগুলি সৃতিবস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছোট ছোট আঁশগুলি ঐ বস্ত্র প্রস্তুতির কাজে লাগে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা (Cotton linters) এবং বিশুদ্ধ উদ্ভিদ-মণ্ডল (Wood-pulp) উৎকৃষ্ট রেয়ন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতির ফলে তুলার আঁশে গুজ্জল্য ও চাকচিক্য সৃষ্টি হয় এবং রেশম বলিয়া মনে হয়। রেয়ন প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা—(১) ভিসকোস (Viscose), (২) কিউ-প্রামোনিয়াম (Cu-prammonium), (৩) সেলুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose acetate), এবং (৪) সেলুলোজ নাইট্রেট

(Cellulose nitrate)। ইহাদের মধ্যে সেলুলোজ অ্যানিটেট এবং সেলুলোজ নাইট্রেট তত্ত্ব দেখিতে রেয়ন তত্ত্বর স্রায় হইলেও ইহাদের প্রকৃতপক্ষে রেয়ন বলা হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কিউপ্রামোনিয়াম পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট রেয়ন ভিসকোস পদ্ধতিতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

**প্রকৃতি :** লম্বালম্বিভাবে দেখিলে রেয়নতত্ত্ব অনেকটা চওড়া ফিতার মত বলিয়া মনে হয়। আড়াআড়িভাবে কাটা তল অদমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত দেখায়। নিম্নে উহাদের চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।



রেয়ন তত্ত্ব



রেয়ন তত্ত্ব (আড়াআড়িভাবে কাটা তল)

কিউপ্রামোনিয়াম তত্ত্বর আড়াআড়ি কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকৃতি। জলে ভিজাইলে এই রেয়ন তত্ত্ব শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ জল শোষণ করে এবং জোর অনেক কমিয়া যায়। ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল হইতে ইহা বেশী জল শোষণ করে। এই জগুই রেয়ন বস্ত্র গরমজলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুইতে হয়। কিন্তু শুষ্ক রেয়ন বস্ত্রে আবার পূর্ব জোর ফিরিয়া আসে। ভিজা অবস্থায় রেয়ন বস্ত্রের আকৃতির কোন রকম পরিবর্তন হইলে শুষ্ক অবস্থায় ঐ আকৃতি আর ফিরিয়া আসে না। এই জগুই রেয়নের জামা-কাপড় খুব সাবধানে যত্নের সহিত ধুইতে হয়। আজকাল অবশ্য রেয়ন তত্ত্বর অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং জলে ভিজাইলেও এখন আর তত্ত্বর জোর কমিয়া যায় না। আজকাল রেয়নের তোয়ালে (towel) এবং কম্বলও ব্যবহৃত হইতেছে।

রেয়নতত্ত্ব সেলুলোজ হইতেই প্রস্তুত। স্মরণীয় স্মৃতির বস্ত্রে যে সকল রঙ ধরে তাহাদের সাহায্যে রেয়ন বস্ত্রও রঙ করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে

সুতির বস্ত্র অপেক্ষা রেয়ন বস্ত্র রঙ করা অনেক সহজ। পূর্বেই বলিয়াছি অ্যাসিটেট রেয়ন বিশুদ্ধ সেলুলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা চলে না। এইজন্ত এই জাতীয় কাপড়ে রঙ ধরান অনেক কষ্টসাধ্য। সুতির বস্ত্রের ত্রায় ইহাও অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মৃদু অ্যাসিড প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৃদু ক্ষার জাতীয় দ্রব্যে রেয়নের কোন ক্ষতি হয় না। রেয়ন বস্ত্রে সুতির বস্ত্রের মতোই গরম ইঞ্জি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অত্যধিক গরম ইঞ্জি ব্যবহারে পোড়া দাগ পড়িতে পারে। রেয়নতন্তু আঙুনে সুতির মতোই শিখাসহ পুড়িতে থাকে।

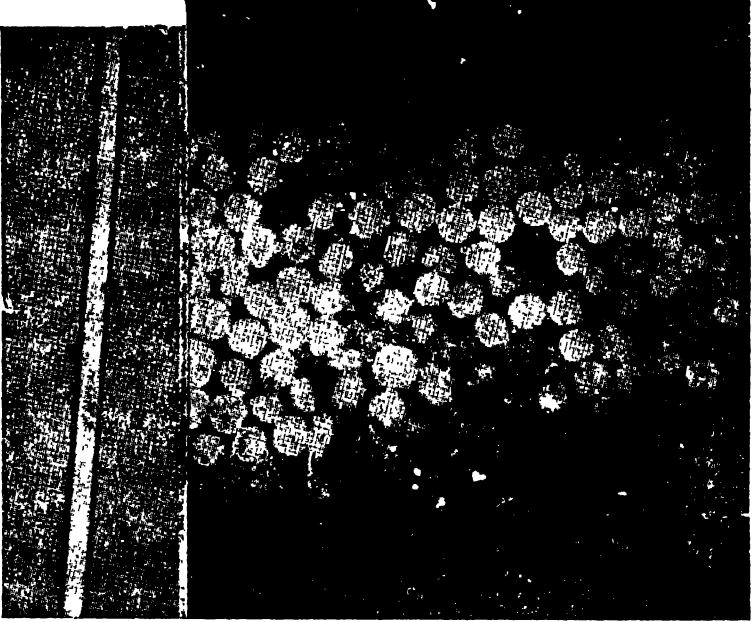
**নাইলন (Nylon) :** নাইলনই প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম সাংশ্লেষিক তন্তু। খৃঃ 1938 আমেরিকার Du Pont Company অক্সান্ত গবেষণার দ্বারা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে কয়েকটি তন্তুর ত্রায় পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহার মধ্যে Fibre—66এ স্বাভাবিক তন্তুর প্রায় সকল গুণই দৃষ্ট হয়। এই Fibre—66-ই পরে নাইলন নামে পরিচিত হয়। তখন এই নাইলন টুথ ব্রাস প্রস্তুতিতেই ব্যবহৃত হইত। ক্রমশঃ গবেষণার ফলে ইহার আরও উন্নতি হয় এবং 1940 খৃঃ সর্বপ্রথম নাইলন তন্তু কাপড় বুনিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নাইলন তন্তু দুইটি ধাপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে কয়লা, জল এবং বায়ুর সাহায্যে নাইলনের কুচি (Flakes) প্রস্তুত হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই কুচি হইতে নাইলনতন্তু সৃষ্টি হয়।

**প্রকৃতি :** লম্বালম্বিভাবে দেখিলে নাইলনের তন্তু লম্বা নলাকৃতি বলিয়া মনে হইবে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল কতগুলি ক্ষুদ্র বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

নাইলনতন্তু সাধারণতঃ অর্ধস্বচ্ছ (translucent)। আজকাল অস্বচ্ছ (opaque) নাইলন তন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় তন্তু খুব শক্ত, ইলাস্টিক এবং টিকসহি। নাইলনের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। আজকাল এই তন্তুর উপর একপ্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো হইয়াছে। নাইলন তন্তু 480° ফাঃ উত্তাপে গলিয়া যায়। স্তবরাং সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহা আঙুনের সংস্পর্শে শিখাসহ জলে না, গলিয়া যায়। জল বা ড্রাইক্লিনিংএ ব্যবহৃত তরল পদার্থে ইহার

কোন ক্ষতি হয় না। যুদ্ধ ক্ষারে এবং দ্রবদ্রব জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। যুদ্ধ অ্যাসিড নাইলনের কোন ক্ষতি করে না। শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের স্রবণ নাইলনের



নাইলন তত্ত্ব

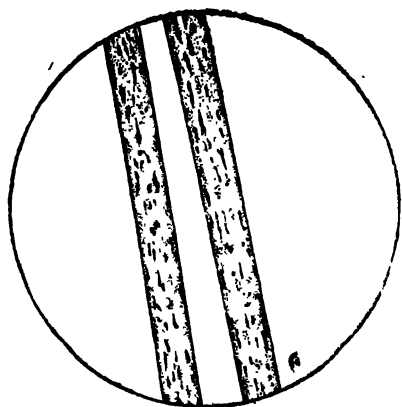
আড়াআড়িভাবে কাটা তত্ত্ব

পক্ষে ক্ষতিকর। ক্লোরিনের স্রাব উগ্র ব্লিচিং পদার্থ নাইলনের বস্ত্রে ব্যবহার করিতে নাই। অপেক্ষাকৃত যুদ্ধ ব্লিচিংই নাইলনের পক্ষে নিরাপদ। সূর্যের আলোতে এই জাতীয় তত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং নাইলনের বস্ত্রাদি ছায়ায় শুকাইতে হয়। এই জাতীয় বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে যে ইহা কোন পোকাঃ কাটিতে পারে না। অবশ্য নাইলনের সহিত পশম মিশানো থাকিলে উহা পোকায় কাটিতে পারে।

**ডেক্রন (Dacron) :** 1946 খৃঃ ব্রিটেনে টেরিলিন (Terylene) নামক এক প্রকার নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই টেরিলিন ইথিলিন গ্লাইকল ( Ethylene glycol ) এবং ডাই-মিথাইল টেরেথ্যালাট ( Dimethyl terephthalate ) হইতে প্রস্তুত হইত। আমেরিকার Du Pont Company ঐ বৎসর টেরিলিনের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার আরও উন্নতির জন্য গবেষণা কার্য চালাইতে থাকে। এই কোম্পানী অবশেষে ঐ তত্ত্বকেই ডেক্রন নাম প্রদান করে।

**প্রকৃতি :** ডেক্রনের সহিত অ্যাসিটেট তন্তুর কিছুটা মিল দেখা যায়। ডেক্রনের তন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে প্রায় নাইলনের মতই।

আঙনের সংস্পর্শে ইহা গলিয়া শক্ত দানাতে পরিণত হয়। ডেক্রনের কাপড় ঘামে বা জলে কুচকাইয়া যায় না এবং ইহার ভাঁজও নষ্ট হয় না। ডেক্রন-উপাদানে প্রস্তুত জামা-কাপড়ের ইজ্জি করার কোন প্রয়োজন হয় না।



ডেক্রন তন্তু

এইজন্য ইহার প্রচলন দিন দিনই বাড়িতেছে। যুহ অ্যাসিডি এবং ক্ষার ডেক্রন তন্তুর কোন ক্ষতি করে না। ব্লিচিং ড্রব্যাদি এই জাতীয় তন্তুতে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাইলনের মত ডেক্রন তন্তুও পোকায় কাটিতে পারে না। আজকাল অনেক প্রকার রঙিন ডেক্রন দেখিতে পাওয়া যায়। ডেক্রন পুড়িবার সময় কালো ধোঁয়া (dark-smoke)

বাহির হয়। নাইলন পুড়িবার সময় ধূসরবর্ণের (whitish gray) ধোঁয়া বাহির হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে ডেক্রন ও নাইলনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল আরও নূতন নূতন অনেক তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ওরলন (Orlon), সরান (Saran), ভিনিয়ান (Vinyon) ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট সর্বাধুনিক তন্তু হইতেছে টেফলন (Teflon)। ইহা 1954 খৃঃ আমেরিকার Du Pont Company কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

### খনিজ তন্তু (Mineral Fibres)

খনিজ তন্তুসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; অ্যাসবেসটস, গ্লাস এবং শাতব। এই সকল তন্তু বস্ত্রশিল্পে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না।

**অ্যাসবেসটস (Asbestos) :** ইহা একপ্রকার প্রাকৃতিক তন্তু, খনিতে বিভিন্ন প্রকার অপদ্রব্যের (impurities) সহিত ইহা আকরিক হিসাবে



পাওয়া যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অপদ্রব্যসমূহ দূর করিয়া এই তত্ত্ব প্রস্তুত করা হয়।

**প্রকৃতি :** অ্যাসবেসটস তত্ত্ব লম্বায় ৬ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইহাদের ব্যাস অত্যন্ত ছোট। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই তত্ত্ব মন্থন, সরল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডের মত দেখায়। শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ স্থিতি মিশালিয়া এই তত্ত্বের সাহায্যে বস্তাদি প্রস্তুত হয়। এই তত্ত্ব তাপের কুপরিবাহী বলিয়া ইহার সাহায্যে অগ্নিনির্বাপক দলের পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পরীক্ষাগারেও অ্যাসবেসটসের পাত উত্তপ্ত বীকার ইত্যাদি ঠাণ্ডা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

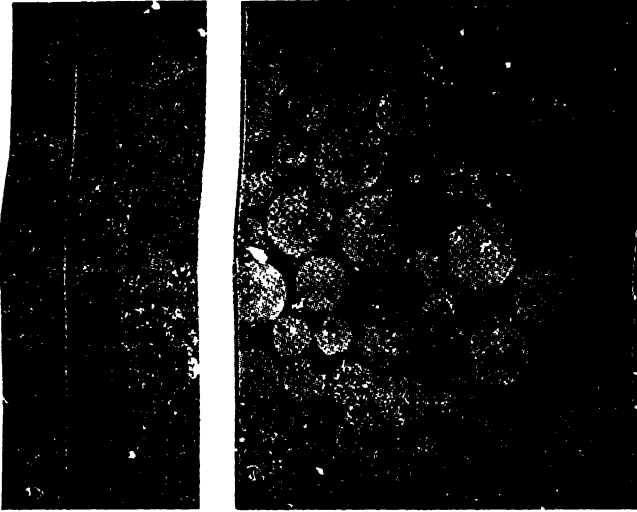
**গ্লাস (Glass) :** ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো শহরে লিবি গ্লাস কোম্পানী (Libbey Glass Company) প্রথম গ্লাস এবং বেশম তত্ত্বের সংমিশ্রণে একটি আলো আচ্ছাদনী (lamp shade) প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করে। একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী ঐ আচ্ছাদনী দেখিয়া উহার সাহায্যে একটি পোশাক প্রস্তুত করেন। জানা যায় যে স্পেন দেশের রাজকন্যাও বহু অর্থব্যয়ে গ্লাস তত্ত্বের একটি পোশাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই পোশাকের একটি অঙ্গবিধা ছিল এই যে ইহা ভাঁজ করা যাইত না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথম বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হইবার মত উন্নত ধরনের গ্লাস তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। গ্লাসেব মার্বেল (marbles) হইতেই এই তত্ত্ব প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রিক চুল্লিতে প্রায় ২৪০০° ফাঃ উত্তাপে এই মার্বেলগুলি গালাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়।

**প্রকৃতি :** গ্লাসের তত্ত্বদ্রব্য স্বচ্ছ, মন্থন ও সরু দণ্ডের ন্যায়। আড়াআড়ি ভাবে কাটা তল কতগুলি বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়।

গ্লাসতত্ত্ব আশ্বিন বা অ্যাসিডে নষ্ট হয় না এবং পোকায় কাটিতে পারে না। সূর্যের আলোতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জলে ধুইলে ইহার আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে খুব মতকতার সহিত ধুইতে হয়। যেন মোচড়ান বা রগড়ান না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মোচড়াইলে গ্লাসতত্ত্বগুলি ভাঙিয়া যায়। এই কারণেই এই তত্ত্বের বস্ত্রশিল্পে বহুল প্রচলন নাই।

জানালা-দরজার নকশার কাজে এই তত্ত্বের প্রচলন বেশ দেখা যায়। ধূলা-বালি ইত্যাদি এই ধরনের তত্ত্বতে লাগিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এইসকল

পর্দা সহজে ময়লা হয় না। কোট জ্যাকেট ইত্যাদিতেও আজকাল এই তন্তু ব্যবহৃত হইতেছে।



শ্বাস তন্তু

আডামাডিমানে কাটা তন্তু

**ধাতব তন্তু ( Metal Fibres ) :** স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও বিভিন্ন শঙ্কর ধাতু ( alloys ) আজকাল বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ধাতব তন্তু প্রধানতঃ কাপড়ের উপর নকশা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও সূতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি তন্তুর উপরে এই সকল ধাতুর আবরণে একপ্রকার নূতন তন্তু সৃষ্টি করিয়া কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কাপড়ের ধাতু কিছুদিন পরে ক্ষয় হইয়া কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে। কিছুদিন যাবৎ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু হইতেও তন্তু প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

## ২. বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন তন্তুর বস্ত্রধোতি।

( Different methods of washing and finishing materials of different fibres )

তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে একখানি কাপড় বা একটি ব্লাউজ কিছুদিন ব্যবহার করিলেই উহা ময়লা হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া:

পড়ে। তখন উহা সাবান, সোডা বা অন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তবেই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু পরিষ্কার করিলেই হয় না, কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও চকচকে ভাবটি ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহাতে নীল, কলপ ইত্যাদি লাগাইয়া ইঞ্জি করিয়া লইতে হয়। সুতরাং বস্ত্রধৌতি বসিতে শুধুমাত্র সাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে বস্ত্রখানি পরিষ্কার করাই বুঝায় না ; নীল দেওয়া, কলপ লাগান, ইঞ্জি করা ইত্যাদি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া—যাহার সাহায্যে বস্ত্রখানির পূর্বের সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনা হয়—সমস্তই বস্ত্রধৌতির অন্তর্গত। বস্ত্রধৌতির মূল উদ্দেশ্য দুইটি :

(১) কাপড়ের ময়লা প্রভৃতি দূব করিয়া উহা পরিষ্কার করা (washing) এবং (২) পরিষ্কার কাপড়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা (Finishing)।

বস্ত্রধৌতি প্রণালীটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) বস্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা (sorting), (২) রিফ বা সেলাই করা (mending), (৩) দাগ উঠান (stain removal), (৪) জলে ভিজানো (steeping), (৫) ময়লা দূব করা (cleaning), (৬) ফুটান (boiling), (৭) নীল দেওয়া (blueing), (৮) কলপ দেওয়া (starching), (৯) শুক করা (drying), (১০) আর্দ্র করা (damping), (১১) ভাঁজ করা (folding), (১২) ইঞ্জি করা (ironing), (১৩) বায়ু চালিত করা এবং তুলিয়া রাখা (airing and storing)।

## সাদা সূতি ও লিনেনের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী

বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা : পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামা, কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি একত্রিত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে।

(ক) অল্প ময়লা বস্ত্রাদি : এই ধরনের অল্প ময়লা জামা, কাপড় ইত্যাদি অধিক ময়লা বস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন করিয়া ধুইলে পরিশ্রমও কম হয় এবং খরচও বাঁচে।

(খ) মাঝারি ধরনের ময়লা বস্ত্রাদি : এই সকল বস্ত্রাদিও অধিক ময়লা বস্ত্রাদির সহিত একত্রে না ধুইয়া ভিন্ন ভাবে ধুইলে পরিশ্রম কম হয়।

(গ) অধিক ময়লা বজ্জাদি : এই জাতীয় বজ্জাদি পরিষ্কার করিতে সাধারণত বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ইহাদের আলাদা ভাবে পরিষ্কার করাই ভাল।

(ঘ) কমাল প্রভৃতি ছোটখাটো বজ্জাদি : অন্যান্য বজ্জাদির সহিত এইগুলি ধুইতে গেলে অনেক সময় হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য ইহাদের আলাদা করিয়া ধুইতে হয়।

**রিফু বা সেলাই করা :** বজ্জাদি অনেকদিন ব্যবহারের ফলে অনেক সময় একটু আধটু ফাঁসিয়া যায়। পরিষ্কার করিবার পূর্বে এই সকল ফাঁসিয়া-যাওয়া বজ্জাদি প্রয়োজনমত রিফু এবং সেলাই করিয়া মেরামত না করিলে ধুইবার সময় আরও ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ফাঁসিয়া যাওয়া অংশ বড় হইলে সেলাইয়ের পরও সহজে নজরে পড়ে এবং বস্ত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বজ্জ পরিষ্কার করিবার পূর্বেই ছোটখাটো ফাঁসিয়া-যাওয়া অংশগুলি ভাল করিয়া সেলাই করিতে হয়। ইহাতে সময়, পরিশ্রম এবং অর্থের অপচয় কম হইবে এবং বজ্জাদি অধিক দিন টিকিবে।

**দাগ উঠান :** বজ্জাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ ও প্রয়োজনমত রিফু এবং সেলাই করিবার পর উহাতে কালি, রক্ত, লোহা ইত্যাদি কোন কিছু দাগ লাগিয়াছে কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার পূর্বেই ঐ দাগ না উঠাইলে ধুইবার সময় উহা একেবারে স্থায়ীভাবে বসিয়া যাইতে পারে। একাধিক জামা একত্রে ধুইলে একটির দাগ অপরগুলিতে লাগিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। এই ভাবে লোহার দাগ এক কাপড় হইতে অন্য কাপড়ে লাগিয়া থাকে।

**জলে ভিজানো :** দাগ উঠাইবার পরও বজ্জাদি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জলে বজ্জাদি ভিজাইয়া রাখিলে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি হইবে :

(১) তন্তুর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া ধুলা, বালি ইত্যাদি ময়লা আলাগা করিয়া দিবে। (২) ইহা ব্যতীত পূর্বে যে শ্বেতসার মাড় হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও আলাগা হইয়া বাহির হইয়া আসিবে।

**ময়লা দূর করা :** এইবার একটি বড় পাঞ্জে কিছু গরম জল লইয়া উহাতে পরিমাণ মত সাবান গুলিয়া লও। সাবানের পরিবর্তে বাজারে যে সাবানের গুঁড়া বা নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (Neutral detergent) পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহার করা চলিতে পারে। মিহি কিংবা দামী কাপড় হইলে 'নিউট্রাল ডিটারজেন্ট' বা ভাল সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করাই বিধেয়। একটু মোটা

(coarse) ধরনের কাপড়ে অথবা কাপড় বেশী ময়লা হইলে সাবানের সহিত সামান্য সোডাও মিশাইতে হয়। সর্বদাই মুছ জল বা বৃষ্টির জল ব্যবহার করিবে। জল অত্যধিক গরম হইলে ময়লা দূর হইবে না, বরং আরও দৃঢ়ভাবে তত্ত্ব গায়ে লাগিয়া থাকিবে। বস্ত্রাদি গরম সাবান জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর করিবে। কখনও কখনও ধীরে ধীরে থুশিয়া কাচিলেও কাপড় ভাল পরিষ্কার হয়। ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি জলে বার বার ধুইবে যেন উহাতে একটুও সাবান জল লাগিয়া না থাকে।

**ফুটান :** সাবানজলে ধোওয়ার ফলেই বস্ত্রাদির ময়লা দূর হইবে। ময়লা পরিষ্কারের পর কাপড়ের ধবধবে সাদা ভাবটি কিন্তু সর্বদা কাপড়ে ফুটিয়া উঠে না। বরং অনেক সময় একটা ম্যাটম্যাটে লালচে ভাব দেখা দিতে পারে। বস্ত্রাদির স্বাভাবিক ধবধবে ভাবটি ফিরাইয়া আনিবার জন্ত অনেক সময় উহা সাবানজলে ফুটাইতে হয়। একটি পাত্রে কিছু সাবান জল লইয়া গরম কর। ঐ গরমজলে এইবার বস্ত্রাদি পাঁচ হইতে দশ মিনিট পর্যন্ত ফুটাও। ফুটাইবার সময় মুছ জল ব্যবহার করিবে। ফুটানো হইলে বস্ত্রাদি কাচিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে।

বস্ত্রাদি গোঁড়ে বা ঘাসেব উপর শুকাইলেও বস্ত্রের সাদা ধবধবে ভাবটি ফিরিয়া আসে।

**নীল দেওয়া :** সাবান ও সোডার ব্যবহারে সাদা বস্ত্রাদিতে যে হলদে ভাব দেখা দেয় তাহা দূর করিবার জন্ত বস্ত্রাদি নীলের জলে ডুবানো হয়। এক টুকরা নেকড়ার মধ্যে কিছুটা নীল ভাল করিয়া জড়াইয়া একটি পুঁটলি করিয়া লও। বাজারে অনেক রকমের নীল কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আলট্রামেরাইন ব্লু (Ultramarine Blue) এই কাজে বিশেষ উপযোগী। এইবার একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইয়া কাপড়ের পুঁটলিটি ঐ জলে ধীরে ধীরে নাড়াইতে থাক যতক্ষণ না জল আকাশী-নীল (Sky-Blue) বর্ণ ধারণ করে। কাপড়ে ভাল ভাবে নীল দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

(১) কাপড় ডুবাইবার সময়ই নীল জল প্রস্তুত করিবে। ব্যবহারের অনেক পূর্বে নীল জল প্রস্তুত করিলে পাত্রের গায়ে গুঁড়াগুঁড়া নীল লাগিয়া থাকিবে। পরে কাপড় ঐ জলে ডুবাইলে কাপড়ে নীল দাগ হইয়া যাইবে।

(২) ডুবাইবার পূর্বে কাপড়খানি খুব ভাল করিয়া মেলিয়া লইবে যেন উহাতে কোন ভাজ না থাকে।

(৩) ডুবাইবার সময় নীল জল নাড়িয়া লইবে।

(৪) কাপড় বেশীক্ষণ ভিজাইবে না। তাহাতে কাপড়ে দাগ পড়িবার ভয় থাকে।

(৫) কাপড় জলে ভিজাইয়া কখনও জলে নীল গুলিবে না।

(৬) একবারে একটির বেশী কাপড় ভিজাইবে না।

**কলপ দেওয়া :** সূতি ও লিনেনের কাপড়ে সাধারণতঃ কলপের সাহায্যে বস্ত্রের স্বাভাবিক কাঠিগু ও চকচকে ভাব ফিরাইয়া আনা হয়। ফলে কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হইতে পারে না। অনেকে ভাতের মাড় কলপ হিসাবে ব্যবহার করেন। মাড়ের একটি স্বাভাবিক হলদেটে ভাব থাকে। তাই মাড় অপেক্ষা বাজারের 'স্টার্চ'-ই ( Starch ) উৎকৃষ্টতর কলপ।

স্টার্চ প্রস্তুত করিয়া স্টার্চের দ্রবণে কাপড়খানি প্রায় মিনিটখানেক ভাল করিয়া ভিজাইয়া রাখ। এইবার নিংড়াইয়া অতিরিক্ত স্টার্চ বাহির করিয়া কাপড়খানি শুকাইতে দাও।

অনেক সময় নীল ও কলপ একই সঙ্গে গুলিয়া লইয়া ব্যবহার করা হয়।

**শুক করা :** বজ্রাদি সর্বদাই সম্ভব হইলে রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া উচিত। রৌদ্রে শুকাইবার সুবিধা :

(১) কাপড় বেশ টাটকা থাকে এবং কখনও খারাপ গন্ধ হয় না।

(২) কাপড়ের লালচে ভাব রৌদ্রের প্রভাবে দূর হইয়া যায়।

(৩) কাপড় ধবধবে সাদা হয়।

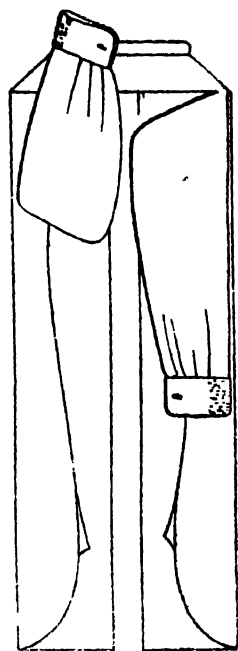
(৪) শুকাইবার জন্ত অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না।

পাশ্চাত্য দেশে গ্যাস বা ইলেকট্রিকের উত্তাপেও বজ্রাদি শুকানো হয়। আমাদের দেশে তাহার ব্যবস্থা নাই এবং প্রয়োজনও হয় না।

শুকাইবার সময় বজ্রাদি কখনও লোহার তাবের উপর মেলিবে না। কারণ তাহাতে লোহার দাগ লাগিবার আশঙ্কা থাকে। কাঠের 'পেগ' ( Peg )-এর সাহায্যে তার হইতে ঝুলাইয়া দিবে। সার্ট, পাজামা, প্যাণ্ট প্রভৃতি উল্টাইয়া ভিতরের দিকে সবচেয়ে পুরু অংশ পেগের সাহায্যে আটকাইতে হয়।

**আর্দ্র করা :** কলপ দেওয়া সূতি ও লিনেনের বজ্রাদি ভাল করিয়া শুকাইলে ঘরে আনিতে হয়। ইঞ্জি করিবার পূর্বে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া নরম করিয়া লইতে হয়। সাটের কলার, আস্তিন ইত্যাদিতে আঙুল দিয়া জল লাগাইতে হয়। জল ছিটাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে কাপড় যেন একেবারে ভিজিয়া না যায় এবং কোন একস্থানে বেশী জল না পড়ে। সর্বত্র সমান ভাবে জল পড়িলে ইঞ্জি সুন্দর হইবে।

**ভাঁজ করা (Folding) :** কাপড়গুলি ইঞ্জি করিবার পূর্বে যথাযথরূপে ভাঁজ করিয়া লইতে হয়। সার্ট, পাজামা, কোট, ব্রক ইত্যাদিও ভাঁজ করিয়া ঐ ভাঁজের উপর ইঞ্জি করিতে হয়। সার্ট ভাঁজ করিবার সময় কলার ও পুটের দুইদিকে কিছু অংশ ছাড়িয়া বরাবর লম্বালম্বি দুইদিকে ভাঁজ দিতে হয়। ইহার ফলে বুক সামনের দিকে থাকিবে এবং হাত পিছনদিকে ভাঁজ হইয়া থাকিবে। পাজামা, কোট ইত্যাদিও ঐ একই ভাবে ভাঁজ করিতে হয়। কোট এবং সার্টের কলারটি আগে ভাঁজ করিয়া ইঞ্জি করিতে হয়।



**ইঞ্জি করা :** ইঞ্জি করিবার জন্ত একটি ইঞ্জি বোর্ড বা সমতল চোকা টেবিলের প্রয়োজন। টেবিলটির উচ্চতা প্রায় কোমর পর্যন্ত হইবে এবং উহার উপরে একটি পরিষ্কার পুরু চাদর পাতিয়া টান করিয়া লইবে।

সূতি ও লিনেনের বস্ত্রে ইঞ্জি বেশ ভালভাবে গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয় ; তাহা না হইলে ইঞ্জি ভাল হয় না। ইহা ব্যবহারের সাধাবন

সার্ট ভাঁজ করিবার পদ্ধতি

- (১) ইঞ্জিট বেশ পরিষ্কার হইবে, যেন উহা হইতে কাপড়ে দাগ না লাগে।
- (২) ইঞ্জি যেন খুব কম বা বেশী গরম না হয়। কম গরম হইলে ইঞ্জি ভাল হইবে না, বেশী গরমে কাপড় পুড়িয়া যাইবে।
- (৩) সার্ট, প্যান্ট ইত্যাদির সেলাইয়ের উপর ভাল করিয়া ইঞ্জি করিবে, যেন সেলাইয়ের সূতায় জ্বল না থাকে।
- (৪) এমব্রয়ডারী (Embroidery) ইঞ্জি করার সময় উল্টা দিঠে একখণ্ড ফ্লানেলের কাপড় পাতিয়া লইবে।

**বাম্বুচালিত করা এবং তুলিয়া রাখা :** ইঞ্জি করিবার পরই বস্ত্রাদি বাস্ত্রে ভরিয়া রাখিবে না। তাহার পূর্বে কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া দিবে। তাহা না হইলে কাপড়ে যে জনীয় বাষ্প থাকে তাহার ফলে কাপড়ের উপর একপ্রকার 'ফাঙ্গাস' (Fungus) জন্মিয়া Mildew সৃষ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে। যেখানে এই 'ফাঙ্গাস' লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগুলি খুব তাড়াতাড়ি ফাঁসিয়া যায়। নিত্যব্যবহার্য বস্ত্রাদি হাতের কাছেই রাখিবে

এবং যেগুলি অনেকদিন পরে ব্যবহার করিবে তাহা জাপখালিন দিয়া স্বরক্ষিত-ভাবে রাখিবে যেন পোকায় কাটিতে না পারে।

## সূতি এবং লিনেনের ছাপা রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি

আজকাল রঙিন ও ছাপা বস্ত্রাদির প্রচলন প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাদের মোটামুটি দুইটি ভাগ ভাগে করা যাইতে পারে। (১) পাকা রঙের বস্ত্রাদি, (২) কাঁচা রঙের বস্ত্রাদি। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কোন কোন কাপড়ে সাবান ঘষিলে সহজে উহার রঙের কোন পরিবর্তন হয় না; ইহাদের রঙ পাকা বলিয়া সহজে নষ্ট হয় না। এইজন্য এই সকল বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আবার এমন অনেক কাপড় আছে যাহাদের রঙ সামান্য সাবানজলে ধুইলেই উঠিয়া যায়। ইহাদের রঙ কাঁচা, সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়।

**পাকা রঙের বস্ত্রাদি :** এই সকল বস্ত্র ধুইবার প্রণালী অনেকটা সাদা বস্ত্র ধোওয়ার প্রণালীর অনুরূপ। প্রয়োজনমত বিদু বা সেলাই করিয়া কোন দাগ লাগিয়া থাকিলে তাহা উঠাইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় সর্বদাই দাগ উঠাইবার দ্রব্যটি জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবে। কখনও পাউডার বা গুঁড়া রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ক্লোরিন বা এই ধরনের উগ্র ব্লীচিং দ্রব্যাদি কখনও রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না। অত্যধিক ময়লা হইলে কাপড়গুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে ময়লা আলাগা হইয়া আসিবে এবং পরিষ্কার করিতে সুবিধা হইবে। জলে ভিজাইবার সময় প্রতি ১০ ছটাক জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ গুলিয়া লইবে। ইহাতে কাপড়ের রঙ স্থায়ী হইবে। সর্বদাই ঠাণ্ডা বা ঈষৎষ্ণ এবং মুহু জল ব্যবহার করিবে। তেমন ময়লা না হইলে কাপড় জলে ভিজাইবার প্রয়োজন নাই। ঈষৎষ্ণ মুহু জলে কিছু সাবান বা সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাপড়খানি ভিজাইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১০০-১১০° ফাঃ-এর মধ্যে থাকে। ধীরে ধীরে রগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বাহির করিয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে থুপিয়া কাচিতেও পার। ময়লা উঠিয়া গেলে প্রায় ১০ ছটাক ঠাণ্ডা জলে বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার গুলিয়া তাহাতে কাপড়খানি ২-৩



মিনিট ভিজাইয়া রাখ। ধুইবার সময় রঙ বিবর্ণ হইয়া গেলে ইহাতে আবার উহার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার ১ : ৪ বা ১ : ৬ স্টার্চের দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া লইবে। কাপড়ের জমিন সাদা হইলে উহা নীলজলে ডুবাইতে পার। ভিনিগারে ভিজাইবার পরই স্টার্চের সহিত নীল ব্যবহার করিবে। কাপড়ের জমিন সাদা না হইলে পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল যথাসম্ভব নিংড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে। রঙিন কাপড় যোত্রে শুকাইতে হয় না। শুকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়া ইঞ্জি করিবে। ইঞ্জি করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে জল দ্বারা আর্দ্র (damping) করিয়া লইবে। খুব গরম ইঞ্জি ব্যবহার করিলে রঙ চটিয়া যাইতে পারে।

**কাঁচা রঙের বস্তাদি :** কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে কখনও জলে ভিজাইয়া রাখিবে না। গরম জলের পরিবর্তে ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। সাবানে যেন ক্ষার বেশী না থাকে। সর্বদা ভাল সাবান ব্যবহার করিবে নতুবা খারাপ সাবান হইলে রঙ চটিয়া যাইবে। খুব বেশী সাবান গুলিবে না এবং সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। সাবান-জলে অল্প লবণ গুলিয়া সইলে রঙ স্থায়ী হইবে। কাপড়খানি জলে ভিজাইবার পর রগড়াইয়া বা খুপিয়া ময়লা দূর কর। এইবার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ভিনিগার মিশ্রণে ডুবাও। মিনিট কয়েক রাখিলে কাপড়ের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে। এখন ১ : ৪ বা ১ : ৬ স্টার্চের দ্রবণে ডুবাইয়া লও এবং কাপড় হইতে অতিরিক্ত জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া ছায়ায় শুকাও। অল্পক্ষণ আর্দ্র করিয়া রাখিয়া ইঞ্জি কর। অধিকক্ষণ আর্দ্র রাখিলে রঙ জলিয়া যাইবে।

রঙিন বস্তাদি ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে :—

(১) পাকা রঙের অল্প ময়লা কাপড় ও কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিবে না।

(২) পাকা রঙের অত্যধিক ময়লা বস্তাদি লবণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

(৩) পাকা রঙের কাপড় ঈষদুষ্ক জলে এবং কাঁচা রঙের কাপড় ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।

(৪) যে সাবানে বেশী ক্ষার আছে তাহা ব্যবহার করিবে না।

(৫) সাবান-জলে রঙিন বস্তাদি বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে না।

(৬) সর্বশেষে ভিনিগারের জলে ভিজাইলে কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

- (৭) রঙিন কাপড় ছায়ায় শুকাইতে দিবে।
- (৮) অত্যধিক গরম ইঞ্জি ব্যবহার করিও না। তাহাতে রঙ চটিয়া যাইবে।
- (৯) এক একবারে একটি করিয়া বস্ত্র ধুইবে।

## সাদা পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং অসাধারণতার ফলে অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। ধুলাবালি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বস্ত্রে বসিতে পারে না। এইজন্য ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না, ঝাড়িয়া ফেলিলেই আলগা ময়লা বাহির হইয়া যায়। নূতন বস্ত্রাদি অবশ্য প্রায় আধঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়। জলে সামান্য বোরাক্স (Borax) বা অ্যামোনিয়া (Ammonia) গুলিয়া লইতে হয়। পশমের বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার করিবে। বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলই এই সকল বস্ত্র ধুইবার পক্ষে অসুযোগী। জলের উষ্ণতা প্রায়  $100^{\circ}$  ফাঃ হওয়া উচিত। পশমের বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি ধুইতে হয় কারণ ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে পশম শক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উষ্ণ জলে সামান্য অ্যামোনিয়া (এক গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চামচ) এবং ভাল সাবান বা লাক্স (Lux) সাবানের গুঁড়া গুলিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। মনে রাখিবে পশমের বস্ত্রে অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (Neutral Detergent), রিঠা প্রভৃতি এই জাতীয় বস্ত্র ধোঁতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশমের কাপড়খানি সাবান-জলে ডুবাইয়া ধীরে ধীরে রগড়াইয়া উহার ময়লা দূর কর। কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে বস্ত্রটি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এইবার উষ্ণ জলে ( $100^{\circ}$  ফাঃ) বস্ত্রখানি কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইয়া ঈষৎ চাপ দিয়া বস্ত্র হইতে জল বাহির করিয়া দাও। কখনও নিংড়াইয়া জল বাহির করিবে না। টার্কিশ তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া কিছুটা জল শুষিয়া লও এবং বস্ত্রখানি টান টান করিয়া মুক্ত বাতাসে ছায়ায় মেলিয়া দাও। ধুইবার সময় বস্ত্রের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সময় বার বার টানিয়া দিলে উহা দূর হয় এবং বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি ও নমন্যতা বজায় থাকে। বস্ত্রগুলি যখন সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম ইঞ্জি দ্বারা ভাঁজ করা অবস্থায় উল্টাপিঠে চাপিয়া দিতে হয়। শুকাইয়া গেলে একটি ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইঞ্জি করিবে। কখনও খুব গরম ইঞ্জি ব্যবহার করিবে না। ইঞ্জির পর বায়ুতে ফেলিয়া রাখিবে।

**রঙিন পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি :** রঙিন বস্ত্রাদি ধোয়ার পদ্ধতি প্রায় সাদা বস্ত্রের মতই। তবে এই ক্ষেত্রে কখনও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিবে না ; কারণ ইহা রঙিন পশমের ক্ষতি করে। সাবানজলে বস্ত্রাদি বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না এবং ময়লা পরিষ্কার হইলে উষ্ণজলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। ধুইবার সময় জলে একটু ভিনিগার ও লবণ মিশাইয়া লইবে ( এক গ্যালন জলে বড় চামচের এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার )। ইহাতে বস্ত্রের ঐচ্ছল্য ফিরিয়া আসিবে। শুকাইবার সময় টানিয়া পূর্বাবস্থায় রাখিয়া শুকাইবে, তাহা হইলে আকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না। অল্প ভিজা থাকিতে ইঙ্গি করিবে। শুকাইয়া গেলে ভিজা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া ইঙ্গি করিবে। খুব গরম ইঙ্গি ব্যবহার করিবে না। সর্বশেষে বায়ু চালনা (Airing) করিয়া Mildew হাত হইতে রক্ষা করিবে।

পশমের বস্ত্র ধুইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিবে :—

- (১) কখনও খুব গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিবে না।
- (২) অত্যধিক ক্ষাব জাতীয় সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করিবে না।
- (৩) কখনও ঘষিয়া পরিষ্কার করিবে না।
- (৪) ভিজা অবস্থায় বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না।
- (৫) মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। ইহাতে তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।
- (৬) সূর্যালোকে বা অত্যধিক গরম স্থানে শুকাইবে না।
- (৭) অত্যধিক গরম ইঙ্গি ব্যবহার করিবে না।
- (৮) ইঙ্গি হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাস্কে তুলিয়া রাখিবে না। কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রাখিয়া দিবে।

## সাদা রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি

পশমের মত রেশমেও ধুলা, বালি ইত্যাদি একেবারে কাপড়ে বসিয়া যায় না। সুতরাং জলে ভিজাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনেক পুরানো ও অত্যন্ত বেশী ময়লা রেশমের বস্ত্র অবশ্য অল্পক্ষণ ঈষদুষ্ণ জল ও বোরাফ্লেক্সের (Borax) দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিলে পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয়। প্রথমে বস্ত্রখানি ঝাড়া দিয়া আলাগা ময়লা যতদূর সম্ভব দূর কর। প্রয়োজনমত রিফু, সেলাই ইত্যাদি করিবার পর যদি কোন দাগ লাগিয়া থাকে তবে উহা উঠাইতে চেষ্টা কর। সর্বদাই দাগ লাগামাত্র উঠাইতে হয়, পুরান দাগ রেশমের বস্ত্র হইতে

উঠানো খুবই মুশ্কিল। দাগ উঠাইয়া বস্ত্রখানি এইবার ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ডুবাও। সর্ববাই মুহূ জল ব্যবহার করিবে। জল খুব গরম হইলে বেশমের ক্ষতি হইবে। নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (Neutral Detergent) বেশমের বস্ত্র ধুইবার পক্ষে খুবই উপযোগী। রিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গুঁড়াও ব্যবহার করা চলিতে পারে। অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে বেশমের ক্ষতি হইবে। ময়লা দূর হইলে বস্ত্রখানি ভাল করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইবে। সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। ইহাতে বেশমের কাঠিষ্ঠ কিছু ফিরিয়া আসিবে। বেশমের বস্ত্রাদিতে সাধারণতঃ কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজা থাকিতে ইঞ্জি করিলেই কাপড়ের কাঠিষ্ঠ ফিরিয়া আসে। প্রয়োজন মত গঁদের জল (Gum-water) কলপ হিসাবে ব্যবহার করিতে পার (৩ ছটাক জলে চা-চামচের এক চামচ গঁদের জল)। যদি বেশমের মধ্যে ঔজ্জল্য সৃষ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক জলে একটি বড় চামচের এক চামচ মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাওয়া লইবে। হাতে চাপিয়া যতদূর সম্ভব জল বাহির করিয়া দাও। কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকাও। বোত্রে বা উচ্চ তাপে শুকাইলে অথবা অধিক উত্তপ্ত ইঞ্জির সংস্পর্শে আসিলে সাদা বেশমের কাপড়ে হলদে দাগ পড়ার আশঙ্কা থাকে। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্য বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে কিছু সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই।\* বেশমের বস্ত্র একটু ভিজা অবস্থাতেই ইঞ্জি করিতে হয়। কারণ একবার শুকাইয়া গেলে আর জল ছিটাইয়া আঁত্র' করা যায় না। এইরূপক্ষেত্রে বস্ত্রখানি পুনরায় ভিজাইতে হয়। বেশমে খুব বেশী গরম ইঞ্জি ব্যবহার করিলে বেশম পুড়িয়া যাইবে। (Tussore) এবং শানটুং (Shantung) বেশম শুষ্ক অবস্থায় ইঞ্জি করিতে হয়। ইঞ্জির পর বায়ুচালিত করিয়া শুষ্ক করিবে।

**রঙিন বেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি :** ছাপা এবং রঙিন বেশমের বস্ত্রাদি অনেক সময় সাবানজলে ধুইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জনৈক

\*বায়ুর (air) মধ্যস্থিত গন্ধকই এই হলদে বর্ণের কারণ—কাহারও কাহারও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই (compound) বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান নয়। তবে শিল্প এলাকার গন্ধকের যৌগ বায়ুতে দূষিত গ্যাসরূপে কখনও কখনও দেখা যায়। কিন্তু অধিক উত্তপ্ত ইঞ্জির সংস্পর্শ এবং যে সকল জ্বলে এই গন্ধকজাত যৌগ উৎপন্নকারী কোন শিল্পই নাই সেখানেও যখন সূর্যালোকে সাদা বেশম হলদে হইয়া যায় তখন একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ঐ গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই এই হলদে বর্ণ সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নয়।

## পরিবারের উপযোগী তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান

পরিবর্তে পেট্রল (Petrol) ব্যবহার করিবে। যদি সাবানজলে উহার রঙের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তবে একটু সাবধানতার সহিত জলেই বস্ত্রখানি ধুইবে। স্ততরাং প্রথমে বস্ত্রখানির এক কোণে একটু সাবানজল ঘষিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য ডিটারজেন্ট ই বিশেষ উপযোগী। লাক্স পাউডার এবং রিঠাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষারজাতীয় দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার করিবে না, ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবে। দ্রবদুষ্ক জলে লাক্স বা ডিটারজেন্ট গুলিয়া ফেলা হইলে উহাতে বস্ত্রখানি ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি ময়লা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে রঙ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ময়লা পরিষ্কার হইলে বস্ত্রখানি প্রথমে একবার দ্রবদুষ্ক জলে ধুইয়া লও। দ্বিতীয়বার ঠাণ্ডা জলে লবণ ও ভিনিগার (এক গ্যালন জলে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখানি ধুইবে। ইহাতে রঙের চাকচিক্য ফিরিয়া আসিবে। অনেক সময় কালো রেশমের বস্ত্র ধুইবার জলে সবুজ বা লালচে হইয়া যায়। এই সকল বস্ত্রাদি ধুইতে জলে সামান্য অ্যামোনিয়া মিশাইতে হয়। পরে পরিষ্কার বস্ত্রটি গাঢ় নীলজলে ডুবাইলেই উহাতে কোন প্রকার দাগ দেখা যাইবে না। শুকাইবার এবং ইঙ্গি করিবার প্রণালী সাদা রেশমের বস্ত্রাদির অনুরূপ। রেশমের বস্ত্র ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে :—

- (১) সাবানগতঃ ধুইবার পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না :
- (২) দ্রবদুষ্ক জল ব্যবহার করিবে এবং সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইবে।
- (৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার করিবে না।
- (৪) সবদা মৃদু জল ব্যবহার করিবে।
- (৫) কখনও ঘষিয়া ময়লা পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে তত্ত্ব ছিঁড়িয়া যাইবে।
- (৬) কখনও মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না।
- (৭) রঙিন ও ছাপা রেশম হইলে ধুইবার জলে লবণ ও ভিনিগার মিশাইবে।
- (৮) কাঠিগের ক্ষত্ৰ গর্দের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে।
- (৯) সর্বদা ছায়ায় শুকাইবে।
- (১০) সামান্য ভিজা থাকিতেই ইঙ্গি করিবে।
- (১১) তসব (Tussore) ও শ্যান্টুং (Shantung) রেশম শুকাইয়া ইঙ্গি করিবে।

## কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী

রেসন প্রভৃতি কৃত্রিম রেশম ধুইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ। ধুলা-বালি ইত্যাদি ময়লা কৃত্রিম রেশমে গভীর ভাবে বসিতে পারে না। অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তন্তুগুলি পচিয়া যায়। এইজন্য কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না। সর্বদাই মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। অত্যধিক ক্ষার জাতীয় দ্রব্যাদি বর্জন করিবে। লাক্স সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া কাপড়খানি উহাতে ভিজাইয়া আলগা হাতে রগড়াইয়া কাচিবে। কৃত্রিম রেশমে সাধারণতঃ কোন কলপের প্রয়োজনই হয় না। অনেকদিনের ব্যবহারে যদি স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে। হাতে চাপিলেই কৃত্রিম রেশম হইতে জলটুকু বাহির হইয়া যায়। একখানি টার্কিশ তোয়ালেতে কাপড়খানি আঁট করিয়া জড়াইয়া রাখিলে অধিকাংশ জলই বাহির হইয়া যাইবে। এই সকল কাপড় কখনও রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। একটা কাঠের ক্রেমে কাপড়খানি টানিয়া পূর্বাকৃতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। শুকাইবার সময় টানিয়া কাপড়খানিকে পূর্বাকৃতিতে না আনিলে কাপড়খানির আকৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে। অল্প ভিজা থাকিতেই ইঞ্জি করিয়া লইবে। খুব গরম ইঞ্জি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। স্নতরাং ইঞ্জি করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। প্রায় অধিকাংশ কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রই উন্টাপিঠে ইঞ্জি করিতে হয়।

**নাইলন (Nylon), টেরিলিন (Terylene) বা ডেক্রন (Dacron)**  
**প্রভৃতি ধুইবার প্রণালী :** এই সকল সিন্থেটিক (Synthetic) তন্তু জলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। স্নতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবানজলে ভিজাইয়া রাখিলে সহজে পরিষ্কার হয়। নাইলন ইত্যাদিতে মৃদু ও ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। ভাল সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ধুইবার সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। একখানি বড় তোয়ালেতে পরিষ্কার বস্ত্রখানি জড়াইয়া রাখিলে জলটুকু বাহির হইয়া যাইবে। একটি কাঠের ক্রেমে বস্ত্রখানি টানিয়া স্বাভাবিক আকৃতিতে আনিয়া শুকাইতে দিবে। নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতির তন্তুগুলি এমনভাবে নির্মিত যে ইহাতে কোন ভাঁজ পড়ে না (anti-crease)। তাই উহাদের ইঞ্জি করিবার প্রয়োজন হয় না।

**জর্জেট (Georgette) এবং ক্রেপ ডি সীন (Crape de Chine)**  
**ধুইবার প্রণালী :** এই জাতীয় কাপড়ে ক্রেপ মিশ্রিত থাকে, তাই ধুইবার

সময়ে সঙ্কচিত হইয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন করিলে কোন কোন জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন জলেই ধুইতে পারা যায়। আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা অতি সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করিলেই কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কাপড় জলে পরিষ্কার না করিয়া ড্রাই ওয়াশ (Dry wash) করাইতে হয়। জলে ধুইবার উপযুক্ত জর্জেট ও ক্রেপ ডি সীন বেশমের কাপড় ধুইবার প্রণালীতে ধুইতে হয়। উৎকৃষ্ট সাবানের গুঁড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ইত্যাদি পরিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিবে। কখনও ঘষিয়া ময়লা দূর করিবে না, ইহাতে জমিন নষ্ট হইয়া যাইবে। আলগা হাতে রগড়াইয়া ময়লা বাহির করিয়া দিবে। শুকাইবার সময়েই সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ধুইবার পূর্বে প্রস্থের মাপ একটি কাঠের লাঠিতে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। ধুইবার পরে যাহাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা কাপড়খানি ঐ কাঠের লাঠিতে জড়াইয়া লইতে হয়। জড়াইবার সময়ে কাপড়খানি টানিয়া প্রস্থের দাগের সহিত মিলাইয়া জড়াইবে এবং ঐ জড়ানো অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে। উপরের কিছুটা অংশ শুকাইয়া গেলে উহা অত্র একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইভাবে কাপড়খানি ধীরে ধীরে শুকাইলে ইঞ্জি করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাঁজ করিয়া সামান্য গরম ইঞ্জি দ্বারা চাপিয়া দিলেই ইঞ্জির প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে।

**অর্গান্ডি (Organdie) ধুইবার প্রণালী :** অত্যন্ত মিহি এবং দামী সূতা হইতে এই কাপড় প্রস্তুত হয়। সাদা, ছাপা, রঙিন প্রভৃতি বহু প্রকার অর্গান্ডি পাওয়া যায়। ইহা ধুইবার প্রণালী ছাপা ও রঙিন সূতির কাপড় ধুইবার অমুরূপ। অত্যধিক ক্ষারজাতীয় সাবান সোডা ব্যবহার করা এবং জলে ফুটানো অর্গান্ডির পক্ষে ক্ষতিকর। নূতন কাপড়ে কলপ লাগে না। সামান্য ভিজা অবস্থায় ইঞ্জি করিলেই স্বাভাবিক কাঠি ফিরিয়া আসে। পুরানো কাপড়ে পাতলা স্টার্চের (scarch) কলপ ব্যবহৃত হইতে পারে। খুব দামী ও মিহি জমিনের অর্গান্ডিতে গঁদের জল স্টার্চের বদলে কলপ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

### সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা (Removal of Yellowish Colour from White Clothes)

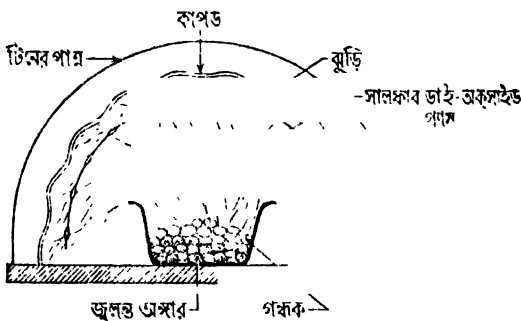
বস্ত্রধোতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তোমরা জানিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও সাদা বস্ত্রাদি অনেকবার ধুইবার পর তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা হলদেটে রঙ দেখা দেয়। কাপড়ের হলদেটে ভাবটি

বিভিন্ন ব্রিচিং অপসারকের সাহায্যে দূর করা যায়। বিভিন্ন ব্রিচিং অপসারকের মধ্যে ক্লোরিন সর্বাধিক কার্যকরী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত উগ্র বলিয়া সূতি ও লিনেনের কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার করিলে কাপড় ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ব্রিচিং পাউডারের দ্রবণ এবং জাভেলী দ্রবণে এই ক্লোরিন থাকে বলিয়া কেবলমাত্র সূতি ও লিনেনের কাপড়েই এই দুই প্রকার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সালফার বা গন্ধক পোড়াইয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে সালফার ডাই-অক্সাইড বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার ব্রিচিং অপসারক। তবে ইহা ক্লোরিনের তায় তত উগ্র নয়। সুতরাং ইহা নির্ভয়ে রেশম, পশম, নাইলন, রেয়ন, ডেক্রন ইত্যাদি কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সালিক অ্যাসিডেরও সামান্য ব্রিচিং করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যাদিও রেশম, পশম ইত্যাদি দামী কাপড়ে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

### সূতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

**প্রাচীন পদ্ধতি :** অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যের আলো, বায়ু, জলীয় বাষ্প ও সবুজ ঘাসের সাহায্যে সূতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাই সর্বাধিক সহজ পদ্ধতি এবং ইহাতে কোন অর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া টান টান করিয়া খোলা জায়গায় সবুজ ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া উহাকে আর্দ্র অবস্থায় রাখিতে হয়। বায়ুর অক্সিজেন, সবুজ ঘাস, জলীয় বাষ্প এবং রোদের সাহায্যে কাপড়ের হলদে রঙটি দূর করিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবটি ফুটাইয়া তোলে।

**আধুনিক পদ্ধতি :** উপরের পদ্ধতির একটি অনুরূপ হইতেছে এই যে



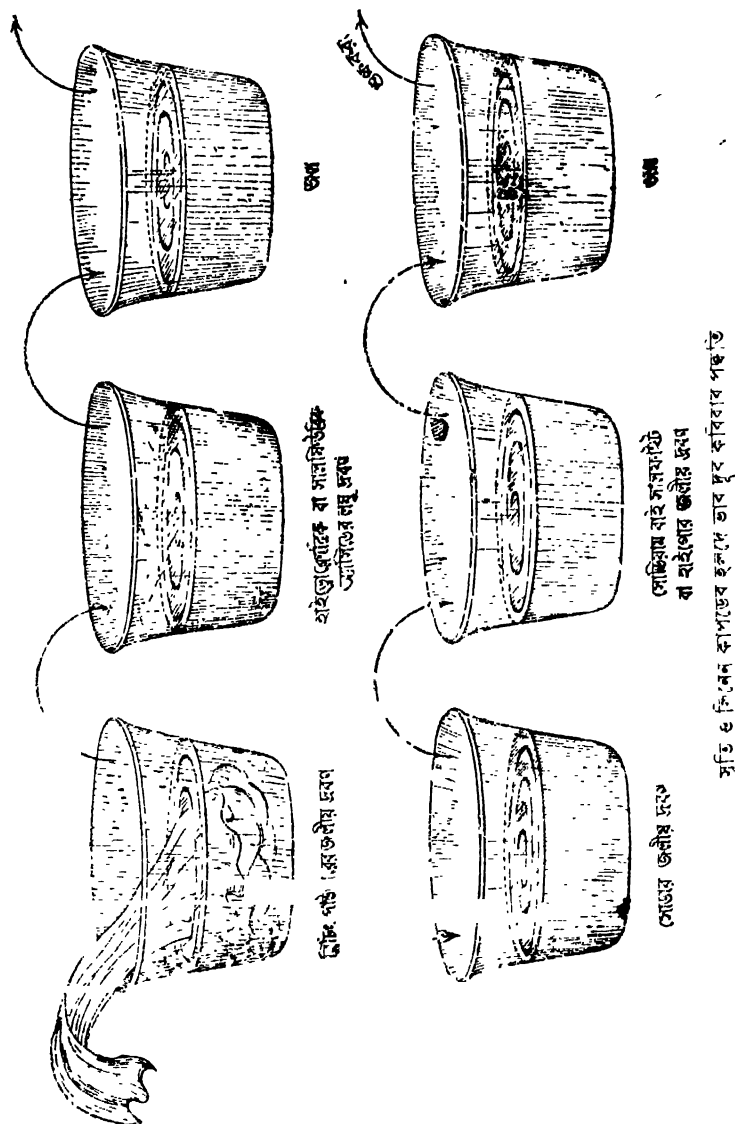
রেশম ও পশমের কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি

আকাশ যখন মেঘলা থাকে বা বর্ষার দিনে আকাশে যখন সূর্য দেখা যায় না



তখন এই পদ্ধতি অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই নূতন পদ্ধতি গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই প্রযোজ্য।

প্রথমে কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়া ব্লিচিং পাউডারের একটি লঘু জলীয় দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হয়। (ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে জাভেলী



দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে)। পরে কাপড়খানি ঐ দ্রবণ হইতে উঠাইয়া হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের অতি লঘু দ্রবণে আরও

কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের সৃষ্টি হয়। এখন কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া উহা হইতে আদিত সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হয়, কারণ সামান্য আদিতেও কাপড় ফাশিয়া হাইবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড়খানি এইবার প্রথমে সোডার জলীয় দ্রবণে এবং পরে সোডিয়াম বাই-সালফাইট অথবা 'হাইপো'র লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

**রেশম, শশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার পদ্ধতি :** এই সকল কাপড়ে উপরের কোন পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যাইবে না। এই জাতীয় বস্ত্রে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেমন কার্যকরী তেমনি নিরাপদ।

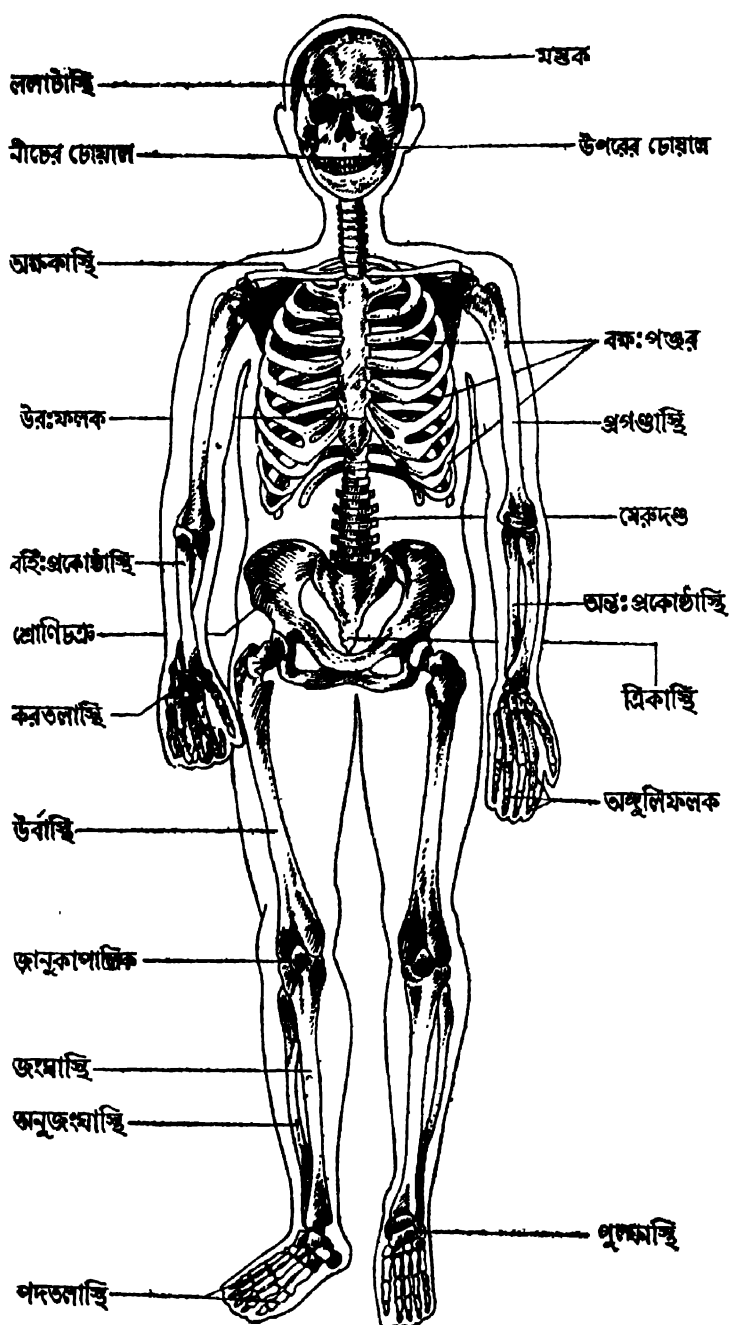
একটি মাটির পাত্রে কিছুটা জলস্ত অঙ্কার লইয়া উহাতে কয়েক টুকরা গন্ধক স্থাপন কর। পাত্রটি এখন একটি বড় বাঁশের বা বেতের ঝুড়ি দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এই ঝুড়ির উপরে ঐ হলদে দাগওয়ালা পরিষ্কার কাপড়খানি ছড়াইয়া দাও এবং সমস্ত ঝুড়িটি আরেক্ষণি বড় টিনের কাঠের বা মাটির পাত্র দ্বারা একপ ভাবে ঢাকিয়া দাও যেন ঝুড়ি এবং ঐ পাত্রের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা থাকে। জলস্ত অঙ্কারে গন্ধক পুড়িয়া সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই গ্যাস ঝুড়ির ছিদ্র দিয়া কাপড়ের হলদে অংশের উপর ক্রিয়া করিবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উহাতে সাদা ধবধবে ভাব ফুটিয়া উঠিবে। এইবার কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

১. দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (Elementary Knowledge of the structure and functions of different systems of the human body) :

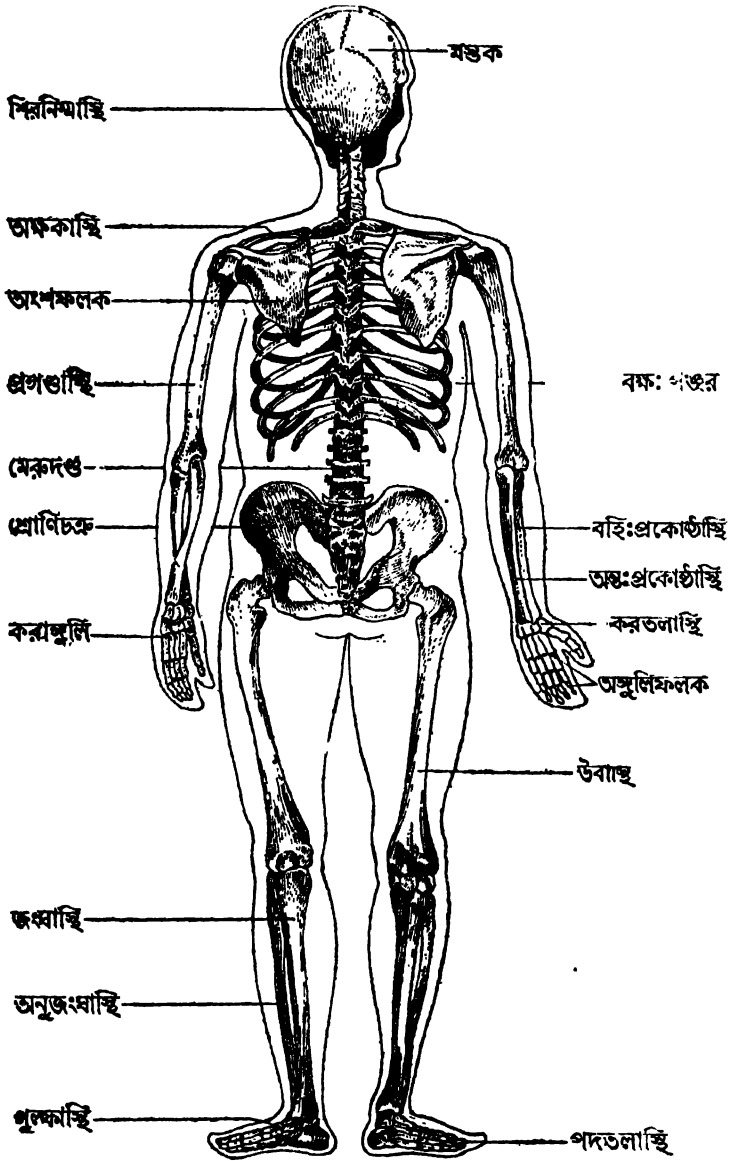
### নর-কঙ্কালের গঠন ( Structure of the human skeleton )

নর-কঙ্কালটি প্রধানতঃ কতকগুলি হাড় বা অস্থি দ্বারা গঠিত। এই অস্থি-গুলিকে উহাদের আকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, (১) লম্বা অস্থি ( Long bones ), (২) ছোট অস্থি (Short bones), (৩) চ্যাপ্টা অস্থি (Flat bones) এবং (৪) অনিয়মিতাকার অস্থি (Irregular bones)। হাত এবং পায়ের অস্থিগুলিই লম্বা অস্থির অন্তর্গত। ইহারা দেখিতে বেশ লম্বা এবং নলাকৃতি। আবার হাতের কব্জি ( wrist ) এবং পায়ের গোড়ালিতে (ankle) কতকগুলি ছোট ছোট হাড় বা অস্থি দেখা যায়। এইগুলি লম্বা অস্থির তুলনায় অনেক ছোট এবং এই জগাই ইহাদের দ্বারা একটি ভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার আমাদের পিঠে ঘাড়ের কাছে দুই পাশে দুইখানি বড় চ্যাপ্টা হাড় আছে। হাতের সঙ্গে এই হাড় দুইখানি সংযুক্ত। ইহা ছাড়া কবোটি বা মাথাব খুলিটিও কয়েকটি চ্যাপ্টা হাড়ের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ আকৃতির অস্থিও আমাদের দেহে দেখা যায়। মানবদেহের মেরুদণ্ডটি এইরূপ কতকগুলি বিশেষ আকৃতির অস্থিদ্বারা গঠিত। এই অস্থিগুলিকেই অনিয়মিতাকার অস্থি বলে।

সমগ্র নর-কঙ্কালটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের একটি কবোটি (Skull), মেরুদণ্ড ( Backbone or Vertebral Column ), পঞ্জব ( Ribs ) এবং উরুফলক ( Sternum ) ইত্যাদি লইয়া গঠিত। ইহাকে অ্যাক্সিয়াল কঙ্কাল ( Axial skeleton ) বলে। ইহা ছাড়া অঙ্গকান্ধি ( Clavicle ), অঙ্গফলক ( Scapula ), বাহু, শ্রোণিচক্র (Pelvic girdle), পা ইত্যাদি লইয়া অপর অংশটি গঠিত। এই অংশটিকে অ্যাপেন্ডিকুলার কঙ্কাল ( Appendicular skeleton ) বলে।

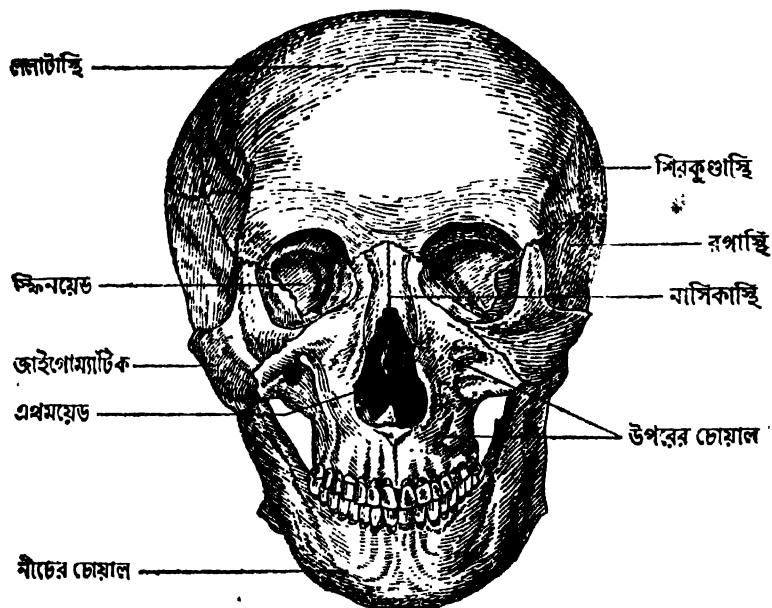


নরকঙ্কালের সামনের দিক



মরকশালের গিঁহনের দিক

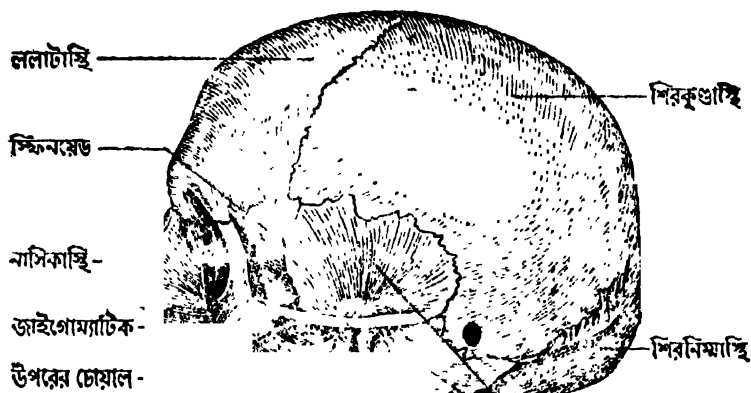
**করোটি (Skull) :** সমগ্র করোটি প্রায় ২২ খানা অস্থি দ্বারা গঠিত। ইহাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মস্তিষ্কাধার (Cranium) এবং (২) মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহ (Bones of the face)। মস্তিষ্কাধার ৮ খানা এবং মুখমণ্ডল ১৪ খানা অস্থি লইয়া গঠিত। মস্তিষ্কাধারের এই ৮ খানি অস্থি



করোটি

হইতেছে, ললাটাস্থি (Frontal bone), দুইটি শিরকুণ্ডাস্থি (Parietal bones), শিরনিয়াস্থি (Occipital bone), দুইটি রগাস্থি (Temporal bones), স্কিনয়েড (Sphenoid) ও এথময়েড (Ethmoid) অস্থি। এই অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া একটি কোটরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কোটরেই মস্তিষ্ক (Brain) থাকে। মস্তিষ্কাধারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুসমূহ প্রবিষ্ট হয়। রগাস্থি দুইটির মধ্যে অবস্থান করে এবং ইহার মধ্য হইতে একটি প্রণালী বা ডাক্তি বাহির হইয়া বহিঃকর্ণ পথে গিয়াছে। মস্তিষ্কাধারের বিরাট গহ্বরের সহিত শিরনিয়াস্থিতে অবস্থিত একটি ছিদ্রপথে মেরুদণ্ডের ছিদ্রের (Neural canal) সংযোগ আছে। স্নায়ুশাখাও (Spinal cord) এই ছিদ্রপথেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

মুখমণ্ডলের অস্থিগুলি হইল—উপরের ও নীচের চোয়ালের অস্থি ( Maxilla and Mandible), গঙাস্থি (Zygomatic), তালুদেশীয় অস্থি (Palatine), ভোমার ( Vomer ), নাসিকার অস্থিসমূহ ( Nasal bones ), নিম্ন নাসাকণা ( Lower Nasal Conchae ) এবং অশ্রুবাহী অস্থিসমূহ ( Lachrymal bones ) । হাড় (Maxilla ) এবং তালু দেশীয় অস্থিসমূহ নাসিকা এবং মুখ-



কণ-গহ্বরের মুখ

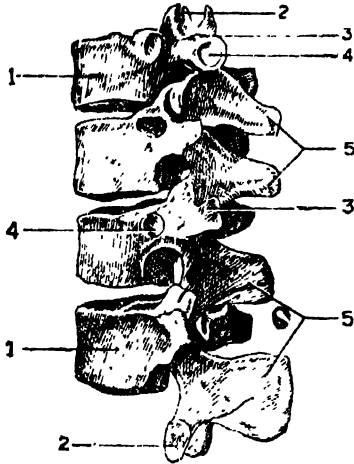
নীচের চোয়াল-

কবোটি

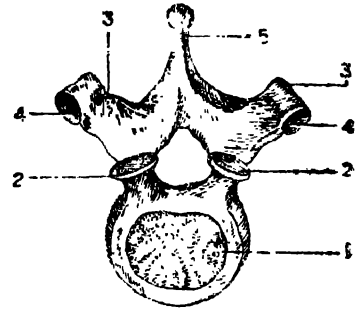
গহ্বরের মধ্যে অস্থি-প্রাচীর গঠন করে। নাসিকার অস্থিগুলি দ্বারা নাসাগহ্বর সৃষ্টি হয়। ভোমার এবং এথ্ময়েড অস্থির নিম্নভাগ দ্বারা নাসাগহ্বর দক্ষিণ ও বাম এই দুই অর্ধে বিভক্ত হয়। এথ্ময়েড অস্থির উপরিভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রপথে ঘ্রাণবাহী স্নায়ুগুলি নাসাগহ্বর হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। এথ্ময়েড অস্থির উদাত্ত অংশ দ্বারা উপর ও মধ্য নাসাকণা গঠিত হয়। নিম্ন নাসাকণা ভিন্ন অস্থিদ্বারা গঠিত। গঙাস্থিগুলি উপরের চোয়ালের সহিত ললাটস্থি ও রগাস্থিকে সংযুক্ত করিয়া মুখের কাঠামোটিকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

**মেরুদণ্ড (Vertebral Column) :** দেহের পিছন দিকে কবোটির নিম্ন-দেশ হইতে শ্রোণিচক্রের ( Pelvic girdle ) একটু নীচে পর্যন্ত যে অস্থিনির্মিত দেহকাণ্ডটি অবস্থিত তাহাই মেরুদণ্ড নামে পরিচিত। ইহা একখানা লম্বা অস্থিদ্বারা প্রস্তুত নয়। ইহা ছোট ছোট প্রায় ৩৩ খানা অনিয়তাকার

অস্থিখণ্ডের দ্বারা গঠিত। এক একটি অস্থিখণ্ডকে ভার্টিব্রা বা কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রত্যেকটি কশেরুকা ছব্ব একই রকম না হইলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার মধ্যে একটি করিয়া বেশ বড় ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে নিউরাল গহ্বর (Neural cavity or Neural canal) বলে। এই গহ্বরের সম্মুখের দিকে একটি অস্থিময় নলাকৃতি অংশ আছে, ইহাকে সেন্ট্রাম (Centrum) বলে। সেন্ট্রামের



কশেরুকার পাশ্চাদ্দেশের চিত্র।



B

কশেরুকার উপরিভাগের চিত্র।

- (১) কশেরুকার দেহকাণ্ড। (২) দুইটি কশেরুকা পরস্পরের সহিত যেখানে যুক্ত থাকে।  
(৩) ও (৫) মেরুদণ্ডের উদগত অংশ। (৪) কশেরুকা ও পঞ্জরাস্থি ব সন্ধিস্থল।

অপরদিকে নিউরাল গহ্বরকে ঘিরিয়া কতগুলি উদগত অংশ দেখা যায়। এই সকল উদগত অংশেই কশেরুকাগুলির পরস্পরের সহিত সংযোজিত হওয়ার সন্ধিস্থল বর্তমান। আবার বক্ষদেশীয় কশেরুকাগুলির সহিত পঞ্জরের অস্থিগুলি সংযুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলও এই উদগত অংশে অবস্থিত। কশেরুকার সেন্ট্রাম দেহের সম্মুখদিকে এবং উদগত অংশগুলি দেহের পিছন দিকে থাকে। কশেরুকাগুলি উপর্যুপরি সজ্জিত হইয়া মেরুদণ্ডটি গঠন করে। প্রত্যেক দুইটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে তরুণাস্থি স্তবকের (Cartilage) একটি পুরু আস্তরণ থাকে। এই তরুণাস্থি স্তবকের জন্তই মেরুদণ্ড স্থিতিস্থাপকতা ও সচলতা লাভ করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পেশী সংকুচিত হইলে তরুণাস্থি স্তবকও সংকুচিত হয় এবং কশেরুকাগুলি পরস্পরের দিকে সরিয়া আসে। ফলে দেহের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আবার পেশীগুলি শিথিল

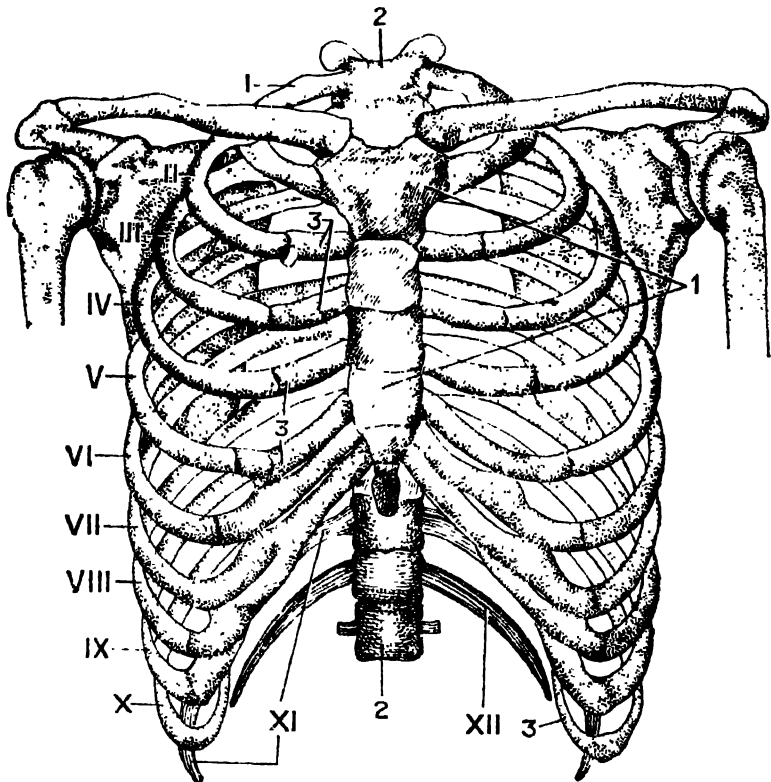


হইয়া গেলে তরুণাঙ্গি স্তবকগুলিও প্রসারিত হয় এবং কশেরুকাগুলি পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফলে দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই এলায়িত অবস্থায় আমাদের দেহের দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা বেশী হয়। আবার ভাইনে অথবা বাঁয়ে দেহ বঁকাইলে ঐ দিকের তরুণাঙ্গি স্তবকগুলি সংকুচিত হয় এবং অপরদিকের স্তবকগুলি প্রসারিত হয়। ফলে কশেরুকাগুলি তথা সমগ্র মেরুদণ্ডটি ঐ বাকের দিকে হেলিয়া পড়ে। এইরূপে কশেরুকার মধ্যবর্তী এই তরুণাঙ্গি স্তবকের জন্ত সমগ্র মেরুদণ্ডটি ভাইনে-বাঁয়ে ও সম্মুখে-পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে বঁকান যায় এবং সঞ্চালন করা যায়। সমস্ত কশেরুকাগুলি পর পর এইভাবে সাজান থাকে যে উহাদের নিউরাল গহ্বরগুলি মিলিত হইয়া একটি নলের আকার ধারণ করে। এই ফাঁপা নলের মধ্য দিয়াই স্নায়ুকাণ্ডটি প্রবাহিত হয়। সমগ্র মেরুদণ্ডটিকে উহার বিভিন্ন অংশের কাজের তারতম্য অনুযায়ী ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গ্রীবাদেশীয় (Cervical vertebrae)—করোটির দিক হইতে প্রথম ৭ খানি কশেরুকা লইয়া এই অংশটি গঠিত। (২) বক্ষদেশীয় অংশ (Thoracic vertebrae)—গ্রীবা দেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ১২ খানি কশেরুকা লইয়া এই অংশটি গঠিত। এই সকল কশেরুকার প্রত্যেকটির সহিত এক জোড়া করিয়া পঙ্কজের অস্থি সংলগ্ন থাকে। (৩) কটদেশীয় অংশ (Lumber vertebrae)—বক্ষদেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ৫ খানি কশেরুকা লইয়া এই কটদেশীয় অংশটি গঠিত। (৪) ত্রিকাস্থি (Sacral vertebrae)—কটদেশীয় কশেরুকার পরবর্তী ৫ খানি কশেরুকা ত্রিকাস্থি বলে। পরিণত বয়সে এই ৫ খানি অস্থি যুক্ত হইয়া একখানি ত্রিকাস্থিতে (Sacrum) পরিণত হয়। (৫) অণুত্রিকাস্থি (Coccygeal vertebrae)—অবশিষ্ট ৪ অথবা ৫ খানি কশেরুকা লইয়া অণুত্রিকাস্থি গঠিত। যে সকল স্তন্যপায়ী জীবের লেজ আছে তাহাদের অণুত্রিকাস্থিতে অনেকগুলি কশেরুকা থাকে এবং এই অণুত্রিকাস্থিই লেজের কঙ্কাল গঠন করে। মানুষের পূর্ব-পুরুষদেরও যে লেজ ছিল অণুত্রিকাস্থির এই ৪ ৫ খানি কশেরুকাই তাহার প্রমাণ।

পশুদের মেরুদণ্ডটি প্রায় সোজা, কেবলমাত্র গ্রীবাদেশে একটি বাক আছে। কিন্তু মানুষের মেরুদণ্ডে গ্রীবাদেশ ছাড়াও বক্ষ, কট এবং ত্রিকাস্থিদেশে বক্রতা আছে। এই বক্রতাগুলির জন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় দেহের ভারকেন্দ্রটি একটি লম্ব রেখার উপর অবস্থান করে এবং গোড়ালির নিকট পায়ের পাতার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্তই আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং ভুই পড়ে উঠা সম্ভব হয়। এই বক্রতার জন্তই হাঁটা-চলা,

দৌড়ান, লাফান ইত্যাদির সময় মেরুদণ্ডটি স্ত্রিং-এর দ্বারা কাজ করে এবং মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত ও আলোড়নের হাত হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাড়া মেরুদণ্ডের বক্রতা ইহাকে অধিকতর স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা দান করে।

**পঞ্জরাস্থি (Ribs) :** বার জোড়া পঞ্জরাস্থি দ্বারা বক্ষ-গহ্বরটি গঠিত। এই বক্ষ-গহ্বরেই হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস অবস্থিত। প্রত্যেক জোড়া পঞ্জরাস্থির এক প্রান্ত পিছন দিকে এক একটি বক্ষদেশীয় কশেরুকার উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে। উপরের দশজোড়া পঞ্জরাস্থির অপর প্রান্ত তরুণাস্থির দ্বারা

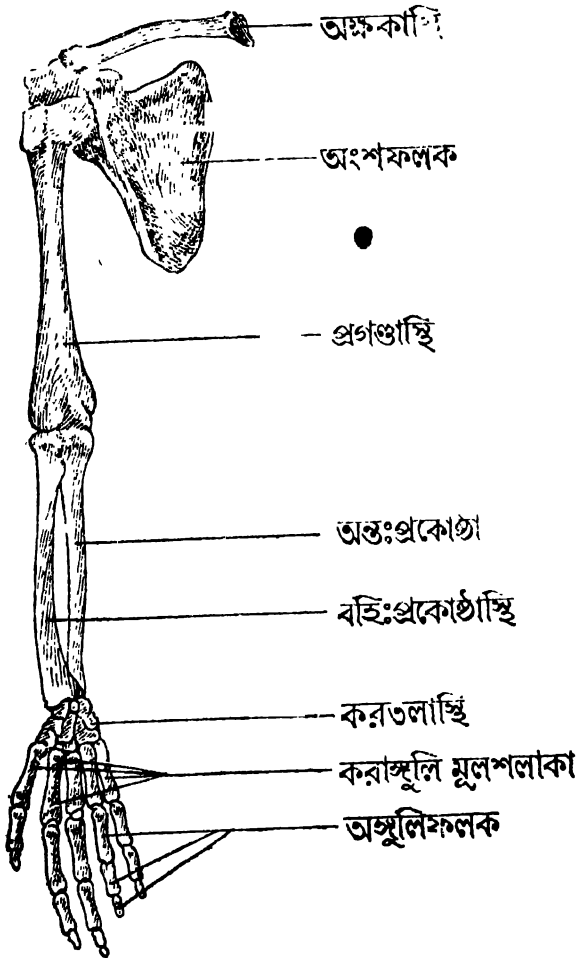


ঃফলক ২. মেরুদণ্ড ৩. পঞ্জরাস্থির, তরুণাস্থির গঠিত অংশ I—XII. পঞ্জরাস্থি

সম্মুখের উরঃফলকের (Sternum) সহিত সংযুক্ত। অষ্টম, নবম এবং দশম পঞ্জরাস্থিসমূহ সরাসরি উরঃফলকে সংযুক্ত নয়। উহাদের তরুণাস্থিগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্জরাস্থি তরুণাস্থির মাধ্যমে উরঃফলকের সহিত যুক্ত হইয়াছে। একাদশ এবং দ্বাদশ পঞ্জরাস্থির অপর প্রান্ত যুক্ত অবস্থায়

আছে। ইহারা উরঃফলকের সহিত যুক্ত নয়। পঞ্জরাস্থিগুলি কশেরুকা হইতে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইবার সময় একটু নীচের দিকে হেলিয়া থাকে। প্রবাস গ্রহণের সময় পঞ্জরাস্থির সম্মুখপ্রান্ত একটু উপরের দিকে উঠিয়া বক্ষ-গহবরের আয়তন বৃদ্ধি করে। এই সময়ে শ্বসনতন্ত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্জরাস্থিসমূহ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে আকস্মিক আঘাত ও আলোড়ন হইতে রক্ষা করে।

**ক্ধ ও বাহু (Pectoral girdle and the arm) :** আমাদের ঘাড়ের দুইপাশে দুইখানা বীকা হাড় অন্যায়মেই হাত দ্বারা অসুভব করা যায়। এই



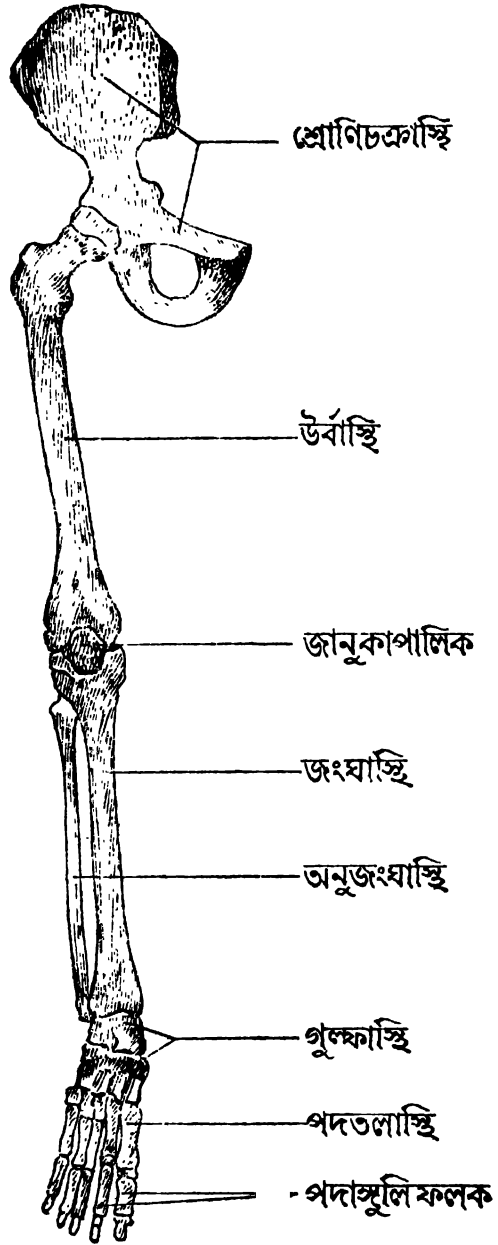
ক্ধ ও বাহু

হাড় দুইখানাকে অক্ষকাণ্ঠি (Clavicle or collar bones) বলে। ইহাদের

একপ্রান্ত উরঃফলকের সহিত এবং অপর প্রান্ত অঙ্গফলকের (Scapula or shoulder blades) সহিত সংযুক্ত। পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে দুই পার্শ্বে যে দুইখানি বড় চ্যাপ্টা অস্থি হাত হইতে মেরুদণ্ডের দিকে প্রসারিত তাহাদের অঙ্গফলক বলে। এই অঙ্গফলক এবং অক্ষকাস্থি হাতের দিকে একত্রে সংযুক্ত আছে। আমাদের প্রত্যেক বাহুতে তিনখানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। উপরের অস্থিখানিকে প্রগণ্ডাস্থি (Humerus) বলে। প্রগণ্ডাস্থির গোলাকৃতি প্রান্ত বা 'বল' অঙ্গফলকের এক প্রান্তে অবস্থিত গর্তের (Socket) মধ্যে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকে। অপর দুইখানি লম্বা অস্থি কনুই হইতে হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ভিতরের দিকে অবস্থিত অস্থি-খণ্ডকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) এবং বাহিরের দিকের অস্থিখানাকে বহিঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি (Radius) বলে। এই অস্থি দুইখানি কনুইতে প্রগণ্ডাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অপর প্রান্ত হাতের কব্জিতে আসিয়া মিশিয়াছে। হাতের কব্জিতে ছোট ছোট আটখানি অস্থি আছে। ইহাদের কারপাল অস্থি (Carpal bones) বা করতলাস্থি বলে। কব্জি হইতে পাঁচখানি অপেক্ষাকৃত বড় অস্থি অঙ্গুলির মূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আমাদের হাতের করতল (Palm of the hand) গঠন করিয়াছে। এই পাঁচখানি অস্থিকে করতালুলি মূলশলাকা (Metacarpal bones) বলে। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (Thumb) দুইখানি এবং অন্যান্য অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১৪ খানি অস্থি দ্বারা এক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি গঠিত। এই অস্থিগুলিকে অঙ্গুলিফলক (Phalanges) বলে। অতএব প্রত্যেক স্বক্ষে ২ খানি এবং এবং প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি অস্থি অবস্থিত।

**শ্রোণিচক্র ও পা (Pelvic girdle and the leg) :** শ্রোণিচক্রে দুইখানি বড় বড় গামলার গ্রায় শ্রোণিচক্রাস্থি আছে। কোমরের নীচে দুই পাশে এই দুইখানি অস্থি অবস্থিত। প্রত্যেকটি শ্রোণিচক্রাস্থি আবার ইলিয়াম (Ilium), ইশিয়াম (Ischium) এবং পিউবিশ (Pubis) নামক তিনখানি অস্থির মিলনে গঠিত হইয়াছে। শ্রোণিচক্রাস্থি দুইখানি ত্রিকোণাকার (sacrum) সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। দুইখানি শ্রোণিচক্রাস্থির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া গভীর গর্ত (socket) আছে। এই গর্তকে এসিটাবুলাম (Acetabulum) বলে। বাহুর মত প্রত্যেক পায়ে ৩খানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। উপরের অস্থিখানিকে উর্বাস্থি (Femur) বলে। এই উর্বাস্থির গোলাকৃতি প্রান্ত শ্রোণিচক্রাস্থির এসিটাবুলামে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। উর্বাস্থির অপর প্রান্ত জংবাস্থি (tibia) এবং অঙ্গজংবাস্থির সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগ স্থানকে

জাহ্নসন্ধি ( knee joint ) বলে । এই জাহ্ন সন্ধির সম্মুখে একটি ছোট চ্যাপ্টা অস্থি থাকে । ইহাকে জাহ্নকাপালিক (patella or knee caps) বলে । জংঘাস্থি এবং অহুজংঘাস্থি পায়ের গোড়ালিতে (heel) আসিয়া মিলিত হইয়াছে । গোড়ালিতে ছোট ছোট সাতখানি অস্থি আছে । ইহাদের গুলুফাস্থি ( tarsal bones ) বলে । হাতের করতলের মত পায়ের পাতাতেও পাঁচখানি অস্থি আছে । ইহাদের পদতলাস্থি ( Metatarsals ) বলে । হাতের অঙ্গুলির মত পায়ের অঙ্গুলিতেও মোট ১৪ খানি অস্থি আছে । ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (Great toe) দুইখানি এবং অপর চারিটি অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১২ খানি । এই সকল অস্থিকে পদাঙ্গুলি ফলক ( phalanges ) বলে । সুতরাং বাহু এবং পায়ের গঠনে অনেক সাদৃশ্য আছে । অতএব জাহ্নকাপালিক সহ প্রতি পায়ে মোট ৩০ খানি অস্থি আছে



শ্রোণিচক্র ও পা

মানবদেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিসমূহের নাম ও সংখ্যা উপরে বর্ণিত হইল। ইহা হইতে মানবদেহের মোট অস্থিসংখ্যার একটি আভাস পাওয়া যাইবে।\*

১. করোটির মোট অস্থিসংখ্যা	{ (১) মস্তিষ্কাধার	৮
	(২) মূখমণ্ডল	১৪
২. মেরুদণ্ডের অস্থিসংখ্যা		৩৪
৩. বক্ষপঞ্জরের অস্থিসংখ্যা		২৪
৪. প্রতিদিকের ঘাড়ে ২ খানি করিয়া দুই দিকের ঘাড়ে মোট অস্থিসংখ্যা		৪
৫. প্রতি বাহুতে ৩০ খানি করিয়া দুই বাহুতে মোট অস্থিসংখ্যা		৬০
৬. প্রত্যেক শ্রোণিচক্রাঙ্স্থিতে ৩ খানি করিয়া দুইটি শ্রোণিচক্রাঙ্স্থিতে মোট অস্থিসংখ্যা		৬
৭. প্রতি পায়ে ৩০ খানি করিয়া দুই পায়ে মোট অস্থিসংখ্যা		৬০
	সর্বমোট	২১০

### পেশী ( Muscles )

নর-কঙ্কালের উপর পেশী বা মাংসপেশীর আবরণে মানবদেহ গঠিত। এই পেশীর মধ্যে আবার অসংখ্য শিরা, ধমনী এবং স্নায়ু প্রবাহিত হয়। আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের পেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি পেশী দেহের অভ্যন্তরে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের ক্রিয়ার উপরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব থাকে না, যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে উহা গলনালী হইয়া ক্রমশঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। গলনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির পেশীসমূহের ক্রিয়ার ফলেই খাদ্যদ্রব্য এইরূপে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সকল যন্ত্রের (organs) পেশীকে মৃদু পেশী (smooth muscles) বলে। ইহারা দেহের অভ্যন্তরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর না করিয়াই কাজ করিয়া থাকে। আবার কতগুলি পেশীর একপ্রান্ত বা উভয় প্রান্তই অস্থি বা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই প্রকার অস্থি-

\*মানবদেহের মোট অস্থিসংখ্যা আজও সঠিকরূপে নির্ণয় করা যায় নাই।

সংশ্লিষ্ট পেশীর সংখ্যাই আমাদের দেহে অধিক। প্রায় ছয় শতেরও অধিক অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশী মানবদেহে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল পেশীর মোট ওজন আমাদের দেহের মোট ওজনের অর্ধেকেরও বেশী। সাধারণতঃ শরীরের পেশী বা মাংসপেশী বলিতে এই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীই বুঝায়। এই সকল পেশীতে ফিকা ও গাঢ় রঙের ডোরা কাটা থাকে বলিয়া এই জাতীয় পেশীকে **ডোরাকাটা পেশী** ( striated muscles ) বলে। ইহা **ছাড়া হৃৎপিণ্ডের পেশী** ( Heart or cardiac muscles ) একটি ভিন্ন প্রকারের পেশী। পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির পেশীর গ্রায় হৃৎপিণ্ডের পেশীও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বদাই কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাকস্থলী ইত্যাদির মসৃণ পেশীর সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীর আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

**পেশীর গঠন :** অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা কতগুলি লম্বা সরু সরু পেশী তন্তু ( fibres ) গুচ্ছাকারে একত্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পেশীতন্তু প্রায় ০.০৫ মি. মি. চওড়া এবং ইহার বহুশতগুলি লম্বা। এইগুলি খালি চোখেই ইহাদের দেখা যায়। এক একটি তন্তুর মধ্যে একই আবরণী ( membrane ) মধ্যে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। স্তব্ধভাবে একটি তন্তু একাধিক কোষের দ্বারা গঠিত বলা যায়। পেশী তন্তুর জীবোপাদানে অতি সূক্ষ্ম বহু সংখ্যক পেশী-সূত্র ( Fibrils ) দেখা যায়। এই সকল পেশী-সূত্র পেশী তন্তুর সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া প্রসারিত থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী সূত্রগুলি গুচ্ছাকারে পর পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং গুচ্ছগুলির একটি অংশের রঙ ফিকা এবং পরবর্তী অংশের রঙ গাঢ়। লম্বালম্বি ভাবে গঠিত পেশীসমূহে এই ফিকা এবং গাঢ় রঙের ডোরাগুলি আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত তন্তুটি ডোরা কাটা বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীগুলিকে **ডোরাকাটা ( striated ) পেশী** বলে। **ডোরাকাটা পেশীগুলি সহজেই উত্তেজিত হয় এবং দ্রুত সংকুচিত হইতে পারে।** মানবদেহের **ডোরাকাটা পেশীগুলি** সেকেশুে দশবারেরও বেশী সংকুচিত হইতে পারে। **মসৃণ পেশীর ( Smooth muscles )** তন্তুগুলিতে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে অর্থাৎ একটি তন্তু একটি কোষের দ্বারা গঠিত এবং ইহাতে ডোরা কাটা থাকে না। এই শ্রেণীর পেশী অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সংকুচিত হইতেও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। মসৃণ তন্তুতে গঠিত পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীসমূহের একবার সংকোচন হইতে কয়েক সেকেশুে সময় লাগে।

**পেশীর কাজ :** পেশীর প্রধান কাজ আমাদের দেহে গতি সঞ্চার করা। হাঁটা, দৌড়ান, লেখা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজে দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পেশীসমূহই দেহের ঐ সকল অংশকে সচলতা প্রদান করে। দেহের কোন অঙ্গই পেশীর সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ করিতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা এইজন্ত অস্থিকে পেশীদ্বারা সচলতা-প্রাপ্ত কপি-কল বলিয়া মনে করিতেন। পেশীগুলি কপিকলের বজ্রের জ্বায় কাজ করিয়া থাকে। পেশীসমূহ সাধারণতঃ খুব শক্ত সাদা ফিতার জ্বায় কণ্ডোরার (tendon) মাধ্যমে অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত এই কণ্ডোরার সাহায্যে নিকটস্থ স্থি-গ্রস্থির (joint) সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। যখন পেশীতে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় তখন পেশীটি সংকুচিত হইয়া ঐ পেশী-সংলগ্ন অস্থিকে সচল করিয়া তোলে। উত্তেজনার ফলে যে পেশীর সংকোচন ঘটে তাহা ব্যাঙের দেহ হইতে একটি পেশী কাটিয়া লইয়া সহজেই প্রমাণ করা যায়। ঐ কাটা পেশীকে পিনের দ্বারা খোঁচা দিলে, উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা স্পর্শ করিলে, তড়িৎস্পৃষ্ট করিলে বা উহার উপর একটু লবণ রাখিলে পেশীটির সংকোচন ঘটিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যান্ত্রিক, তাপোদ্বীপক, বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় পেশীর সংকোচন ঘটে। তবে জীবন্ত দেহে পেশীর স্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটে স্নায়ুতাড়না হইতে (Nerve impulses) ; অর্থাৎ স্নায়ুদ্বারা পেশী উত্তেজিত হইয়া সংকুচিত হয়, ফলে পেশীসংলগ্ন অঙ্গে গতি সৃষ্টি হয়। আমাদের বাহ্যর ওঠা-নামা দ্বারা পেশীর ক্রিয়া সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমাদের বাহ্যর প্রগণ্ডাস্থির (Humerus) সম্মুখভাগে একখানি বড় পেশী আছে। ইহাকে বাইসেপ্‌স্ (Biceps) বলে। এই পেশীর এক প্রান্ত দুইটি কণ্ডোরার সাহায্যে ঘাড়ের অঙ্গফলকের (Scapula) সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত। অপর প্রান্ত অল্প একটি কণ্ডোরার সাহায্যে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির (Radius) সহিত আবদ্ধ আছে। বাইসেপ্‌স্ পেশীটি যখন স্নায়ু দ্বারা উত্তেজিত হয় তখন উহা সংকুচিত হয়। ফলে বাহ্য কহুইতে ঝাঁকিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থিসহ হাতের সম্মুখের প্রান্ত উপরে উঠিয়া আসে। এইরূপে বাইসেপ্‌স্ পেশীর সংকোচনের ফলে আমরা হাত ঝাঁকাইতে পারি। তবে একটি কথা মনে রাখা ভাল যে আমাদের বাহ্যতে অসংখ্য পেশী আছে এবং বাইসেপ্‌সের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল পেশীও কম বেশী সংকুচিত হইয়া বাহ্য ঝাঁকাইতে সাহায্য করে। বাহ্যকে যখন ভিতরের বা বাইরের দিকে ঘুরান হয় তখন বাইসেপ্‌স্ অপেক্ষা অল্পাংশ পেশীর সংকোচনেই তাহা প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে। বাইসেপ্‌স্ পেশী বাহ্যকে ঝাঁকাইতে পারিলেও



ইহা বাহকে সোজা করিয়া পূর্বাবস্থায় আনিতে পারে না। বাহকে সোজা করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে অপর একটি পেশীর প্রয়োজন। প্রগণ্ডাস্থির পিছনের দিকে এইরূপ একটি পেশী আছে। ইহাকে ট্রাইসেপ্‌স্ (triceps) পেশী বলে। এই পেশীটি সংকুচিত হইলে বাহুটি সোজা হইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। স্ততরাং বাইসেপ্‌স্ ও ট্রাইসেপ্‌স্ পেশীর ক্রিয়া বিপরীতমুখী। প্রথমটা বাহকে বাঁকায় এবং দ্বিতীয়টি উহাকে সোজা করে। এইরূপ বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল পেশীকে Antagonistic muscles বলে। দেহের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল পেশীর জোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মুখ খোলা এবং বন্ধ করা, পা সম্মুখে ও পিছনে বাঁকান ইত্যাদি কাজে এই প্রকার পেশী-জোড়াই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই পেশী-জোড়া একত্রে সংকুচিত হইলে দেহের ঐ অংশ একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় অচল হইয়া থাকিবে। বাইসেপ্‌স্ ও ট্রাইসেপ্‌স্ পেশী এক যোগে সংকুচিত করিয়া আমরা আমাদের বাহকে যে কোন অবস্থায় বাঁকাইয়া রাখিতে পারি।

পেশীর অপর একটি কাজ হইল দেহে তাপ উৎপন্ন করা। আমাদের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮°৬' ফাঃ। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই এবং সকল প্রাকৃতিক অবস্থায়ই স্বস্থ লোকের দেহের এই উত্তাপ রক্ষিত হয়। স্ততরাং দেহ হইতে অনবরত যে তাপ চারিপাশে বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা পূরণ করিয়া দেহের উত্তাপ বজায় রাখিতে হইলে দেহের মধ্যে অনবরত তাপ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পেশীসমূহই এই তাপ উৎপাদন করিয়া দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে খাণ্ড-দ্রব্য হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাণ্ড-দ্রব্যের মধ্যে যে শক্তি (energy) থাকে তাহাকে রাসায়নিক শক্তি (Chemical energy) বলে। পেশীর সংকোচনের সময় খাণ্ডের এই রাসায়নিক শক্তি কিছুটা যান্ত্রিক শক্তিতে (Mechanical energy) পরিণত হইয়া পেশী সংকোচনে সহায়তা করে। রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইবার সময় অবশুশ্চাবীরূপে কিছুটা তাপ (Heat energy) উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক শক্তির কেবলমাত্র শতকরা ২০/৩০ ভাগ যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। অবশিষ্ট ৭০/৮০ ভাগ তাপে পরিণত হয়। স্ততরাং দেখা যাইতেছে পেশীর ক্রিয়ার বা সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপই দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে।

পেশী-সংলগ্ন স্নায়ু উত্তেজিত হইলেই পেশী সংকুচিত হইয়া কাজ করিয়া থাকে। মানবদেহের কার্যকলাপ গুরুমস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের কর্টেক্স দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্টেক্সের ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহে পরিবর্তন

ঘটিলে পেশীর কার্যেরও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোন লোকের মেজাজ খারাপ থাকিলে বা মন অবসাদগ্রস্ত, বা চিন্তাক্রান্ত থাকিলে তাহার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না এবং পেশীর কর্মতৎপরতা কমিয়া যায়। অপর পক্ষে কোন লোক প্রফুল্ল থাকিলে তাহার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সে উৎসাহে কাজ করিয়া থাকে। কোন একটি পেশীকে বিশ্রাম না দিয়া অনবরত সংকুচিত করিতে থাকিলে ইহা সহজেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং ইহাতে কার্যক্ষমতা কমিয়া যাইবে। বাছ উচু করিয়া ও বাড়াইয়া সামান্য ওজনের জিনিসও হাতে ধরিয়া রাখা খুবই কষ্টকর, কারণ এই অবস্থায় বাছের পেশীসমূহ অনবরত সংকুচিত অবস্থায় থাকে, বিশ্রাম পাইবার সুযোগ পায় না। ফলে পেশীসমূহ শীঘ্রই ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পেশীকে সংকোচনের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম দিলে উহার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; কারণ ঐ বিশ্রামের ফাঁকে সে তাহার ক্লান্তি দূর করিয়া পূর্বশক্তি ফিরিয়া পায়। যে পেশী যত বেশী কাজ করে সে তত বেশী পুরু, শক্তিশালী ও আকারে বড় হয়। পেশীগুলি বেশী কাজ করিলে তাহাদের অঙ্গিভেদ ও খাণ্ডের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পেশী সঞ্চালনের ফলে যে শুধু পেশীগুলিই শক্তিশালী হয় তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে খাস ও রক্ত বহনের যন্ত্রগুলিকেও সবল ও সতেজ করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া পেশীর উত্তমপূর্ণ কার্যকলাপে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়; দেহে সতেজ অমৃভূতি জাগে ও মেজাজ ভাল থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে শারীরিক পরিশ্রম, খেলাধুলা, দৌড়, ব্যায়াম, সাঁতার ইত্যাদি অস্থি, পেশীতন্ত্র তথা সমগ্র দেহকে শক্তিশালী ও সতেজ করিয়া তুলিতে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

**অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর বিভাগ :** দেহের সচলতা সৃষ্টির অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

**মস্তকের পেশী :** চিবাইবার এবং মুখের ভাব সৃষ্টিকারী পেশীসমূহের দ্বারা মস্তকের পেশীসমূহ গঠিত। চিবানোর পেশীগুলি সংকুচিত হইলে নীচের চোয়ালটি সচল হয়। মুখের ভাবসৃষ্টিকারী পেশীগুলির এক বা উভয় প্রান্ত অকের সহিত সংযুক্ত। এই সকল পেশী সংকুচিত হইলে অকের বিভিন্ন অংশ এক স্থান হইতে অল্পস্থানে সরিয়া গিয়া মুখে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। চোখের পেশীগুলি সংকুচিত হইলে চোখের পাতা দুইটি বন্ধ হইয়া যায়।

**দেহকাণ্ডের পেশী :** বক্ষ, পাকস্থলী এবং পৃষ্ঠদেশের পেশী লইয়া দেহকাণ্ডের পেশীসমূহ গঠিত। বক্ষদেশের পেশীর সংকোচনে বক্ষ উঠা-নামা:

করিয়া শ্বাসকার্যের সহায়তা করে। কশেরুকার উদগত অংশগুলি পৃষ্ঠদেশের দিকে অবস্থিত। এই সকল উদগত অংশের সহিত পৃষ্ঠদেশের পেশীসমূহ বিভক্ত থাকে। পৃষ্ঠদেশে বিভিন্ন প্রকারের পেশী আছে। ইহাদের মধ্যে কতগুলি পেশী মেরুদণ্ডকে পিছনের দিকে এবং ভাইনে বায়ে বাঁকাইতে সাহায্য করে। আবার কতগুলি পেশীর সাহায্যে মেরুদণ্ডটিকে সোজা করা যায়। কতগুলি পেশীর একপ্রান্ত মেরুদণ্ডের সহিত এবং অপর প্রান্ত বক্ষ-পঞ্জরের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল পেশীর সংকোচনে বক্ষের সচলতা সৃষ্টি হয়। পাকস্থলীর পেশীসমূহই প্রধানতঃ মেরুদণ্ডকে সম্মুখের দিকে বাঁকাইয়া থাকে। পাকস্থলীর মধ্যরেখা বরাবর একটি কস্তেরা জাতীয় শক্ত ফিতা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। এই ফিতার ভাইনে ও বায়ে ঋজু ওদরিক পেশী (Erect abdominal muscles) অবস্থিত। ইহাদের একপ্রান্ত বক্ষের সহিত এবং অপর প্রান্ত শ্রোণিচক্রের সংযোগস্থলে সংযুক্ত। এই পেশীর উভয় পার্শ্বে আবার পাকস্থলীর বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ তির্যক পেশী দুইটি (Outer and inner oblique muscles of the stomach) অবস্থিত। এই তির্যক পেশী দুইটি একসঙ্গে সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু কোন একটি পেশী একক ভাবে সংকুচিত হইলে দেহ পার্শ্বের দিকে ঘুরিয়া যায়।

**স্কন্ধের পেশী :** স্কন্ধের পেশীসমূহ মস্তককে সামনে পিছনে এবং পাশে নত করিতে সাহায্য করে। কোন কোন পেশী আবার নীচের চোয়ালকে টানিয়া নীচের দিকে নামায়। স্টারনোক্লিডোমাস্টয়েড (Sternocleidomastoid) এবং স্কন্ধের অন্তান্ত পেশীগুলি একযোগে বক্ষকে টানিয়া তুলিতে পারে। হায়ড (Hyoid) নামক একটি অস্থি জিহ্বা ও স্বরযন্ত্রের (Larynx) সহিত যুক্ত আছে। স্কন্ধের পেশীগুলি এই হায়ড অস্থির সচলতা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। হায়ড অস্থির সচলতায় জিহ্বা নড়াচড়া করিতে পারে।

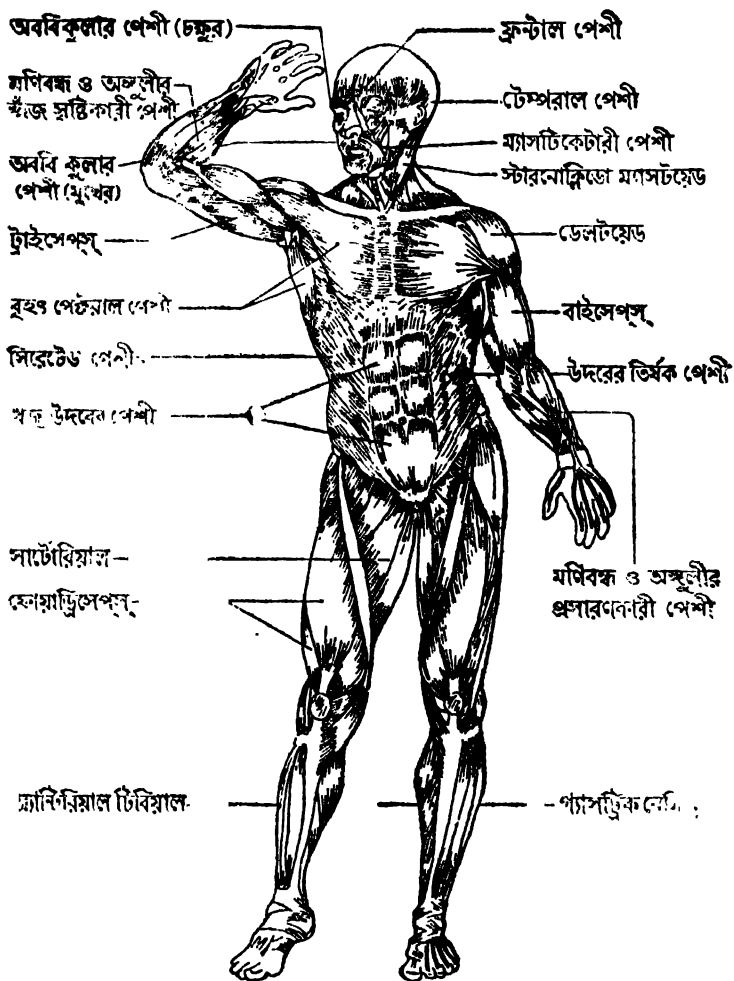
**প্রান্তীয় পেশী :** হাত-পা ও শ্রোণিচক্রের পেশীগুলি লইয়া প্রান্তীয় পেশী সমূহ গঠিত। এই পেশীগুলির সহায়তায়ই হাত-পা নড়াচড়া করিতে পারে। হাত-পা-কে ভাঁজ করা এবং সোজা করা বা ইহাদের ভাইনে বায়ে ঘুরাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পেশী দেখা যায়। পৃষ্ঠ এবং বক্ষের কয়েকটি পেশীও (যেমন, বক্ষের পেকটোরাল পেশী) হাত-পায়ের সচলতা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

নিম্নে অস্থি-সংলগ্ন পেশীসমূহের নাম, অবস্থান ও কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

**মানবদেহের সম্মুখ ভাগের পেশীসমূহ :**

(১) **ফ্রন্টাল পেশী :** এই পেশীটি ললাটে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ সৃষ্টি করে।

- (২) **চক্ষুর অববিকুলার পেশী** : এই পেশীর সাহায্যে চক্ষুর পাতা দুইটি বন্ধ করা যায়। (৩) **টেম্পরাল পেশী** : মাথা ঘুরাইতে সাহায্য করে। (৪) **মুখের অববিকুলার পেশী** : এই পেশীর সংকোচনে মুখবিবর বন্ধ হয়। (৫) **ম্যাসটিকেটোরী পেশী** : খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে এই পেশীটি অন্যতম



### মানবদেহের সম্মুখভাগের পেশী সমূহ

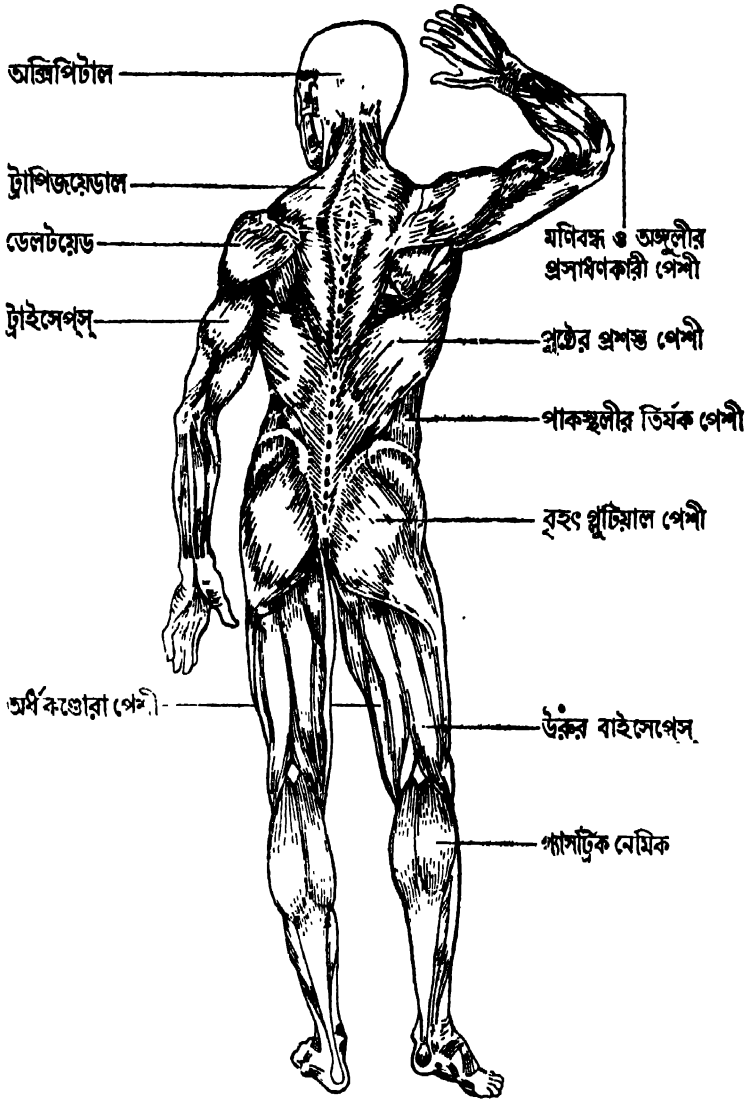
পেশীর সহিত সহযোগিতা করে। (৬) **স্টারনোক্লিডো ম্যাসটয়েড** : দুই পাশের দুইটি পেশী একযোগে সংকুচিত হইয়া মস্তককে সামনের দিকে অবনমিত করে। এক পাশের একটি পেশী সংকুচিত হইলে মস্তকটি সংকোচনের দিকে নত হয়। (৭) **বৃহৎ পেটেক্যাল পেশী** : এই পেশীর

সংকোচনে বাহু সম্মুখের দিকে আগাইয়া যায় এবং উত্তোলিত বাহু নীচের দিকে নামিয়া আসে। বাহু স্থির থাকিলে ইহার সাহায্যে বন্ধ উত্তোলিত হয়।

(৮) **সিরেটেড পেশী** : গভীর প্রস্রাবের সময় এই পেশীর সংকোচনে বন্ধ উত্তোলিত হয়। (৯) **কজু উদরের পেশী** : ইহা সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে অবনমিত হয়। (১০) **উদরের তির্যক পেশী** : ইহা দেহকাণ্ডকে সম্মুখে ও পার্শ্বের দিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে। (১১) **কোর্মা-ড্রিসেপ্‌স্** : ইহার সাহায্যে উরু সম্প্রসারণ করা হয়। (১২) **সার্ভো-রিয়াল পেশী** : ইহা পদদ্বয়কে হাঁটুতে ভাঁজ করে এবং ভিতরের দিকে ঘুরায়। (১৩) **গ্যাস্ট্রিক-নেমিক্ পেশী** : ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা নীচু করিয়া এবং গোড়ালি উঁচু করিয়া রাখা যায় অর্থাৎ ইহার সাহায্যে পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়। (১৪) **অ্যান্টিরিয়াল টিবিয়াল** : ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা সোজা করা যায়। (১৫) **ডেলটয়েড পেশী** : এই পেশীর সাহায্যে বাহু উত্তোলন করা হয়। (১৬) **ট্রাইসেপ্‌স্ পেশী** : ইহার সাহায্যে গুটানো বাহুকে সোজা করা যায়। (১৭) **বাইসেপ্‌স্ পেশী** : ইহার সাহায্যে সোজা বাহুকে গুটানো যায়। (১৮) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাঁজ সৃষ্টিকারী পেশীসমূহ**। (১৯) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী পেশীসমূহ**।

**মানবদেহের পিছন দিকের পেশীসমূহ** : (১) **অস্পিনেটাল পেশী** : মাথা ঘুরাইতে সাহায্য করে। (২) **ট্র্যাপিজয়েড পেশী** : অঙ্গুল্যককে মেরুদণ্ডের দিকে আকর্ষণ করে। (৩) **ডেলটয়েড পেশী** : বাহুকে উত্তোলিত করে। (৪) **ট্রাইসেপ্‌স্ পেশী** : গুটানো বাহুকে সোজা করে। (৫) **পৃষ্ঠের প্রশস্ত পেশী** : বাহুকে ভিতর ও পিছনের দিকে ঘুরায়। (৬) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী পেশী**। (৭) **মণিবন্ধ ও অঙ্গুলীর ভাঁজসৃষ্টিকারী পেশী**। (৮) **পাকস্থলীর তির্যক পেশী** : ইহার সাহায্যে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে অবনমিত হয় ও একদিকে ঘোরে। (৯) **বৃহৎ গ্লুটিয়াল পেশী** : ইহার সাহায্যে উরু বাহিরের দিকে ঘোরে। (১০) **অধরকণ্ঠের পেশী** : ইহার সাহায্যে হাঁটু সোজা করা যায় এবং হাঁটুতে ভাঁজ সৃষ্টি করা যায়। পদদ্বয়কে ভিতরের দিকে ঘুরাইতেও ইহা সাহায্য করে। (১১) **উরুর বাইসেপ্‌স্** :

ইহার সাহায্যে হাঁটু ভাঁজ করা যায়। (১২) গ্যাসট্রিকনেমিক



মানবদেহের পিছনদিকের পেশী সমূহ

ইহার সাহায্যে পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়।

## রক্তসংবহন তন্ত্র

### ( Circulatory System )

আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং ঐ সকল কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দূষিত এবং অসার পদার্থ ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদিতে পরিবহন করিয়া দেহ হইতে অপসারণে সাহায্য করাই এই তন্ত্রের প্রধান কাজ। ট্রেন, স্ট্রীমার ইত্যাদির সাহায্যে যেমন দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্য-দ্রব্য ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়, তেমনি দেহের মধ্যে এই রক্ত-বহন তন্ত্র ট্রেন, স্ট্রীমারের মত দেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করিয়া থাকে। এই তন্ত্রের প্রধান প্রধান কার্য :

(১) অন্ত্র ( Intestine ) এবং যকৃত হইতে ইহার সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্য বিভিন্ন কোষে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

(২) ফুসফুস হইতে অক্সিজেন এই তন্ত্রের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন কোষে যায় এবং কোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসে ফিরিয়া আসে।

(৩) নাইট্রোজেন-ঘটিত দূষিত পদার্থ ( ইউরিয়া ইত্যাদি ) এই তন্ত্রের সাহায্যে বৃক্কে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

(৪) দেহের তাপমাত্রিকারী অঙ্গের সহিত যথা, মাংসপেশী ( muscles ), এবং তাপ অপসারণকারী অঙ্গ যথা, ত্বক্ ও ফুসফুসের সংযোগসাধন করিয়া এই তন্ত্র দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(৫) ইহার সাহায্যে হরমোন নামক দেহের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

(৬) এই সংবহন তন্ত্র আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা করে।

(৭) দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যাহাতে অধিক রক্তপাতে আমাদের কোন ক্ষতি না হয় সেইজন্য এই সংবহন তন্ত্রের সাহায্যেই ঐ ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে ইহা আমাদের দেহকে অধিক রক্তপাতের হাত হইতে রক্ষা করে।

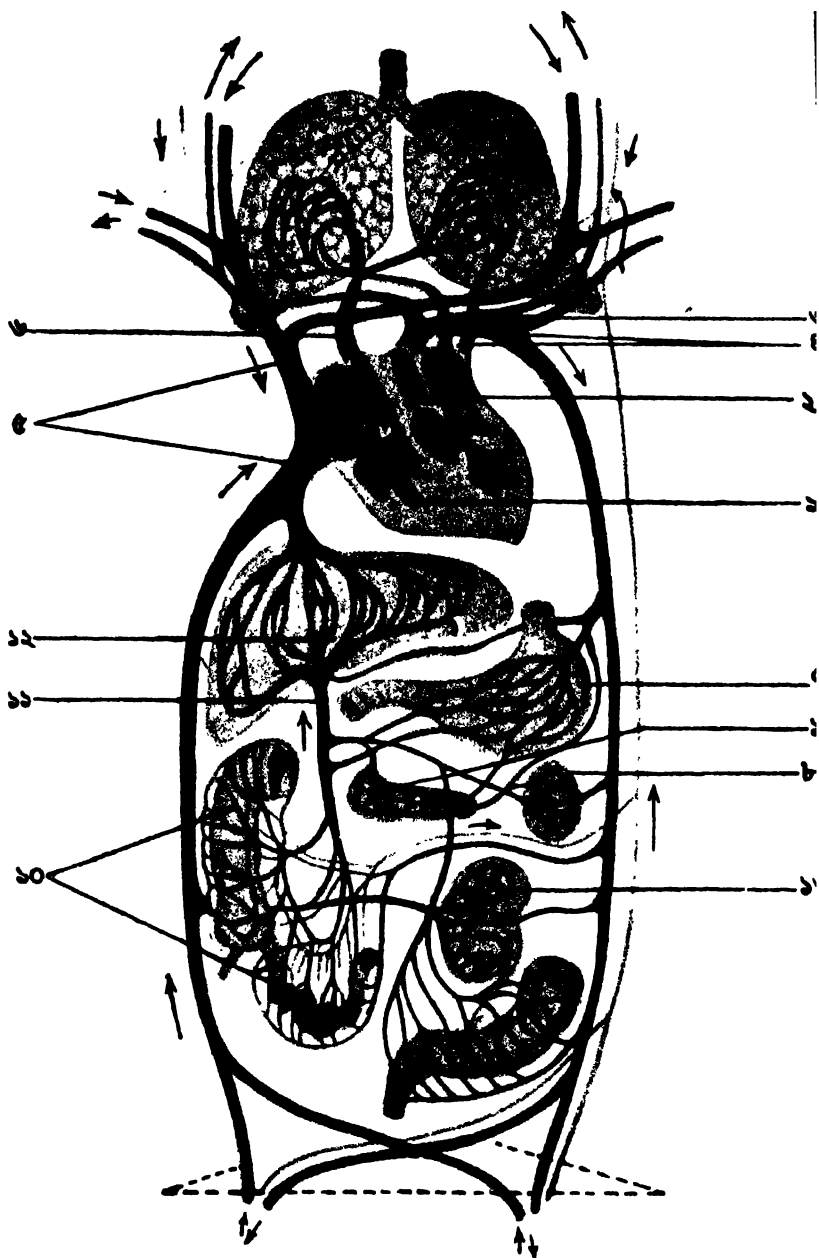
আমাদের **হৃৎপিণ্ডটি** ( Heart ) এই সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ইহা ছাড়া **রক্ত** ( Blood ) নামক একটি লাল ওরল পদার্থ এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই তরলে দ্রবীভূত করিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া

বাওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডটি একটি পাম্পের জায় এই রক্তকে বিভিন্ন স্থানে পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ধমনী ( Arteries ), শিরার ( Veins ) এবং জালকশ্রেণী ( Capillaries ) নামক কতগুলি পাইপ লাইনও এই সংবহন তন্ত্রের অঙ্গ। এই পাইপ লাইনগুলির মধ্য দিয়াই রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্থান হইতে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের দূষিত পদার্থসমূহ প্রধানতঃ শিরার সাহায্যে পরিবাহিত হইলেও সমস্ত দূষিত পদার্থই এই শিরার দ্বারা পরিবাহিত হয় না। দূষিত পদার্থের কিছু অংশ অল্প এক প্রকার পাইপ লাইনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি প্রধান শিরায় গিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকার পাইপ লাইনের নাম লসিকামালী ( Lymphatics )। ইহাও রক্ত সংবহন তন্ত্রের অন্তর্গত।

**রক্ত (Blood) :** একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ কোয়ার্ট (Quarts) রক্ত থাকে। খালি চোখে রক্ত সমসত্ত্ব (Homogeneous) বলিয়া মনে হইলেও আসলে ইহা অসমসত্ত্ব (Heterogeneous)। বাতাসের সংস্পর্শে রক্ত সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায়। কিন্তু রক্তের সহিত কিছুটা অক্সিজেনের জলীয় দ্রবণ মিশাইলে উহা আর জমাট বাঁধে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে জলের মত একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পাত্রে নীচে কতগুলি কণিকা থিতাইয়া পড়িতে দেখা যায়। উপরের এই তরল পদার্থটিকে রক্ত রস ( Plasma ) বলে। দেহে যতটা রক্ত আছে তাহার মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী এই রক্তরস, বাকী অংশ ঐ কণিকাসমূহ। কণিকাগুলি আবার তিন প্রকারের—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকা। স্নুডরাং রক্ত লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, অণুচক্রিকা এবং রক্তরস এই চারিটি উপাদানে গঠিত।

**শ্রেণীবিভাগ :** কোন কারণে আমাদের শরীরে রক্তের অভাব হইলে আমরা অল্প লোকের শরীর হইতে রক্ত গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু যে-কোন লোকের রক্তই অল্প যে-কোন লোকের দেহে দেওয়া যায় না। কারণ সকল মানুষের রক্ত একই রকম নয়। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে এক জাতীয় জন্তুর লোহিত কণিকা অপর জাতীয় জন্তুর রক্তমস্ত বা সিরামের ( Serum ) সংস্পর্শে আসিলে পিণ্ডিত দোষ ( Agglutination ) ঘটে। অর্থাৎ লোহিত কণিকাগুলি একত্রে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহা রক্তের জমাট বাঁধা ( coagulation ) নহে। খানিকটা তাজা রক্ত একটি পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখিবে যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে ( coagulation )। রক্তের লাল জমাট অংশটুকু ছাড়া ইহাতে ঈষৎ হরিদ্রাভ একটি তরল পদার্থ দেখিতে পাইবে।





রক্ত ও লসিকা সংবহনের চিত্র

লাল রং—ধমনী বাহিত রক্ত। নীল রং—শিরা। বেগুনি রং—পোর্টাল বা যকৃতের শিরা। পীত রং—লসিকা নালী।

১। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্ধ ২। হৃৎপিণ্ডের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালমনারি শিরা  
৫। উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা ৬। পালমনারি ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। মূত্রাশয় ৯। অগ্ন্যাশয়  
১০। অস্ত্র ১১। পোর্টাল শিরা ১২। যকৃত ১৩। কুষ্ঠ



এই তরল পদার্থটিকে রক্তমস্ত (Serum) বলে। রক্তের লোহিত কণিকায় একপ্রকার পদার্থ (Agglutinin) থাকে যাহা অল্প প্রাণীর রক্তমস্তের সংস্পর্শে জমিয়া যায়। এই পদার্থটি A এবং B দুই প্রকারের হইতে পারে। রক্তমস্তের মধ্যেও অল্প একপ্রকার পদার্থ (Agglutinin) থাকে যাহা লোহিত কণিকার A এবং B কে জমাইতে পারে। ইহাও  $\alpha$  (আলফা) এবং  $\beta$  (বিটা) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং রক্তের উপর রক্তমস্তের  $\alpha$  এবং  $\beta$  এই দুই প্রকার উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া রক্তকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

- (১) O গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তের  $\alpha$  অথবা  $\beta$  উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে না (not agglutinated)।
- (২) A গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তের  $\alpha$  উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে।
- (৩) B গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তের  $\beta$  উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে।
- (৪) AB গ্রুপ রক্ত—যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমস্তের  $\alpha$  এবং  $\beta$  উভয় উপাদানের দ্বারা জমাট বাঁধে।

আবার রক্তে এই সকল উপাদানের উপস্থিতির প্রকারভেদে চারি প্রকারের দাতা এবং চারি প্রকারের গ্রহীতা হইতে পারে।

- (১) প্রথম শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A এবং B আছে কিন্তু রক্তমস্তে  $\alpha$  এবং  $\beta$  নাই।
- (২) দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A আছে এবং রক্তমস্তে  $\beta$  আছে।
- (৩) তৃতীয় শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় B এবং রক্তমস্তে  $\alpha$  আছে।
- (৪) চতুর্থ শ্রেণী—যাহাদের লোহিত কণিকায় A এবং B নাই, কিন্তু রক্তমস্তে  $\alpha$  এবং  $\beta$  আছে।

প্রথম শ্রেণীর লোক সকলের রক্তই গ্রহণ করিতে পারে (Universal recipient) এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোক অল্প সকলকেই রক্ত দিতে পারে (Universal donor)। দ্বিতীয় শ্রেণীর রক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রাহকের উপযুক্ত এবং গ্রহীতা হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর রক্ত তৃতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণীর লোক গ্রহণ করিতে পারে এবং গ্রহীতা হিসাবে তৃতীয়

শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া এই চারিটি শ্রেণীর রক্ত নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান করিতে পারে। যেমন, কোন চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত অগ্নি যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারে বা চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহক একজন অগ্নি যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে।

**কাজ :** রক্ত একটি মুহু স্কার জাতীয় তরল। দেহের মধ্যে ইহা বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। রক্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজসমূহ সমস্তই রক্তের দ্বারা সাধিত হয়। ( রক্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজ দেখ )

**রক্তরস ( Plasma ) :** ইহা দেখিতে জলের মত স্বচ্ছ এবং কিছুটা ঘন। রক্তরসের শতকরা ৯০ ভাগই জল এবং অবশিষ্ট দশ ভাগ কঠিন পদার্থ। কঠিন দ্রব্যাদির মধ্যে অ্যালবুমিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রোটিন রক্তের চাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণও ( যথা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট, ফসফেট ইত্যাদি ) ইহাতে দ্রবীভূত থাকে। প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ ইত্যাদি খাওয়ার মার অংশ এবং ফুসফুস হইতে গৃহীত অক্সিজেন গ্যাস এই রক্তরসেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া রক্তরসে হরমোন নামক কতকগুলি এনজাইম এবং নানাবিধ রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ দেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় ফুসফুসে বাহিত হয়।

**লোহিত কণিকা ( Red Corpuscle or Erythrocytes ) :** রক্তের বিভিন্ন প্রকার কণিকার মধ্যে এই লোহিত কণিকার আধিক্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। দেখিতে গোল গোল চাকার মতো এবং এত ছোট যে ৩৫০০ লোহিত কণিকা এক নাইনে সাজাইয়া রাখিলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জোড়ে। এই সকল কণিকার কোষে কিছু নিউক্লিয়াস নাই। খালি চোখে ইহাদের দেখা যায় না। এক বিন্দু রক্তে (One cubic millimeter) প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা যায়। রক্তের লাল রঙটি এই লোহিত কণিকার জন্তই। লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহযুক্ত একপ্রকার লাল পদার্থের জন্তই লোহিত কণিকার বর্ণ লাল। অস্থি-মজ্জায় ( Bone-marrow ) এই সকল কণিকা সৃষ্টি হইয়া থাকে। রক্তের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন পর্যন্ত এক একটি কণিকা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় ইহা ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছাইয়া দেয়। কোষ হইতে ফুসফুসে ফিরিয়া যাইবার

সময় আবার কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছুটা লইয়া ফুসফুসে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিবহন করাই এই কণিকার প্রধান কাজ। এইরূপে কাজ করিবার ফলে প্রায় ১২০ দিন পরে এই কণিকাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন স্প্লিন ( spleen ) এই ক্ষয়প্রাপ্ত রক্ত কণিকাগুলি রক্ত হইতে অপসারিত করে। প্রতি সেকেন্ডে আমাদের দেহ হইতে এইরূপে প্রায় দশ লক্ষ লোহিত কণিকা অপসারিত হইতেছে এবং উহাদের স্থান আবার নূতন কণিকাদ্বারা পূরণ করা হইতেছে।

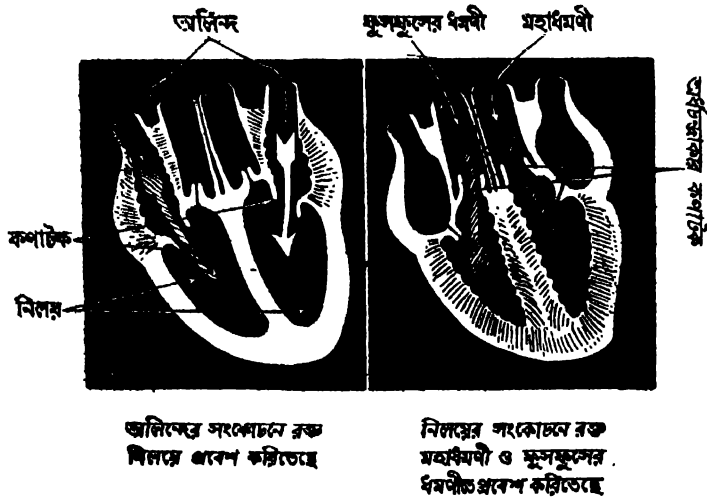
**শ্বেতকণিকা (white corpuscle) :** লোহিত কণিকার তুলনায় ইহারা আকারে অনেকটা বড় এবং সংখ্যায়ও অনেক কম। নিউক্লিয়াস এবং আকারের তারতম্য হেতু ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৮০০০ শ্বেতকণিকা থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রক্তে ইহার সংখ্যা কিছু কম থাকে। বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে লিউকোসাইট ( Leucocytes ) এবং লিম্ফোসাইট ( Lymphocytes ) এই দুই প্রকার কণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিউকোসাইট শ্বেতকণিকা অস্থি-মজ্জায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। লিম্ফোসাইটের জন্মস্থান ভিন্ন। ইহারা লিম্ফানোড ( Lymph nodes ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতকণিকা আমাদের দেহের মধ্যে পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া থাকে। হাওয়া, মাটি, জল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিতে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। এই সকল জীবাণু যদি কোন প্রকারে আমাদের রক্তে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বেতকণিকা ঐ সকল জীবাণু ধরিয়া উহাদের মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। যুদ্ধশেষে শ্বেতকণিকার জয় হইলে আমরা স্বস্থ থাকি এবং অপর পক্ষের জয় হইলে জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। দেহের কোন কাটা অংশ পাকিয়া গেলে উহাতে পুঁজ ( Pus ) জমা হইতে দেখিয়া থাকিবে। জীবাণু এবং শ্বেতকণিকার মধ্যে যুদ্ধে মৃত জীবাণু, শ্বেতকণিকা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ-কোষ কলা রসের ( Tissue fluid ) সহিত একত্রিত হইয়া এই পুঁজের সৃষ্টি করে। স্তব্ধতা দেহকে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা করাই শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া শ্বেতকণিকা মাঝে মাঝে নষ্ট কলা পুনর্গঠনে ( Tissue repair ) এবং রক্ত জমাট বাধিতেও সাহায্য করে। কিছুদিন কাজ করিবার ফলে যখন শ্বেতকণিকাগুলির কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় তখন সেই ক্ষয়িষ্ণু শ্বেতকণিকা স্প্লিন এবং যকৃতের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

**অনুচক্রিকা ( Platelets ) :** এইগুলি আকারে অতি ছোট এবং রক্তের

মধ্যে অনেকগুলি একত্রিত হইয়া গুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে। প্রতি ঘন মিলি-মিটার রক্তে প্রায় ২,৫০,০০০ অম্লচক্রিকা দেখা যায়। অস্থির লোহিত মজ্জা এবং প্লীহার মধ্যে এই সকল কণিকা সৃষ্টি হইয়া থাকে। রক্ত জমাট (Blood clotting) বাধিবার জন্য এই অম্লচক্রিকার প্রয়োজন হয়। রক্ত স্থানে ইহারা শ্বেতকণিকার সহিত একত্রিত হইয়া ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে রক্তরসের প্রোথ্রুদিন নামক উপাদানকে থ্রুদিনে রূপান্তরিত করে। এই থ্রুদিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন হইতে ফাইব্রিন প্রস্তুত করে। ইহার ফলে কণিকাগুলি ঐ ক্ষতস্থানে জড় হইয়া রক্ত জমাট করিয়া ফেলে। ইহারই নাম তঞ্চন প্রক্রিয়া (Coagulation)।

মাঝে মাঝে এই তঞ্চন প্রক্রিয়া রক্তনালীর (Blood vessel) মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কোন কারণে রক্তনালীর গাত্র বিধ্বস্ত হইলে ঐ নালীর মধ্যেই রক্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জমাট বাধিয়া যায়। মস্তিষ্ক, ফুফুস বা হৃৎপিণ্ডের কোন ক্ষুদ্র ধমনীতে এইরূপে রক্তজমাট বাধিলে আমাদের অকস্মাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে এবং এই অবস্থাকেই থ্রম্বোসিস (Thrombosis) বলে।

**হৃৎপিণ্ড (Heart) :** রক্ত-সংবহন তন্ত্রের এইটিই প্রধান অঙ্গ। ইহার কাজ রক্তকে পাম্প করিয়া রক্তনালীর মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছাইয়া



দেওয়া। ইহা দেখিতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই ইঞ্চি পুরু একটি পেশীময় থলির মত। বুকের বাম দিকে বক্ষগহ্বরে এই হৃৎপিণ্ডটি অবস্থিত। অত্যন্ত দেহযন্ত্রের সহিত যাহাতে ইহার কোন রকম

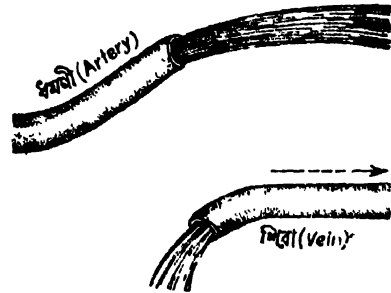
আঘাত না লাগে সেইজন্য ইহা একটি তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। বাহিরের আঘাত এই তরলেই প্রতিহত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এবং ইহার চারিদিকে অবস্থিত এই তরল হৃৎস্বাকলা ( Pericardium ) নামক একটি বিশিষ্ট কুঠুরিতে ( Chamber ) এই বক্ষ-পঙ্খর অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের উপরের দিক অপেক্ষাকৃত চওড়া, তলার দিকে ইহা ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া একটি কোণের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। উপরের চওড়া অংশে দুইটি এবং নীচের সরু অংশে দুইটি মোট চারিটি কক্ষ এই হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়। উপরের কক্ষ দুইটিকে অলিন্দ ( Auricle ) এবং নীচের কক্ষ দুইটিকে নিলয় ( Ventricle ) বলে। ডান পাশের অলিন্দ ডান পাশের নিলয়ের সঙ্গে একটি কপাটকের ( Valve ) দ্বারা যুক্ত। এই কপাটকটি কেবলমাত্র নিলয়ের দিকেই খুলিতে পারে। অর্থাৎ এই কপাটকের সাহায্যে রক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যায় ; নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বাম দিকেও অত্বরূপ একটি কপাটিকা উপরের অলিন্দ এবং নীচের নিলয়ের মধ্যে বর্তমান এবং ইহার সাহায্যে রক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যাইতে পারে। ডানদিকের অলিন্দে এবং নিলয় বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয় হইতে একটি পেশীময় পর্দা দ্বারা লম্বালম্বিভাবে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত। উপরের অলিন্দ দুইটিতে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে শিরার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। নীচের নিলয় দুইটি এই রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছাইয়া দেয়। ডান দিকের অলিন্দে দুইটি মহাশিরা আসিয়া একত্রে মিশিয়াছে। একটি মহাশিরা দেহের উপরাংশ হইতে দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহাকে উপর মহাশিরা ( Superior Venae Cavae ) বলে। অপরটি দেহের নিম্নাংশ হইতে দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহাকে নিম্ন-মহাশিরা ( Inferior Venae Cavae ) বলে। ডান দিকের অলিন্দ হইতে এই দূষিত রক্ত ডান দিকের নিলয়ে গমন করে। এই নিলয় হইতে দূষিত রক্ত ফুসফুস ধমনীর ( Pulmonary artery ) সাহায্যে ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। নিলয় হইতে ফুসফুস ধমনী বাহির হইয়া দুইটি অংশে বিভক্ত হয় এবং এই দুইটি শাখা দক্ষিণ ও বাম ফুসফুস ধমনীরূপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসে চলিয়া যায়। এইখানে রক্ত বিশোধিত হইয়া ফুসফুসের চারিটি শিরার ( Pulmonary Veins ) সাহায্যে বাম অলিন্দে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাম অলিন্দ হইতে এই বিশোধিত রক্ত কপাটক পথে নীচের নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাম নিলয় হইতে মহাধমনী ( Aorta ) বাহির হইয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে দেহের সকল অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাম নিলয় হইতে রক্ত এই

মহাধমনীর সাহায্যে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত হয়। প্রতি হৃদস্পন্দনে প্রায় চার আউন্স রক্ত এই মহাধমনীতে প্রবেশ করে। রক্ত যাহাতে মহাধমনী হইতে ফিরিয়া নিলয়ে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উভয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকার (Semi-lunar) কপাট আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ডান দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে দূষিত রক্ত এবং বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি এক প্রকার বিশিষ্ট মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। এই মাংসপেশী খুব সবল এবং ইহার ক্ষুণ্ণত সংকুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। অলিন্দ অপেক্ষা নিলয়ের গাত্র-প্রাচীর অধিক পুরু।

**ধমনী ও শিরা (Arteries and veins) :** হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ যে পাইপ লাইনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের ধমনী (Arteries) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে এইরূপ দুইটি প্রধান ধমনী বাহির হইয়াছে। ইহাদের একটি ডান দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া ফুসফুসের দিকে গিয়াছে। ইহাকে ফুসফুস ধমনী বলে। অপরটি বাম দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া দেহের অন্যান্য অংশে গমন করিয়াছে। ইহাকেই মহাধমনী বলে। এই দুইটি প্রধান ধমনী প্রথমে কতকগুলি শাখা ধমনীতে এবং প্রত্যেকটি শাখা ধমনী আবার কতকগুলি প্রশাখা ধমনীতে বিভক্ত হইয়া দেহের প্রতিটি অংশে বিস্তৃত হইয়া আছে। প্রতিটি প্রশাখা ধমনী অবশেষে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি জালকে (Capillaries) বিভক্ত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হইয়া অবশেষে এই জালকে আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জালকের মধ্য দিয়াই রক্তের সহিত একদিকে বিভিন্ন দেহকোষের এবং অন্যদিকে ফুসফুসস্থিত বায়ুর সহিত আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে। জালক শ্রেণীর অপর প্রান্ত একত্রিত হইয়া প্রথমে প্রশাখা শিরা (Veinlets) গঠন করে। কয়েকটি প্রশাখা শিরা মিলিত হইয়া একটি শাখা শিরা এবং কতগুলি শাখা শিরা একত্রিত হইয়া একটি মহাশিরা গঠিত হয়। মহাশিরা অবশেষে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া মিলিত হয়। ডান দিকের অলিন্দে এইরূপ দুইটি মহাশিরা (উর্ধ্ব এবং নিম্ন) এবং বাম দিকের অলিন্দে এইরূপ চারিটি মহাশিরা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। শিরা এবং মহাশিরাপথে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে লক্ষ্য করিবে যে উর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা দ্বারা দেহের দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু



ফুসফুস মহাশিরা (Pulmonary Vein) দ্বারা ফুসফুস হইতে নিষ্কৃত রক্ত বাম অনিন্দে প্রবেশ করে। স্বতরাং শিরা-পথে বিস্তৃত এবং দূষিত উভয় প্রকার রক্তই প্রবাহিত হয়। অন্তরূপভাবে মহাপমণীপথে বিস্তৃত রক্ত পরিচালিত হইলেও ফুসফুস ধমনীপথে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়।



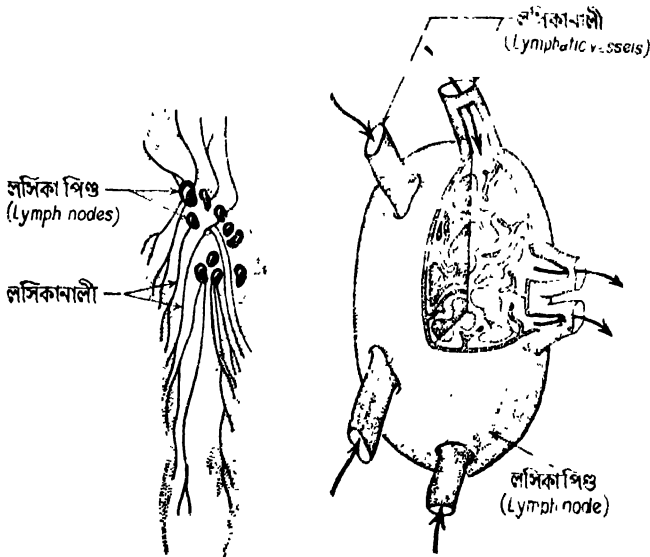
ধমনীর গাত্র-প্রাচীর শিরার গাত্র-

প্রাচীর অপেক্ষা মোটা। ধমনীর (উপরে) ধমনী পথে ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতেছে হৃৎপিণ্ডের ত্রায় স্পন্দিত (Pulse) হইয়া (নীচে) কাটা শিরা হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে রক্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই জগুই ধমনী কাটিয়া গেলে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হয়। কিন্তু শিরার কোন স্পন্দন (Pulse) নাই এবং ইহা রক্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে না। এইজগুই শিরা ছিন্ন হইলে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির না হইয়া রক্ত গড়াইয়া পড়ে। মাংস-পেশীর চাপে রক্ত শিরার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। এক জায়গায় অনেকক্ষণ নিষ্কল ভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে লক্ষ্য করিলে যে পায়ের পাতা একটু ফুলিয়া যায়। কারণ পায়ের মাংসপেশী নিষ্কল থাকায় রক্ত পা হইতে উপরের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। এইজগুই পা তখন ফুলিয়া যায়। রক্ত যাহাতে গড়াইয়া পিছনে যাইতে না পারে এইজগু শিরার মধ্যে কপাটক থাকে। ঐ কপাটকের মধ্য দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে শিরার মধ্য দিয়া উর্নাদিকে প্রবাহিত হইতে পারে না।

**জালক শ্রেণী (Capillaries) :** ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত খাণ্ডের সারাংশ এবং অক্সিজেন বহন করিয়া আনে। এইজগু ধমনীর রক্ত লাল টকটকে। কিন্তু শিরার রক্ত লালচে বেগুনী বর্ণের। কারণ শিরার রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি দেহের আবর্জনা ও অসার পদার্থ থাকে। ধমনীর রক্ত উত্তম অক্সিজেন এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি কলাকোসে (Tissue cells) পৌঁছাইয়া কলা-কোষের কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ করিয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের এই পরিবর্তন যেখানে সাধিত হয় তাহাকেই জালক বলে। জাহাজ যেমন বন্দরে আসিয়া তাহার মালপত্র নামাইয়া আবার নতুন মালপত্রে তাহা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া যায়, তেমনি এই জালক শ্রেণী আমাদের দেহে এক একটি বন্দরের মত। রক্ত এইখানে তাহার অক্সিজেন ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান ত্যাগ করিয়া আবার

কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নূতন প্রকার উপাদানে উহা পূর্ণ করিয়া অল্প পথে ফিরিয়া যায়। জালকের এক প্রান্ত ধমনীর সহিত এবং অপর প্রান্ত শিরার সহিত যুক্ত। জালকগুলি কলাকোষের চারিদিকে উহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে। এইজন্যই কলাকোষ এবং জালকের মধ্যে আদান-প্রদান সহজেই হইতে পারে। এক একটি জালক অতি ক্ষুদ্র। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিলিমিটার এবং ব্যাস প্রায় ০.০১ মিলিমিটার। আমাদের দেহের সমস্ত জালকগুলি যদি পর পর একটির সহিত অল্প একটি জোড়া দেওয়া হয় তবে প্রায় ৬২,০০০ মাইল দীর্ঘ একটি জালক প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং আমাদের দেহে জালক শ্রেণী কত ঘনভাবে সম্বিবদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের মাংসপেশীর (skeletal muscle) এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ১৫,৬২,৫০০টি জালক বর্তমান। জালকের গাত্র-প্রাচীর খুব পাতলা (Thin), এত পাতলা যে উহার মধ্যদিয়া খাণ্ডদ্রব্যের সারাংশ, অক্সিজেন, কিছু কিছু প্রোটিন, ধাতব লবণ, জল এমন কি শ্বেত কণিকাও বাহির হইয়া যাইতে পারে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় লোহিত কণিকা (Red corpuscle) ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। জালক এবং কলাকোষের (Tissue cells) মধ্যে খাণ্ডদ্রব্য এবং অসার পদার্থের আদান-প্রদান কিন্তু একেবারে সরাসরি ঘটে না। কলাকোষগুলি একেবারে নিরেট নয়। উহাদের মধ্যে অল্প অল্প ফাঁক (Tissue spaces) থাকে। এই ফাঁকগুলি একপ্রকার তরলে পূর্ণ থাকে। এই তরলকে কলারস (Tissue fluid) বলে। প্রকৃত পক্ষে কলাকোষগুলি এই কলারসেই নিমজ্জমান থাকে। জালক শ্রেণী কলাকোষের একেবারে গা ঘেষিয়া না থাকিয়া এই কলারসেব মধ্যেই বিস্তৃত থাকে। রক্তের চাপে জালক শ্রেণীর গাত্র-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল, ধাতব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলাকোষের মধ্যে অবস্থিত থালি জায়গায় (Tissue spaces) সংগৃহীত হয়। এইরূপে রক্ত হইতেই কলারসের সৃষ্টি হয়। কলাকোষগুলি কলারসে নিমজ্জিত বলিয়া কোষ-প্রাচীরের (cell wall) মধ্য দিয়া কলারসের অক্সিজেন, গ্লুকোজ ইত্যাদি খাণ্ডদ্রব্য সহজেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবর্জনা এবং অসার পদার্থ কোষ হইতে কলারসে বাহির হইয়া আসে। এখন জালকের যে প্রান্ত শিরার সঙ্গে যুক্ত সেই প্রান্ত কলারস হইতে কিছু কিছু জল, ধাতব লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবার শোষণ করিয়া শিরার মধ্যে পরিচালিত করে। এইরূপে জালক শ্রেণীর ধমনীপ্রান্ত হইতে খাণ্ডদ্রব্য, জল, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলারসের সৃষ্টি করে এবং

উহাদের শিৱাৰ প্ৰান্তৰাৱা আৱাৰ জল, ধাতৱ লৱণ, কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি শোষিত হইয়া শিৱাৰ মধ্য পৰিচালিত হয়। কলাৱস হইতে সবটুকু অসাৰ এবং আৱৰ্জনা জালক শ্ৰেণী গ্ৰহণ কৰিতে পাৰে না। অবশিষ্ট অসাৰ পদাৰ্থ অল্প এক প্ৰকাৰ প্ৰণালীৰাৱা সংগৃহীত হইয়া শেষ পৰ্যন্ত হৃৎপিণ্ডৰ কাছাকাছি একটি শিৱাৰ ফিৰাইয়া দেওয়া হয়। এই অল্প প্ৰকাৰ প্ৰণালীই **লসিকা প্ৰণালী** (Lymphatic system) নামে পৰিচিত। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ লসিকা প্ৰণালী কলাৱস হইতে জল, ধাতৱ লৱণ, প্ৰোটিন, শ্বেত কণিকা ও অসাৰ পদাৰ্থ ইত্যাদি গ্ৰহণ কৰিয়া থাকে। লসিকা প্ৰণালীৰ মধ্যস্থিত এই তৰলকে **লসিকা** (Lymph) বলে। অনেকে লসিকা এবং কলাৱসেৰ মধ্য কোন পাৰ্থক্য না কৰিয়া উভয়কেই লসিকা নামে অভিহিত কৰেন। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ লসিকানালী মিলিত হইয়া একটি বড় লসিকা সৃষ্টি কৰে। এই বড় লসিকা নালীগুলি অবশেষে একত্ৰিত হইয়া গলদেশে বড় শিৱাৰ মধ্য প্ৰৱেশ কৰে। লসিকা নালীগুলিকে শিৱাৰ সন্নিহিত তুলনা কৰা যায়। শিৱাৰ মত এই সকল লসিকা নালীতেও কপাটক থাকে এবং ৰক্ত অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডেৰ দিকেই প্ৰৱাহিত হয়। শিৱাৰ মত ইহাদেরও ৰক্ত পৰিচালনেৰ ক্ষমতা নাই, মাংসপেশীৰ



গতিৰ উপৰেই লসিকা প্ৰণালীতে ৰক্তেৰ প্ৰৱাহ নিৰ্ভৰ কৰে। তৰে লসিকা প্ৰণালীগুলি উহাদের গতিপথে কতকগুলি লসিকাপিণ্ডেৰ (Lymph nodes) মধ্য দিয়া যায়। এই সকল লসিকাপিণ্ড ছাঁকনিৰ (Filter) জায় কাজ কৰে এবং ৰক্তকে জীৱাণু এবং বিষেৰ হাত হইতে ৰক্ষা কৰে।

**হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন :** এখন আমরা হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করে তাহা লক্ষ্য করিব। হৃৎপিণ্ডটি এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কাহারও উপর ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে না। সমস্ত শিরা, ধমনী ও স্নায়ু ( Nerve ) হইতে হৃৎপিণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং উহার মধ্যস্থ সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া যদি উহা লবণ জলে পূর্ণ করিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পূর্বে যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ( Beat ) বলিতে আমরা কি বুঝি ? তোমরা বুকে কান পাতিয়া থাকিলে হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ শুনিতে পাইবে। এই ধুক ধুক শব্দকে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ( Heart sound ) বলা হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে এইরূপ দুইটি ধুক ধুক শব্দ বা ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটিকে প্রথম হৃদধ্বনি ( First heart sound ) এবং অপরটিকে দ্বিতীয় হৃদধ্বনি ( Second heart sound ) বলে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে শরীর অস্থস্থ হইলে চিকিৎসকেরা হাতের কব্জির মধ্যে একটি ধমনী চাপিয়া ধরিয়া দেহের অস্থস্থতা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ ধমনীটিও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে। সুতরাং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর স্পন্দনের সংখ্যা সমান। স্বস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সংখ্যার ভ্রাস-বৃদ্ধি অস্থস্থতার লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। ধমনীর স্পন্দন হইতে চিকিৎসকেরা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারেন। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং বিকোচনের ফলেই এই স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় লইয়া গঠিত। উপরের অলিন্দেই প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইয়া নীচের নিলয়ে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হইলে প্রতি স্পন্দনে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড সময় লাগে।

অর্থাৎ প্রতি ০.৮ সেকেন্ড পর হৃৎপিণ্ডের একটি করিয়া স্পন্দন হইতে থাকে। এই ০.৮ সেকেন্ডের ০.১ সেকেন্ড ধরিয়া অলিন্দ দুইটি প্রথমে সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের ফলে অলিন্দ এবং নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটক খুলিয়া রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করিতে থাকে। ০.১ সেকেন্ড পরে নিলয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় নিলয়ের সংকোচন আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ এবং নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটক বন্ধ হইয়া যায়। এই কপাটক বন্ধ হইবার সময়ই আন্দোলনের ( vibrations ) ফলে প্রথম হৃদধ্বনিটি ( First heart sound ) স্রুত হয়। নিলয়ের সংকোচন কাল ০.৩ সেকেন্ড কাল। এই ০.৩ সেকেন্ড কাল সংকোচনের সময় দুইটি নিলয়ের প্রত্যেকটি হইতে প্রায় ৩ আউন্স রক্ত

মহাধমনীতে এবং ফুগফুসের ধমনীতে উহাদের অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক খুলিয়া প্রবেশ করে। ধমনীতে রক্ত প্রবেশ করার ফলে উহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং নিলয় ও ধমনীর মধ্যবর্তী অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক হঠাৎ বন্ধ হইয়া রক্তের নিলয়ে প্রত্যাগমন প্রতিহত করে। এই কপাটক বন্ধ হইবার সময় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাতেই দ্বিতীয় হৃদস্পন্দনটি (Second heart sound) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভাবেই হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ইহার পর ০.৪ সেকেন্ড সময় সমস্ত হৃৎপিণ্ডটিই বিশ্রাম করে। এইরূপে মোট ০.৮ সেকেন্ড সময়ে নিলয় হইতে এক বার রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ডের একটি স্পন্দন (Beat) সম্পূর্ণ হয়। যে সময় নিলয় হইতে রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে সেই সময় আলিন্দের বিকোচন ঘটে। ফলে শিরা হইতে রক্ত এই সময়ে আলিন্দে আসিয়া প্রবেশ করে। ০.৮ সেকেন্ডে একটি স্পন্দন পূর্ণ হইবার পর পুনরায় আলিন্দে অপর একটি স্পন্দনের সূত্রপাত হয়। এইরূপে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং বিকোচনের ফলে হৃদস্পন্দনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিমিনিটে ৭০-৮০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। শিশু ও মেয়েদের স্পন্দনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। দুই বৎসরে শিশুদের মিনিটে ১০০-১৪০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। অতি বৃদ্ধাবস্থা ব্যতীত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনের সংখ্যাও হ্রাস পাইতে থাকে। প্রৌঢ়াবস্থায় ৬০-৭০ বার হৃদস্পন্দন হইয়া থাকে। আরও অধিক বয়সে ৭৫-৮০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে স্পন্দনের সংখ্যা কমিয়া যায়। অধিক শারীরিক পরিশ্রমে, ভয়ে, উৎকণ্ঠায় বা অত্যন্ত কোন মানসিক বিপর্যয়েও হৃদস্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রুত কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বা অক্সিজেনের হ্রাস ঘটিলেও স্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে হৃদস্পন্দনের তালে তালে ধমনীও স্পন্দিত হইতে থাকে। ধমনীর এই স্পন্দন কি ভাবে উৎপন্ন হয় এখন তাহাই লক্ষ্য করিব। বায় নিলয় হইতে রক্ত যখন অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটক খুলিয়া মহাধমনীতে হঠাৎ সজোরে প্রবেশ করে তখন ধমনীর প্রাচীর প্রসারিত হইয়া ঐ রক্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ধমনীর প্রাচীর স্থিতিস্থাপক (Elastic) বলিয়া পরমুহর্তে উহা সংকুচিত হয়। ফলে ঐ স্থানের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটক এই চাপে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রক্ত এই চাপে কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। ধমনী-প্রাচীরের এইরূপ প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই নাড়ীর স্পন্দন (Pulse) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্যায়ক্রমে নাড়ীর এইরূপ স্পন্দনেই রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়া থাকে।

ধমনীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে রক্ত ধমনীর প্রাচীরে আঘাত করিয়া থাকে। রক্তশ্রোত ঐ প্রাচীরে যে পরিমাণ শক্তিতে আঘাত করিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকেই **রক্তের চাপ** ( Blood pressure ) বলে। প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা ই ধমনীর অভ্যন্তরে রক্তের স্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া গেলে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। একই বয়সের পুরুষ এবং নারীর রক্তের চাপ সমান নয়। সাধারণতঃ পুরুষের রক্তের চাপ নারীর চাপ অপেক্ষা ১০-১৫ মিলিমিটার বেশী থাকে। জন্মের সময় শিশুর রক্তের চাপ ৭০-৭৫ মিলিমিটার থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাপ বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত বয়সে উহা প্রায় ১২০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক ( Normal ) রক্তের চাপ উহার বয়সের অর্ধেকের সহিত ১০০ যোগ করিলেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে রক্তের চাপ কমবেশী হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বা গরম জলে স্নান করিলে রক্তের চাপ কিছু বাড়িয়া থাকে। খাণ্ড গ্রহণের পর অথবা জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিলেও রক্তের চাপ বাড়িত দেখা যায়। মানসিক চিন্তা, উৎকর্ষা প্রভৃতিতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের ঋতুকালে ইহার হ্রাস এবং গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এবার স্থাপিও হইতে রক্ত কোন্ পথে দেহের বিভিন্ন অংশে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কিভাবে আবার স্থাপিওে ফিরিয়া আসে তাহা দেখা যাউক।

চিত্রে রক্তের এই যাতায়াতের পথ দেখান হইল। একমাত্র ফুসফুস ব্যতীত দেহের অগ্নাগ্র সকল অংশ হইতে দূষিত রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দেহের আবর্জনা বহন করিয়া উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরাপথে দক্ষিণ অলিন্দ এবং নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে নিলয়ের সংকোচনের ফলে এই রক্ত ফুসফুসের ধমনীপথে দুইটি ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে ( alveoli ) অসংখ্য জালক ( capillaries ) থাকে। এই জালকের সাহায্যে রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। পরে ফুসফুসের শিরাপথে বাম অলিন্দে আসিয়া উপস্থিত হয়। ডান অলিন্দ হইতে ফুসফুস হইয়া আবার বাম অলিন্দে রক্তের এই প্রবাহকে **Pulmonary circulation** বলে।

বাম অলিন্দ হইতে রক্ত বাম নিলয়ে গমন করে এবং সেখান হইতে নিলয়ের সংকোচনের ফলে মহাধমনীতে ( Aorta ) প্রবেশ করে। মহাধমনী হইতে অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া মস্তিষ্ক, হাত, পা, বুক, যকৃত, পাকস্থলী, অস্ত্র ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। একমাত্র ফুসফুসেই কোন শাখা-

প্রশাখা মহাধমনী হইতে গমন করে নাই। হৃৎকক্ষ মহাধমনীর পথে রক্ত ফুলফুল ব্যতীত দেহের সকল অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাধমনীর রক্ত অক্সিজেনের জন্ত লাল টক্টকে। দেহের বিভিন্ন অংশে এই অক্সিজেন ছাড়িয়া রক্ত ঐ সকল স্থান হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শিরাপথে উদ্ভব ও নিম্ন মহাশিরায় আসিয়া মিলিত হয় এবং সেখান হইতে ডান অনিন্দ্রে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির জন্ত শিরার রক্ত লালচে বেগুনি। রক্তের এই প্রবাহকে Systemic circulation বলে।

Systemic circulation-এ একটি রক্তপ্রবাহ পাকস্থলী, অম্ন, প্রীহা, অগ্ন্যাশয় ও যকৃত পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিম্ন মহাশিরাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্ত উক্ত প্রবাহকে দুই প্রস্থ জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হয়। পাকস্থলী, অম্ন, অগ্ন্যাশয়, প্রীহা ইত্যাদির জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধমনীর রক্ত প্রবাহিত হইয়া পরে একটি শিরাপথে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাকে Portal শিরা বলে। এই রক্ত খাণ্ডদ্রব্যের সারাংশ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বহন করিয়া দ্বিতীয়বার যকৃতের জালক শ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এখানে এই জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া রক্তের সহিত যকৃতের আদান-প্রদান ঘটে। খাণ্ডেব অতিরিক্ত গ্লুকোজ বাহা রক্ত অম্ন হইতে বহন করিয়া আনিয়াছে—এইখানে গ্লাইকোজেনরূপে জমা হইয়া থাকে। যকৃত হইতে রক্ত এইবার নিম্ন মহাধমনীপথে ডান অনিন্দ্রে ফিরিয়া যায়। Systemic circulation-এর অগ্ন সর্ব ভায়গায় রক্ত কেবলমাত্র একপ্রস্থ জালকের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। এইজন্ত রক্তের এই প্রবাহটিকে Portal System বলে।

আমাদের দেহের সর্বত্রই কিন্তু রক্তের প্রবাহ সব সময় সমান থাকে না। কোন সময় রক্ত কোন একটি অঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়। আবার অগ্ন সময় হয়ত ঐ স্থানে রক্তের প্রবাহ অনেক কমিয়া যায়। কোন অঙ্গের প্রয়োজন অনুসারেই ঐ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে। যখন একটি অঙ্গ খুব কর্মব্যস্ত থাকে তখন উহাতে রক্তের প্রয়োজন বেশী হয়। ফলে দেহের অগ্নাংশ হইতে রক্ত ঐ অঙ্গে দিকে প্রবাহিত হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আহাৰের পর আমাদের সকলেরই একটু ঘুমের ভাব আসে। আমাদের মস্তিষ্কটি তখন অলস হইয়া পড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক চালনার কোন কাজ তখন আমরা করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? পাকস্থলীতে খাণ্ডদ্রব্য প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পরিপাক করিবার জন্ত সেখানে বিভিন্ন কোষগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন ঐ অংশে

রক্তের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীর দিকে প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্কে এই সময় রক্তের প্রবাহ মন্দীভূত হয় বলিয়া আমাদের ঘুম পায় এবং তখন আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার কাজ করিতে পারি না।

### শ্বসন-তন্ত্র

#### ( Respiratory System )

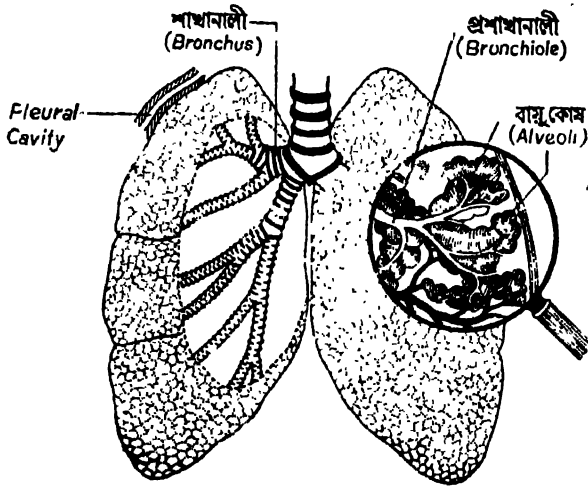
জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে শক্তির ( Energy ) প্রয়োজন তাহা আমরা খাদ্যদ্রব্য হইতেই পাইয়া থাকি। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লুক্কায়িত এই শক্তি পাইতে হইলে আবার অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য হইতে এই শক্তি আমাদের দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর ( Air ) মধ্যে অক্সিজেন আছে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা বায়ুর হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এই কারণেই আমাদের জীবন ধারণের জন্য বায়ু এত প্রয়োজন। আবার আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে ( cell ) খাদ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলও উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অধিক পরিমাণে দেহের মধ্যে জমিতে থাকিলে শরীরের ক্ষতি হয়। এইজন্য এই গ্যাস অনবরতই দেহ হইতে অপসারণ করা প্রয়োজন। এই শ্বসন তন্ত্রের সাহায্যেই দেহের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কিছু জলীয় বাষ্প ত্যাগ করা হইয়া থাকে। শ্বসন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইতেছে ফুসফুস ( Lungs )।

**শ্বসন-ক্রিয়া ( Respiration ) :** আমরা শ্বসন ক্রিয়া বলিতে সাধারণতঃ প্রশ্বাসের ( Inspiration ) সঙ্গে ফুসফুসে কিছু বায়ু গ্রহণ এবং পরমুহূর্তে নিঃশ্বাসের ( expiration ) সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস হইতে কিছু বায়ু ত্যাগই বুঝিয়া থাকি। আসলে কিন্তু ইহা শ্বসন ক্রিয়া নয়। ইহা শ্বসন ক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। ইহাকে বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া ( External respiration ) বা সাধারণভাবে breathing বলে। বাহ্যিক শ্বসন ক্রিয়ায় ফুসফুস হইতে অক্সিজেন জালকের ( capillaries ) মধ্য দিয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসের মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। ফুসফুস এবং জালকের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের এরূপ আদান-প্রদানই বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া নামে পরিচিত। ফুসফুস ছাড়া দেহের বিভিন্ন কোষে ও রক্তের সহিত এইরূপ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-



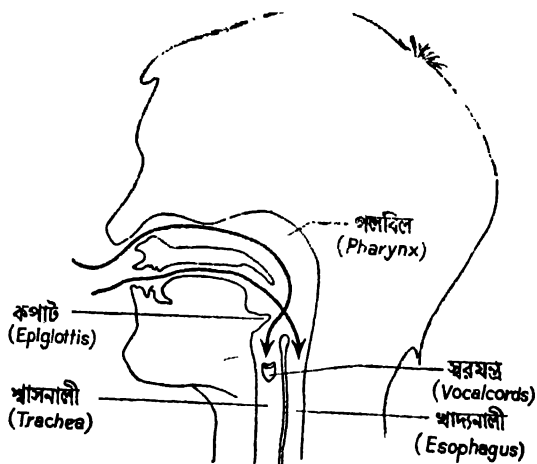
অক্সাইড গ্যাসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া রক্ত দেহের বিভিন্ন কোষে যাইয়া উপস্থিত হয়। তথায় জালক এবং কোষের সূক্ষ্ম প্রাচীরের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঐ প্রাচীরের মধ্য দিয়া রক্তে আসিয়া পৌঁছায়। কোষ এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের এই আদান-প্রদানকে **অভ্যন্তরীণ শ্বসন-ক্রিয়া** ( Internal respiration ) বলে। রক্ত ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরে ফুসফুসে লইয়া বাহ্যিক শ্বসন-ক্রিয়া দ্বারা বাহিরে পরিত্যাগ করে।

সুতরাং শ্বসন-ক্রিয়া বলিতে বায়ু হইতে ফুসফুসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ঐ অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন কোষে ( cell ) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং বিভিন্ন কোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রক্তের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া ফুসফুসের মাধ্যমে বাহিরে পরিত্যাগ করা বুঝায়।



**ফুসফুসের অবস্থান ও গঠন :** আমাদের বক্ষপঞ্জরের ( Ribs ) ঠিক নীচে একটি পেশীময় পরদা দ্বারা আমাদের দেহ-গহ্বরকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই পরদাটিকে মধ্যচ্ছদা ( Diaphragm ) বলে। মধ্যচ্ছদার উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর ( Chest or thoracic cavity ) এবং নীচের অংশকে উদর-গহ্বর ( Abdominal cavity ) বলে। বক্ষ-গহ্বরেই ফুসফুস ( Lungs ) এবং হৃদযন্ত্র ( Heart ) অবস্থিত। এই দুইটি দেহযন্ত্র দেহের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যই প্রকৃতি উহাদের বক্ষপঞ্জরের খাঁচার মধ্যে

অতিযত্নে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই বক্ষ-গহ্বরে দুই পাশে দুইটি ফুসফুস অবস্থিত। ডান পাশের ফুসফুসের তিনটি অংশ এবং বাম পাশের ফুসফুসের দুইটি অংশ আছে। প্রত্যেকটি অংশ আবার অসংখ্য ছোট ছোট বায়ুকোষ (Air-sacs called alveoli) দ্বারা গঠিত। অসংখ্য জালক (capillaries) এই সকল বায়ুকোষগুলিকে ঘিরিয়া আছে। ফলে বায়ুকোষে গৃহীত বায়ুর সঙ্গে জালকের রক্তের আদান-প্রদান সহজেই হইতে পারে। প্রত্যেকটি ফুসফুসের বাহিরের দিকে একটি পাতলা জলসিক্ত আবরণ আছে। এই আবরণটিকে ফুসফুস-ধরা-কলা (Pleurum) বলে। ফুসফুসের উপরে এবং চারি পাশে আমাদের দেহ-প্রাচীর এবং নীচে মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)। এই দেহ-প্রাচীর এবং মধ্যচ্ছদার ভিতরের গায়ে অল্পরূপ একটি ফুসফুস-ধরা-কলার পাতলা আবরণ আছে। এই দুইটি ফুসফুস-ধরা-কলার অভ্যন্তরীণ অংশটুকু (Pleural cavity) বায়ু-নিরুক্ত অর্থাৎ বাহির হইতে বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার মধ্যে একটি তৈলাক্ত তরলের (Lubricating liquid) আবরণ দেখা যায়। বাহির হইতে নাসিকার দুইটি ছিদ্রপথেই সাধারণতঃ আমরা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। নাসাপথের প্রথমই কতকগুলি লোম দেখা যায়। এইগুলি সর্বদাই ভিজা থাকে বলিয়া বায়ুর সঙ্গে ধূলিকণা ইত্যাদি প্রবেশ করিলে উহা ঐ লোমের সঙ্গে আটকাইয়া

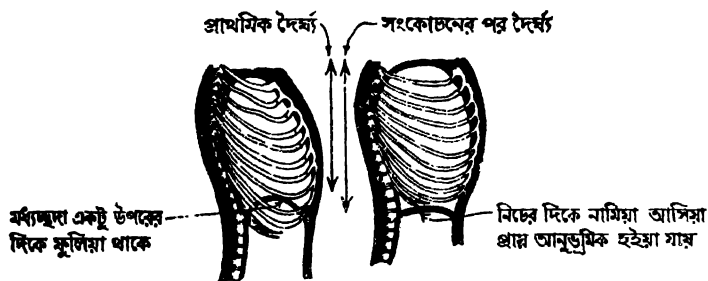


যায়। যেখানে লোমগুলি শেষ হইয়াছে সেখান হইতে ভিতরের দিকে নাসাপথের গায়ে কতকগুলি ভাঁজ দেখা যায় এবং উহার উপরে একটি পাতলা আবরণ (Mucous membrane) থাকে। নাসাপথের এই অংশটুকু ফুসফুসগামী বায়ুকে গরম ও ভিজা রাখে। ফুসফুসকে স্বস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে ঈষৎ

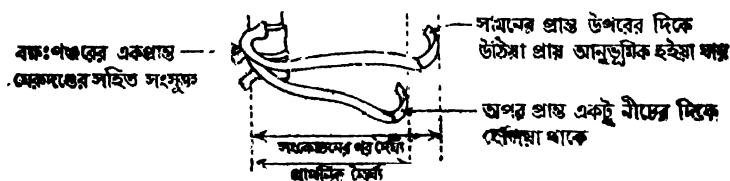
গরম ও ভিজা বা আর্দ্র বায়ুই উহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বায়ু ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা বাহির হইতে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ করিলেও নাসাপথের এই অংশে আসিয়া উহা উপযুক্তভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র হইয়াই ফুসফুসে প্রবেশ করে। নাসাপথের এই অংশ অতিক্রম করিয়া বায়ু যেখানে প্রবেশ করে তাহাকে গলবিল ( Pharynx ) বলে। এই গলবিলের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুইটি টিউব বা নালী দেখা যায়। সামনের দিকেরটি শ্বাস-নালী ( Trachea ) এবং পিছনেরটিকে খাচ্চ-নালী ( Esophagus ) বলে। গলবিল হইতে বায়ু এই শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীর উপরের অংশটি ( Larynx ) একটু বিশেষভাবে গঠিত। এই অংশেই বায়ুর এক প্রকার কম্পনের দ্বারা আমাদের স্বরের ( Voice ) সৃষ্টি হয়। শ্বাসনালীর মুখটি খাইবার সময় নিজে হইতেই একটি কপাটের ( Epiglottis ) দ্বারা বন্ধ হইয়া যায় যেন কোন খাচ্চ-দ্রব্য এই নালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। সামান্য একটু খাচ্চ-কণাও যদি অসাবধানতার জন্ত উহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে ফুসফুস হইতে বায়ু প্রবলবেগে উহা ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ইহাকেই আমরা 'বিষম লাগা' বলি। এই শ্বাসনালীটি বক্ষ-পঞ্জরের প্রথম হাড় জোড়ার নীচে দুইটি শাখানালীতে ( Bronchi ) বিভক্ত হইয়া দুই পাশে দুইটি ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেকটি শাখানালী আবার অসংখ্য সৰু সৰু প্রশাখানালীতে ( Bronchioles ) বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি বায়ুকোষে ( Alveoli ) পৌঁছিয়াছে। সুতরাং শ্বাসনালী হইতে বায়ু শাখানালী, প্রশাখানালী হইয়া অবশেষে বায়ুকোষে পৌঁছে। বায়ু প্রবেশের ফলে ফুসফুস দুইটি ফুলিয়া উঠে আবার বায়ু বাহির হইয়া গেলে চূপসিয়া যায়। শাখা-প্রশাখার সহিত ফুসফুসটিকে বড় একগুচ্ছ আঙুরের মত দেখায়। এক একটি আঙুর যেন এক একটি বায়ুকোষ।

**ফুসফুসের ক্রিয়া :** সাধারণ লোকের ধারণা ফুসফুস নিজেই বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে এবং পরমুহূর্তে আবার উহা পরিত্যাগ করে। আসলে কিন্তু ফুসফুসের বায়ু গ্রহণ করিবার বা উহা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। বক্ষ-প্রাচীরের পেশী এবং নীচের মধ্যচ্ছদার দ্বারাই এই কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যচ্ছদা একটু উপরের দিকে ফুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অনেকটা গম্বুজাকৃতি ( Dome-shaped )। মধ্যচ্ছদার পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইলে উহার উপরের উত্তল অংশ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া প্রায় অনুভূমিক ( horizontal ) হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষ-গহ্বরয়ের উপর-নীচ বা লম্বালম্বি বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। আবার আমাদের বক্ষপঞ্জরের হাড়গুলির এক প্রান্ত

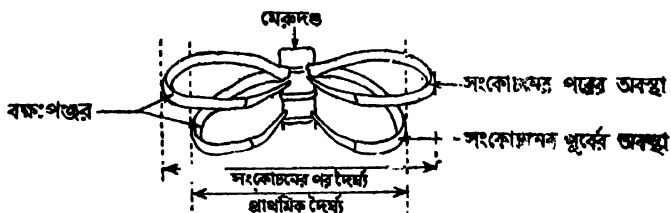
পিছনে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল হইতে সামনের দিকে প্রসারিত হইবার সময় ইহার একেবারে অনুভূমিক (horizontal) ভাবে না থাকিয়া একটুখানি নীচের দিকে হেলিয়া থাকে। বক্ষপ্রাচীরের পেশী-সমূহ সঙ্কুচিত হইলে বক্ষপঞ্জরের অস্থিসমূহের সামনের প্রান্ত উপরের দিকে উঠিয়া উহার প্রায় অনুভূমিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষগহ্বরের বুক ও পিঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (Depth) এবং ডাইনে-বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (Breadth)



মধ্যচ্ছদের পেশী সংকোচনের ফলে বক্ষগহ্বরের উপর-নীচ লম্বালম্বি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়



পেশী সংকোচনের ফলে বক্ষগহ্বরের বুক ও পিঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (Depth) বৃদ্ধি পায়



পেশী সংকোচনের ফলে ডাইনে বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (Breadth) বৃদ্ধি পায়

বৃদ্ধি পায়। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করিলে আমাদের সকলেরই যে দুই-তিন ইঞ্চি বকের ছাতি (Chest) বৃদ্ধি পায়, ইহাই তাহার কারণ। মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের একই সঙ্গে সংকোচনের ফলে এইরূপে উপর-নীচে এবং

পাশাপাশি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসেরও আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের আয়তন (volume) বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহার মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ কমিয়া যায় (বয়েলের সূত্রানুসারে)। কিন্তু বাহিরের বায়ুর চাপের কোন বৃদ্ধি পরিবর্তন না হওয়ায় উহার চাপ ফুসফুসের বায়ুর চাপ অপেক্ষা অধিক থাকে। বাহিরের বায়ু আমাদের নাসাপথ ও শ্বাসনালী দ্বারা ভিতরের ফুসফুসের বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এই উচ্চ চাপের বায়ু প্রকৃতির নিয়মানুসারে ফুসফুসের নিম্নচাপের বায়ুর দিকে অগ্রসর হয় (কোন গ্যাস বা বায়ু সর্বদাই উচ্চ চাপের দিক হইতে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়)। এই প্রক্রিয়াকেই আমরা প্রশ্বাস বলিয়া থাকি। মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নামিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরে (Abdominal cavity) চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে। এই জন্যই আমরা যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন পেটও ফুলিয়া উঠে। বায়ু এইরূপে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের সঙ্কোচন দূর হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা আবার উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং বক্ষপঞ্জরের অস্থিসমূহও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ফলে বক্ষগহ্বর তথা ফুসফুসের আয়তন কমিয়া যায়। আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপ এবার বাহিরের বায়ুর চাপের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ফলে ফুসফুস হইতে কিছুটা বায়ু বাহিরের নিম্নচাপের বায়ুর দিকে বাহির হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা নিঃশ্বাস বলি। মধ্যচ্ছদা এবার উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরের চাপ কমিয়া যায় এবং পেটও নামিয়া চূপসিয়া যায়। সুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পেটও তালে তালে নামা-উঠা করে। পেটের এরূপ ওঠা নামাকে abdominal breathing বলে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বস্থ লোকের ফুসফুসে ৪½ লিটার বায়ু ধরিতে পারে। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সাধারণতঃ ৫০০ সি. সি. বায়ুই আদান-প্রদান হইয়া থাকে। আমরা খুব গভীরভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াও ফুসফুসের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিতে পাবি না। আমরা মরিয়া গেলেও প্রায় এক লিটারের মত বায়ু আমাদের ফুসফুসে থাকিয়া যায়।

**অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আদান-প্রদান :** ফুসফুসের প্রত্যেকটি বায়ুকোষের চারিপাশে অসংখ্য জালক (Capillaries) বিরিয়া আছে। জালক এবং বায়ুকোষের (alveoli) পাতলা-গাভ্রাবরণ ভেদ করিয়া রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অনায়াসেই ফুসফুসে এবং পরে ফুসফুস হইতে শ্বাসনালীর সাহায্যে নিঃশ্বাসের সহিত বাহিরে চলিয়া যায়। অল্পরূপভাবে

প্রাশাসের সহিত যে অক্সিজেন ফুসফুসে আসে তাহাও বায়ুকোষ এবং জালকের গাজাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে গিয়া উপস্থিত হয়। রক্তের লাল রঙটি উহার রক্ত কণিকার জন্ত (Red blood corpuscle)। এক একটি রক্ত কণিকায় কয়েক লক্ষ করিয়া হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) নামক এক প্রকার প্রোটিন থাকে। রক্ত কণিকার লাল রঙটি আসলে এই হিমোগ্লোবিনেরই জন্ত; প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনেই লৌহ কণিকা থাকে। এই লৌহ কণিকা সহজেই অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিনকে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে।

হিমোগ্লোবিন + অক্সিজেন = অক্সি-হিমোগ্লোবিন। একটি হিমোগ্লোবিন চারিটি অক্সিজেনের অণুর (Molecule) সহিত মিলিত হইয়া একটি অক্সি-হিমোগ্লোবিনের অণু গঠন করে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে একটি রক্ত কণিকা কত লক্ষ লক্ষ অক্সিজেন অণু শোষণ করিতে পারে। প্রত্যেকটি রক্ত কণিকার এইরূপ অদ্ভুত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ফুসফুস হইতে অত সহজেই প্রচুর অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। রক্তের জলীয় অংশে খুব সামান্য অক্সিজেনই দ্রবীভূত হইতে পারে। রক্ত কণিকা না থাকিলে আমাদের দেহের অক্সিজেনের চাহিদা কখনই পূরণ হইত না।

ফুসফুসের অক্সিজেন অক্সি-হিমোগ্লোবিনরূপে (Oxy-hemoglobin) রক্তের মাধ্যমে অবশেষে বিভিন্ন কোষে (Cell) আসিয়া পৌঁছায়। প্রত্যেকটি কোষের চারিপাশে আবার জালকশ্রেণী ঘিরিয়া আছে। রক্তের অক্সি-হিমোগ্লোবিন এখানে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা হইতে হিমোগ্লোবিন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন জালক এবং কোষের পাতলা গাজাবরণ ভেদ করিয়া কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং হিমোগ্লোবিন রক্তেই থাকিয়া যায়। অক্সি-হিমোগ্লোবিন দেখিতে লাল টকটকে, কিন্তু হিমোগ্লোবিন একটু কালচে মত। এইজন্তই অক্সিজেন চলিয়া যাওয়ার পর জালকের রক্ত একটু নীলাভ রঙ ধারণ করে। এইরূপে অক্সিজেন গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুস হইতে বিভিন্ন কোষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিপাকের (Metabolism) ফলে কোষে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয় তাহা এই সময় কোষ ও জালকের গাজাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে আসিয়া পৌঁছায়। রক্তে এই জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিলিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। রক্তে এই কার্বনিক অ্যাসিডের আধিক্য ঘটিলে শরীর অস্বস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং দুইটি উপায়ে এই কার্বনিক অ্যাসিড প্রশমিত হইয়া থাকে। রক্তের জলীয় অংশে (Plasma) ধাতব লবণ ও প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন ও ধাতব লবণ কিছু কার্বনিক অ্যাসিডের অ্যাসিডভাব নষ্ট করিয়া উহাকে বাই-কার্বনেট-এ রূপান্তরিত

করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন ও ধাতব লবণের সহায়তায় অবশিষ্ট কার্বনিক অ্যাসিড বাই-কার্বনেট-এ পরিণত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রোটিন এবং ধাতব লবণের সহায়তায় রক্তের স্বাভাবিক মৃদু ক্ষারীয় ভাব বজায় থাকে এবং কোষ হইতে প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাই-কার্বনেটরূপে ( Bi-carbonate ) ফুসফুসে প্রেরিত হয়। ফুসফুসে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাই-কার্বনেট ভাঙ্গিয়া আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং শ্বাসনালীর দ্বারা বাহিরে 'অপসারিত' হয়। সুতরাং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছুটা রক্তের জলীয় অংশের (Plasma) প্রোটিন এবং ধাতব লবণ দ্বারা এবং অবশিষ্ট অংশ হিমোগ্লোবিন এবং ধাতব লবণ দ্বারা বাই-কার্বনেটরূপে কোষ হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হয়।

### বেচন তন্ত্র ( Excretory System )

খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবার পর ইহা পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হয়—ইহা পূর্বেই তোমরা পাচনতন্ত্রে পড়িয়াছ। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে রক্তের মধ্যে শোষিত হয় না। যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের পরিপাক হয় না তাহা পড়িয়া থাকে। ইহার সঙ্গে থাকে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিণ্ডাশয়, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত এন্জাইম ও অন্যান্য পদার্থ। তাছাড়া অন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুও দেখা যায়। এই জীবাণু এই সকল অবশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য পচাইয়া নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। অন্ত্রের এই অবশিষ্ট পদার্থ একত্রে মল (Feces) নামে পরিচিত। দেহের পক্ষে এই মল ক্ষতিকারক। বৃহদন্ত্রের সাহায্যে এই মল দেহ হইতে অপসারণ করা হয়।

খাদ্যদ্রব্যের যে অংশটুকু রক্তের মধ্যে শোষিত হয় তাহা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয়। দেহের বিভিন্ন কোষ ( cell ) এই খাদ্য-দ্রব্য হইতে নিজেদের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন ও শক্তি আহরণ করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উহার দেহের অনিষ্টকর কতগুলি পদার্থেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (carbon dioxide gas), ইউরিয়া (urea), ইউরিক অ্যাসিড (uric acid), ক্রিয়েটিনিন (creatinine), ধাতব লবণ (inorganic salts), জল ইত্যাদি এই শ্রেণীর পদার্থ। কিরূপে দেহকোষ খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহাদের পুষ্টি ও শক্তি আহরণ করে এবং এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের সৃষ্টি করে তাহা বিপাক প্রক্রিয়ায় (Metabolism) বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের মধ্যে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প আবার

নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের সাহায্যে আমরা পরিভাগ করি। ধাতব লবণের কিছু অংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া ঘামের সহিত স্বকের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ইউরিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেনযুক্ত বিষাক্ত পদার্থ ও অম্লান্ত দ্রবণীয় (soluble) দূষিত পদার্থের অধিকাংশই জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় মূত্রাকারে বৃক্কের (Kidney) সাহায্যে অপসারণ করা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চারিটি বিভিন্ন যন্ত্রের (Organs) সাহায্যে দেহে উৎপন্ন আবর্জনা ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্বকের কাজের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা কম। নিম্নে এই চারিটি দেহযন্ত্র এবং উহাদের সাহায্যে যে সকল পদার্থ অপসারিত হয় তাহা দেওয়া হইল।

Organs	যে সকল পদার্থ অপসারণ করা হয়।
বৃক্ক (Kidneys)	জল ও জলে দ্রবণীয় ধাতব লবণ এবং অম্লান্ত পদার্থ। প্রোটিন হইতে উৎপন্ন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ইত্যাদি নাইট্রোজেনযুক্ত দূষিত পদার্থ প্রধানতঃ ইহার সাহায্যেই অপসারিত হয়।
ফুসফুস (Lungs)	কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প ফুসফুসের সাহায্যে অপসারণ করা হয়।
স্বক (Skin)	জল ও ধাতব লবণ ঘামের সঞ্চিত অপসারিত হয়।
বৃহদন্ত্র (Large Intestine)	মল, খাত্তের অবশিষ্টাংশ, পিত্তজাত রঙিন পদার্থ (Bile pigments), জল, ধাতব লবণ ইত্যাদি মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

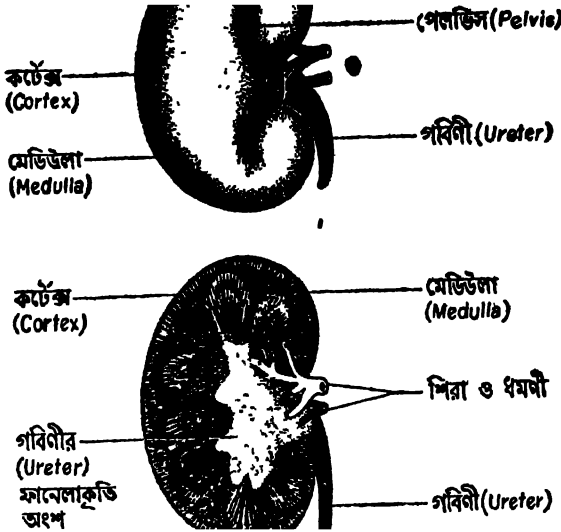
রেচন প্রক্রিয়ায় যকৃতের গুরুত্বও কম নয়। অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ যকৃতের সাহায্যে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া অপসারণের জন্য বৃক্কে প্রেরিত হয়। বৃক্কের হিমোগ্লোবিন ধ্বংস হইলে যকৃত রক্ত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া bile pigment-এ পরিণত করে এবং উহা পিত্তের সহিত অন্ত্রে নির্গমনের জন্য পাঠাইয়া দেয়। পরে মলের সহিত এই bile pigment দেহ হইতে অপসারিত হয়।



## বেচন তন্ত্র

**অবস্থান :** বেচন তন্ত্র এক জোড়া বৃক্ক ( Kidney ), মূত্রাশয় ( Urinary bladder ), বৃক্ক ও মূত্রাশয় সংযোগকারী দুইটি টিউব (Ureters) এবং মূত্রাশয় হইতে মূত্র বহির্গমনের জন্য উহার সহিত সংযুক্ত অপর একটি টিউব ( Urethra ) দ্বারা গঠিত ।

বৃক্ক দুইটি পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডের দুই দিকে অবস্থিত । এক একটি বৃক্ক দেখিতে সিমের ( Bean ) মত ; এক ধাব একটু অবতল এবং অপর ধার উত্তল । ইহা আমাদের হাতের মুঠি ( Fist ) অপেক্ষা আকারে সামান্য বড় । প্রত্যেক বৃক্কের অবতল অংশ হইতে একটি করিয়া টিউব বাহির হইয়া নীচে মূত্রাশয়ে গিয়া মিশিয়াছে । এই টিউবকে ইউরেটার বলে । মূত্রাশয় একটি ফাঁপা মাংসপিণ্ড । ইহার মধ্যে মূত্র আসিয়া জমা হয় এবং প্রায় ৩০০-৪০০ সি.সি মূত্র

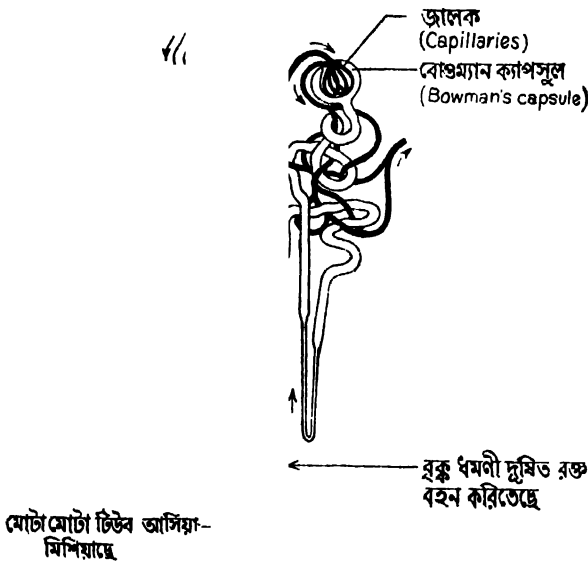


১ক

ইহার মধ্যে জমা হইতে পারে । এই মূত্রাশয়ের সহিত আবেকটি টিউব সংযুক্ত আছে । ইহাকে ইউরেথ্রা বলে । ইহার সাহায্যেই মূত্রাশয় হইতে মূত্র বাহিরে অপসারিত হয় ।

**বৃক্কের গঠন ও দূষিত পদার্থ বেচন :** বৃক্কের যে স্থান হইতে ইউরেটার নামক টিউবটি বাহির হইয়াছে তাহার ঠিক উপরেই বেনাল ধমনী ও শিরা বৃক্ক-মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য শাখা, প্রশাখা এবং অবশেষে জালকে (Capillaries)

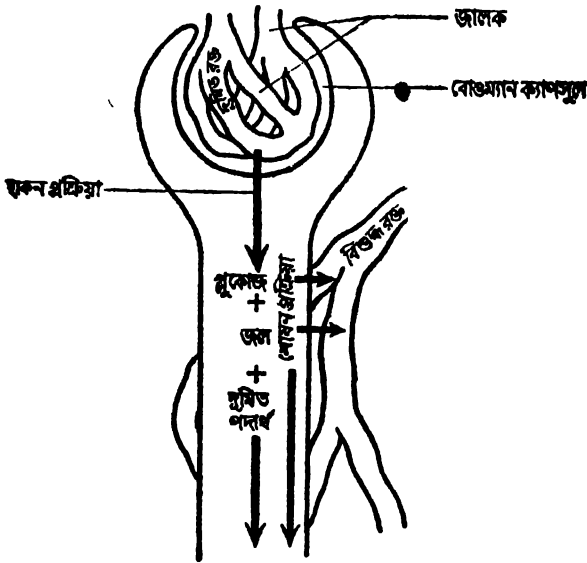
বিভক্ত হইয়াছে। দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত দূষিত পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করিয়া অবশেষে এই বৃকে শোধনের জন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত বৃকটি অসংখ্য সরু সরু টিউবের (tubules) সমষ্টি মাত্র। ইহার চতুঃপার্শ্ব বাহিরের অংশকে কর্টেক্স (Cortex) এবং ভিতরের মাঝামাঝি স্থানকে মেডুলা (Medulla) বলে। ইহা ছাড়া ইউরেটার নামক টিউবটি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে তাহা দেখিতে অনেকটা ফানেলের মত। এই ফানেলাকৃতি অংশকে পেলভিস (Pelvis) বলে। এই সকল সরু টিউবের এক প্রান্তে বাল্‌বের মত একটি স্ফীত অংশ আছে। এই স্ফীত অংশটিকে বোওম্যান ক্যাপসুল (Bowman's capsule) বলে। ইহা বৃকের বহিরাবরণ কর্টেক্সে অবস্থিত। এই ক্যাপসুলের মধ্যে ধমনীর অসংখ্য জালক (Capillaries) বর্তমান এবং এই সকল জালক



বৃকটি কতকগুলি সরু সরু টিউবের সমষ্টি মাত্র

গ্লোমেরিউলাস (Glomerulus) নামে পরিচিত। ক্যাপসুলের পরেই সরু টিউবগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া কয়েক বার ঘুরিয়া অবশেষে মেডুলা স্থানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা টিউবে আসিয়া মিশিয়াছে। এক একটি মোটা টিউবের সঙ্গে এইরূপ অনেক সরু সরু টিউব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সকল মোটা টিউবগুলি আবার ইউরেটারের ফানেলাকৃতি মুখের সহিত সংযুক্ত।

সকল টিউবগুলি যে পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে তাহার চারিপাশে উহাদের ঘিরিয়া অসংখ্য জালক অবস্থান করিতেছে। রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়া দূষিত রক্ত প্রথমে এই সকল বোঁদ্যমান ক্যাপসুলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্যাপসুলের অন্তর্গত জালকের (গ্লোমেরিউলাস) পাতলা গাত্রপ্রাচীর ও ক্যাপসুলের ভিতরের গাত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া ছাঁকন প্রক্রিয়ায় (Filtration) রক্তের মধ্যে অবস্থিত দূষিত পদার্থসমূহ, গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি জলের সহিত সৰু টিউবের মধ্যে চলিয়া যায়। গ্লোমেরিউলাসের গাত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া রক্ত কণিকা ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যাইতে পারে না। সুতরাং ক্যাপসুলের এই ছাঁকন প্রক্রিয়ায় রক্ত দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত হইলেও উহাতে গ্লুকোজ ও প্রয়োজনীয় ধাতব লবণের হ্রাস ঘটে। কিন্তু ঐ সৰু টিউবের মধ্য দিয়া যখন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ ও দূষিত পদার্থসমূহ জলে দ্রবীভূত অবস্থায়



ক্যাপসুলের মধ্যে বিস্তৃত রক্ত প্রস্রব হইতেছে

ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন ঐ টিউবের গাত্র-প্রাচীর ঐ সকল ধাতব লবণ, গ্লুকোজ এবং অধিকাংশ জল শোষণ করিয়া পুনরায় রক্তে ফিরাইয়া দেয়। সুতরাং টিউবের অপর প্রান্তে যখন উহা বড় টিউবে আসিয়া পৌঁছে তখন ঐ জলীয় দ্রবণে শুধু দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহই থাকে এবং এই দ্রবণকেই মূত্র (Urine) নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে অসংখ্য সৰু সৰু টিউবের মধ্য দিয়া মূত্র আসিয়া

বড় টিউবে পৌঁছিলে উহা ঐ টিউব হইতে গবিনীর (Ureter) মুখে ফানেলাকৃতি অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখান হইতে মূত্র গবিনীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে গিয়া জমা হয়। এই মূত্রাশয়ে মূত্রের আধিক্য ঘটিলে মূত্রাশয়ের চাপে উহা নীচের মূত্রনালীর (urethra) মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর সংযোগস্থলে একটি ভালব (valve) বা কপাট আছে। মূত্রাশয়ে চাপের আধিক্য হইলে ঐ ভালব খুলিয়া মূত্র মূত্রনালীতে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ ভালবের মুখ বন্ধ থাকে।

## স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ তন্ত্র

( Nervous System )

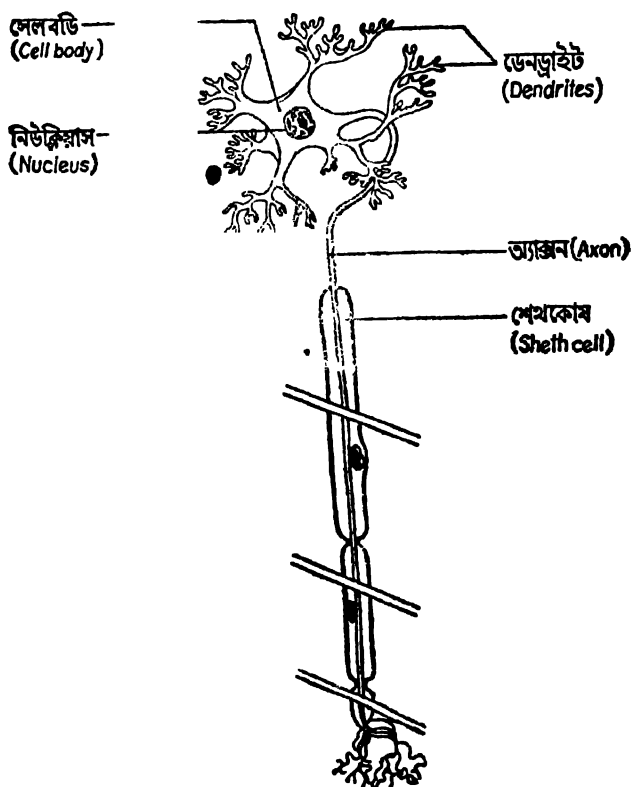
স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে ? তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে হাতে আগুনের সেকা লাগিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই। কিন্তু কাহার হুকুমে হাত সরাইয়া লওয়া হয় এবং কোথা হইতে এই হুকুম আসিল তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? ভাল খাটুত্ব দেখিলে অথবা উহাদের গন্ধে আমাদের মুখে লালো নিঃসৃত হয়। দেখা কাজটা চোখের এবং ভ্রাণের কাজটা নাকের। তাহা হইলে মুখে লালো নিঃসৃত হয় কেন ? নিশ্চয়ই এই দেখা এবং ভ্রাণের সহিত লালো নিঃসরণের একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে এই কার্য-কারণের যোগাযোগ সাধন হইতেছে কি প্রকারে ? আবার ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার গায়ে মশায় কামড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তোমার হাত ঐ স্থানে মশা তাড়াইতে চলিল। কি করিয়া হাত খবর পাইল এবং কাহার আদেশে সে মশা তাড়াইতে চলিল ? এইরূপে আমাদের দৈনন্দিন গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের হাত, পা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ যেন কোথা হইতে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেখানে যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে দ্রুত খবর লইয়া যাওয়া হয় তেমনি সেখান হইতে দ্রুত আদেশ বহন করিয়া দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দেহের মধ্যে দ্রুত খবরাখবর বহন করিয়া অবস্থানসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। দেহের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রটিকে টেলিগ্রাফ বিভাগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এবং স্নায়ুকান্ড (spinal cord) ইহার হেড-অফিস ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ইহার শাখা অফিস। স্নায়ুগুলি (nerves) হেড-অফিসের সহিত শাখা-অফিসের সংযোগকারী তার এবং বিভিন্ন ইঞ্জিয়গুলি সংবাদ সংগ্রহ

কেন্দ্র। দেহের পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি এই অফিসের আজ্ঞাবহ বাহন। হাতে আঙুলের সেকা লাগা, ভাল খাবার দেখা বা উহার গন্ধ পাওয়া কিংবা গায়ে মশার কামড় ইত্যাদি খবর সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুকাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং এই হেড-অফিস হইতে আবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরাইয়া লইবার, মুখে লালি নিঃসরণের এবং হাতের দ্বারা মশা তাড়াইবার হুকুম আসিয়া পৌঁছে। তাই ঐ সকল অঙ্গের এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং যে তন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি, শুনি, ভ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করি অথবা স্পর্শ, বেদনা, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অনুভব করি, ভালমন্দ বিবেচনা করি কিংবা সুখ-দুঃখ টের পাই এবং কখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আবার কখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি চালনা করি তাহারই নাম স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র।

**স্নায়ুতন্ত্রের গঠন :** মস্তিষ্ক বা মগজ এবং স্নায়ুকাণ্ড স্নায়ুতন্ত্রের হেড-অফিস তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হইতে যেমন মহাধমনী বাহির হইয়া উহা কতগুলি শাখা ধমনীতে বিভক্ত হয় এবং ঐ শাখা ধমনীগুলি আবার কতগুলি প্রশাখা ধমনীতে বিভক্ত হইয়া অবশেষে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া পৌঁছে, তেমনি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ড হইতে কতগুলি মোটা মোটা স্নায়ু (Nerve) স্নাতক গ্রাম বাহির হইয়া ঐগুলি আবার কতগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু স্নাতক বিভক্ত হইয়া হাত-পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এই সকল স্নায়ু (Nerves) স্নায়ুকাণ্ড (Spinal cord) এবং মস্তিষ্ক বা মগজ (Brain) লইয়াই স্নায়ুতন্ত্রটি গঠিত।

**স্নায়ু :** স্নায়ুতন্ত্রটি আগাগোড়াই কতগুলি বিশেষ ধরনের কোষের দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলিকে স্নায়ুকোষ (Nerve cells) বা নিউরন (Neuron) বলে। আমাদের হাত-পা, ঠাণ্ডা ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ডে খবর বহিয়া আনা এবং এখান হইতে আবার ইন্দ্রিয়ে খবর পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ কিন্তু একই স্নায়ুদ্বারা হয় না। যে সকল স্নায়ুদ্বারা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হইতে হেড-অফিসে খবর লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদের সংবেদীয় স্নায়ু (Sensory or afferent Nerve) বলে। এই সংবেদীয় স্নায়ু যে কোষ দ্বারা গঠিত তাহাদের সংবেদীয় নিউরন (Sensory neuron) বলে। আবার মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ড হইতে খবর যে সকল স্নায়ু দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের চেষ্টীয় স্নায়ু (efferent or Motor Nerve) বলে এবং এই সকল স্নায়ু চেষ্টীয় নিউরন (efferent Neuron or Motor Neuron) দ্বারা গঠিত। একটি চেষ্টীয় নিউরন (Motor

**Neuron** )-এর ছবি দেখ। নিউরনের যে অংশে উহার নিউক্লিয়াসটি থাকে তাহাকে সেল বডি (Cell body) বলে। এই সেল বডির একটি অংশ হইতে একটি সরু সূতার গায় রজ্জু বাহির হইয়াছে। এইটি বেশ লম্বা—৮।১০ ফুট বা তাহারও অধিক হইতে পারে। উহার শেষপ্রান্ত অনেকগুলি সরু সরু অংশে বিভক্ত থাকে। এই লম্বা সরু রজ্জুটিকে অ্যাক্সন (Axon) বলে। এই অ্যাক্সনটির অধিকাংশ অংশই আবার অল্প একপ্রকার কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার কোষগুলি শেথ কোষ (Sheath cells) নামে পরিচিত। এই কোষের উপরে মায়েলিন (Myelin) নামক চর্বির একটি সাদা আবরণ থাকে। এই মায়েলিনের জগুই অ্যাক্সনটি দেখিতে শ্বেতবর্ণ। সেল বডির অগ্নাগ্ন



চেষ্ট্রিয় নিউরন

অংশ হইতে আরও কতগুলি ছোট ছোট অংশ বাহির হয় এবং এই সকল উদ্ভূত অংশগুলি আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। এইগুলিকে ডেনড্রাইট (Dendrites) বলে। সূতরাং এক একটি চেষ্ট্রিয় নিউরন সেল বডি, অ্যাক্সন

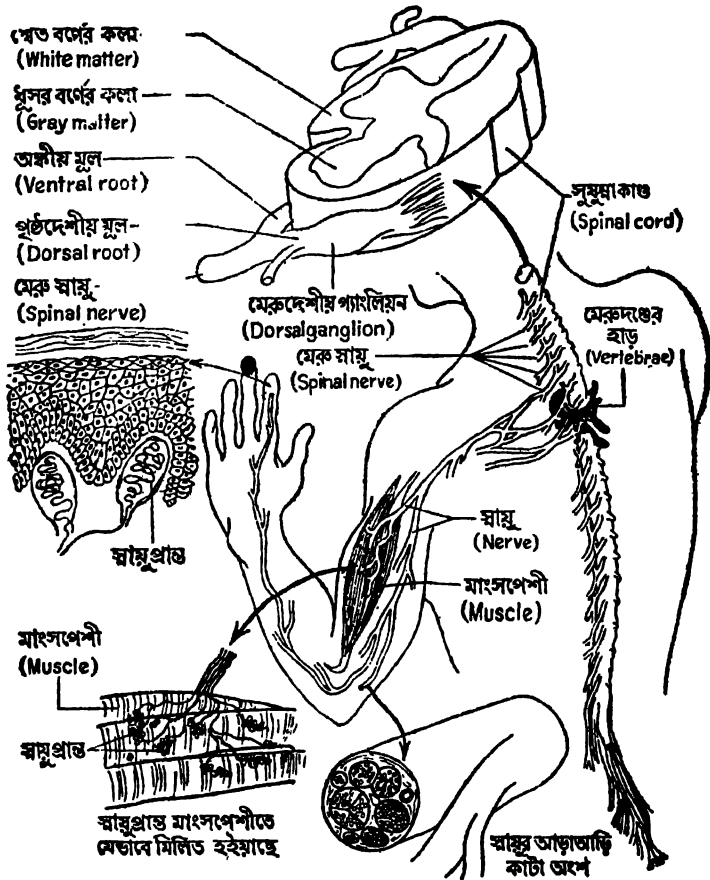
এবং কতগুলি ডেনড্রাইট লইয়া গঠিত। চেষ্টিয় নিউরনের সেল-বডি এবং ডেনড্রাইট সাধারণতঃ মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুস্নাকাকোণের মধ্যে থাকে। উহার অ্যাক্সনটি ঐ হেড অফিস হইতে প্রসারিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুস্নাকাকোণ হইতে খবর এই অ্যাক্সনের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়।

সংবেদীয় নিউরন (Sensory Neuron)ও একটি কোষ এবং ইহার নিউক্লিয়াসটি উহার সেল বডির মধ্যে অবস্থিত। এই সেল বডি হইতে একটি লম্বা ও একটি ছোট (short) সক্রিয়তার স্নায়ু অংশ বাহির হয়। লম্বাটিকে অ্যাক্সন এবং ছোটটিকে ডেনড্রাইট বলে। অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট উভয়ের শেষপ্রান্ত কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। সংবেদীয় নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্তটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের (হাত, পা, চোখ, নাক, ত্বক ইত্যাদি) কোষের সহিত যুক্ত থাকে এবং ডেনড্রাইট মস্তিষ্ক বা স্নায়ুস্নাকাকোণের মধ্যে থাকে। উহার সেল বডিটি কিন্তু মস্তিষ্ক বা স্নায়ুস্নাকাকোণের মধ্যে থাকে না। সমস্ত সংবেদীয় নিউরনের সেল বডি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুস্নাকাকোণের বাহিরে উহাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় দলবদ্ধভাবে থাকে। এই জায়গাকে গ্যাংলিয়ন (Ganglion) বলে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে খবর গ্রহণ করিয়া সংবেদীয় নিউরন মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুস্নাকাকোণে পৌঁছাইয়া দেয়।

সংবেদীয় নিউরন এবং চেষ্টিয় নিউরনের কতগুলি অ্যাক্সন একত্রিত হইয়া একটি স্নায়ু (Nerve) গঠিত হয়। অ্যাক্সনগুলি মায়েলিনের (Myelin) সাদা আবরণে আবৃত থাকে বলিয়া স্নায়ুগুলিও দেখিতে সাদা হয়। স্নতরাং এক একটি স্নায়ু একগুচ্ছ অ্যাক্সনের সমষ্টি মাত্র এবং ইহাতে সাধারণতঃ সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার নিউরনের অ্যাক্সনই বর্তমান। একটি স্নায়ুর সংবেদীয় নিউরনের অ্যাক্সনগুলি, ত্বক, চোখ, নাক ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রাহক ইন্ড্রিয়ের কোষের সহিত যুক্ত থাকিয়া সংবাদ গ্রহণ করে এবং ঐ একই স্নায়ুর চেষ্টিয় অ্যাক্সনের প্রান্তসমূহ পেণী, গ্রন্থি ইত্যাদি আঞ্জাবহ অঙ্গের কোষের সহিত যুক্ত থাকিয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ুস্নাকাকোণের আদেশ ঐ সকল অঙ্গে পৌঁছাইয়া দেয়। স্নতরাং একটি স্নায়ুর মধ্য দিয়া উভয় দিকেই খবরখবর যাতায়াত করিতে পারে।

**স্নায়ুস্নাকাকোণ :** স্নায়ুগুলির অপস্রান্ত স্নায়ুস্নাকাকোণে আসিয়া শেষ হইয়াছে। স্নায়ুস্নাকাকোণের দিকে অগ্রসর হইবার সময় সক্রিয় স্নায়ুগুলি মিলিত হইয়া এক একটি মোটা স্নায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপ কয়েকটি মোটা স্নায়ু মিলিত হইয়া অবশেষে মেরু স্নায়ু (Spinal nerves) নামে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া স্নায়ুস্নাকাকোণে

আসিয়া মিলিত হয়। স্বস্থ্যাকাণ্ডের বুক ও পিঠের দিক হইতে গাছের ডাল-পালার স্তায় এইরূপ ৩১ জোড়া মেরু স্নায়ু বাহির হইয়া হাতে, বৃকে, পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পিঠের মেরুদণ্ডটি কতগুলি ছিদ্র-যুক্ত হাড় একটির উপর অপর একটি জুড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ফলে মেরুদণ্ডের



### দেহের বিভিন্ন অংশে স্নায়ু তন্ত্রের অবস্থান

মধ্যে বরাবর একটি নলের মত গর্ত আছে। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক দুইটি হাড়ের সংযোগস্থলের দুই পাশে দুইটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া মেরু স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের গর্তের মধ্যে আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে। একগাছা ইলেকট্রিক কেবলের (Cable) মধ্যে যেমন তারগুচ্ছ বাঁধা থাকে, তেমনি মেরুদণ্ডের মধ্যে স্নায়ুকোষের মোটা গুচ্ছ আছে। এই গুচ্ছ নীচে বস্তু প্রদর্শন হইতে আরম্ভ

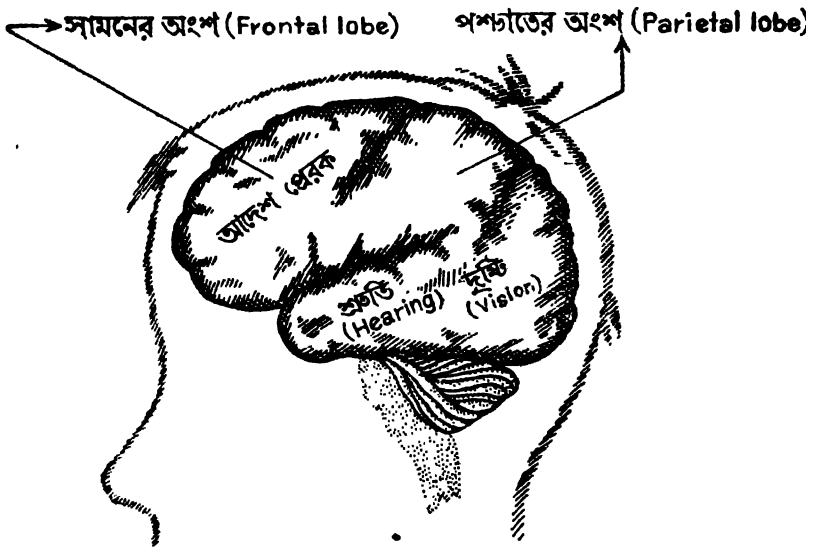


কারয়া উপরে মগজের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানে মস্তিষ্কের করোটির ছিদ্র দিয়া আবার নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে বস্তু প্রদেশ হইতে মগজ পর্যন্ত স্নায়ু কোষের এই গোছাকেই স্নায়ুশাখাও (Spinal Cord) বলে। ইহা প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং একটি আঙুলের মত মোটা। প্রত্যেকটি মেরুস্নায়ু মেরুদণ্ডের ছিদ্র দিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মূল (root) বলে। একটি মূল পিঠের দিকে এবং অপরটি বুকের দিকে আসিয়া স্নায়ুশাখাওের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। প্রথমটিকে পৃষ্ঠদেশীয় মূল (Dorsal root) এবং শেষেরটিকে অক্ষীয় মূল (Ventral root) বলে। পৃষ্ঠদেশীয় মূলের মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীতকায় এবং এই অংশটুকু মেরুদেশীয় গ্যাংলিয়ন (Spinal ganglion) নামে পরিচিত। পূর্বেই বলিয়াছি এক একটি স্নায়ুর মধ্যে সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার তন্তুই (Sensory and Motor fibres) বর্তমান। মেরুস্নায়ুর এই দুই প্রকারের তন্তু মেরুমূলে আসিয়া দুইভাগে ভাগ হইয়াছে। পেটের দিকে অক্ষীয় মূলে কেবলমাত্র চেষ্টিয় তন্তুই (Motor fibres) আছে। স্তব্রাং ইহারা স্নায়ুশাখাও হইতে বিভিন্নদিকে আদেশ বহন করিয়া লইয়া যায়। পৃষ্ঠদেশীয় মূলে শুধু সংবেদীয় তন্তু (sensory fibres) বর্তমান। স্তব্রাং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। সংবেদীয় তন্তু সংবেদীয় নিউরনের দ্বারা গঠিত এবং এই সকল নিউরনের সেল বডি স্নায়ুশাখাওের বাহিরে ঐ স্ফীত অংশ গ্যাংলিয়নে অবস্থিত।

এখন স্নায়ুশাখাওের ভিতরের অবস্থা দেখা যাউক। স্নায়ুশাখাওের প্রস্থচ্ছেদে (Cross section) দুই প্রকারের কলা (Tissue) দেখা যায়। মধ্যখানে একটি সুরু ছিদ্রের চারিদিকে ধূসর বর্ণের কলা (Gray Matter) এবং উহার চারিদিকে শ্বেতবর্ণের কলা (White Matter)। ধূসর বর্ণের অংশটুকু দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির স্তায় (Butterfly-like pattern)। পূর্বে বলিয়াছি যে চেষ্টিয় নিউরনের সেল বডি স্নায়ুশাখাওের মধ্যে থাকে। তাছাড়া চেষ্টিয় নিউরনের অ্যাক্সনের কিছু অংশ মায়েলিন (Myelin) নামক শ্বেত বর্ণের চর্বি জাতীয় পদার্থে আবৃত থাকে। অ্যাক্সনের ঐ সাদা অংশটুকু ছাড়া নিউরনের অবশিষ্ট অংশ ধূসর বর্ণের। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্নায়ুশাখাওের মাঝের ঐ প্রজাপতিসদৃশ অংশটুকু সেল বডি, ডেনড্রাইট এবং মায়েলিনহীন অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। তাই উহা দেখিতে ধূসর বর্ণের। ধূসরবর্ণের চারিদিকের সাদা অংশটুকু মায়েলিন-যুক্ত অ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। মায়েলিনের জগ্গ উহা দেখিতে সাদা। স্তব্রাং সমস্ত স্নায়ুশাখাওটি কতকগুলি স্নায়ু কোষের সমষ্টিমাত্র।

**কাজ :** মাথার নীচে শরীরের বিভিন্ন অংশ হাত, পা, ঝক্ ইত্যাদি হইতে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এবং পেশীর সংকোচন সৃষ্টি করা এই স্নায়ুস্নায়ুকাণ্ডের কাজ। ইহার সাহায্যে কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত-চলাচলও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। লাল গ্রন্থি হইতে লাল নিঃসরণ, জুগপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্ত-নালীর সংকোচন ইত্যাদি কাজ ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মল-ত্যাগ, মূত্র-ত্যাগ, প্রসব ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও এই স্নায়ুস্নায়ুকাণ্ডে অবস্থিত।

**মস্তিষ্ক :** মস্তিষ্ক বা মগজটি মাথায় করোটির মধ্যে অবস্থিত। ইহার গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪২ আউন্স। মস্তিষ্কের আবার কতগুলি অংশ আছে— (১) গুরুমস্তিষ্ক ( cerebrum ), (২) থ্যালামাস ও অধঃথ্যালামাস ( Thalamus or hypothalamus ), (৩) মধ্য মস্তিষ্ক ( Mid-brain ), (৪) মস্তিষ্ক যোজক ( Pons ), (৫) লঘু মস্তিষ্ক ( Cerebellum ) এবং স্নায়ুশীর্ষক ( Medulla oblongata )। মস্তিষ্কের এই বিভিন্ন অংশ হইতে ১২ জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া মাথা এবং ঘাড়ের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। এই স্নায়ুগুলিকে কয়েটি স্নায়ু ( Cranial Nerves ) বলে।

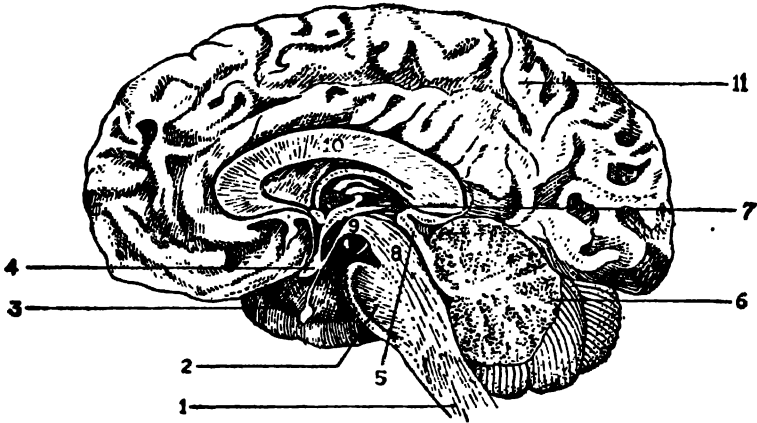


### গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)

**গুরুমস্তিষ্ক :** মস্তিষ্কের মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রধান মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া ইহা অবস্থিত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত

প্রত্যেকটি অংশ কতগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি পিণ্ডে (Lobes) এবং প্রত্যেকটি পিণ্ড আবার কতকগুলি অগভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি ছোট ছোট পিণ্ডকে (Gyri) বিভক্ত হইয়া আছে। এই সকল পিণ্ডকের কোনটি চিন্তাশক্তি, কোনটি দৃষ্টিশক্তি, কোনটি শ্রাবশক্তি ইত্যাদির কেন্দ্র। এক কথায় বলিতে গেলে গুরুমস্তিষ্কই দেহের প্রকৃত কর্তা। ইহার অগোচরে বা আদেশ ব্যতীত খুব সামান্য ক্রিয়াই ঘটিতে পারে। যাহার গুরুমস্তিষ্কের পিণ্ডকের সংখ্যা যত বেশী তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও তত প্রখর। শিশুদের মস্তিষ্কে পিণ্ডকের সংখ্যা অনেক কম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পিণ্ডকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বাড়াইতে পারা যায়। গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাতের অংশই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইখানেই স্রষ্টিকেন্দ্র, দর্শনকেন্দ্র ইত্যাদি অবস্থিত। গুরুমস্তিষ্কের সামনের অংশ হইতে আদেশ দেওয়া হয়।

**থ্যালামাস ও অধঃথ্যালামাস :** মস্তিষ্কের অন্ত্রাত্ম অংশগুলি গুরুমস্তিষ্কের নিম্নদিক হইতে সুষুম্নাকাণ্ড পর্যন্ত স্থানে পর পর অবস্থিত। গুরুমস্তিষ্কের ঠিক



- লম্বালম্বিতাবে কাটা মস্তিষ্ক—(১) সুষুম্নাশীর্ষ; (২) উষ্ণীষক. (৩) পিটুইটারি গ্রন্থি; (৪) অক্ষিয়াদু; (৫) মধ্য মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ; (৬) সেরিবেলাম; (৭) থ্যালামাস; (৮) মধ্য-মস্তিষ্ক; (৯) থ্যালামাসের নিম্নাঞ্চল; (১০) কর্পাস ক্যালোসাম; (১১) গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স।

নীচেই ধূসর রঙের বড় অংশটিকে থ্যালামাস বলে। থ্যালামাসের ঠিক নীচে অধঃথ্যালামাস অবস্থিত। থ্যালামাসের সাহায্যে আমরা খুব গরম, খুব ঠাণ্ডা বা তীব্র বেদনা ইত্যাদি গভীর অনুভূতিগুলি অনুভব করিয়া থাকি। ক্রোধ, লজ্জা, অহুঃখ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনাগুলিও থ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত

হইয়া থাকে। আত্মরক্ষা বা নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অপরকে আক্রমণ করা এই কাজগুলি পরাসমব্যাথী (Parasympathetic) এবং সমব্যাথী (Sympathetic) স্নায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। অধস্থ্যালামাস এই পরাসমব্যাথী এবং সমব্যাথী স্নায়ু দুইটির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। নিদ্রা ও দেহের তাপ সংরক্ষণের ব্যাপারেও অধস্থ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদানের বিপাকক্রিয়া ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

**মধ্য-মস্তিষ্ক :** থ্যালামাস এবং অধস্থ্যালামাসের ঠিক নীচেই এই অংশটি অবস্থিত। ইহার উপরের দিকে গুরুমস্তিষ্ক, থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস এবং নীচের দিকে মস্তিষ্ক যোজক ও লঘুমস্তিষ্ক। ইহার পিছন দিকে চারিটি টিবি আছে। ইহাদের পিণ্ডচতুষ্টয় (Corpora quadrigemina) বলে। উপরের পিণ্ড দুইটিকে নিয়দৃষ্টিকেন্দ্র বলে। কারণ চোখে হঠাৎ তীব্র আলো পড়িলে চোখ যে ছোট হইয়া বা বুজিয়া আসে তাহা এই দুইটি টিপির ক্রিয়ার জন্য। নিয়পিণ্ড দুইটি নিয়শ্রুতিকেন্দ্র নামে পরিচিত কারণ ইহারা শ্রুতিবহ তন্তুগুলির বিরতি স্থানরূপে কাজ করে। মধ্য মস্তিষ্কে লোহিত নিউক্লিয়াস (Red Nucleus) এবং ক্রমোপাদান (Substantia nigra) নামক দুইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে। লোহিত নিউক্লিয়াসের সাহায্যে পেশীর কতগুলি বিশিষ্ট সঞ্চালনক্রিয়া সাধিত হয়। নৃত্য, ব্যায়াম ইত্যাদি ক্রিয়াতে আমাদের পেশীর নিপুণ সঞ্চালন প্রয়োজন। ক্রমোপাদান এই সকল পেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

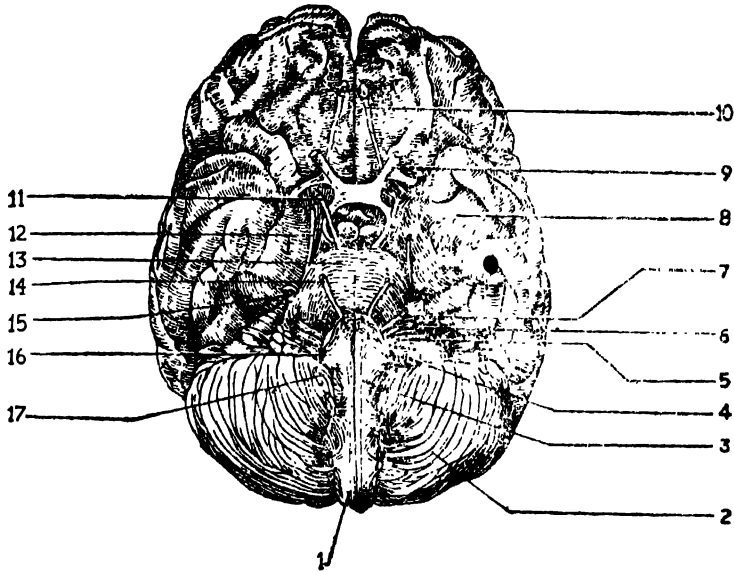
**মস্তিষ্ক যোজক :** মধ্যমস্তিষ্কের নীচে এই অংশটি অবস্থিত। ইহা মধ্যমস্তিষ্কের সহিত স্নায়ুশীর্ষক ও লঘু মস্তিষ্কের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা নাসিকা এবং বাক্যতন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। আহার করিবার সময় মুখের এবং গলাধঃকরণের সময় গলার পেশীগুলিও ইহার সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

**লঘু মস্তিষ্ক :** ইহা মস্তিষ্ক যোজক, স্নায়ুশীর্ষক ও মধ্য মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে। হাঁটা-চলা, দৌড়ান বা কোন প্রকার শারীরিক কাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশের পেশী কাজ করিয়া থাকে। এই সকল পেশীর কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করাই লঘু মস্তিষ্কের কাজ। পেশীর স্বাভাবিক সংকোচনও ইহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে।

**স্নায়ুশীর্ষক :** ইহা ঠিক মস্তিষ্ক যোজকের নীচে এবং স্নায়ুকাণ্ডের উপরে অবস্থিত। এই অংশটি হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, ধমনী সংকোচন, লালানিঃসরণ, বমন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই অংশটিতে আঘাত লাগিলে স্নেহ

সঙ্গে সংজ্ঞা লোপ পায় এমন কি গুরুতর আঘাতে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। যকুতে যে কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় তাহা এই কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাঙ ও অগ্ন্যাশ্ব ইতর প্রাণীর এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**করোটি স্নায়ু (Cranial Nerves) :** মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে যে বার জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া করোটির ছিদ্রপথে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, কর্ণ, স্বপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদিতে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাদের করোটি স্নায়ু বলে। নিম্নে এই সকল স্নায়ুর নাম, উৎপত্তি ও কাজ দেওয়া



মস্তিষ্কের অভ্যন্তর—(1) মস্তিষ্কশীর্ষ ; (2) লবু-মস্তিষ্ক ; (3) মস্তিষ্কশীর্ষ ; (4) গুরুমস্তিষ্কের কটেক্স ; (13) উচ্চাধিক, (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17)—১২ জোড়া করোটি স্নায়ু। ইহাব মধ্যে (10) স্নায়ু স্নায়ু ; (9) অক্ষি স্নায়ু, (7) মুখমণ্ডলের স্নায়ু ; (6) শ্রবণ স্নায়ু ; (4) ভেগাস স্নায়ু ইত্যাদি।

হইল। এই সকল স্নায়ুর কোনটি সংবেদীয়, কোনটি চেষ্টিয় এবং কোনটি আবার উভয় প্রকার স্নায়ুর দ্বারা গঠিত।

(১) **স্রাববহ স্নায়ু (Olfactory Nerve) :** নাসিকার অভ্যন্তরে স্রাবেন্দ্রিয় হইতে বাহির হইয়া এই স্নায়ু গুরুমস্তিষ্কে আসিয়া শেষ হয়। ইহা মস্তিষ্কে স্রাব অহুভূতি বহন করে। স্বতরাং ইহা সংবেদীয় স্নায়ু।

(২) **দৃষ্টিবহ স্নায়ু (Optic Nerve) :** ইহা অক্ষিপট (Retina) হইতে আরম্ভ হইয়া গুরুমস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা দৃষ্টি

অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহা এক প্রকারের সংবেদীয় স্নায়ু।

(৩) অক্ষিগোলকের পেশীসমূহের চেষ্টিয় স্নায়ু (Oculomotor Nerve) : ইহা মধ্যমস্তিক হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুকোটর এবং চক্ষুর বাহিরের দিকের পেশীসমূহে বিস্তৃত। এই স্নায়ুর সাহায্যে চোখ উপরে, নীচে বা নাকের দিকে ঘুরানো যায়। তাঁর আলোকে যে চোখ ছোট হইয়া আসে তা এই স্নায়ুর জন্তই। তাছাড়া ইহার সাহায্যে চোখের উপরের পাতা উঠাইতে পারা যায়। এই সমস্তই চেষ্টিয় স্নায়ুর কাজ।

(৪) অক্ষিগোলকের উর্ধ্ববক্রগ পেশীর স্নায়ু (Trochlear Nerve) : ইহাও মধ্যমস্তিক হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর পেশীতে বিস্তৃত থাকে। ইহার সাহায্যে চোখ নীচের দিকে ঘুরান যায়। ইহাও চেষ্টিয় স্নায়ু।

(৫) মুখমণ্ডলের ত্রিশাখা স্নায়ু (Trigeminal Nerve) : ইহা সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার স্নায়ুর দ্বারা গঠিত। সংবেদীয় স্নায়ুগুলি সমগ্র মুখমণ্ডলের সাধারণ অনুভূতিগুলি অর্ধচন্দ্রাকার স্নায়ুগ্রন্থিতে লইয়া যায়। ইহার চেষ্টিয় স্নায়ুগুলি মধ্যমস্তিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৬) অক্ষিগোলকের বহিঃপার্শ্ব পেশীর স্নায়ু (Abducent Nerve) : এই স্নায়ু মধ্যমস্তিক হইতে বাহির হইয়া চক্ষুর পেশীতে বিস্তৃত থাকে। ইহার সাহায্যে একই সঙ্গে এক চক্ষুকে বাহিরের দিকে এবং অপরটিকে নাকের দিকে ঘুরান যায়। ইহা একটি চেষ্টিয় স্নায়ু।

(৭) মৌখিক স্নায়ু (Facial Nerve) : ইহা স্নায়ুশীর্ষক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার স্নায়ুই ইহাতে আছে। এই স্নায়ুর সাহায্যে মুখের সকল পেশী কাজ করিয়া থাকে। জিহ্বার সন্মুখের অংশ হইতে স্বাদ-অনুভূতিও ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে।

(৮) শ্রুতিবহ স্নায়ু (Auditory Nerve) : ইহা কর্ণকোটর হইতে উৎপন্ন হইয়া গুরুমস্তিষ্কে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ইহার সাহায্যে শ্রুতি-প্রবাহ মস্তিষ্কে লইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং ইহা সংবেদীয় স্নায়ু।

(৯) জিহ্বামূলীয় স্নায়ু (Glossopharyngeal Nerve) : ইহা স্নায়ুশীর্ষক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাও সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার স্নায়ুদ্বারা গঠিত। সংবেদীয় স্নায়ু জিহবা হইতে স্বাদ-অনুভূতি বহন করিয়া লইয়া যায়। চেষ্টিয় স্নায়ুদ্বারা গলবিলের (Pharynx) মাংসপেশীর সংকোচন হইয়া থাকে।

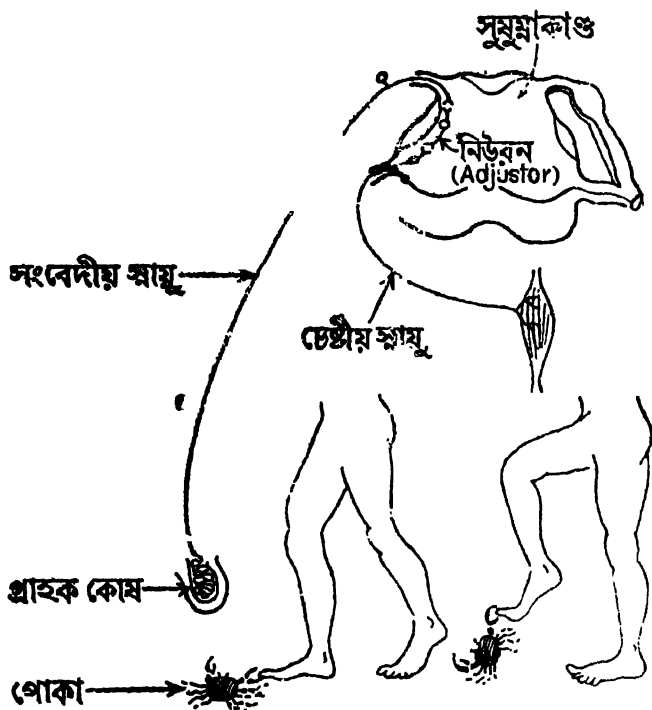
(১০) **ভেগাস স্নায়ু (Vagus Nerve)** : ইহা স্নায়ুশীর্ষক হইতে উৎপন্ন হয় এবং সংবেদীয় ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ুর দ্বারাই গঠিত। এই সকল স্নায়ু ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতিতে বিস্তৃত থাকে। ইহার সাহায্যে পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংকোচন এবং উহাদের রস ক্ষরিত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হ্রাসও ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে। সংবেদীয় স্নায়ু ফুসফুস হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় অহুভূতি শ্বাসকেজ্রে লইয়া যায়।

(১১) **মেরুস্নায়ুর সহায়ক স্নায়ু (Spinal accessory Nerve)** : ইহার উৎপত্তিস্থল স্নায়ুশীর্ষক ও স্নায়ুকাণ্ড। স্টার্নোমেস্টয়েড এবং ট্রাশিজিয়স নামক দুইটি পেশীর ক্রিয়া ইহার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

(১২) **রসনা-নিম্নবর্তী স্নায়ু (Hypoglossal Nerve)** : ইহা স্নায়ুশীর্ষক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জিহ্বার পেশীগুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করাই এই স্নায়ুর কাজ।

**স্নায়ু-তন্ত্রের ক্রিয়া প্রণালী** : দেহের মধ্যে স্নায়ু জাল কিভাবে ছড়াইয়া আছে তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্নায়ুগুলি নিজেরাই বাহির হইতে খবর সংগ্রহ করে না বা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ডের আদেশে কার্য করে না। বিভিন্ন খবরাখবর পরিবহন করিবার কাজটুকুই স্নায়ুতন্ত্রের। খবর সংগ্রহ ও আদেশ পালনের জগৎ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি রহিয়াছে। স্ততরাং একটি কাজ সুসম্পন্ন করিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র, পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি একযোগে কাজ করিয়া থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, তোমার ডান পায়ের আঙ্গুলে একটি পোকায় কামড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি ডান পাখানা সরাইয়া ফেলিবে। পোকাটি তোমার পায়ের চামড়া বা ত্বকে কামড়াইল। চামড়া বা ত্বক চারি প্রকারের কোষে গঠিত। ইহাদের কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি স্পর্শ আবার কোনটি বেদনা অহুভব করিতে পারে। দেহের সর্বত্রই এই চারি প্রকারের কোষ ছড়াইয়া আছে। তাই আমরা দেহের সব জায়গায়ই এই চারি প্রকারের অহুভূতি গ্রহণ করিতে পারি। বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় বলিয়া ইহাদের গ্রাহক কোষ (Receptor cells) বলে। পোকায় কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানের বেদনা-অহুভূতির গ্রাহককোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে। আবার প্রত্যেকটি গ্রাহককোষের সঙ্গে স্নায়ুর একপ্রান্ত সংযুক্ত থাকে। স্ততরাং গ্রাহককোষের উত্তেজনা সংবেদীয় স্নায়ুর দ্বারা স্নায়ুকাণ্ডে পরিচালিত হয়। সংবেদীয় স্নায়ুর সেল বডি এবং ডেনড্রাইট স্নায়ুকাণ্ডের মধ্যে থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এবার এই উত্তেজনা

সংবেদীয় স্নায়ু হইতে স্নায়ুশাখাও অবস্থিত adjustor নিউরনের সাহায্যে চেষ্টিয় স্নায়ুতে পরিবাহিত হয়। Adjustor নিউরনগুলি সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় নিউরনের মধ্যে ডেনড্রাইটের মাধ্যমে যোগসাধন করে (চিত্র 'ক' দেখ)। একটি নিউরন



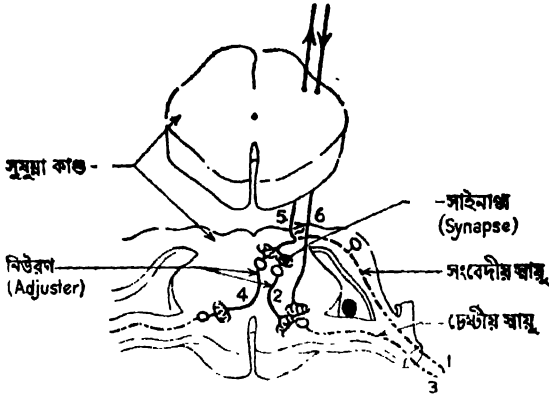
চিত্র 'ক'

অপর একটি নিউরনের সহিত সরাসরি সংযুক্ত থাকে না; দুইটি সংযুক্ত নিউরনের ডেনড্রাইটগুলি এক জায়গায় আসিয়া একত্রিত হয়। এই জায়গাটিকে সাইনাপ্স (Synapse) বলে। সাইনাপ্সকে আমাদের ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ডের বোতামের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বোতামটি টিপিয়া দিলেই দুইটি তারের মধ্যে সংযোগ সাধিত হইয়া বাতিটি জলিয়া উঠে। শোভামটি না টেপা পর্যন্ত উহাদের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় না এবং বাতিও জলে না। সাইনাপ্সেও দুইটি নিউরন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না; উহাদের মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। উত্তেজনার স্থিতি হইলে উত্তেজিত নিউরন হইতে অ্যাসিটিল কলিন (Acetyl choline) নামক একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বাহির হয়। ইহার সাহায্যেই সন্নিহিত নিউরনে উত্তেজনার স্থিতি হয়। এইরূপে অ্যাসিটিল কলিনের সাহায্যে সাইনাপ্সের মধ্য দিয়া একটি নিউরন হইতে অন্য একটি নিউরনে



## স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র

উদ্বেজনা প্রবাহিত হয়। স্নায়ুকাণ্ড ও মস্তিষ্কে এইরূপ অসংখ্য সাইনাপ্স আছে। সুইস বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম টিপিয়া যেমন আমরা একই স্থান হইতে বিভিন্ন ঘরের আলো জ্বালাইতে পারি, তেমনি এই স্নায়ুকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন সাইনাপ্সের সাহায্যে খবরাখবর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাঠাইতে পারা যায়। সুতরাং সংবেদীয় স্নায়ু যে উদ্বেজনা স্নায়ুকাণ্ডে বহন করিয়া আনিল তাহা সঙ্গে সঙ্গে adjustor নিউরনের সাহায্যে দুইটি সাইনাপ্স অতিক্রম করিয়া চেষ্টীয় স্নায়ু ৫ পাঠান হইল ('খ' চিত্রে ১, ২, ৩ পথে) চেষ্টীয় স্নায়ু মারফত



চিত্র 'খ' -- একটি প্রতিবর্তিত স্নায়বিক চক্র (Reflex Arc)

পায়ের ঐ স্থানের পেশীর কাছে গরুর গেল - 'পা সরাইয়া লও'। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের মাংসপেশী সংকুচিত হইয়া পা সরাইয়া লইল। মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি যে সকল অঙ্গ স্নায়ুর আদেশ পালন করে তাহাদের Effector বলে। সুতরাং পোকাকার কাপড়ের উদ্বেজনা একটি গ্রাহক কোষ, একটি সংবেদীয় স্নায়ু, একটি adjustor নিউরন, একটি চেষ্টীয় স্নায়ু হইয়া আবার মাংসপেশীতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপ ক্রিয়াকে প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া (Reflex action) বলে এবং যে চক্রে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইল তাহাকে প্রতিবর্তিত স্নায়বিক চক্র (Reflex arc) বলে। সুতরাং একটি প্রতিবর্তিত স্নায়বিক চক্র কতগুলি গ্রাহক কোষ (Receptor cells), সংবেদীয়, চেষ্টীয় এবং adjustor নিউরন ও effector অঙ্গ লইয়া গঠিত। প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়।

সংবেদীয় স্নায়ু দ্বারা সংগৃহীত উদ্বেজনা কিন্তু ঐ একই অঙ্গে চেষ্টীয় স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া অঙ্গ অঙ্গেও (চিত্রে ১, ৪ পথে) যাইতে পারে। উপরের প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়ায় পা সরাইয়া লইবার আদেশ স্নায়ুকাণ্ড হইতেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবরটি প্রথমে মস্তিষ্কে

যাইবে ( চিত্রে ১, ৫ পথে ) এবং মস্তিষ্ক হইতে পা সরাইয়া লইবার আদেশ ( চিত্রে ৬, ৩ পথে ) পায়ের পেশীতে উপস্থিত হইবে। স্নায়ুর মধ্য দিয়া খবরা-খবর মিনিটে ৬'৪ কিলোমিটার গতিবেগে গমনাগমন করে। পায়ের আঙ্গুল হইতে মেরুদণ্ড বা মগজ পর্যন্ত স্থান মাত্র কয়েক ফুট। এইটুকু পথ যাতায়াত করিতে এক সেকেন্ডও লাগে না। সুতরাং আঙ্গুলে কামড় দেওয়া এবং পা সরাইয়া লইবার মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্নায়ুকাণ্ডের মধ্যে সাইনাপ্সের মধ্য দিয়া উদ্ভেজনা যে বিভিন্ন দিকে যাইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করা যায়।

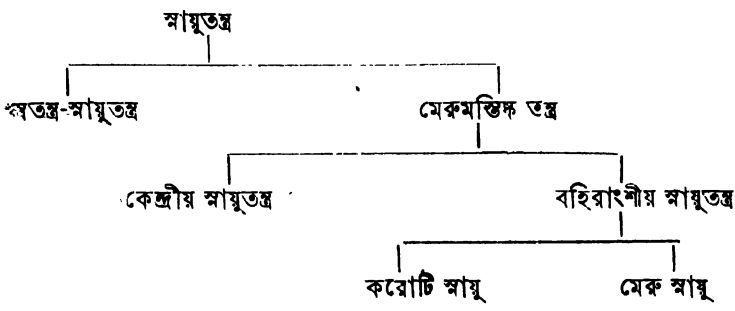
একটি ব্যাণ্ডের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া কিছুক্ষণ পরে যদি উহার একটি পায়ে আলপিন ফুটান হয়, তবে দেখা যাইবে যে ব্যাণ্ড ঐ পাখানি সরাইয়া লয়। ইহা একটি প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া এবং ইহা চিত্রের ১, ২, ৩ প্রতিবর্তিত স্নায়বিক চক্রে সম্পন্ন হইতেছে। এবার যদি উহার বুকের উপর একবিন্দু অ্যামিড ফেলা হয় তবে দেখা যাইবে যে ব্যাণ্ডটি উহা হাতের সাহায্যে অপসারণের চেষ্টা করিতেছে। হাত দুইখানি ধরিয়া রাখিলে এবার সে একখানি পা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। দুইখানি হাত এবং একখানি পা ধরিয়া রাখিলে সে অপর দু'খানি সাহায্যে অ্যামিড অপসারণের চেষ্টা করিবে। মস্তিষ্ক অপসারণের জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া স্নায়ুকাণ্ডের আদেশেই হইতেছে এবং বিভিন্ন হাত-পা ব্যবহার করায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে স্নায়ুকাণ্ডের মধ্য দিয়া সাইনাপ্সের সাহায্যে উদ্ভেজনা বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইতেছে। মস্তিষ্কটি না থাকায় এই সকল ক্রিয়াতে ব্যাণ্ডের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই। সুতরাং এই সমস্তই প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া। পাকস্থলীতে অন্নরস স্রবণ, স্বাস্থ্য খাওয়া গ্রহণে মুখে লালানিঃসরণ, তীব্র আলোকে চক্ষুতরকার সংকোচন, ইত্যাদি সমস্তই প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়া।

**স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র ( Autonomic nervous system ) :** এই পর্যন্ত যে স্নায়ুর কথা বলা হইতেছে তাহারা সকলেই মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ডই এই সকল স্নায়ুর কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই সকল স্নায়ু ছাড়াও দেহের মধ্যে অল্প এক প্রকারের স্নায়ু আছে যাহারা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে। এই জাতীয় স্নায়ু-তন্ত্রকে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র বলে। দেহের মধ্যে কোন প্রকার আকস্মিক উদ্ভেজনার কারণ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধান করাই এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। এই স্নায়ুতন্ত্রটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সমবায়ী স্নায়ু ( Sympathetic Nerves ) এবং (২) পরাসমবায়ী স্নায়ু ( Parasympathetic Nerves )। ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ কতগুলি স্নায়ুগ্রন্থি ( Ganglion ) অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখ স্নায়ু লইয়া গঠিত। চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা, অস্ত্র, বৃক্ক, যন্ত্রাশয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের দুইপ্রকার স্নায়ুরই প্রভাবাধীন। দেহরক্ষার ব্যাপারে সমবায়ী স্নায়ু সর্বদাই অপরকে আক্রমণ করিয়া শক্তির

অপচয় করিয়া থাকে। পরাসমব্যাথী স্নায়ু বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। সে শক্তির অপচয় বন্ধ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণের দ্বারা দেহকে অপরের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা দেহের অলীক অংশের সাম্য রক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া কতগুলি পরাসমব্যাথী স্নায়ু মল-মূত্র-ত্যাগ এবং সন্তান প্রসবেও সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা আজকাল স্থির হইয়াছে যে স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের উপর মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমাঝাকণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকিলেও পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

**স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ :** আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমাঝাকণ্ড এবং ইহাদের প্রভাবাধীন যে সকল স্নায়ু তাহাদের লইয়া একটি বিভাগ গঠিত। এই বিভাগটিকে **মেরুমস্তিষ্ক তন্ত্র (Cerebrospinal system)** বলে। ইহা ছাড়া যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমাঝাকণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাহিরে তাহাদের লইয়া দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত। ইহাকে **স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic system)** বলে। মেরুমস্তিষ্ক তন্ত্রটিকে আবার দুইটি ভাগে বিভাগ করা হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমাঝাকণ্ড লইয়া স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশটুকু গঠিত তাহাকে **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous system)** বলে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমাঝাকণ্ড হইতে খবরাখবর দেহের বিভিন্ন অংশে যে স্নায়ু দ্বারা বহন করা হয় এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুমাঝাকণ্ডে যাহাদের সাহায্যে খবরাখবর আনিয়ন করা হয়, এই উভয় প্রকার স্নায়ু লইয়া **বহিরাংশীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous system)** গঠিত।

বহিরাংশীয় স্নায়ুগুলির আবার দুইটি ভাগ আছে—(১) **করোটী স্নায়ু (Cranial Nerves)**। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ১২ জোড়া এইরূপ স্নায়ু বাহির হইয়াছে। (২) **মেরুস্নায়ু (Spinal Nerves)**। স্নায়ুমাঝাকণ্ড হইতে ৩১ জোড়া এইরূপ স্নায়ু বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া আছে।



## অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

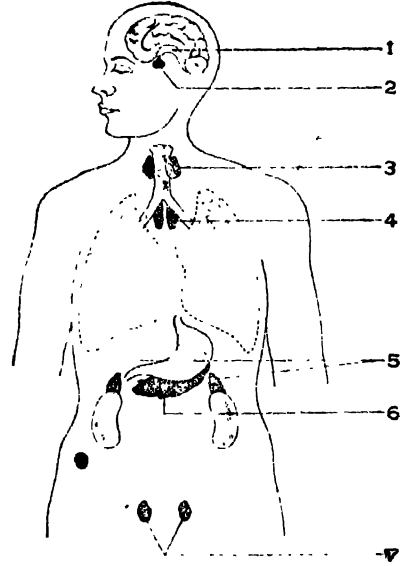
### ( Endocrine glands )

দেহের বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকারের রস অনবরতই নিঃসৃত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রস কতকগুলি প্রণালীদ্বারা (duct) তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়াস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ পাচন-তন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাকের জন্য যে লালা লালা-গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় তাহা কতকগুলি প্রণালী দ্বারাই মুখগহ্বরে লইয়া যাওয়া হয়। অম্লরূপভাবে পাকস্থলীতেও কতকগুলি রস পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন প্রণালী-দ্বারা ঐস্থানে নীত হইয়া থাকে। লালা-গ্রন্থি ইত্যাদির ন্যায় যে সকল গ্রন্থির রস নির্দিষ্ট প্রণালী সাহায্যে প্রবাহিত হয় তাহাদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine glands) বলে। প্রথমে ধারণা ছিল যে রস-নিঃস্রাবী সকল গ্রন্থিরই প্রণালী (duct) আছে এবং এই প্রণালী দ্বারাই ঐ রস দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞানী ক্লড বার্নার্ড (Claude Bernard) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যাহাদের এই ধরনের রস পরিবহনের জন্য কোনও প্রণালী নাই। ঐ সকল গ্রন্থির রস সরাসরি রক্তের মধ্যে এবং লসিকায় (lymph) নিঃসৃত হইয়া দেহের বিভিন্ন-স্থানে প্রেরিত হয়। এইজন্য এই সকল গ্রন্থিকে তিনি প্রণালীবহীন গ্রন্থি (ductless glands) বলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে এই প্রকারের সকল গ্রন্থিই প্রণালীবহীন নয়। যেমন, অগ্নাশয় (Pancreas) এই প্রকারের একটি গ্রন্থি হইলেও ইহার প্রণালী আছে। অগ্নাশয়ের একটি অংশ হইতে রস প্রণালী সাহায্যে পরিবাহিত হয়। আবার অন্য আরেকটি অংশ হইতে রস সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয়। এইজন্য এখন এই সকল গ্রন্থিকে 'প্রণালী-বহীন গ্রন্থি' না বলিয়া অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (endocrine glands) বলা হয়। গ্রীক ভাষায় endo মানে অন্ত এবং crino মানে ক্ষরণ। অগ্নাশয়ের দুইটি অংশ আছে—একটি অংশ অন্তঃক্ষরা এবং অপরটি বহিঃক্ষরা। নিম্নে প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিদমূহের নাম দেওয়া হইল।

(১) পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland or epiphysis), (২) পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland or hypophysis), (৩) থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি (Thyroid glands), (৪) প্যাঁরা-থাইরয়েড বা উপগল গ্রন্থি (Parathyroid

glands), (৫) থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland) ও এড্রিনাল বা কটিগ্রন্থি (Adrenal or Suprarenal glands), (৬) অগ্ন্যাশয় (Pancreas), (৭) যৌন গ্রন্থি (Gonads or testes and ovaries)।

এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি লইয়া অন্তঃক্ষরণতন্ত্র গঠিত। এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি-সমূহের রস স্নায়ুতন্ত্রের উপর অদ্ভুত উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া স্টারলিং (Starling) এই এসকেট হরমোন (Hormone) নাম দিয়া ছিলেন। ইংরাজী হরমোন কথাটি গ্রীক শব্দ 'হরমাস' (Harmao) হইতে উদ্ভূত। এই



1. পিনিয়াল গ্রন্থি ; 2. পিটুইটারি গ্রন্থি ;  
3. থাইরয়েড গ্রন্থি ; 4. থাইমাস গ্রন্থি ;  
5. এড্রিনাল গ্রন্থি ; 6. অগ্ন্যাশয় ; 7. যৌন গ্রন্থি।

‘আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করি’ বা ‘আমি জাগ্রত করি’। অতি সামান্য পরিমাণ হরমোনই স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন। উহার জৈবিক অণুঘটকের তায় কাজ করিয়া থাকে। হরমোনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উহার প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় যৌগ। অধুনা রসায়নাগারে অনেক হরমোন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সঠিকরূপে জানা যায় নাই।

## পিটুইটারি গ্রন্থি

( Pituitary gland or Hypophysis )

**অবস্থান :** এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের নিম্নদেশে চক্র স্নায়ুর নির্গমন পথের অনতিদূরে একটি ভিষাকৃতি অস্থিময় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। এই গ্রন্থিটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

- (১) পুরোভাগ ( Pars anterior )
- (২) মধ্যভাগ ( Pars intermedia )
- (৩) পশ্চাৎভাগ ( Pars posterior )

এই তিনটি অংশের মধ্যে পুরোভাগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই অংশ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমূহ শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে নিঃসৃত হরমোন-সমূহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই জন্যই শরীর স্বস্থ রাখিতে সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের মধ্যে এই পিটুইটারি গ্রন্থিটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

**উৎপন্ন হরমোনসমূহ :** পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

- (১) দেহবৃদ্ধিকারক হরমোন ( Growth hormone ), (২) গলগ্রন্থি-উত্তেজক হরমোন ( Thyroid stimulating hormone [TSH] ), (৩) কটিগ্রন্থি-উত্তেজক হরমোন ( Adrenocorticotrophic hormone ) [ACTH] (৪) ঘোনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন ( Follicle stimulating hormone [FSH] and luteinising hormone [LH] ), (৫) দুগ্ধবর্ধক হরমোন ( Prolactin ) ও (৬) এড্রিনো-কটিকো হরমোন ( Adrenocorticotrophic )।

পিটুইটারির পশ্চাৎ ভাগ হইতে তিনটি হরমোন নিঃসৃত হয়। (১) পিট্রেসিন (Pitressin), (২) অক্সিটোসিন বা পিটোসিন (Oxytocin or Pitocin) এবং (৩) বহুমূত্র প্রতিষেধক হরমোন ( Antidiuretic factor )। বর্তমানে নানা গবেষণা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে পশ্চাৎ ভাগ হইতে এই তিনটি হরমোনের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি হরমোনই নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোনটি অক্সিটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন (Oxytocin and vasopressin) নামক দুইটি উপাদানে গঠিত। ইহা ছাড়া পশ্চাৎভাগ হইতে বহুমূত্র (Diabetes insipidus) প্রতিষেধক একপ্রকার হরমোনও (Antidiuretic factor) উৎপন্ন হয়। বৃক্ক হইতে জল শোষণে ইহা সহায়তা করে।

মধ্যভাগ হইতে ইন্টারমেডিন ( Intermedin ) নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। ইহার প্রভাব এখনও সঠিকরূপে নির্ণয় করা হয় নাই।

(১) পিটুইটারির পুরোভাগ হইতে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশের স্বসমঞ্জস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। (২) ইহা ছাড়া গলগ্রন্থিতে ( Thyroid ) উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উহার হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এই হরমোনের

(TSH) একটি কাজ। এই হরমোনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে গলগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং গলগ্রন্থিজাত হরমোনের অভাবে বা অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে যে সকল রোগ সৃষ্টি হয় তাহার পশ্চাতে এই গলগ্রন্থি উদ্ভেজক হরমোনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। (৩) ইহা ছাড়া কটিগ্রন্থি ( Adrenal gland )-নিঃসৃত হরমোনের ক্রিয়াও এই জাতীয় একটি হরমোনের (ACTH) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থির নির্ধারিত প্রয়োগে যে এডিসনস্ রোগের ( Addison's disease ) উপশম হয় তাহাই ইহার প্রমাণ। (৪) এই পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন অপর দুইটি হরমোন (FSH & LH) স্ত্রী এবং পুরুষের জননেদ্রিয়ার উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের প্রভাবে ডিম্বাধারে ( Ovary ) ডিম্বাণুর যথাযথ বৃদ্ধি, মাসিক ঋতুর নিয়মিত আবির্ভাব এবং অগ্রাণু যৌন হরমোনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহারা পুরুষের অণ্ডকোষে (testes) শুক্রকীট সৃষ্টিতে সহায়তা করে। (৫) এই পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত প্রোল্যাকটিন ( Prolactin ) গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নারীর স্তনে দুগ্ধ স্রবণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (৬) রক্তের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য এই পিটুইটারি হইতে উৎপন্ন পিট্রেসিন হরমোনটির কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (৭) অক্সিটোসিন জরায়ু সংকোচনের কাজে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য প্রসবকালে এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। (৮) এক প্রকার শর্করাবিহীন বহুমূত্র ( Diabetes insipidus ) রোগের চিকিৎসায়ও পশ্চাৎভাগের নির্ধারিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

**অতিরিক্ত কার্যকলাপ :** শৈশবে যদি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়ানীলতা ( activities ) অতিশয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে **অতিকায় রোগ** ( gigantism ) দেখা দেয়। এই রোগে শিশুর দেহের অস্থি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই সে দানবাকৃতি লাভ করে। এই প্রকার লোকের উচ্চতা ৮-৯ ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। ইহাতে বিপাক শক্তি ( metabolism ) বৃদ্ধি পায় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। ইহাদের প্রজনন শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। বয়স্ক লোকের দেহে এই গ্রন্থির অতিরিক্ত কার্যকলাপের জন্য **এক্রোমেগালি** ( acromegaly ) রোগ দেখা দেয়। ইহাতে বয়স্ক লোকদের হাত, পা, নাক, কান, চিবুক, ঠোঁট ইত্যাদি অস্বাভাবিক বর্ধিত হইতে থাকে। ফলে তাহার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া দেখিতে অনেকটা বনমানুষের মত হয়। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়ানীলতার জন্য **কুশিং রোগও** দেখা দিতে পারে। নিতম্ব ও মুখমণ্ডলে চর্বির আধিক্য, হাত, পা এবং মুখের কালচে ভাব, কেশ বহুলতা ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ।

**অপ্রতুল কার্যকলাপ :** পিটুইটারি গ্রন্থিটি শৈশবে যথোপযুক্তভাবে সক্রিয় না হইলে বামনত্ব ( Dwarfism ) প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। ইহাতে দেহের



কোন বৃদ্ধি হয় না। যৌবনাগমে এই সকল লোকের দেহে যৌবনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ছেলেদের দাঁড়ি-গোঁফ, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণসমূহ এই সকল বামনদের দেহে প্রকাশ পায় না। ইহা ছাড়া গ্রন্থিটির অপ্রতুল ক্রিয়াজীবিতার জন্ম দেহ শার্ব হইয়া শুকাইয়া গেলে তাহাকে সাইমণ্ড রোগ

দেহের উপর পিটুইটারি গ্রন্থির প্রভাব। মধ্যস্থলে—গড়পড়তা উচ্চতাবিশিষ্ট লোক।

বামে—পিটুইটারি অতিবিক্ত কার্যকলাপের ফলে অতিকায় ব্যক্তি।

দক্ষিণে—পিটুইটারি অপ্রতুল কার্যকলাপের ফলপ্রসূত বামন

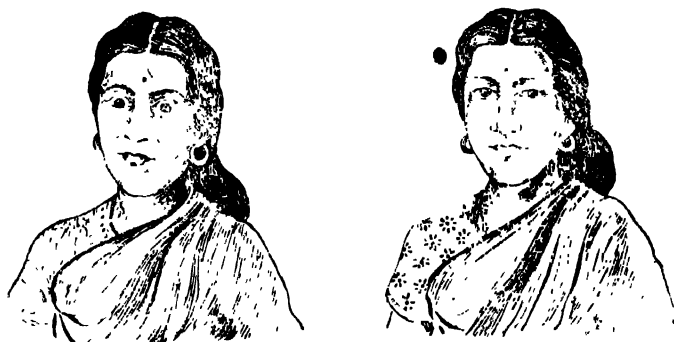
বলে। পিটুইটারির পুরোভাগ এবং পশ্চাদভাগ উভয়ের অক্ষমতার জন্ম **ফ্রলিচ রোগ ( Frolich's Syndrome )** নামক এক প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা অল্প বয়সেই হইয়া থাকে। ইহাতে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি হয় না এবং মুখ ও চোখের ভাব হাবার মতো হয়। যৌবনের লক্ষণসমূহ দেহে বেশী বয়সে দেখা দেয়।



## গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি ( Thyroid glands )

**অবস্থান :** ইহা গ্রীবাদেশে বাগ্যন্ত্রের থাইরয়েড গ্রন্থির কিছু নীচে অবস্থিত — দেখিতে একটি থলির মত। এই থলির মধ্যে একটি আঠাল তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তরল পদার্থের মধ্যেই থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গলগ্রন্থির গড়পড়তা ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম হয়। রক্ত নানা শাখা-প্রশাখায় অধিক পরিমাণে এই গ্রন্থির মধ্যে প্রবাহিত হয়।

**হরমোন ও কাজ :** গলগ্রন্থি হইতে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তাহাকে থাইরোক্সিন ( Thyroxine ) বলে। আয়োডিন থাইরোক্সিনের একটি প্রধান উপাদান। এইজন্যই খাণ্ডে আয়োডিনের অভাব হইলে দেখে এই হরমোনেরও



১নং চিত্র—গ্রেভস বোগাক্রান্ত মহিলা। ২নং চিত্র—ঐ মহিলাটির থাইরয়েড গ্রন্থি  
আংশিক অপসারণের পূর্বের অবস্থা।

অভাব লক্ষিত হয়। থাইরোক্সিন প্রধানতঃ দেহের বিপাক ( metabolism ) ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া থাকে।

**অতিরিক্ত কার্যকলাপ ( Hyperactivity ) :** কোন কোন ব্যক্তির গলগ্রন্থিটি বৃদ্ধি পাইয়া অধিক পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। ফলে ঐ ব্যক্তির অঙ্গিভেনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সে অনিদ্রায় ভুগিতে থাকে এবং মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হয়। এই অতিরিক্ত সক্রিয়তার একটি কুফল গ্রেভস্ রোগ ( Graves disease )। এই রোগে গলগ্রন্থি বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। স্বংপিণ্ডের স্পন্দন তীব্র ও দ্রুত হয়। দেহ দ্রুত ক্ষয় হয় এবং তাপ বৃদ্ধি পায়। হাত পায়ের অতি সূক্ষ্ম কম্পন দেখা দেয় এবং বহুমূত্র রোগ হয়।

**চিকিৎসা :** গলগ্রন্থির এই প্রকার অতিরিক্ত কার্যকলাপ ঐ গ্রন্থির অধিকাংশ ( প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ ) কাটিয়া বাদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য এই প্রকার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রপিল ও মেথিল থায়োইউরেসিল ( propyl and methyl thiouracil ) ঔষধ প্রয়োগে আজকাল এই রোগ দূর করা যায়।

**অপ্রতুল কার্যকলাপ ( hypoactivity ) :** পূর্বেই বলিয়াছি আয়োডিন গলগ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের একটি উপাদান। হুতরাং খাচ্ছে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে হরমোনের উপাদান কমিয়া যাইবে। খাচ্চ এবং পানীয় জলে যে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে তাহাই গলগ্রন্থির স্বাভাবিক কার্য কলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন অঞ্চল যথা, উরাল, ককেলাস, মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মাটি এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ এত অল্প যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। ফলে গলগ্রন্থির কোষগুলি আকৃতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উহার মধ্যস্থিত তরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থলিটি বড় হওয়া ফুলিয়া উঠে। এই অস্বস্থ গ্রন্থির ওজন ৪৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে। এই অবস্থাকে **গলগণ্ড রোগ ( Goitre )** বলে। প্রতিদিন খাওয়ার সহিত ০.২ গ্রাম করিয়া আয়োডিন মিশ্রিত লবণ ( Sodium iodide ) খাইতে দিলে দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই রোগের উপশম হইয়া থাকে।

গলগ্রন্থির অপ্রতুল কার্যকলাপের জন্য শিশুদের **ক্রেটিনিজম ( Cretinism )** নামক রোগ হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে শিশুদের দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা প্রকার বিকৃতি দেখা দেয়। দেহের চামড়া পুরু হয় এবং জিহ্বা বড় হইয়া মুখের বাহিরে বুলিয়া থাকে। আঙ্গুলগুলি মোটা এবং ছোট ছোট হয়। এই সকল শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেও যৌবনের কোন লক্ষণই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। অর্থাৎ ছেলেদের গৌরব, দাঁড়ি ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি, রজো-দর্শন ইত্যাদি দেখা যায় না। এই সকল শিশুদের বুদ্ধি-বৃত্তি অত্যন্ত কম থাকে এবং দেখিতে হাবার মতো হয়।

পরিণত বয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য **মিক্সিডিমা ( Myxoidema )** নামক এক প্রকার শোথরোগ দেখা দেয়। ইহাতে চোখ, মুখ ফুলিয়া উঠে এবং মাথার ও ভুরুর অধিকাংশ চুল উঠিয়া যায়, প্রজনন শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং মেয়েদের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়; চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং আলস্য ও শূন্মের ঢুলঢুল ভাব দেখা যায়।

**চিকিৎসা :** ক্রিটিনিজম এবং মিন্ডিডিমা রোগ গলগ্রন্থি নির্ধাস (extract) খাওয়াইয়া অথবা ষাইরোমিন্ হরমোনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে।

## কটিগ্রন্থি বা এড্রিনাল গ্রন্থি ( The Adrenals )

**অবস্থান :** মানবদেহে দুই পাশে দুইটি বৃক্কের ( Kidney ) উপরে এই গ্রন্থিষয় অবস্থিত। এইজন্যই ইহাদের কটিগ্রন্থি বলে। বামদিকের গ্রন্থিটি আকারে অপেক্ষাকৃত একটু বড়। প্রত্যেক গ্রন্থির আবার দুইটি স্বল্পষ্ট অংশ আছে—(১) বহির্ভাগ ( cortex ) এবং (২) কেন্দ্রীয় ভাগ ( medulla )

**হরমোন :** কটিগ্রন্থির দুইটি অংশের মধ্যে বহির্ভাগই ( cortex ) জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অংশ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। বহির্ভাগের নির্ধাস ( extract )—যাহার মধ্যে ঐ অংশের সকল হরমোনসমূহই বর্তমান থাকে—তাহাকে কর্টিন ( cortin ) বলা হয়। কেন্দ্রীয় বা মধ্যভাগ হইতেও একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এড্রিনেলিন বা এপিনেফ্রিন ( Adrenalin or epinephrine ) হরমোনটি উল্লেখযোগ্য।

**কাজ :** (১) গ্রন্থির বহির্ভাগের ক্রিয়ার ফলে দেহের পেশীসমূহের শক্তি ও সংকোচন ক্ষমতা রক্ষা পায়। (২) ইহা দেহের জলীয় অংশের এবং ধাতব লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। (৩) ইহার সাহায্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। (৪) স্ত্রী এবং পুরুষের যৌনগ্রন্থিষয়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় : (১) গ্রন্থির কেন্দ্রীয় ভাগ হইতে উৎপন্ন এড্রিনেলিন হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক হিসাবে একটি উপকারী ঔষধ। (২) ইহার সাহায্যে হাঁপানী রোগীর শ্বাসকষ্টের উপশম হয়। (৩) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ এই হরমোনের প্রয়োগে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (৪) রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহা রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে (৫) ইহার প্রয়োগে লালগ্রন্থির নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এড্রিনেলিনকে জরুরীকালীন হরমোন ( Emergency Hormone )-ও বলে। কারণ ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি দেহের জরুরী অবস্থায় এই হরমোনটি রক্তে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া দেহকে ঐ জরুরী অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে।

**অতিরিক্ত কার্যক্ষমতার ফল :** এই গ্রন্থির অতিশয় ক্রিয়ালীলতার ফলে পুং-শিশু অতিকায় মানবশিশুতে পরিণত হয়। শরীরের সর্বত্র মেদ বৃদ্ধি

পায় এবং ওজন বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের অল্প বয়সে দেহে পূর্ণ নারীত্বের কতগুলি লক্ষণ ফুটিয়া উঠে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক রূপে কেশোদ্গম হইতে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পুরুষের মত বাইরের লক্ষণগুলি ( দাঁড়ি-গোঁফ, ইত্যাদি ) প্রকাশ পায় এবং তাহারা পুরুষালি মেয়েতে পরিণত হয়।

**অপ্রতুল কার্যক্ষমতার ফল :** এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্ম শিশুর দেহের যথাযথ বৃদ্ধি হয় না এবং দিনের পর দিন দেহ ক্লান্ত হইতে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের অকালবার্ধক্য দেখা দেয় এবং প্রজনন শক্তি হ্রাস পায়। কখনও কখনও **এডিসন্স রোগ** ( Addison's disease ) হইয়া থাকে। এই রোগের ফলে শৈথীল্য, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, রক্তের চাপ হ্রাস, পরিপাক-শক্তি হ্রাস এবং হাত-পা ইত্যাদিতে এক প্রকার কালো কালো দাগ জন্মে।

## যৌন গ্রন্থি

### ( Gonads )

**অবস্থান :** অগাঢ় ঐশ্বর্যকরা গ্রন্থিসমূহের মত এই যৌন গ্রন্থি স্ত্রী এবং পুরুষের দেহে একই জায়গায় অবস্থিত নয়। পুরুষের লিঙ্গের নীচে চামড়ার একটি খিলির মত আছে। এই খিলির মধ্যে দুইদিকে দুইটি প্রায় গোল মাংসপিণ্ড আছে। ইহাদের **অণ্ডকোষ** ( testes ) বলে। এই অণ্ডকোষ দুইটিই পুরুষের যৌনগ্রন্থি। পুরুষের যৌনগ্রন্থিদ্বয় যেমন নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে মেয়েদের যৌনগ্রন্থি কিন্তু সেই রকম নয়। ইহা জরায়ুর কিঞ্চিৎ উপরে দুই পাশে অবস্থিত এবং **ভিষাধার** ( ovaries ) নামে পরিচিত। ইহারাও সংখ্যায় দুইটি। একটি টিউবের মধ্য দিয়া ভিষাধার হইতে **ভিষ** বা **ভিষাণু** ( ovum ) জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে।

**হরমোন :** পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি হরমোনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) **টেস্টোস্টেরন** ( Testosterone ) এবং (২) **এণ্ড্রোস্টেরন** ( Androsterone )। শেষোক্ত হরমোনটি মেয়েদের মস্তিষ্কের মধ্যেও কখনও কখনও দেখা যায়। তবে মেয়েদের মধ্যে উহা ভিষাধারে উৎপন্ন হয় না।

মেয়েদের ভিষাধার হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য দুইটি হরমোন হইল—(১) **ইস্ট্রোজেন** ( Estrogen ) (২) এবং **প্রজেষ্টেরন** ( Progesterone )। ইস্ট্রোজেন ভিষাধারের গ্রাফিয়ান ফলিকুল হইতে উৎপন্ন হয়। ভিষাণু নির্গত হইবার পর ঐ গ্রাফিয়ান ফলিকুল-এ পীত বর্ণের কর্পাসলুটিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই কর্পাসলুটিয়াম হইতেই প্রজেষ্টেরন উৎপন্ন হয়।

**কাজ :** পুরুষের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটি পিটুইটারি গ্রন্থিনিঃসৃত যৌনগ্রন্থি উদ্ভেজক হরমোনের সহায়তায় শুক্রোৎপাদনে সাহায্য করে। (২) এণ্ড্রোস্টেরন প্রধানতঃ যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা জননেন্দ্রিয়গুলির বৃদ্ধি এবং যৌবনের লক্ষণসমূহ বিকশিত করে। (৩) এই গ্রন্থি-নিঃসৃত হরমোন দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত এবং যৌনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে।

(১) যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ঋতু বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাধার হইতে প্রতিমাসে একটি বা একাধিক ডিম্বাণু (Ovum) বাহির হয়। (২) ডিম্বাধার-নিঃসৃত হরমোনের (প্রোজেস্টেরন) সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে প্রতিষ্ট হইয়া উপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন হয় এবং সেইস্থানে গর্ভফুলের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই হরমোনের প্রভাবেই গর্ভকালে অল্প ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয় না এবং ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ভ্রূণের পরিপুষ্টি এবং স্তনের আনুষঙ্গিক পরিবর্তনও এই হরমোনের প্রভাবেই ফল। (৩) অল্প একটি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন) প্রভাবে যৌবন সমাগয়ে নারীর যৌনি প্রদেশ এবং গর্ভাশয়ের বৃদ্ধি হেতু রজোদর্শন হইয়া থাকে এবং নারীদেহের অগ্রাঙ্গ লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়।

**অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল :** শিশুকালে এই গ্রন্থির অত্যধিক সক্রিয়তার ফলে পুরুষের দেহে অকালে যৌবনের বিকাশ হয়। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অল্প বয়সেই তাহাতে পরিণত বয়সের লক্ষণ (অকালবার্ধক্য) দেখা যায়। যৌবনাবস্থায় এই গ্রন্থির অতিশয় সক্রিয়তা হেতু প্রথমে দেহ ও মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অচিরেই সমগ্রদেহ অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়ে।

মেয়েদের অল্প বয়সে এই গ্রন্থির ক্রিয়ানীলতা বৃদ্ধি পাইলে তাড়াতাড়ি দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং যৌবনের সমস্ত লক্ষণসমূহ (যথা, রজোদর্শন, জননেন্দ্রিয়ার পরিণতি, কেশোদগম, কামভাবের উদ্বেক, ইত্যাদি) অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যৌবনে এই অবস্থা ঘটিলে অতিরিক্ত কামেচ্ছা হয় এবং পরে সাধারণ দৌর্বল্য ও বক্ষ্যাত্ম ঘটে।

**অপ্রভুল কার্যকলাপের ফল :** শৈশবে ছেলেদের এই গ্রন্থির অক্ষমতা দেখা দিলে শরীর বেঁটে এবং মেদবহুল হয়। যৌন অঙ্গগুলি ছোট থাকে এবং দেহে কেশের অভাব হয়। যৌবনে এই অবস্থার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজনন শক্তি কমিয়া যায় এবং বক্ষ্যাত্ম জন্মে।

মেয়েদের অল্পবয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য যৌবনের লক্ষণগুলি বিলম্বে দেখা দেয় এবং মেদবহুল হইয়া পড়ে। যৌবনে এই অবস্থার জন্য অনিয়মিতভাবে ঋতুস্রাব হইতে থাকে এবং পরিমাণে কম হয়। কখনও কখনও ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং বক্ষ্যাত্ম ঘটে।

### গ্রন্থির অপসারণ এবং জোড়া লাগান (Gastration and grafting)

—যৌনগ্রন্থি মানুষের দেহ ও মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই জন্তই যৌনগ্রন্থি অপসারণের দ্বারা প্রাণীর দেহ ও মনের পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভবপর। কোন অপরিণত প্রাণীর যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে তাহার দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিত্রগুলি প্রকাশ পায় না অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। যেমন কোন মোরগের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে উহার মাথার শিখা বা কুটি বড় হয় না, অপর পক্ষে মুরগীর ডিম্বাধার অপসারণ করিলে সে তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারাওয়া ফেলে এবং যৌনগ্রন্থিহীন মোরগের আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। যৌনগ্রন্থির অপসারণে দেহে প্রচুর মেদেরও হ্রাস হইয়া থাকে। যৌনগ্রন্থি অপসারণে উদ্দীপনা এবং সক্রিয় চিন্তাশক্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায় এবং নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখা দেয়। মোগল আমলে খোজাদিগের চরিত্রে এই সকল বৈশিষ্ট্য এই কারণেই দেখা যাইত।

অপসারিত যৌনগ্রন্থিবিশিষ্ট কোন প্রাণীর দেহে বিপরীত লিঙ্গের যৌনগ্রন্থি জোড়া লাগাইয়া এক প্রকার যৌন রূপান্তর আনয়ন করা যাইতে পারে।

যৌনগ্রন্থি অপসারিত মোরগের দেহে মুরগীর ডিম্বাধার জোড়া লাগাইলে ঐ মোরগের দেহে মুরগীর দেহের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পাইবে। অপর পক্ষে যৌনগ্রন্থিহীন একটি মুরগীর দেহে মোরগের অণ্ডকোষ জোড়া লাগাইলে উহা মোরগে পরিণত হইবে এবং উহার মাথায় শিখা দেখা যাইবে।

অক্ষম যৌনগ্রন্থির কার্যক্ষমতা ভরোনফ (Voronoff) প্রণালীতে অস্ত্রোপচান করিয়া ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে অক্ষম গ্রন্থির বহিরাবরণে মধ্যে স্তন্য বানরের যৌনগ্রন্থি জোড়া লাগানো হয়। ফলে যৌবনের লক্ষণগুলি আবার দেহে ও মনে ফিরিয়া আসে। এইরূপে যৌবনের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করাকে পুনর্যৌবন লাভ (Rejuvenation) বলে। আজকাল অবশ্য এই পুনর্যৌবন লাভের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। কারণ পুরুষের এই যৌবনোচিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মূলে হইতেছে যৌনগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন এবং এই হরমোনটি এখন মেথিল টেস্টোস্টেরন বা টেস্টোস্টেরন প্রপিয়নেটরূপে খাওয়াইয়াও অম্লরূপ ফ পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশেই কেবলমাত্র অন্তঃক্ষর গ্রন্থি দেখা যায়। এই অংশটিকে বৈশিক অংশ (cell-islets of Langerhans) বলে। এই বৈশিক অংশ হইতে ইন্সুলিন (insulin) নামক হরমো

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইন্স্যালিন দেহের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে। ইহার অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে এই শর্করা বাহির হইয়া যায়। ইহাতে অতি তৃষ্ণা, অতি ক্ষুধা, পেশী দৌর্বল্য প্রভৃতি দেখা যায়। এই অবস্থাকে **মধুমেহ** নামক একপ্রকার **বহুমূত্র রোগ** (Diabetes mellitus) বলে। আঙ্গকাল ইন্স্যালিন বিত্ত্বকভাবে গবেষণাগারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মধুমেহ রোগীকে ইন্স্যালিন ইন্জেক্সেন করিলে উপকার পাওয়া যায়। ইন্স্যালিন খাইতে দিলে রোগের উপশম হয় না।

গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থির সহিত সংলগ্ন চারিটি **প্যারাথাইরয়েড** বা **উপগলগ্রন্থি** দেখা যায়। আকারে এই সকল উপগলগ্রন্থি এক একটি গোটা ছোলার মত। এই গ্রন্থি হইতে **প্যারাথরমোন** (Parathormone) নামে হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন প্রধানতঃ রক্তের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রাক্লান্তা এবং রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধিও এই অবস্থায় দেখা যায়। অপরপক্ষে উপগলগ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তা হেতু রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে পেশীগুলির কম্পন ও অনবরত সংকোচন ঘটে। এই অবস্থাকে **টিটানি রোগ** (tetany) বলে। টিটানি রোগে উপগলগ্রন্থির নির্ধাস, ক্যালসিয়াম গঠিত লবণ এবং ভাইটামিন 'ডি' প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। উপগলগ্রন্থির অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের অধিক্য ঘটে। ফলে অস্থি ও পেশীর অস্বস্থতাজনিত এক প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়। ইহাকে **ভন রেকলিং-হাউসেন রোগ** (Von Reckling hausen's disease) বলে।

**থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus gland) গ্রীবামূলে অবস্থিত। জন্ম হইতে যৌবনকাল অবধি এই গ্রন্থি দেখা যায়। যৌবনপ্রাপ্তির পর ধীরে ধীরে উহার বিলুপ্তি ঘটে। সম্ভবত যৌবনে যৌবনগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের জগ্জগ্জ উহার বিলোপ হয়। থাইমাস গ্রন্থির একটি বিশিষ্ট হরমোন হইতেছে **থাইমোক্রাইসিন** (thymocrysin)। উহার দ্বারা যৌবনলক্ষণগুলি দ্রুত পরিণতি লাভ করে। অণাবস্থায় লিঙ্গভেদ এবং যৌবনাবস্থার লক্ষণগুলির বিকাশ আরম্ভ হয় এই থাইমাস গ্রন্থির প্রভাবে।

মাথার মধ্যে **পিটুইটারি গ্রন্থি** আছে আরও একটি **ভিষাকৃতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি** আছে ইহাকে **পিনিয়াল গ্রন্থি** (Pineal gland) বলে। এই গ্রন্থির কাজ সম্বন্ধে এখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় নাই। তবে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষা করা ইহার একটি কাজ।

**অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক :** প্রতিটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রক্তের মধ্যে তাহার নিজ নিজ হরমোনের ক্ষরণ করিয়া পরিপাক ক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কাজ করিবার সময় উহার পারস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এইভাবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন যৌনগ্রন্থির কার্যকলাপ বাড়াইয়া দেয়। পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারণ করিলে যৌনগ্রন্থির ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। আবার যৌনগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকলাপ কমাইয়া থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং থাইরয়েড গ্রন্থি ও যৌনগ্রন্থিসমূহ পরস্পরের উপর কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কোন একটি গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে সক্ষে সক্ষে অগ্নাত গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপও ব্যাহত হইবে এবং জীবদেহে এক জটিল বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের ক্ষরণ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি-গামী কোনও স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হইলে ঐ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হইতে অধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। যেমন ভেগাস স্নায়ু উত্তেজিত হইলে রক্তে ইনসুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

**হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ :** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও উহা হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়াকলাপ সম্যক্রূপে পরীক্ষা করিবার পর আজকাল উহা চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে। থাইরয়েড গ্রন্থি বা গলগ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তার জন্ত সন্ধ্যাত কোন ব্যাধি এখন অনায়াসেই ঐ গ্রন্থিচূর্ণ সেবনে আরোগ্য করা যায়। যে সকল মেয়ে তাহাদের যৌন অঙ্গের যথাযথ বৃদ্ধির অভাবে সম্ভাব্য ধারণে অক্ষম তাহাদের উপরে হরমোনের চিকিৎসায় সফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বুদ্ধের দেহে নব-যৌবনের সৃষ্টিও এই হরমোন চিকিৎসায় সম্ভবপর।

আজকাল হরমোনের ব্যবহার অর্থনৈতিক কারণেও করা হইতেছে। হরমোন প্রয়োগে পশুর আকৃতি বড় করিয়া উহাতে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া মাংসে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেও হরমোনের ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাঁস এবং মূগীর ডিমের উন্নতি বিধানও হরমোন প্রয়োগ করা যায়। পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা, পালক ও পশুর বৃদ্ধিও হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দুর্দান্ত বাঁড়ের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে উহা শান্ত ও অসুগত হইয়া পড়ে। তখন অনায়াসেই উহাকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালেও এই পদ্ধতি অবলম্বনে বাঁড় দ্বারা কৃষিকার্য করা হইত।





প্রধান প্রধান হরমোন, উহাদের উৎপত্তি, কাজ হত্যা প সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

গ্রন্থি	হরমোন	কাজ	অগ্রভূম কার্যকলাপের ফল	অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল
গলাগ্রন্থি (Thyroid)	থাইরোক্সিন (Thyroxine)	দেহের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।	শৈশবে ক্রেটিনিজম (Cretinism) এবং পরিণত বয়সে মিক্সিডিয়া (Myxoedema) রোগ।	গ্রেভস বোগ (Graves' disease)
উপগলাগ্রন্থি (Parathyroid)	প্যারাগর্মন (Parathormone)	ক্যালসিয়ামের বিপাক নিয়ন্ত্রিত করে।		ভন রেকলিং-হাউসেন রোগ (Von Reckling-hausen's disease)
থাইমাস (Thymus)	থাইমোক্রিসিন (Thymocrysin)	ক্রণবহুয় লিম্ফোভাইবোব যৌবন লক্ষণগুলির অবস্থা ইহার সাহায্যে ঘটে।		
অগ্ন্যাশয় (Pancreas)	ইনসুলিন (Insulin)	কার্বোহাইড্রেট, বিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।	মধুমেহ নামক বহুমূত্র রোগ (Diabetes mellitus)	মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, দ্রাব্যবিক দোষ।
কডিগ্রন্থি (Adrenals)	১। কর্টিকিন (Corticoids) ২। এড্রিনেলিন বা এপিনেফ্রিন (Adrenalin or epinephrine)	১। দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে। ২। বিপদ-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। চাপ বৃদ্ধি, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি। দেহে কোষ, ভয়, ইত্যাদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে রক্তে অধিক পরিমাণে এই হরমোন নিঃসৃত হইয়া শরীরকে ঐ অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে।	এডিসন্স রোগ (Addison's disease)  কিছু নাই।	অতিক্রম্য মানবিশিষ্ট এবং পুরুষালি মেয়ে সৃষ্টি। অপ্রয়োজনীয় জরুরী অবস্থার অবসান।

প্রধান প্রধান হরমোন, উহাদের উৎপত্তি, কাজ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

গ্রন্থি	হরমোন	কাজ	অন্তঃস্থল কার্যকলাপের ফল	অতিবিক্ত কার্যকলাপের ফল
ডিম্বাশয় (Ovaries)	১। ইস্ট্রোজেন (Estrogen)	১। দেহ ও মনে যৌবনের বিকাশ সাধন করে। ২। ডিম্বাণুস্ফোটন ও ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে।	১। দৈনিক ও মাসিক অপরিণত অবস্থা বা অপূর্ণতা। ২। পর্জয়ারণ ক্ষমতা হ্রাস।	
	২। প্রোজেস্টেরন (Progesterone)	১। প্রাণীজীবন। ২। প্রসূতি।	১। প্রাণীজীবন। ২। প্রসূতি।	
অণ্ডকোষ (Testes)	টেস্টোস্টেরন ও এণ্ড্রোস্টেরন (Testosterone and Androsterone)	১। জননোৎপাদন। ২। প্রসূতি।	১। যৌন অঙ্গসমূহের অপরিণতি ও যৌবন লক্ষণের অপূর্ণ বিকাশ।	অঙ্গবয়সে যৌবনের বিকাশ ও অকল্যাণ।

## কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি

( Essential glandular organs )

আমাদের দেহে দুইপ্রকার গ্রন্থি ( glands ) দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার গ্রন্থি প্রণালীযুক্ত এবং এই সকল গ্রন্থির রস এই প্রণালীর সাহায্যে নিজ নিজ ক্রিয়াস্থানে নীত হয়। লালগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লাল মুখের মধ্যে লালগ্রন্থির প্রণালীর সাহায্যে লইয়া যাওয়া হয়। অল্পরূপভাবে অগ্ন্যাশয়ের রসও উহার প্রণালীর সাহায্যে অস্থের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। সুতরাং লালগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থি প্রণালীযুক্ত গ্রন্থি। যকৃত, স্তন ইত্যাদিও প্রণালী-যুক্ত গ্রন্থি। প্রণালীবিহীন গ্রন্থির রস সরাসরি রক্তের মধ্যে পরিচালিত হয়। পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থি। ইহাদের নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। প্রণালীবিহীন গ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে হরমোন অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

এখানে যকৃত (liver) এবং প্লীহা ( spleen ) এই দুইটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। যকৃতের গ্রাম প্লীহার অল্পরূপ কোন প্রণালী না থাকিলেও এই দুইটি গ্রন্থি দেহের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের নীচে একটি পদাধারা আমাদের দেহগহ্বর দুইটি ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর ( Thoracic cavity ) এবং নীচের অংশকে উদর গহ্বর ( Abdominal cavity ) বলে। এই উদর-গহ্বরে উপরে ডান দিকে যকৃত এবং বামদিকে প্লীহা অবস্থিত। যকৃতই দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি। যকৃত ও প্লীহার কার্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) রক্তসংক্রান্ত কার্যাবলী : ভ্রূণাবস্থায় প্লীহা এবং যকৃতে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন এবং রক্তবসের ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন যকৃতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতে পুষ্কাতন ও বিকৃত রক্তকণিকার বিনাশ ঘটে এবং হিমোগ্লোবিন হইতে মুক্ত লৌহ এই দুইটি গ্রন্থিতেই সঞ্চিত থাকে। উভয় গ্রন্থিতেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত পরিচালিত হয়। ফলে উহার হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত রক্তের চাপ হইতে রক্ষা করে। প্লীহাতে জীবাণু ও বিষের প্রতিবেদক বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যকৃতে প্রোথ্রুসিন বিরোধী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্লীহা হাঁকনির মত রক্তকে ছাঁকিয়া জীবাণু ও অনিষ্টকর বস্তুর হাত হইতে মুক্ত করে।

(২) **বিপাকঘটিত ক্রিয়া :** খাতের মধ্যে প্রয়োজনাত্মক প্রোটিন থাকিলে অতিরিক্ত প্রোটিন যকুতে আসিয়া ভাস্কিয়া ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থে পরিণত হইয়া পরিশেষে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। খাতের গ্লুকোজ যকুতে আসিয়া গ্লাইকোজেনে পরিণত হইয়া সেখানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। ইহা ছাড়া যকুতে স্নেহজাতীয় পদার্থ হইতে কার্যশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যকুতের চর্বিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' সঞ্চিত থাকে। খাতের কেরোটিন নামক পদার্থ হইতে দেহের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেরোটিনের এই পরিবর্তন যকুতের মধ্যেই সাধিত হইয়া থাকে।

(৩) **দেহ-রক্ষা-সংক্রান্ত কার্য :** রক্তপাতে, কার্বন-মনঅক্সাইডের বিষক্রিয়ায় বা অন্য কোন কারণে রক্তে লোহিত কণিকার অভাব হইলে প্রীহাই তাহার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রচুর পরিমাণে লোহিত কণিকা রক্তশ্রোতে পাঠাইয়া ঐ সংকটমুহুর্তে দেহকে রক্ষা করিয়া থাকে। যকুৎও নানাভাবে দেহকে বিষক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা করে। ঐজীর্ণ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হইতে জীবাণু দ্বারা অস্ত্র ইণ্ডল, স্কেটল, ফিনল, ক্রিজল ইত্যাদি অপকারী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য রক্তকে দূষিত করে। রক্তমধ্যস্থিত এই সকল অপকারী পদার্থ যকুতে সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা গ্লাইকোরোনিক অ্যাসিডের সাহায্যে নির্দোষ যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া দেহকে ঐ সকল অপকারী পদার্থের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা করে।

যকুৎ ও প্রীহা এই দুইটি গ্রন্থির মধ্যে যকুৎ স্বস্থ জীবন যাপনের জন্য অত্যাৱশ্যক। প্রীহা কিন্তু যকুতের গায় অত্যাৱশ্যক নয়, কারণ প্রীহাকে কাটিয়া দেহ হইতে উৎপাটিত করিলেও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে কোন অন্তরবিধা হয় না।

## 2. স্বাস্থ্য

( Hygiene )

a. বায়ু—উহার গঠন, অবিশুদ্ধি ও বায়ু-সঞ্চালন ( Air—its composition, impurities, ventilation )

পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে। ইহাকেই বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া আছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই বায়ু রহিয়াছে। মাছ যেমন সর্বদা জলে বিচরণ করে, আমরাও তেমনি এই বায়ু-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি। জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হইল বায়ু, কারণ, মানুষ খাদ্য এবং জল ব্যতীত যদিও বা কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ু ব্যতীত কয়েক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। বায়ু একটি মিশ্র জড় পদার্থ। ইহা আমরা চোখে দেখি না বটে তবে অনুভব করিতে পারি।\* বায়ুর কোন বর্ণ কিংবা আকৃতি নাই এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার কোন গন্ধও নাই।

**বায়ুর গঠন বা উপাদান :** বায়ু একাধিক উপাদানে গঠিত। বায়ুর উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পই প্রধান। আয়তন হিসাবে বায়ুর সংগঠন নিম্নরূপ :—

অক্সিজেন	শতকরা	২০.৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	"	৭৭.১৬ "
কার্বন ডাই-অক্সাইড	"	০.৪ "
জলীয় বাষ্প	"	১.৮০ "

এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সামান্য পরিমাণে আর্গন, ক্রিপটন, নিয়ন, জেনোন, হিলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থান অনুযায়ী বায়ুতে আবার নানাপ্রকার গ্যাস, ধূলিকণা ও জীবাণু দেখা যায়।

**অক্সিজেন :** আয়তন অনুযায়ী বায়ুর প্রায় ২ অংশ হইল অক্সিজেন।

বায়ুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া বায়ুতে রাখিলে উহা জ্বলিতে জ্বলিতে অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যেই এই দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বায়ুতে অক্সিজেন না থাকিলে মোমবাতিটি জ্বলিতে পারিত না। এইরূপ যে কোন বস্তুর দহনই বায়ুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

**অক্সিজেনের কাজ :** অক্সিজেনের সাহায্যে আমাদের দহনক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়া চলে। আমরা প্রতিদিন যে জ্বালানী খাদ্য গ্রহণ করি, রক্তের সঙ্গে তাহা দেহকোষে নীত হয় এবং অক্সিজেন ফুসফুসে গিয়া রক্তের সঙ্গে মেশে এবং দেহকোষে গিয়া ঐ খাদ্য জ্বালায়। তারপর তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিয়া আবার নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে বাহির হইয়া আসে।

**নাইট্রোজেন :** আয়তন হিসাবে বায়ুর প্রায়  $\frac{1}{5}$  অংশ নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। অক্সিজেনের ত্রায় ইহাও একপ্রকার গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। ইহার কোন বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ নাই। বায়ুতে ইহার অবস্থিতি নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছুটা পাইরোগ্যালেক্টের ক্ষারীয় দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইলে ঐ বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে ঐ দ্রবণে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে নাইট্রোজেন গ্যাস পড়িয়া থাকিবে। নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্য নয় এবং ইহা দহনেও সাহায্য করে না। স্তব্ধ অবশিষ্ট গ্যাসে একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি রাখিলে উহা নিভিয়া যাইবে। তাছাড়া শুধু নাইট্রোজেন গ্যাসে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও চলে না। এইজন্য ঐ গ্যাসে ইঁদুর বিড়াল ইত্যাদি কোন জীবন্ত প্রাণী ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যু ঘটিবে।

**নাইট্রোজেনের কাজ :** নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুতে এই গ্যাসটি অক্সিজেনের দহন ক্ষমতা মন্দীভূত করে। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকিলে আমাদের শরীর অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া যাইত। বায়ুর এই নাইট্রোজেন হইতে আর্থোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সার প্রস্তুত করা হয়।

**কার্বন ডাই-অক্সাইড :** বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সামান্য—প্রায় ০.৪ ভাগ। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে স্বচ্ছ চূনের জল একটি বাটিতে করিয়া বায়ুতে খুলিয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে ঐ চূনের জলের উপর একটি সাদা কঠিন পাতলা আবরণ পড়ে এবং স্বচ্ছ চূনের জল ঘোলা হইয়া যায়। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড চূনের জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অদ্রব্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠন করে। এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্মই চূনের জল ঘোলা হয় এবং ঐ সাদা আবরণ গঠিত হয়। নানাভাবে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয়। গাছপালা, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি বিভিন্ন কার্বন-ঘটিত যৌগ বায়ুতে পোড়াইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গঠিত হয়। তাছাড়া আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা আমাদের দেহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য পোড়াইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে ত্যাগ করি। এইরূপে বায়ুর কার্বন

ডাই-অক্সাইডও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে উহা আমাদের জীবনধারণের পরিপন্থী হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জীবজন্তু বায়ুতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে গাছপালা ইত্যাদি উদ্ভিদ সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতেই তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এইজন্য বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কখনই বিপজ্জনক অবস্থায় আসিতে পারে না। এইজন্য বাড়ির আশেপাশে গাছপালা ইত্যাদি থাকা স্বাস্থ্যসম্মত।

**জলীয় বাষ্প :** বায়ুতে ইহার পরিমাণ থাকা উচিত ১'৪০ ভাগ। এই জলীয় বাষ্পের জন্ম বায়ু শীতল থাকে। শীতল বায়ু মনোরম। কিন্তু বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা উত্তাপ বাড়িয়া যাওয়া দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া গেলে আমাদের ঘাম শুকাইতে চায় না। পরন্তু শুষ্ক বায়ু আমাদের স্বকৃ শুকাইয়া দেয়, ফলে চামড়ার খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

**স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটুকু বায়ুর প্রয়োজন?** আমরা অনবরত প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং দম আটকাইয়া আসে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহার পরিমাণ যদি প্রতি ঘনফুট বায়ুতে ০'০০০২ ঘনফুটের অধিক হয় তবে ঐরূপ বায়ুতে শ্বাসকষ্ট হয়। সুতরাং ঘরের বায়ুতে নিঃশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যাহাতে এই সীমা লঙ্ঘন করিতে না পারে সেইজন্য ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য প্রতি ঘণ্টায় ঘরে কতটুকু বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত করা প্রয়োজন তাহা  $\frac{e}{p} = d$  এই সূত্রটির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

$e$  = একজন প্রতি ঘণ্টায় যতটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে।

$p$  = প্রতি ঘনফুট বায়ুতে সর্বাধিক যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কষ্ট হয় না (০'০০০২ ঘনফুট)।

$d$  = প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ঘণ্টায় যত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়।

প্রতি ঘণ্টায় বায়ুতে আমরা যে কতটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহা প্রধানতঃ আমাদের বয়সের উপর নির্ভর করে। একটি শিশুর তুলনায় একটি বয়স্ক লোক অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। সুতরাং



উপরি-উক্ত সংকেত অনুযায়ী  $\left(\frac{p}{p} = d\right)$  শিশু অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বেশী। একজন বয়স্ক ব্যক্তি গড়পড়তা প্রতি ঘণ্টায় ০.৬ ঘনফুট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। সুতরাং  $\frac{p}{p} = d$  সূত্রানুযায়ী একজন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি ঘণ্টায়  $\frac{0.6}{1.0002} = 0.0002$  ঘনফুট বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজন হয়। একজন বয়স্ক ও স্বস্থ ব্যক্তির বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানী ডে-চৌমন্ট (De Choumont) উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বয়স্ক লোক অপেক্ষা শিশু কম কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় যে একটি শিশুর প্রতি ঘণ্টায় ২০০০ ঘনফুট বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজন হয়।

স্বস্থ অপেক্ষা অস্বস্থ অবস্থায় বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। কারণ অস্বস্থ অবস্থায় দেহের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পাইবার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সুতরাং স্বস্থ-অবস্থায় একজন ব্যক্তির যতটুকু বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজন হয় অস্বস্থ অবস্থায় তাহার প্রয়োজনীয়তা কমপক্ষে ষোল্ল অংশ বৃদ্ধি পায়। একজন স্বস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজন হয় তবে ঐ লোক অস্বস্থ হইলে তাহার কমপক্ষে  $3000 + \frac{3000}{16}$  ঘনফুট বা ৩৭৫০ ঘনফুট বিস্তৃত বায়ুর প্রয়োজন হয়।

আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বায়ুতে ত্যাগ করি তাহাতে উহার গঠন নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্তিত হয় :

	বিস্তৃত বায়ু	নিঃশ্বাস বায়ু
অক্সিজেন	২০.৬০	১৬.৪০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০.০৪	৪.২৪
নাইট্রোজেন	৭৭.১৬	৭৭.১৬
জলীয় বাষ্প	}	বেশী
জৈব পদার্থ		
উত্তাপ		

বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া গেলে নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ুর যে পরিবর্তন ঘটে তাহা এই :

(ক) নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের দেহ হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প

নির্গত হয়। এইভাবে বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া যায় বলিয়া তখন স্বকনিষ্কৃত-মাম সহজে শুকাইতে চায় না।

(খ) নিঃশ্বাস বায়ু আবার উষ্ণ বলিয়া বদ্ধকক্ষে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

(গ) বদ্ধকক্ষের বায়ু স্থির এবং উহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী বলিয়া বদ্ধ বায়ুর সঞ্চরণশীলতা গুণটি মুক্ত বায়ুর তুলনায় ঢের কম।

(ঘ) উক্তগুণ সঞ্চালনহীন বায়ুতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে গরম বোধ হয়। শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া দ্রুত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনে, অতিরিক্ত ভীড়ে মাহুষ কখনও মূর্ছা যাইতে পারে।

**বায়ুর অবিশুদ্ধি (Impurities) :** বায়ুর সাধারণ উপাদান ছাড়াও বায়ুতে নানারকম অবিশুদ্ধি ও দূষিত পদার্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ু দুইটি উপায়ে অবিশুদ্ধ হয় : (১) জীবজন্তু দ্বারা এবং (২) কল-কারখানা ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা।

**জীবজন্তু দ্বারা :** সকল জীবজন্তুই প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভাগ করে। সুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

(ঙ) বায়ুর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অবিশুদ্ধি রোগ-জীবাণু। এই রোগ-জীবাণু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং রোগীর দেহ ও জামা-কাপড় হইতে বায়ুতে ছড়াইতে পারে।

**কলকারখানা ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা :** কলকারখানা হইতে নানা-প্রকার দূষিত গ্যাস বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। সালফার ডাই-অক্সাইড, সাল-ফিউরেটেড হাইড্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি দূষিত গ্যাস এইরূপে বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে। তাছাড়া লোহা তৈরীর কারখানা হইতে কার্বন মনোক্সাইড নামক একটি অতি দূষিত গ্যাস বায়ুতে মিশে। আমরা বাড়ীতে প্রতিদিন যে উনান জ্বালাই তাহাতেও বায়ু দূষিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস এই ধোঁয়াতে থাকে।

তাছাড়া গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রভৃতি পচিয়াও বায়ু দূষিত হইতে পারে।

**অক্সিজেনের উপর বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাব**

(১) ইহাতে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে বজায় থাকে। অক্সিজেনের কাজ আমাদের দেহের জ্বালানী খাদ্য দহন করিয়া দেহে তাপ ও শক্তি জোগান।

মুক্ত বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চালিত করিয়া হজমশক্তি ও মেটাবলিজম বাড়াইয়।

(২) তাছাড়া আবদ্ধ স্থানের বায়ু ধেমন স্থির থাকে উন্মুক্ত স্থানের বায়ু তেমন স্থির থাকে না, সর্বদাই প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহমান বায়ুর প্রভাবে দেহের ঘাম বাষ্পে পরিণত হয় এবং দেহ শীতল থাকে। এই সকল কারণে মুক্ত বায়ুতে দেহ সতেজ ও সুস্থ এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

সুতরাং যাহারা সচরাচর মুক্তবায়ু সেবন করেন তাহারা অপরের তুলনায় দীর্ঘজীবন লাভের অধিকারী হন। অবশ্য রুগ্ন দেহে কিংবা শীতকালে উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান না করিয়া মুক্তবায়ু সেবন করা উচিত নয়। তাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে পারে।

**বায়ু সঞ্চালন ( Ventilation ) :** কোন স্থান হইতে বদ্ধ বায়ুকে অপসারিত করিয়া সেই স্থানে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করাকে বলে বায়ু সঞ্চালন।

**বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা :** (১) বায়ুর উপাদান চারিটি— অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও জল। ইহাদের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেনই আমাদের দেহের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আমরা প্রাশাস বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দিই। এই উপাদানটি আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বাভাবিক কারণে বায়ুতে পরিমিত পরিমাণ কার্বন থাকে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ফলে উহা বাড়িয়া গিয়া বায়ুকে দূষিত করে। বদ্ধ কক্ষের বায়ুতে বায়ু চলাচলের সুযোগ নাই বলিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত বেশী উৎপন্ন হয়। তাই এইরূপ কক্ষে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে শরীরে ক্লান্তি বোধ হয় এবং মাথা ধরা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। যাহারা বহুদিন বদ্ধ কক্ষে বাস করেন অক্সিজেনের অভাবে তাহাদের কর্মক্ষমতা কমিয়া যায়। ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাশ্রিততা, চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। বাসগৃহে যাহাতে অক্সিজেনের অভাব না ঘটে এইজন্য বায়ু-সঞ্চালন প্রয়োজন।

(২) বায়ুর অগ্রতম উপাদান হইল জল। বায়ুতে জলের পরিমাণ থাকা উচিত ১'৪০ ভাগ। এই পরিমাণ জল বায়ুকে শীতল রাখে। বায়ুতে জলের মাত্রা বাড়িয়া গিয়া বায়ুর আর্দ্রতা ( humidity ) বাড়িতে পারে, আবার জলের মাত্রা কমিয়া গিয়া বায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হইয়া উঠিতে পারে। তাহা জানি আমাদের দেহ হইতে সর্বদা ঘাম নিঃসৃত হইতেছে। আর্দ্র বায়ুর জল

ধারণের ক্ষমতা নাই বলিয়া বায়ু আর ঘাম শুকাইতে পারে না। বর্ষার শুমোট দিনগুলিতে এইজন্য আমাদের এত কষ্ট হয়। বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিরিক্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু ভাল নয়। শুষ্ক বায়ু আমাদের ত্বক শুকাইয়া ফেলিতে চায়। শীতকালে এমন কি গ্রীষ্মকালেও কখনও কখনও বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

নৈসর্গিক কারণে বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ বাড়ে। তাছাড়া প্রাথমিক বায়ুর সঙ্গে আমরা বায়ুর জলীয় উপাদান কিছুটা টানিয়া লইয়া বায়ুকে উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিয়া তুলি। বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ আংশিকভাবে দূর করিতে পারি।

(৩) বায়ু আরেকভাবে আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। বায়ুতে জৈব ধূলিকণা, রোগজীবাণু প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া বায়ু দূষিত হইতে পারে। তারপর ঐ দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরাও রোগাক্রান্ত হইতে পারি। এই ক্ষেত্রেও বায়ুকে যদি সঞ্চালিত করা যায় তবে জীবাণুবাহিত দূষিত বায়ু দূর হইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু উহার স্থান দখল করিতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি কারণে বায়ু-সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—

(১) বায়ুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য ;

(২) বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দূর করিবার জন্য ;

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবার জন্য। এক কথায় বায়ুকে বিশুদ্ধ করাই বায়ু-সঞ্চালনের উদ্দেশ্য।

### প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের মূলনীতি :

স্বাভাবিকভাবে যে বায়ু-সঞ্চালন হয় তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়ু-সঞ্চালন। কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১) বাষ্পীয় সংমিশ্রণ : বায়ু কতকগুলি বাষ্প বা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র।

বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম এই যে একটি অপবরটির সংস্রবে আদিসি বাষ্পীয় পদার্থের সঙ্গে মিশিতে চায় এবং যতক্ষণ না বাষ্পগুলি সমভাবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঘরের কোণে একটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দেগিও যে অপবর কোণ হইতেও সেই গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বায়ুর সংমিশ্রণ ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশে ঘরের দূষিত বায়ু বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশিতে চায়।

(২) **বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের ভারভাৰ্য :** বায়ুমণ্ডলের সকল স্থান সমান উত্তপ্ত থাকে না। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা ও বিস্তৃত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তাহার স্থান দখল করে।

**প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ু-বিশোধন :** বায়ুমণ্ডলী অনবরত দূষিত হইয়া বিবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে :

(১) **সূর্যালোক :** সূর্যরশ্মির জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে এবং সূর্যের প্রখর তাপে বায়ুর আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ দূর হয়। তাছাড়া সূর্যের উত্তাপে বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে।

(২) **গাছপালা :** গাছপালাও বায়ু-বিশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড টানিয়া লইয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।

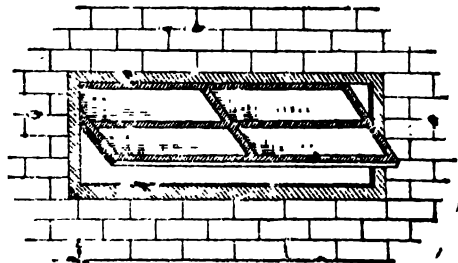
(৩) **বৃষ্টি :** বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ুস্থিত জীবাণু, ধূলিকণা এবং অশ্রাণ্ত ভাসমান পদার্থ ধুইয়া যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

(৪) **ঝড় :** বেগবান বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইলে দূষিত বায়ু গাড়িত হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়ুতে 'ওজোনের' ( ozone ) পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ওজোন দেহের শরীরে বিশেষ উপকারী।

**গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা :**

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বদা বাসগৃহের প্রত্যেক কক্ষে প্রশস্ত এবং কুছু কুছু জানালা রাখিবে যাহাতে বাহিরের বায়ু একদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

(২) স্বাস-প্রশাসনের দ্বারা গৃহের বায়ু সর্বদা উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। গৃহে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার জন্ত কক্ষের উপরিভাগে সর্বদা ঘুলঘুলি ( ventilator ) রাখিবে। শীতের রাজ্বে দরজা-জানালা বন্ধ থাকিলেও এই ঘুলঘুলি দিয়া অনায়াসে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।



ভেন্টিলেটর

ধারণের ক্ষমতা নাই বলিয়া বায়ু আর ঘাম শুকাইতে পারে না। বর্ষার ঋমোট দিনগুলিতে এইজন্য আমাদের এত কষ্ট হয়। বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিরিক্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু ভাল নয়। শুষ্ক বায়ু আমাদের স্বচ্ছ শুকাইয়া ফেলিতে চায়। শীতকালে এমন কি গ্রীষ্মকালেও কখনও কখনও বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে।

নৈসর্গিক কারণে বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ বাড়ে। তাছাড়া প্রাণস বায়ুর সঙ্গে আমরা বায়ুর জলীয় উপাদান কিছুটা টানিয়া লইয়া বায়ুকে উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিয়া তুলি। বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা বায়ুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ আংশিকভাবে দূর করিতে পারি।

(৩) বায়ু আরেকভাবে আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। বায়ুতে জৈব ধূলিকণা, রোগজীবাণু প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া বায়ু দূষিত হইতে পারে। তারপর ঐ দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরাও রোগাক্রান্ত হইতে পারি। এই ক্ষেত্রেও বায়ুকে যদি সঞ্চালিত করা যায় তবে জীবাণুবাহিত দূষিত বায়ু দূর হইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু উহার স্থান দখল করিতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি কারণে বায়ু-সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা অস্বত্বত হয়—

(১) বায়ুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য ;

(২) বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দূর করিবার জন্য ;

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবার জন্য। এক কথায় বায়ুকে বিশুদ্ধ করাই বায়ু-সঞ্চালনের উদ্দেশ্য।

### প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের মূলনীতি :

স্বাভাবিকভাবে যে বায়ু-সঞ্চালন হয় তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়ু-সঞ্চালন। কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১) বাষ্পীয় সংমিশ্রণ : বায়ু কতকগুলি বাষ্প বা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র।

বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম এই যে একটি অপরটির সংস্রবে আসিবারাত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে চায় এবং যতক্ষণ না বাষ্পগুলি সমভাবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঘরের কোণে একটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দেগিও যে অপর কোণ হইতেও সেই গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বায়ুর সংমিশ্রণ ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশে ঘরের দূষিত বায়ু বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশিতে চায়।

(২) **বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের ভারতম্য :** বায়ুমণ্ডলের সকল স্থান সমান উত্তপ্ত থাকে না। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা ও বিস্তৃত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তাহার স্থান দখল করে।

**প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ু-বিশোধন :** বায়ুমণ্ডলী অনবরত দূষিত হইয়া বিবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে।

(১) **সূর্যালোক :** সূর্যরশ্মির জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে এবং সূর্যের প্রখর তাপে বায়ুর আর্দ্রতা ও দুর্গন্ধ দূর হয়। তাছাড়া সূর্যের উত্তাপে বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে।

(২) **গাছপালা :** গাছপালাও বায়ু-বিশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড টানিয়া লইয়া অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়।

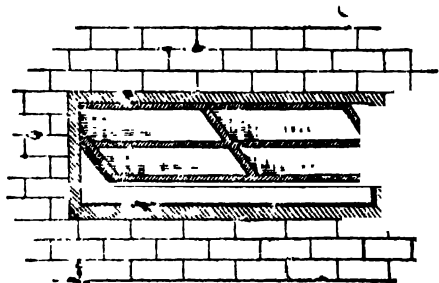
(৩) **বৃষ্টি :** বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ুস্থিত জীবাণু, ধূলিকণা এবং অগ্ন্যাশ্রু ভাসমান পদার্থ ধুইয়া যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

(৪) **নাড় :** বেগবান বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইলে দূষিত বায়ু তাড়িত হয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়ুতে 'ওজোনের' (ozone) পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ওজোন দেহের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

**গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা :**

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বদা বাসগৃহের প্রত্যেক কক্ষে প্রশস্ত এবং কুজু কুজু জানালা রাখিবে যাহাতে বাহিরের বায়ু একদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

(২) শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা গৃহের বায়ু সর্বদা উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। গৃহে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার জন্ত কক্ষের উপরিভাগে সর্বদা ঘুলঘুলি (ventilator) রাখিবে। শীতের রাজ্বে দরজা-জানালা বন্ধ থাকিলেও এই ঘুলঘুলি দিয়া অনায়াসে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।



ভেন্টিলেটর

(৩) বায়ু বিশোধনের জন্য গৃহের চারিপাশে কিছু গাছপালা লাগাইবে।

**কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ( Artificial ventilation ) :** যেখানে প্রাকৃতিক বায়ু-সঞ্চালন সম্ভব হয় না সেখানে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। জনবহুল স্থানে, কলকারখানা ও খনি অঞ্চলে সর্বদাই কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের জন্য তিনটি উপায় গ্রহণ করা যায় :—

(১) **প্লেনাম পদ্ধতি ( Plenum system ) :** এই পদ্ধতিতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রেরণ করা যায়।

(২) **ভ্যাকুয়াম পদ্ধতি ( Vacuum system ) :** বায়ু আকর্ষণকারী পাখা দ্বারা কক্ষের বায়ুকে আকৃষ্ট করিয়া বাহিরে পাঠান হয়।

(৩) **সমতুল্য পদ্ধতি ( Balance system ) :** উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি একসঙ্গে কাজ করে। বৈদ্যুতিক পাখার দ্বারা এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয়।



## জল : ইহার উৎপত্তি, অবিশুদ্ধি এবং

### জল বিশোধন

( Water—its sources, pollution and purification )

**জল :** জল আমাদের জীবনস্বরূপ। খাওয়া না খাইয়াও আমরা কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি কিন্তু জলপান ব্যতীত দুই একদিনের বেশী বাঁচা যায় না। ইহার কারণ দেহের রাসায়নিক সংগঠন এইরূপ যে প্রতি মুহূর্তে দেহ জল চায়। আর এই জল সরবরাহ করিতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। জীবনধারণের জন্য নিম্নলিখিত কারণে আমাদের জলপান করিতে হয় :

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেহের এক-তৃতীয়াংশ জল দ্বারা গঠিত। অস্থিমজ্জা ও রক্তের উপাদানে জল রহিয়াছে এবং দেহের প্রতিটি জীবকোষ জলদ্বারা গঠিত। ঘাম, মলমূত্র ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া আমাদের দেহ হইতে জল নির্গত হইতেছে বলিয়া প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কয়েক লক্ষ জীবকোষ ( cell ) মরিয়া যাইতেছে। উহাদের স্থানে আবার কয়েক লক্ষ জীবকোষ সৃষ্টি হইতেছে। জল পান না করিলে এই নতুন জীবকোষ সৃষ্টি হইতে পারিত না। এই জন্যই বনিয়াছি যে দেহ প্রতি মুহূর্তে জল চায়।

(২) যতক্ষণ খাওয়া কঠিন আকারে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা দেহ পুষ্টির কাজে লাগে না। জল খাওয়াতে ভরল করিয়া প্রতি জীবকোষে পৌঁছাইয়া দেয়।

(৩) জলের জন্য দেহ যেমন খাওয়া গ্রহণ করিতে পারে তেমনি জলের সাহায্যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে নিকাশিত হয়। বাড়ির নর্দমায় যেমন জল ঢালিয়া দিলে সমস্ত ময়লা ঐ নর্দমা দিয়া চলিয়া যায় তেমনি নিয়মিত জলপানের দ্বারা দেহের সমস্ত ময়লা মলমূত্রের আকারে বাহির হইয়া যায়।

(৪) জলের অপর গুণ এই যে উহা আমাদের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে শীতল রাখে। আমাদের দেহ একটি সচ্ছিদ্র (Porous) মাটির পাত্রের মত। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ সচ্ছিদ্র পাত্রে জল রাখিলে জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া মাটির পাত্রটিকে ভিজা রাখে। ফলে ভিতরকার জল ঠাণ্ডা থাকে। দেহ হইতে অনুরূপভাবে ঘামের আকারে জল নির্গত হইয়া দেহ ঠাণ্ডা রাখে।

**জল নির্গমন :** দেহ হইতে চারিটি পথে জল নির্গত হয় :

- (১) ঝামের আকারে ত্বক ( skin ) হইতে ;
- (২) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া ফুসফুস হইতে ;
- (৩) মূত্রের আকারে বৃক্ক ( kidney ) হইতে ;
- (৪) মলের ( excreta ) আকারে ।

এইভাবে প্রতিদিন জলের যে অপচয় হইতেছে জলপান করিয়া আমরা সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি । প্রকৃতি আপনা হইতে তৃষ্ণার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এই জলপানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ।

### জলের প্রাপ্তিস্থান ( Source of Water )

জলের উৎসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করিতে পারি :

- ১। বৃষ্টির জল ।
- ২। ভূপৃষ্ঠস্থ জল : সমুদ্র, হ্রদ, নদী, দীঘি, পুষ্করিণী, ডোবা ইত্যাদির জল ।
- ৩। ভূগর্ভস্থ জল : প্রসব্দ, কূপ ও নলকূপ ।

(১) **বৃষ্টির জল** : ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশি বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে । ঐ মেঘ ঘনীভূত হইলে বৃষ্টি হয় । প্রথম অবস্থায় বায়ু-মণ্ডলীর ভাসমান ধূলিকণা, বাষ্প ইত্যাদি জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে । কিন্তু এক পশলা বৃষ্টির পর যে জল সংগ্রহ করা হয় তাহা মৃদু ও বিশুদ্ধ । উহাতে কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে না । এই জল অতি সুস্বাদু পানীয় ।

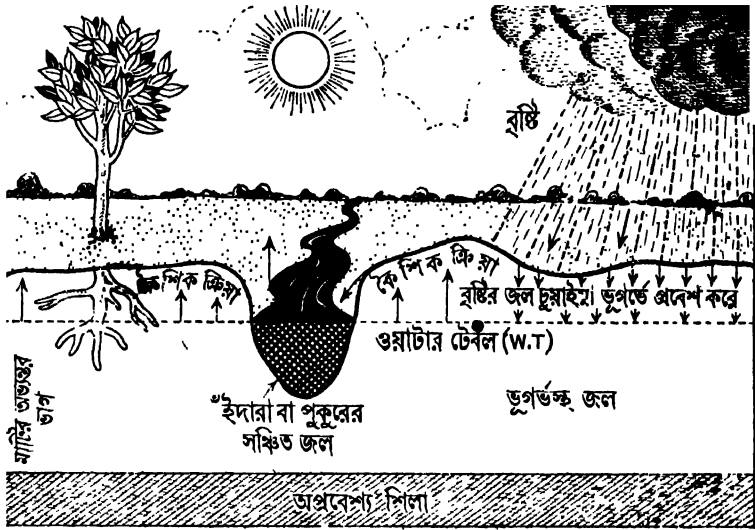
(২) **ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল** : (ক) **সমুদ্র** : পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এবং সমুদ্রই আমাদের জলের প্রধান উৎস, কিন্তু সমুদ্রের জলে ধাতব লবণ খুব বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়া পানের অযোগ্য । সমুদ্র-তীরবর্তী দেশগুলিতে পানের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং সমুদ্রগামী জাহাজ-গুলিতে সর্বদা পানীয় জল রাখিতে হয় ।

(খ) **নদী** : পর্বতের তুষার গলিয়া নদীর সৃষ্টি হয় । নদীর জলে দেহোপযোগী নানাবিধ খনিজ লবণ থাকে । উৎসের নিকটে নদীর জল বিশুদ্ধ এবং পানের যোগ্য থাকে । কিন্তু সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উহাতে নানাবিধ আবর্জনা মিশিতে থাকে এবং ক্রমশঃ পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে । আমাদের দেশে নদীর জলই পরিশ্রুত হইয়া বড় বড় শহরগুলিতে সরবরাহ হয় ।

(গ) **পুষ্করিণী** : ভূগর্ভের অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত থাকে এবং পুষ্করিণী

কাটিয়া সেই জল পাই। প্রথমে গ্রীষ্মে জল বাষ্পীভূত হইবার ফলে পুষ্করিণী যখন শুকাইয়া যায় তখন বর্ষার জল পাইয়াই উহারা আবার ভরিয়া ওঠে।

পুষ্করিণীর জলে মাটির তলার নানাবিধ খনিজ লবণ মিশ্রিত থাকে, তবে এই খনিজ লবণ আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়। কিন্তু মানুষ ও পশুপক্ষী নানাভাবে পুকুরের জল দূষিত করিয়া পানের অযোগ্য করিয়া তোলে।

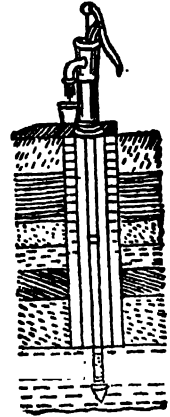


ওয়াটার টেবল

(৩) **ভূগর্ভস্থ জল (Ground water) :** জলের অপরিমিত উৎস হইতেছে ভূগর্ভস্থ জল। যে ভূমির উপরে আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহার বেশ কিছুটা নীচে বৃষ্টির জল অপ্রবেশ্য স্তরে জমা হইয়া আছে। ভূগর্ভে এইভাবে জল সঞ্চিত আছে বলিয়াই পুষ্করিণী কিংবা কূপ খনন করিয়া আমরা জল পাই। মাটির তলার সঞ্চিত জলের উপরের সমতলকে ( level ) water table অথবা দেওয়া যাইতে পারে।

বৃষ্টির জলের যে অংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে তাহারই কিছুটা আবার বালি, মাটি ও কাঁকরের স্তর ভেদ করিয়া অনবরত ভূমির উপরে চুষাইয়া চুষাইয়া উঠিয়া আসিতেছে এবং বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুস্তরে মিশিতেছে। জলের এইরূপ চুষাইবার ক্ষমতাকে বলে কৈশিক ক্রিয়া ( capillary action )। গ্রীষ্মকালে জল অধিক পরিমাণে বাষ্পীভূত হয় বলিয়া water table অনেক নীচে নামিয়া যায়। বর্ষাকালে আবার water table অনেক উপরে উঠিয়া আসে। একটি কূপের দিকে চাহিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

**কূপ (well) :** দুই শ্রেণীর—অগভীর ও গভীর। অগভীর কূপ water table পর্যন্ত পৌঁছায়। পরন্তু গভীর কূপ water table ছাড়াইয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া যায়। গভীর কূপের জল সাধারণতঃ স্থব্বাছ ও পানের উপযুক্ত কিন্তু অগভীর কূপের জলে ময়লা ও রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে। প্রস্তবণের জলে দ্রবীভূত ধাতব লবণ ও গ্যাস অনেক সময় বিভিন্ন রোগ নিবারণ করিতে সাহায্য করে।



নলকূপ

**নলকূপ (tube well) :** নলকূপও কূপের মতই গভীর ও অগভীর হইতে পারে। গভীর নলকূপের জল যেমন পানের পক্ষে নিরাপদ অগভীর নলকূপের জল তেমন নিরাপদ নয়।

**প্রস্তবণ (spring) :** জলে সর্বদাই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। ভূগর্ভস্থ জলে প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন সময় এই দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলে ঐ জল কখনও কখনও ঝরনার আকারে মাটি ফুড়িয়া বাহির হয়।

### জলের দোষ

২-আয়তন হাইড্রোজেন এবং ১-আয়তন অক্সিজেনের মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন। জলের সঙ্গে অগ্ৰাণ্য বিজাতীয় পদার্থ মিশিয়া জলে **আবিলতা (impurity)** সৃষ্টি করে এবং কখনও বা উহাকে সম্পূর্ণ দূষিত (polluted) এবং পানের অযোগ্য করিয়া ফেলে।

**জলের আবিলতা (Impurities in water) :** জলে দুই শ্রেণীর আবিলতা দেখা যায়—(১) ভাসমান বা দৃশ্যমান এবং (২) দ্রবীভূত অর্থাৎ যাহা খালি চোখে দেখা যায় না।

(১) **ভাসমান বা দৃশ্যমান পদার্থ :** বালি, কাঁদা, খড়কুটা, শৈবাল ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ চোখে দেখা যায় এবং উহারা জলের সঙ্গে মিশিয়া জলকে আবিল করিয়া তোলে। মারাত্মক না হইলেও উহারা বিপজ্জনক, কারণ জলের সঙ্গে এইসব পদার্থ পেটে গেলে আমাদের অস্বস্থ করিতে পারে।

(২) **দ্রবীভূত বা অদৃশ্য পদার্থ :** কতকগুলি পদার্থ আবার এমনভাবে জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে উহাদের আমরা চোখে দেখিতে পাই না। ইহারা

(ক) **গ্যাস** : অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বায়ু হইতে জল এইসব গ্যাস নিজের মধ্যে টানিয়া লয়।

(খ) **ধাতব লবণ** : ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, নৌহের ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকার্বোনেট জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। তাছাড়া সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অন্ত্যস্ত ধাতব লবণও সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। এই সকল লবণের প্রকৃতি ভেদে জলকে খরজল ও মৃদুজল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

**দূষিত জল (Polluted water)** : টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগের জীবাণু (bacteria) জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। উহারা আমাদের পেটে গিয়া আমাদের দেহে ঐ সমস্ত ব্যাধির বিস্তার করে। দূষিত জল বলিতে এইরূপ জীবাণুমিশ্রিত জলকেই বোঝায়। দূষিত জল সাক্ষাৎভাবে মারাত্মক।

জল দূষিত হয় তিন ভাবে—(১) **প্রধানতঃ মাতৃশয়ের দ্বারা**। মাতৃশয় জলের ধারে বসিয়া বাসন মাজে, মুখ ধোয়, স্নান করে, শৌচাদি ক্রিয়া করে, গরু-মহিষ স্নান করায়, রাস্তা ধোয়। জল কখনও বা বাড়ির পায়খানার জল জলাশয়ে আসিতে দেয়, মৃত জীবজন্তুর শব ফেলে, কখনও বা রোগীর কাঁথা-কাপড় কাচে, এইভাবে এক-মাতৃশয়ের দেহাশ্রয়ী জীবাণুবা জলের মাধ্যমে অস্ত্রের দেহে সংক্রামিত হয় ও রোগ ছড়ায়।

(২) **পশুপক্ষীর দ্বারা** : পশুপক্ষীর দ্বারাও জল দূষিত হয়। উহারা যখন জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে, মুখে করিয়া নানা আবর্জনা, ভুক্তপ্রব্য, গলিত শবদেহ ইত্যাদি ফেলে তখন জল দূষিত হয়।

(৩) **গাছপালা দ্বারা** : গাছপালা পচিয়া জলে দূষিত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জলাশয়ের নিকটে গাছপালা থাকিলে উহাদের পাতা জলে পড়ে এবং উহা পচিয়া জল দূষিত করে।

\* সাধারণতঃ বায়ুতে সালফার ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস থাকে না। কিন্তু কলকারখানার নিকটবর্তী জলাশয়ের জলে ঐ সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। পশুপাখীর মৃতদেহ ও গাছপালা পচিয়াও জলে বিষাক্ত মার্শ গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে।

## জল বিশোধন ( Purification of water )

দূষিত জল পানের অযোগ্য। তবে আমরা যে শুধু পানের জন্যই বিশুদ্ধ জল চাই তাহা নহে, পরস্তু ঔষধাদি প্রস্তুতির জন্য এবং রসায়নাগারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইবার জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া কোন কোন জলে আবার সাবান গুলিলে ভাল ফেনা হয় না। ফলে ঐ জলে কাপড়-চোপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। বস্ত্রাদি পরিষ্করণের জন্যও তাই জল বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত কারণে বিশুদ্ধ জল চাই :

- (১) রন্ধন ও পানের জন্য ;
- (২) ঔষধাদি প্রস্তুতির ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য ;
- (৩) বস্ত্রাদি পরিষ্করণের জন্য ;
- (৪) বয়লারে ( Boiler ) ব্যবহারের জন্য ।

(১) **রন্ধন ও পানের জন্য জল বিশোধন :** জলের মধ্যে কতকগুলি ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকে। ধাতব লবণগুলির মধ্যে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দেহ গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। পানীয় জলের সঙ্গে এগুলি আমাদের পেটে গেলে উপকারই হয়। সুতরাং পানীয় জল বিশোধনের সময় এগুলি অপসারিত করার প্রয়োজন নাই। তবে ঐ সকল ধাতব লবণ অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রবীভূত থাকিলে উহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়া লইলে অতিরিক্ত ধাতব লবণ নীচে পড়িয়া যায়। তারপর ঐ ফুটানো জল ছাঁকিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

ধাতব লবণ ব্যতীত জল বায়ু হইতে কতকগুলি গ্যাসও টানিয়া লয়। এই সকল গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস। ইহা খাদ্যদ্রব্য হজমে বিশেষ সাহায্য করে। বদহজম হইলে আমরা বাজার হইতে যে মোড়া ওয়াটার কিনিয়া খাই তাহা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবে জলে যে সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকে তাহা সমস্তই যে দেহের পক্ষে উপকারী তাহা নয়। কোন কোন শিল্পাঙ্গলের জলে  $H_2$  ইত্যাদি বিষাক্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। তাছাড়া নদী, পুষ্কর এবং কূপের জলে গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়িয়া বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ সকল বিষাক্ত গ্যাস জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহা অবশ্যই পানীয় জল হইতে অপসারণ করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত জলে আবার বালি, কাঁদা, খড়্গুচা প্রভৃতি কতকগুলি ভাসমান

পদার্থ থাকে। ঐগুলি উদরস্থ হইলে আমাদের অস্থখ করিতে পারে। তবে প্রকৃত দূষিত জল বলিতে বুঝায় বিভিন্ন রোগজীবাণুমিশ্রিত জল। এইসব জীবাণুগুলি আমাদের পেটে গেলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগের পীড়া জন্মায়।

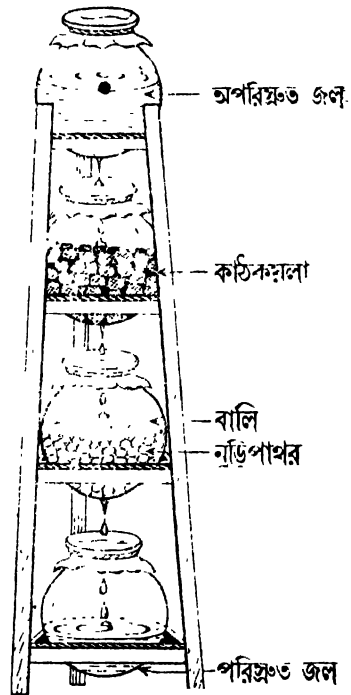
সকল ভাসমান পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগজীবাণু সম্পূর্ণরূপে জল হইতে অপসারিত করাই পানীয় জল প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য। নিয়ে পানীয় জল প্রস্তুতির কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হইতেছে :

### প্রাচীন পদ্ধতি :

**ধিতান ( Sedimentation ) :** ধিতাইতে পারিলে জলের অধিকাংশ ভাসমান ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। যৌত্রে ধিতান জলে রোগজীবাণুও কম থাকে। জলে সামান্য ফটকিরি মিশাইয়া দিলে জলের ময়লা খুব তাড়াতাড়ি ধিতাইয়া যায়। ধিতান জল দেখিতে স্বচ্ছ কিন্তু উহাতে রোগজীবাণুগুলি থাকিয়া যায় বলিয়া উহা পানের অযোগ্য।

**ছাঁকন ( Filtration ) :** ঘড়া বা কলস ফিল্টার : আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে চারিটি ঘড়া কিংবা কলসের সাহায্যে জল ছাঁকান পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

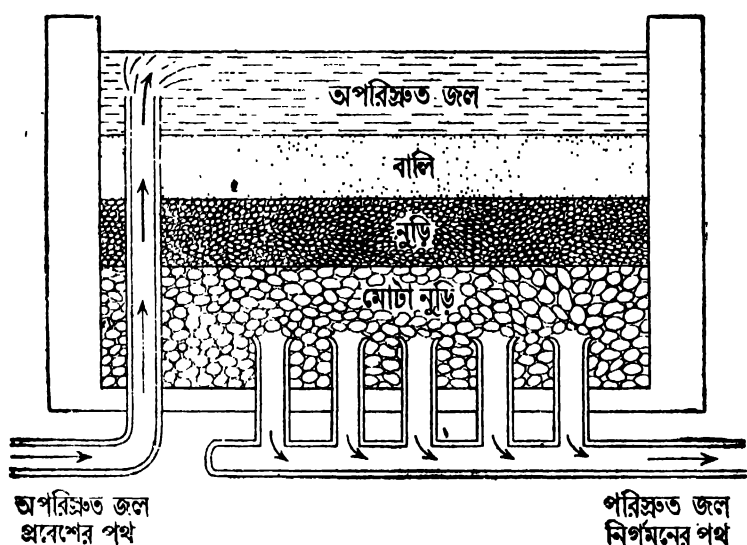
একটি কাঠের মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে উপরূপরি চারিটি ঘড়া কিংবা কলসী সাজান হয়। উহাদের প্রথম তিনটির তলায় ছিদ্র থাকে এবং তাহাতে পাট কিংবা খড়ের পলিতা লাগান থাকে। দ্বিতীয় ঘড়াটিতে



কয়লা থাকে এবং তৃতীয়টির উপরে বালুকণা এবং নীচে নুড়ি সাজান থাকে। প্রথম ঘড়াটিতে জল ঢালিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘড়ার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া সবচেয়ে নীচের ঘড়াটিতে জমা হয়। এই ভাবে ছাঁকা জল দেখিতে খুব স্বচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

**ফুটান (Boiling) :** আমাদের দেশে ফুটাইয়া জল বিশোধনের রীতি প্রচলিত আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিট ধরিয়া জল ফুটাইলে জলের প্রায় সমস্ত জীবাণু মরিয়া যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত ধাতব লবণ ঝিটাইয়া পড়ে এবং দ্রবীভূত গ্যাস বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এইজন্য গৃহে পানীয় জল প্রস্তুতির ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

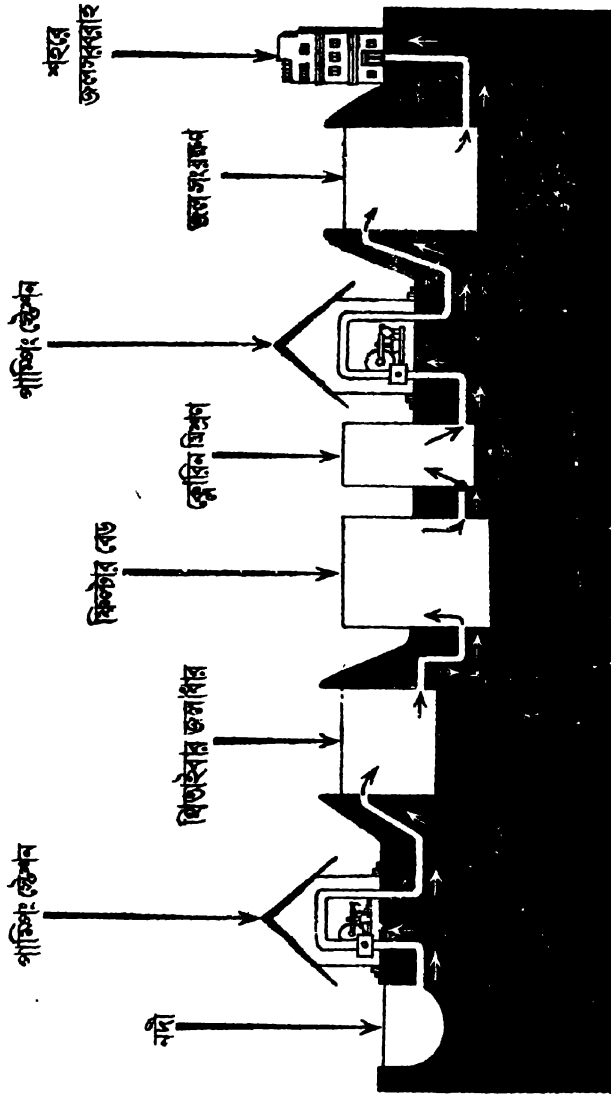
**আধুনিক পদ্ধতি :** প্রথমে পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া বৃহৎ জলাধারে ঝিটাইতে দেওয়া হয়। এই জলাধারে ফটকিবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এখানে জল ঝিটাইবার ফলে জলের সমস্ত ভাসমান



ফিল্টার বেড

ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। তারপর ঐ জল ফিল্টার বেডে পাঠান হয়। ফিল্টার-বেডগুলির চারিপাশ কংক্রিটে বাঁধান এবং মেঝেটি থাকে ইটের তৈয়ারী। প্রত্যেকটি ফিল্টার বেডে উপর্যুপরি বালি, ছোট হুড়ি এবং মোটা হুড়ির তিনটি স্তর থাকে। সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ বালুর স্তরের উপরে জল রাখা হয়। এই সময় বালুর স্তরের উপরে একটি পাতলা পর্দা পড়ে। এই পর্দাটি ফিল্টার বেডের প্রাণস্বরূপ; কারণ উহাই জলের অবশিষ্ট ভাসমান ময়লা এবং জীবাণুসমূহ আটকাইয়া জল পরিশুদ্ধিতে সাহায্য করে। এইজন্য উহাকে vital layer বলে। জলের জীবাণুগুলি এখানে থাক্তের অভাবে মারা যায়। পর্দাটি সাত আট-সপ্তাহ কার্যকর থাকে।

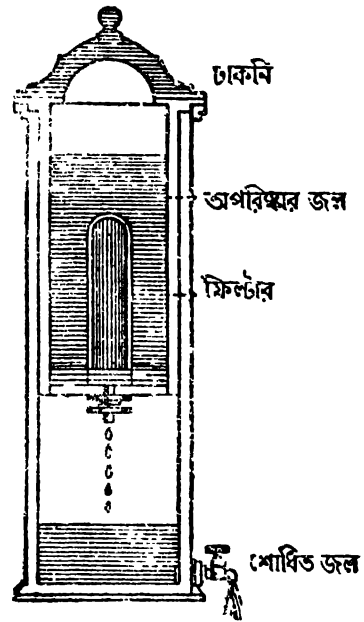




জল পরিষ্কৃত হইয়া সরবরাহের জন্য সংবদ্ধিত হইতেছে

ফিল্টার বেডে জল পরিস্কৃত হইবার পর জলে ক্লোরিন মিশাইতে হয় এই সময় জলের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। ঐ স্বাদ ও গন্ধ সৃষ্টি করার জন্য পরিস্কৃত জলকে যান্ত্রিক উপায়ে বায়ুচালিত করা হয় অর্থাৎ কুয়াশার আকারে উহাকে বায়ুমধ্যে ছিটানো হয়। বায়ুচালিত হইবার ফলে জলের মধ্যে বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং জলে একটি সুন্দর স্বাভাবিক স্বাদ আসে। পরিস্কৃত জলকে তারপর ট্যাঙ্কে ধরিয়া লইয়া সমস্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। কলিকাতা শহরে এই উপায়ে জল বিশোধিত করা হইয়া থাকে।

**বার্কফেল্ড ফিল্টার ( Berkefeld Filter ) :** পানীয় জল বিশোধনের জন্য বর্তমানে গৃহে বার্কফেল্ড ফিল্টার ব্যবহৃত হয়। এই ফিল্টারের মধ্য দিয়া রোগজীবাণু ও ভাসমান পদার্থ-সমূহ অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু জল অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া অশুদ্ধ পরিচালিত হইতে পারে। একটি পিপার দ্বারা চীনা মাটির পাত্রের মধ্যে এই ফিল্টারটি বসান থাকে। নদী, পুকুর ইত্যাদি হইতে জল সরাসরি ঐ চীনা মাটির পাত্রের মধ্যে জমা করা হয়। ফিল্টারের মধ্য দিয়া জলকণাগুলি চুয়াইয়া নিম্নের একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। ধূলাবালি, রোগজীবাণু ইত্যাদি উপরের প্রকোষ্ঠেই পড়িয়া থাকে।



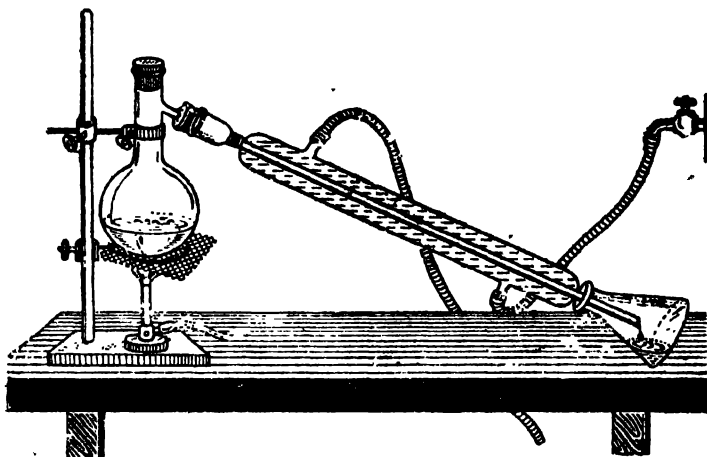
বার্কফেল্ড ফিল্টার

(২) **ঔষধাদি প্রস্তুত ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য জল বিশোধন :**

যদি যে পানের জন্যই জল চাই তাহা নয়, ঔষধাদি প্রস্তুত করা এবং রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ধাতবলবণ ও গ্যাসসমূহ বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন। একমাত্র পাতন প্রক্রিয়ায় এইরূপ বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে সাধারণ পাতন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হইল :

**পাতন প্রক্রিয়া ( Distillation ) :** একটি ফ্লাস্কে কিছুটা অবিভক্ত জল লইয়া কর্কের সাহায্যে উহাকে বায়ুনিরুদ্ধ করিতে হইবে। কর্কের সঙ্গে

একটি নির্গমনল যুক্ত থাকে এবং ঐ নির্গমনলটি আবার লাইবিগ কনডেনসারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লাইবিগ কনডেনসারটি একটি কাচের জ্যাকেট পরানো



পাতন প্রক্রিয়া

নলবিশেষ। প্রথমে জ্যাকেটের মধ্য দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করাইতে হয়। জলীয় বাষ্প সরু কাচের নলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ঐ শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয় এবং গ্রাহক পাত্রে সংগৃহীত হয়। ধাতব লবণসমূহ অস্ফুটনীয়। সুতরাং উহারা ফ্লাস্কের তলায় পড়িয়া থাকে। ফ্লাস্ক, কনডেনসার এবং গ্রাহকপাত্রকে একসঙ্গে পাতনযন্ত্র বলা হয়।

(৪) বস্তাদি ধৌতি এবং বয়লারের জন্য সর্বদা মৃদু জল দরকার। জলে কতকগুলি ধাতবলবণের উপস্থিতি হেতু জল খরতাপ্রাপ্ত হয়। জলের খরতা দুই প্রকার—স্থায়ী ও অস্থায়ী। জল ফুটাইয়া সহজেই জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

1. গৃহে শিশুর স্থান ( Place of child in the home ) :

পরিবারে একটি শিশুর আগমন আনন্দ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ছোট বড় গৃহের সকলে তাহার জন্ম অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তবে বাপ মায়ের জীবনে একটি শিশুর আগমন সাধারণ আনন্দ ও উত্তেজনায় চেয়ে বেশী অর্থবহ। কারণ সন্তান দাম্পত্যসম্পর্ক পাকা করিয়া তোলে এবং নবনারীর জীবনের স্বপ্নকে গভীরতা দেয়। দৈহিক আকর্ষণের স্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। দাম্পত্যজীবনে সন্তানের অভাব কোন কিছু দিয়া পূর্ণ করা যায় না।

পরিবার ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎই হউক শিশুর আগমনে পারিবারিক জীবনযাত্রায় একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। অল্প সময়ের মধ্যে শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা করা কঠিন নয় কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং ইহার জন্ম যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি ঘটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। গৃহের প্রত্যেককে উপলব্ধি করিতে হইবে সকলের উপর একটি নতুন দায়িত্ব আসিয়াছে এবং ছোট বড় সকলকে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ পালন করিতে হইবে।

পরিবার একটি যৌথজীবন এবং গৃহের সকলে এই যৌথজীবনের অংশীদার। সকলের সহযোগিতার উপর যদি এই যৌথজীবন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা শিশুর পক্ষে এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। শিশু পালনের কাজে সাহায্য করিয়া বাবা জীবন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন এবং শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসার সুযোগ পান। অবশ্য পারিবারিক সহযোগিতার দ্বারা সকলের চেয়ে বেশী লাভবান হয় শিশুরা।

শিশু যদি প্রথম হইতেই পরিবারের একজন বাস্তব ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পায় তবে তাহার ভালবাসার দাবী মিটিতে পারে। শিশুকে অবশ্য একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে, তাহার চেয়ে বেশী কিছু নয় অর্থাৎ সে যে পরিবারের সকলের অতি আদরের বস্তু, বাপমার জীবন যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে একথা যেন সে টের না পায়।

শিশুর আগমনের পর বাড়ির সকলকে এই নতুন সভ্যটির সঙ্গে থাপ-

থাওয়াইতে হয়। বয়স্ক শিশুদের উপলব্ধি করা দরকার যে এখন হইতে তাহাদের একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে। নতুন শিশুটির বেশী বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। তাই তাহার নিজার সময় বেশী হৈ চৈ চেষ্টামেচি করা চলিবে না। তাহার খাওয়ার প্রয়োজন বেশী। নতুন শিশুটির প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া হয়ত তাহাদের ছোটখাট দাবীগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বাড়ির সকল শিশুই যদি তাহার প্রাপ্য ভালবাসা এবং বড়দের মনযোগ, লাভ করে, প্রয়োজনীয় স্বত্বস্ববিধাগুলি ভোগ করে এবং নিজ নিজ বয়সের অনুপাতে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায় তবে নতুন শিশুর আগমনে যে অনুবিধা সৃষ্টি হইবে তাহারা অনায়াসে তাহা মানিয়া লইবে। নতুন শিশুটিও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে শিখিবে যে সে পরিবারের একজন অংশীদার কিন্তু একমাত্র অংশীদার নয় কিংবা উহার কর্তা অথবা উপরওয়ালার নয়। শিশুর দৈনিক প্রয়োজনগুলি অবশ্যই মিটান হইবে কারণ তাহার নরম ক্ষুদ্র দেহ এখনও পরিবারের কঠিনের সঙ্গে চলার মত মজবুত হইয়া ওঠে নাই। তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা কোন ব্যাধাবশতঃ ক্রন্দন শোণামাত্র সঙ্গ সঙ্গ মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে শিশুর এই সবেদ মধ্যে একটিও অনুবিধা ঘটে নাই শুধু অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সে কাঁদিতেছে তখন তাহার কান্না থামাইবার জন্য কেহ কাজকর্ম বন্ধ করিবে না। ক্রমশঃ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু উপলব্ধি করিবে যে চাহিলামাত্র তাহার দাবী পূরণের কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাহার পালা আসা পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। শিশু গৃহে এই তথ্যটি যত শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে বড় হইয়া বাহিরের জগতে খাপ খাওয়াইতে তাহার তত বেশী সুবিধা হইবে।

পরিবারের নিকট শিশুর প্রধান দাবী হইল নিরাপত্তার দাবী। বাড়ির সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করিলে তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব আসা সম্ভব। ইহার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠা দরকার। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির লোকদের যত বেশী সঙ্গ পাইবে তত বেশী তাহাদের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইবে।

একটি শিশুর আগমনের ফলে পরিবারের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সময় পরিকল্পনা যেন দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যাহত না হয়। যত শীঘ্র সম্ভব শিশুর জীবনও একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এই ছক যে কিরূপ হইবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া স্থির করিতে হইবে।

জোর অবরুদ্ধি করিয়া শিশুর জীবনে কোন নিয়ম চাপাইতে নাই ইহাতে

হয়ত সে প্রবল আপত্তি জানাইবে। আসল কথা হইল শিশুর জীবনের ছক এবং পারিবারিক জীবনের ছক একরূপ হইবে যে সকলের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ও তৃপ্তিলাভ হইবে এবং সকলের জীবনের কাজকর্ম সবচেয়ে কম ব্যাহত হইবে।

মাতৃমহাত্মাই স্নেহের কাঙাল। তাই জননীর-স্নেহস্পর্শ ব্যতীত শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না। মা কিংবা মাতৃস্থানীয় অপর কেহ তাহার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইলে, তাহার ক্ষুদ্র দেহ লইয়া নাড়াচাড়া করিলে, তাহাকে আদর করিলে, তাহার সঙ্গে স্নেহচুষন আঁকিয়া দিলে, কথা বলিলে এবং খেলা করিলে শিশুর আনন্দলাভ হয় এবং শিশুর সঙ্গে এইভাবে একটা গভীর আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে শিশু মাতৃস্নেহ আশ্বাসন করে। বাহ্যিক শিশু যাহারা পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয় তাহারা বাপ-মা, বাড়ির লোক, পরিবারের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে এত অজস্র স্নেহ পায় যে তাহাদের আর স্নেহের ক্ষুধা থাকে না। অবশ্য অতিরিক্ত আদর আবার অনাদরের মতই খারাপ হইতে পারে।

প্রথম সন্তান এবং বহু আঁকাঙ্ক্ষিত সন্তানরা বাপ-মায়ের অধিক মনোযোগ এবং অতিরিক্ত প্রেমা পায়। তাহার সব আশ্বাস এবং সমস্ত খেয়ালখুশি তাহারা পূরণ করেন। ফলে শিশু তাহার নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বড় ধারণা পোষণ করিতে থাকে। এই ধারণা সবসময় তাহার পক্ষে হিতকর হয় না এবং বাস্তবে তাহার নিজেকে খাপ খাওয়াইতে কষ্ট হয়। জন্মের কয়েক বছর পরে শিশুর যখন বাপমায়ের উপর একান্ত নির্ভরতার সময় কাটিয়া যায় তখনও অনেক বাপ-মা সন্তানের সব কিছু করিয়া দেন। একসময় সে যে তাহাদের খোকা অথবা খুকু ছিল একথা তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। ফলে সন্তানের বাপমায়ের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আসক্তি দেখা যায়। এইসব সন্তানরা কখনো আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না এবং বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে সহজেই ভাঙিয়া পড়ে।

**শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা** ( General management of the baby ) : জন্মের পরেই শিশু স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে না কিংবা নিজের দেহের প্রয়োজনগুলি নিজে মিটাইতে পারে না। পরন্তু অগ্নাগ্ন জীবের তুলনায় মানব-শিশু অনেক বেশী অসহায় এবং পরনির্ভর থাকে। আর এই পরনির্ভরতা চলে দীর্ঘদিন ধরিয়া। মাতৃমহাত্মার মত কোন প্রাণীরই শৈশব এত দীর্ঘ নয়। প্রত্যেক জননীকেই তাই দুইটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, তাঁহার শিশুর দৈহিক প্রয়োজন কি কি? দ্বিতীয়তঃ, কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার প্রয়োজন মিটান যায়। সংক্ষেপে বলা যায় সন্তোজাত

শিশুর দৈহিক প্রয়োজন পাঁচটি—খাদ্য, নীরবতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু ও উপযুক্ত উত্তাপ। শিশুর যত্ন লইবার প্রণালী এই যে আবেগবশতঃ হঠাৎ একেক বার একেক ভাবে যত্ন লওয়া উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত শিশুর চিন্তাশক্তির উদয় না হয় এবং সে অল্প কিছু আশা না করে ততদিন বিনা পরিবর্তনে দিনের পর দিন একই সময়ে এবং একইভাবে যত্ন লইতে হইবে। যে শিশু স্বস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় জাত তাহাকে অনিয়মে অনাবশ্যক বহু দ্রব্য না দিয়া নিয়মিতরূপে কেবল আবশ্যক দ্রব্যগুলি দিলেই সে স্বাস্থ্যে, সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। তাহার ঘুমের, স্নানের, আদরের ও কোলে লইবারও নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক।

শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে পরিমাণ মত ও যথাযথ সময়ে আহার। মায়ের দুধই হউক আর বোতলের দুধই হউক শিশুকে ঘন ঘন না খাওয়াইয়া প্রতি দিন আড়াই কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। প্রতি বারে শিশু যদি যথেষ্ট দুধ পায় তবে সে মনের আনন্দে প্রায় তিন ঘণ্টা থাকিতে পারে।

রাত্রির খাওয়া প্রথম হইতেই বন্ধ করিয়া দিয়া দিনে-রাত্রে ৮-বারের পরিবর্তে ৭-বার খাওয়াইবে। শিশু ছষ্টপুষ্টি হইলে দুই মাস বয়স হইতেই চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান অভ্যাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৬-বার খাওয়াইবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে দুধের সঙ্গে আহুযজিক অগ্রাণু খাওয়া দিতে হয়। উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশুর যথাযথ দৈহিক বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই শিশুকে উপযুক্ত আহার দেওয়াই মায়ের কর্তব্য। শিশু উপযুক্ত আহার পাইলে তাহার বয়সের অল্পপাতে ওজন বৃদ্ধি পাইবে।

**শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপায় :** খাটি দুধ পান না করা পর্যন্ত চিনি ব্যতীত শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাহার ওজন বাড়াইবার জন্য তাই জলমিশ্রিত দুধে কোন প্রকার শর্করা দিতে হয়। গ্লিসি, মধু, কিংবা চিনি মিশান যাইতে পারে। নবজাত শিশুকে দুধ পান করাইবার সময় প্রতি বারে চা চামচের আধ চামচ হইতে শুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে উহার পরিমাণ বাড়াইয়া দুই চামচ পর্যন্ত করা যায়। শিশুর ওজন যদি আশাহরূপ না বাড়ে তবে শিশুকে আর চিনি না দিয়া গুঁড়া দুধ দেওয়া ভাল কারণ উহা হজম করা সহজ। মল নরম কিংবা পাতলা হইলে চিনির পরিমাণ কমাইতে হয়।

যে শিশু মাইপোষে দুধ পান করে তাহাকে এক মাস হইতেই কমলালেবুর

রস দেওয়া উচিত। স্তন্যপায়ী শিশুদের ওজন না বাড়িলে মাইপোষে কিছু স্বতন্ত্র খাদ্য দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মাতৃদুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া কৃত্রিম খাদ্য দিতে হইবে।

নীরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন। কারণ বিশ্রামই শিশুর ক্লান্তি দূর করিয়া তাহার দেহগঠনে সাহায্য করে। শিশুকে তাই একাকী বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়। আহারের পর শিশুকে নিয়া বেশী আদর ও নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। সে হয়ত বিছানায় আদৌ শুইয়া থাকিতে চাহিবে না এবং গা মোচড়া মুচড়ি করিবে কিংবা কাঁদিয়া অসম্মতি জানাইবে কিন্তু এসব ব্যাপার অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর নিস্তরু বিছানায় থাকিয়া আপনিই সে ঘুমাইয়া পড়িবে। অতিরিক্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পরিণত বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল ভাল হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিশুর অগ্রতম দৈহিক প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্নতার ফলেই আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল এবং তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন আরও বেশী। শিশুর দেহ, জামা-কাপড় ও বিছানা সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। এবং শিশুকে নিয়মিত স্নান করাইতে হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশুর জন্ম নির্বাচন করা উচিত। শীতপ্রধান দেশের শিশুদের দেহে উত্তাপ ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট জামাকাপড় পরাইতে হয় কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনাবশ্যক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শিশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটিবে।

**শিশুকে মাই ছাড়ান (Weaning the baby) :** বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ধীরে ধীরে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অল্প খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হয় নতুবা শিশুর উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এইজন্য শিশুকে দুই তিন মাস বয়স হইতে প্রথমে ফলের রস, তারপর সিরিয়াল, তারপর শাক-সবজি এবং অবশেষে শক্ত ফল অভ্যাস করাইতে হয়। প্রথমে চায়ের চামচের সিকি চামচ রস দিয়া শুরু করিয়া ৪/৫ মাস বয়সে ২/৩ চামচ এবং ৬ মাস বয়সে বড় চামচের



২/৩ চামচ দিতে হয়। গাজরের রস, কমলালেবুর রস ও টমেটোর রস বিশেষ উপকারী। ফলের রসে কয়েকদিন অভ্যস্ত হইলে সিরিয়াল দিতে শুরু করিবে।

**সিরিয়াল :** আমরা প্রথমে সূজি জাতীয় মিহি-সিরিয়াল ব্যবহার করিব। তবে 'ফ্যারাক্স' নামক সিরিয়ালও দেওয়া যাইতে পারে। সূজি দিতে হইলে প্রথমে সূজি ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া চা চামচের এক চামচ পরিমাণ দুধের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে। এইভাবে তিন মাস বয়স হইতে সিরিয়াল খাওয়াইতে শুরু করিয়া ক্রমশঃ সিরিয়ালের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সে দৈনিক ৬ আউন্স করা যাইতে পারে। শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পর তিন মাস বয়সে শক্ত বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে সে চুষিতে কিংবা কামড়াইতে পারে। ছয় সাত বয়সে প্রতিদিন সিরিয়াল না দিয়া মাঝে মাঝে দুধের সঙ্গে একটি টোস্টও দেওয়া চলে।

**শাক-সবজি :** সিরিয়ালে অভ্যস্ত হইবার পর পাঁচ মাস হইতে শিশুকে শাক-সবজি দিতে শুরু কারবে। বেলা একটা কিংবা সাড়ে চারটার সময় যখন সে দুধ খাইবে তখনই শাক-সবজির ঝোল খাইবার উপযুক্ত সময়। সবজির মধ্যে আলু, পালং শাক ও গাজরই উৎকৃষ্ট। নয় দশ মাসে কড়াই গুটিও বাধাকপির ঝোল দেওয়া চলে। সবজিগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া একটু লবণ দিয়া সিদ্ধ করিয়া খেঁতলাইয়া দিতে হয়। শিশুর এই খাণ্ডে কোনরূপ মাখন কিংবা তেল দেওয়া চলে না।

শিশুর বৃদ্ধির জন্ত এই বয়সে খনিজ লবণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই শাক-সবজির ঝোল হইতে শিশু যেন প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পায়। কোন সবজি যদি দুই তিন দিন গ্রহণে আপত্তি জানায় তবে ছোর করিয়া উহা আর তাহাকে খাওয়াইবে না। তট এক সপ্তাৎ বাদে ঐ সবজি আবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে সে খায় কিনা।

২/১০ মাসের শিশুকে সুসিদ্ধ মাছ কিংবা মাংস ভাল করিয়া চটকাইয়া একদিন অন্তর একদিন ই হইতে এক আউন্স করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মাছ-মাংসের বদলে ৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া চলে।

**জল, ফল ও ফলের রস :** একেবারে শৈশবের খাণ্ড হইল জলীয়। কিন্তু কঠিন খাণ্ড খাইতে শুরু করিলে শিশু জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। এই সময় কমলালেবুর রস ব্যতীত সিরিয়ালের সঙ্গে খোসাছাড়ান আপেল, আপেলের রস কিংবা পেঁপা পাকা কলা দেওয়া যাইতে পারে। কমলালেবুর রস ব্যতীত আনারসের রসও দেওয়া চলে। অল্প কোন ফলের রস দিলেও লেবু কিংবা টমেটোর রস দিতেই হইবে।

**দন্তোদগম (Teething) :** শিশুর দাঁত ওঠা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা সাধারণতঃ ছয় সাত মাস বয়স হইতেই শিশুর দাঁত ওঠার প্রতীক্ষায় থাকি। কিন্তু ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। ঐ সময় শিশু যদি অসুস্থ হয় তাহার পেটের পীড়া দেখা দেয়, সবুজ ও নরম পায়খানা হয় তবে দাঁত ওঠার জন্মই এরূপ হইতেছে ভাবা ঠিক নয় কারণ দাঁত ওঠা ভিন্ন অস্বাস্থ্য কারণেও ঐসব উপসর্গ আসিতে পারে। কাজেই অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া উহাদের দূর করা উচিত।

এক বৎসর বয়সে শিশুর অন্ততঃ ছয়টি এমন কি বারোটি পর্যন্ত দাঁত উঠিতে পারে। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে দেখিবে শিশু যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ পদার্থ, দুধ, শাক-সবজি, কডলিভার অয়েল এবং রোজ স্নান পাইতেছে কিনা। শিশুর কখন কয়টি দাঁত উঠিতে পারে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অস্থায়ী দাঁত	সংখ্যা ২০ টি
দাঁত ওঠার সময়	দাঁতের সংখ্যা
১ম ৬-৮ মাস	নীচের পাটির সম্মুখের ছেদন দন্ত ২
২য় ৮-১০ মাস	উপরের " " " " ৪
৩য় ১২-১৮ মাস	নীচের পাটির পার্শ্বের ছেদন দন্ত ২
	এবং প্রথম পেষণ দন্ত ৪
৪র্থ ১৮-২০ মাস	শা দন্ত ৪
৫ম ২৮-৩২ মাস	দ্বিতীয় পেষণ দন্ত ৪

মোট—২০

জীবনে দুইবার দাঁত উঠিয়া থাকে। জন্মের পর ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে কুড়িটি অস্থায়ী দাঁত ; তারপর ছয় হইতে বিশ বছরের মধ্যে ঐ দাঁত পড়িয়া গিয়া ৩২টি নতুন স্থায়ী দাঁত ওঠে।

**২. শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের সাধারণ দিক (Elementary aspects of growth and development of children)**

মাতৃভ্রষ্টবে আসিবার পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দেহে অনবরত পরিবর্তন চলিতে থাকে। জীবনের প্রারম্ভে এই পরিবর্তন চলে অতি দ্রুত বেগে, তারপর উহার গতি মত্তর হইয়া আসে কিন্তু পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষ অব্যাহত থাকে। যৌবনের স্বন্দর স্বরূপ দেহের জায়গায় ধীরে ধীরে জরা নামিয়া আসে, দাঁত পড়ে, চুল পাকে, মানুষের দেহের এই যে বিকাশ ইহার গতি ধারাবাহিক, জননীর সম্ভান ধারণের পর হইতে ইহার শুরু। বস্তুতঃ পুং কোষ এবং স্ত্রী কোষের মিলন মুহূর্ত হইতে শিশুর দেহ গঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায় ভূমিষ্ঠ

হইবার পর হইতে সন্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। জন্ম তাই কোন একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, বহুপূর্ব হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃগর্ভে তাহার আগমনের বিরাট প্রস্তুতি চলে।

জন্মের পর শিশু কেবল খানিকটা দৈর্ঘ্যে প্রস্বে বাড়িয়া ওঠে না, পরন্তু পরিণতির লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্ত তাহার একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের নামই শিশুর বিকাশ। জীবনের পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ দেখা যায় যথা—(১) দৈহিক, (২) মানসিক, (৩) ভাষাগত, (৪) প্রাক্ষেপিক এবং (৫) সামাজিক চেতনার বিকাশ।

**দৈহিক বিকাশ (Physical development) :** গর্ভসঞ্চারণের পর মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ গঠিত হয় উহা নিজ ধর্ম অনুসারে বৃদ্ধি পায়। একটি বিভক্ত হয় দুইটি কোষে, দুইটি আবার চারটি কোষে। এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং আদি কোষটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ মাতৃষের আকার ধারণ করে। প্রথম দুই সপ্তাহ ডিম্বকোষের কোন বাহ্য পরিবর্তন ঘটে না। শুধু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। দুই সপ্তাহের পর ডিম্বকোষটি দ্রুত বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং উহা জ্রণ নামে অভিহিত হয়। মাতৃদেহ হইতে ঐ জ্রণ পৃষ্টিলাভ করে। তিন মাসের পর হইতে কোষগুলি মাতৃষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গর্ভের প্রথম সপ্তাহ হইতে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে জ্রণের আদি বা প্রাথমিক পর্যায় এবং নবম সপ্তাহ হইতে ভ্রূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট জ্রণের অবস্থা বলে। সাত মাস ধরিয়া জ্রণ ধীরে ধীরে মানবশিশুর আকার ধারণ করে। এই সময় বিভিন্ন কাজের জন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পেশী, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়।

দেহের অভ্যন্তরে কোন জন্মগত ত্রুটি না থাকিলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু দৈর্ঘ্যে, প্রস্বে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্ত ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং অন্ত্র প্রভৃতিও আকৃতিতে বাড়িতে থাকে। দৈহিক বিকাশ শুধু আকৃতিগত পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও সাংগঞ্জ্য বদলায়। যৌবনোদগমের পরেই শিশুর দেহে বয়স্ক ব্যক্তির দেহের গঠনের অনুরূপ সাংগঞ্জ্য আসে। :

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কতকগুলি অবয়ব বিলুপ্ত হয়, যেমন বক্ষঃস্থলে অবস্থিত শৈশবগ্রন্থী নামে পরিচিত থাইমাস গ্রন্থী, মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থী, বেবিনস্কি এবং ডারউইনিয়ান রিস্ট্রেক্টগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত

হয়। এতদ্ব্যতীত শৈশবের দাঁত এবং চুল পড়িয়া নতুন স্থায়ী দাঁত ও চুল পড়ায়। যৌবনোদগমের সঙ্গে যৌবনের নানা চিহ্ন দেহে পরিস্ফুট হয় এবং তাহার মনে নানা যৌন কৌতূহল দেখা দেয়।

**মানসিক বিকাশ ( Mental development ) :** দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনেরও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নতুন নতুন কথা শেখে, প্রতি বৎসরই তাহার শব্দভাণ্ডার বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, বস্তু নিরীক্ষণের ক্ষমতা, কল্পনা প্রবণতা ইত্যাদি বাড়িতে থাকে।

শিশুর প্রথম চিন্তা অবাস্তব এবং কাল্পনিক। সে সর্বদা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাহার চিন্তা নিজেকে লইয়া। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ করে, তাহার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব কমিয়া যায় এবং সে ক্রমশঃ সামাজিক হইয়া ওঠে।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতূহল। সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতূহল বেশী দেখা যায়। শিশুরা এই সময় খেলনা পাইলে ভাড়িয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাহার কৌতূহল হইতে জ্ঞানপিপাসার গভীরতা ও মানসিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

**ভাষার ক্রমবিকাশ ( Language development ) :** ভাষার ক্রমবিকাশ মানসিক ক্রমবিকাশেরই অন্তর্গত। শিশুর কথা শেখার প্রচেষ্টাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি—(ক) প্রাক্কথন এবং (খ) কথা বলার স্তর।

(ক) **প্রাক্কথন স্তর :** কথা বলিতে শেখা একটি সময়মাপেক্ষ জটিল ব্যাপার। সাধারণতঃ ১১/১২ মাসের পূর্বে শিশুর ভাষা ফোটে না কিন্তু ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বাক্যস্তরের যে স্থনিপুণ কর্মক্ষমতার প্রয়োজন হয় জন্মের প্রথম লগ্নেই তাহার তালিম শুরু হইয়া যায় এবং সে ক্রন্দন, কাকলি এবং ভঙ্গিমার সাহায্যে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে।

**ক্রন্দন :** জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহ শিশু প্রায় অকারণে কাঁদিয়া উঠে। জন্মের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে শিশুর কান্না কমিয়া আসে। তখন শিশু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বস্তিবোধ, যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা কারণে কাঁদে। তিন মাস বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই শিশু উপলব্ধি করিতে শেখে যে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের অব্যর্থ অস্ত্র হইল ক্রন্দন।

**শৈশবের কাকলি :** ক্রন্দন ব্যতীত আরো অনেক ধ্বনি শিশুর কণ্ঠে শোনা যায়। ইহারই নাম শৈশব-কাকলি। সাধারণতঃ চার মাস বয়সে শিশুর কাকলি শুরু হইয়া যায়। ভাষার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে শিশু তাহার প্রায় সবগুলিই এই সময় উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহার মুখে প্রথম স্ববন্ধনি তারপর ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব হয়। জন্মকাকলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরুক্তি অর্থাৎ একটি শব্দ শিশু বার বার উচ্চারণ করে, যেমন মা-মা-মা দা-দা-দা ইত্যাদি। এখানে মামা শব্দের অর্থ মতাই মামান্নয়। শৈশব-কাকলির পুনরুক্তি একেবারে অর্থহীন। বস্তুতঃ শৈশব-কাকলি উদ্দেশ্যহীন কথা নিয়া খেলা। তবে উদ্দেশ্যহীন হইলেও বৃথা নয়। ইহার মধ্য দিয়া শিশু ক্রমশঃ বাক্যস্তরের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে।

**ভঙ্গিমাভাষণ :** ক্রন্দনের মতই ভঙ্গিমাও শিশুর মনের ভাব-প্রকাশের একটি উপায়। প্রত্যেকটি শিশু অঙ্গ দোলাইয়া তাহার আনন্দ, বিরক্তি, নানারকম ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পিতামাতা সামান্য পেচোটা করিলেই প্রত্যেকটি শিশুভঙ্গিমার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন।

(খ) কথা শেখা : প্রাক্কথন হইল কথা শেখার প্রস্তুতির পর্ব। ইহার পরে প্রকৃত কথা শেখার পালা শুরু হয়। মজ্ঞানে ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্বে আসে বয়স্কদের অঙ্কুরণ করার চেষ্টা।

**অঙ্কুরণ :** স্বস্থ শিশুরা ৬/৭ মাস বয়স হইতেই বড়দের স্বর অঙ্কুরণের চেষ্টা করিতে থাকে। বিশেষ শব্দোচ্চারণের পূর্বে শিশু কথার স্বর, টঙ্ক এবং ছন্দ অঙ্কুরণ করে। তাই বড়রা উহার সামনে কথা বলিলে সে আপনার নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনি করিয়া ওঠে। এই অবস্থাকে প্রতিধ্বনি প্রতিক্রিয়া স্তর (echo reaction stage) বলে। ১০/১১ মাস বয়স হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের স্বরকম্পন অঙ্কুরণ করিবার জ্ঞান শিশু প্রস্তুত হয়। এই সময় সে মামা দাদা কথাগুলি বলতে শেখে এবং বয়স্কদের নিকট হইতে ক্রমশঃ মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। পরে বিদেশী ভাষাও শেখে।

**অর্থবোধ :** শিশু ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে স্বতন্ত্র অর্থের সংযোগ সাধন করিতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রথম শিশু প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া উহাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী লক্ষ্য করে। ফলে সকল বয়স্ক পুরুষকে বাবা এবং সকল বয়স্ক মহিলাকে মা বলিতে শেখে।

**শব্দসম্ভার ও বাক্য গঠন :** শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায় এবং এক একটি শব্দের সাহায্যে তাহার মনের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তারপর আসে ক্রিয়াপদ এবং

বিশেষণ। সর্বনাম শব্দ লইয়া প্রত্যেক শিশু বড় গোলমালে পড়ে। দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে শিশুর শব্দে বিশেষত্বের তুলনায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়ের আধিক্য দেখা যায়। তিন বছর বয়সে শিশু শুদ্ধ বাক্য গঠনের অধিকারী হয়।

**তোতলামি :** অনেক সময় দেখা যায় কথা বলিতে গিয়া শিশু ইতস্ততঃ করে, বার বার একটি শব্দ এবং শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। শিশুর এই ভাষাবিকৃতির নামই তোতলামি। তোতলামি ভাষাবিকাশের পথে এক দুস্তর বাধাস্বরূপ। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বাধা ঘটায় এই তোতলামি। শৈশবেই তোতলামি দূর করা উচিত নতুবা উহা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে এবং শিশুর মধ্যে একটি স্থায়ী হীনমত্যতার সৃষ্টি করিতে পারে। সাধারণতঃ দুই তিন বছর বয়সের সময়, পাঠশালায় প্রবেশের কালে কিংবা যৌবনোদ্যমের সময় তোতলামি দেখা দিতে পারে কারণ এই সময়গুলিতে শিশু এক একটি নতুন পরিবেশের সম্মুখীন হয়। দুই তিন বছর বয়সে শিশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের বীজটি সবেমাত্র অঙ্কুরিত হয়, পরিচর্যা হইতে এই প্রথম সে তাহার স্বাভাবিক উপলব্ধি করিতে শেখে। তারপর পাঠশালায় আসিয়া শিশু নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, বিচিত্র পাঠ্যবিষয় ইত্যাদির সম্মুখীন হয়, অপরিচিত বহু নতুন শিশুর সান্নিধ্যেও অনেক শিশু হতভম্ব হইয়া পড়ে। তারপর আবার যৌবনকালে তাহার দেহের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। জীবনের এই তিনটি জটিল সময়ে শিশুর নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হইতে পারে এবং তাহার ভাষা ঠিক পরিবেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না, ফলে তোতলামি দেখা দেয়।

অশুভকরণপ্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে অতিশয় প্রবল। আশেপাশে কোন তোতলা ব্যক্তি থাকিলে শিশু আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অশুভকরণ করিয়াও তোতলা হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে অবস্থিত সঙ্গ হইতে শিশুকে দূরে রাখাই উচিত। এতদ্ব্যতীত স্নানবিক দোর্বল্য, পীড়ন, অকারণ ভীতি ও রুদ্ধ আবেগের ফলে তোতলামি দেখা দিতে পারে। বাবা-মা বদরাগী হইলে কিংবা গৃহে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাভগ্নীর আধিভাবও তোতলামি ঘটতে পারে। শারীরিক কারণ যেমন শৈশবে মস্তিষ্কে গুরুতর অঘাত লাগিলে কিংবা হায় প্রভৃতি পীড়ার ফলে তোতলামি ঘটে।

তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইল শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিসূচক আচরণ করা। তোতলা শিশুকে সর্বদা উপহাস করিলে, তিরস্কার করিলে কিংবা ধীরে ধীরে কথা বলার উপদেশ দিলে উন্টা ফল ফলিয়া থাকে। দৈর্ঘ্য

ধরিয়া তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মাতাপিতা সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন কোন পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে তোতলামির উদ্ভব হয় এবং সর্বদাই ঐরূপ পরিস্থিতি হইতে শিশুকে দূরে রাখিবেন। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক তোতলামি সারান যায়।

**ভাষাবিকাশের প্রধান অন্তরায় :** শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ যদিও একটি নির্দিষ্ট সার্বজনীন নিয়ম ধরিয়া চলে তথাপি কোন কোন শিশু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকে। কোন কোন উপাদানগুলি ভাষা শিক্ষার অন্তরায় সেই সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা হইল :

**স্বাস্থ্য (Health) :** ভগ্নস্বাস্থ্য ভাষাবিকাশের একটি প্রধান অন্তরায়। একেই ত রুগ্ন এবং দুর্বল শিশুর কথা বলার স্পৃহা কম, উপরন্তু তাহার মনোভাব আন্দাজ করিয়া লইয়া শিশু ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্বেই পিতামাতা তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। এইসব শিশু পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না বলিয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে বিলম্ব ঘটে। বধিরতা এবং ক্ষীণ শ্রবণশক্তিও ভাষা বিকাশের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায়। আজন্ম বধির শিশু স্বভাবতঃই মুক হয়।

**বুদ্ধি (Intelligence) :** বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। সকল বুদ্ধিমান শিশুই অবশ্য তাড়াতাড়ি কথা শেখে না। তবে যেসব শিশু তাড়াতাড়ি কথা শেখে তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান।

**সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ (Socio-economic status) :** যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে শিশুর জীবন কাটে ভাষাবিকাশে তাহার প্রভাব অসীম। উন্নত এবং মার্জিত পরিবেশে লালিত শিশুর ভাষা থাকে মার্জিত এবং শব্দভাণ্ডারও থাকে সমৃদ্ধ। দরিদ্র ঘরের শিশুরা মার্জিত ভাষার ব্যবহার শোনে না এবং সচরাচর মায়ের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়। জীবনে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না বলিয়া অশিক্ষিত পরিবারের পিতামাতা শিশুর উচ্চারণভঙ্গীও শোধরাইবার চেষ্টা করে না। অন্তর্ভুক্ত পরিবেশে লালিত হইলে অল্পমত শ্রেণীর শিশুরাও সহজেই সুন্দর ভাষা ও ভাবের অধিকারী হইতে পারে।

**যৌন পার্থক্য (Sex difference) :** গোড়ার দিকে ছেলেরা ভাষা-বিকাশের পথে মেয়েদের চেয়ে একটু অগ্রসর থাকে। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের অতিক্রম করিয়া যায়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ইহার কারণ এই সময় হইতে কন্যা জননীর এবং পুত্র পিতার সহিত আপনার সাযুজ্য লক্ষ্য করিয়া কন্যা মাতাকে এবং পুত্র পিতাকে অঙ্কুরণ করিতে চেষ্টা করে। পিতা অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে

কাটান বলিয়া পুত্র তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয় এবং ফলে তাহার ভাষা শিক্ষাও ব্যাহত হয়। এই কারণেই একমাত্র ছেলের চেয়ে একমাত্র মেয়েরাই বেশী বাকপটু হইয়া থাকে। ছেলেদের উচ্চারণ বিকারও মেয়েদের তুলনায় বেশী এবং তাহারও কারণ মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। মেয়েদের মধ্যে যে ভাবাবেগের ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের মধ্যে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মেয়েদের তুলনায় অভিভাবকদের নিকট বকুনি খায় ছেলেরাই বেশী।

**পারিবারিক সম্পর্ক ( Family relationship ) :** নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক ভাষাবিকাশে সহায়তা করে। শিশুবা যদি গৃহের পরিজনদের সকলের সঙ্গে সচ্ছন্দ কথাবার্তার স্রোত ও স্বাধীনতা পায় তবে তাহার ভাষারও দ্রুত উন্নতি ঘটিয়া থাকে। আবার যমজ শিশু এবং পরিবারের যে সকল শিশুরা একেবারে সমসাময়িক তাহারও ভাষাবিকাশে সচরাচর পিছাইয়া থাকে। কারণ তাহার প্রসঙ্গের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট থাকায় তাহাদের ভাষা সমাজায়িত হইতে বিলম্ব ঘটে। অনাথ আশ্রমের শিশুদের সম্মুখে আদর্শ ভাষার নমুনা থাকে না বলিয়া তাহাদেরও দ্রুত ভাষাবিকাশ ঘটে না। এই কারণে নার্সারী স্কুলের শিশুদের ভাষাবিকাশে বিলম্ব ঘটে।

**দ্বিভাষা (Bilingualism) :** শিশুকে একই সময়ে দুইটি বা ততোধিক ভাষা শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা ভাষা শিক্ষার অগ্রতম প্রধান অন্তরায়। বিশেষতঃ শিশু যদি গৃহে একটি ভাষা ব্যবহার করে এবং স্কুলে অপর একটি ভাষা (সাধারণতঃ বিদেশী ভাষা) শেখে তবে দুইটি ভাষাতেই সে পিছাইয়া থাকে। শিক্ষাবিদগণ আজকাল তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার পক্ষপাতী।

**প্রাক্কোষিক বিকাশ ( Emotional development ) :** নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কয়টি মৌলিক প্রকোষ নিয়া জন্মায় সে সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হইয়াছে। দার্শনিক দেকার্তে (Descarte) বিশ্বাস, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, দুঃখ ও আনন্দ এই ছয়টি মৌলিক প্রকোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ওয়াটসনের মতে শিশুর আবেগ মাত্র তিনটি—ভয়, রাগ এবং আনন্দ। জোর শব্দ এবং হঠাৎ ভারসাম্য বা অবলম্বন হারান হইতে ভয় জাগে। মূল রাগের উপলক্ষ্য মাত্র একটি—শিশুর স্পন্দন, অঙ্গচালনা ইত্যাদিতে বাধা দেওয়া। আবার আদর করিলে শিশুর মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু ওয়াটসনের এই মতের বিরোধিতা করেন। তাহাদের মতে শিশুর প্রকোষ এতই সাধারণধর্মী যে কোন্ প্রকোষের কোন্ প্রতিক্রিয়া তাহা বোঝা প্রায় অসম্ভব। ক্যাথারিন ব্রিজেস ( Katherine Bridges ) একাধিক পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে এক ধরনের



উদ্ভেজনামূলক অবস্থাই শিশুর আদিম প্রকোভ। তিন মাস বয়স হইতেই শিশুর এই আদিম প্রকোভ বিশেষায়িত হইতে শুরু করে এবং উহা হইতে আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য এই দুইটি প্রকোভ জন্ম নেয়। অস্বাচ্ছন্দ্য ৪ মাস বয়সে বিশেষায়িত হয় রাগে, ৫ মাসে বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে। ৬ মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয় উচ্ছ্বাসে, ৯/১০ মাসে বড়দের প্রতি ভালবাসার এবং ১৫ মাসে ছোটদের প্রতি অমুরাগে। এই বয়সেই শিশুর মনে হিংসারূপ প্রকোভেরও সঞ্চার হয়।

**প্রকোভের শ্রেণীবিভাগ :** সমাজজীবনে প্রকোভের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অল্পযায়ী প্রকোভকে ইতিবাচক ( Positive ) ও নেতিবাচক ( Negative ) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইতিবাচক প্রকোভগুলির মধ্যে পড়ে আনন্দ, স্বথ, স্নেহ কোতুহল ইত্যাদি। এই প্রকোভগুলি সমাজ-জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আমাদের সমূহ সাহায্য করে। পরস্তু ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি নেতিবাচক প্রকোভের পর্যায়ভুক্ত। নেতিবাচক বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা কিন্তু জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ভীতি-রোষ প্রভৃতি শিশুকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে। ভীতির অহুভূতি তাহাকে বিপদ হইতে সজাগ করিয়া দেয়, অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করে এবং বিপদের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের সহায়তা করে। রোষের অহুভূতি তাহাকে শত্রুকে পরাজিত করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার প্রেরণা দেয়। তবে এই সকল আবেগগুলি বেশী বাড়িতে দিতে নাই কারণ উহারা অতিরিক্ত বুদ্ধি পাইলে শিশুর মানসিক স্বস্থতার ব্যাঘাত ঘটাইবে। তাই গোড়া হইতেই শিশুকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত আবেগগুলি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

শিশুর আবেগের সুষ্ট বিকাশের পিছনে থাকে দৈহিক ও মানসিক পরিণমন ( maturation ) এবং উপযুক্ত শিক্ষা ( learning )।

**সামাজিক চেতনার বিকাশ ( Social development ) :** সামাজিক চেতনার বিকাশ বলিতে বুঝায় শিশুর পারিপার্শ্বিকস্থিত অত্যাশ্রিত ব্যক্তি, দল ও সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের পরিণতি। শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয় তখন হয়ত তাহার ভিত্তর সামাজিক হইবার ক্ষমতা সূপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু ভবুও সে সামাজিক নয়। কিন্তু শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। যে সমাজের মধ্যে শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমাজের অহুমোদিত আচরণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া ওঠে এবং সেই মান অহুমোদিত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা

করে। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে সামাজিকীকরণ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

**সমাজ বিকাশের ধারা :** দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সেইরূপ শিশুর চেতনার গতি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলে। শিশুর আচরণে এই গতিপথ অবধারিত। ফলে কোন শিশুকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করিয়াও কোন্ বয়সে শিশু ভীক কিংবা লাজুক হইয়া পড়িবে, কোন্ বয়সে ছেলেরা ছেলেদের প্রতি এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কোন্ বয়সে তাহাদের মধ্যে যৌন চেতনার বিকাশ হইবে ইত্যাদি তথ্য শিশুবিদরা বলিয়া দিতে পারেন। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশকে আমরা দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করিতে পারি—(ক) প্রাক্-সামাজিক আচরণ ও (খ) সামাজিক আচরণ।

**(ক) প্রাক্-সামাজিক আচরণ :** জন্মের সময় হইতে প্রায় দেড়মাস পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশু থাকে একটি অসামাজিক জীব। এই সময় শুধু তাহার দেহের প্রয়োজনগুলি মিটিলেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মাহুষ এবং বস্তুর পার্থক্য সে উপলব্ধি করে না। এই বয়সে শিশু মাহুষ এবং পশুপাখীর কণ্ঠস্বরের পার্থক্যও বুঝিতে পারে না। দ্বিতীয় মাস হইতে শিশু মাহুষ চিনিতে পারে। তৃতীয় মাসে সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয়। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া তাহাকে ভুলানো যায়। তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে সে কাঁদে। এই সময় হইতেই তাহার প্রকৃত সমাজচেতনা শুরু হইয়া যায়।

**(খ) সামাজিক আচরণ :** শিশুর প্রথম সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বয়স্কদের সঙ্গে কারণ বয়স্ক ব্যক্তিয়াই শিশুর জীবনের প্রথম সঙ্গী। প্রথম দেড় মাস শিশু মাহুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে কিন্তু প্রায় দুই মাস বয়স হইতেই শিশু মাহুষের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া ঘাড় ফিরাইতে পারে এবং মাহুষের মুখ দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। শিশুর মুখের হাসিই তাহার সমাজ-চেতনার প্রথম স্মৃতি অর্থাৎ এই সময় শিশু সর্বপ্রথম তাহার পাশে অপর ব্যক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

**তৃতীয় মাসে :** সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয় এবং মাহুষ দেখিলে হাত-পা ছুঁড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে। এই সময় শিশুর সঙ্গে কথা বলিলে সে কান্না ধামায় এবং কোনরূপ শব্দ করিয়া অন্তরিক্তে তাহার মনযোগ ফিরান যায়। এই বয়সে একা ফেলিয়া গেলে সে কাঁদে। তৃতীয় মাসেই শিশু মাকে চিনিতে পারে।

**চতুর্থ মাসে :** শিশুর সঙ্গে কেহ খেলা করিলে কিংবা কথা বলিলে সে

হাসিয়া প্রত্যুত্তর দেয়। এই বয়সেও কণ্ঠস্বরের তারতম্য তেমন উপলব্ধি করে না। ক্রুদ্ধ কিংবা প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শিশুর মুখে হাসি ফুটাইতে সমান কার্যকর।

**পঞ্চম মাসে :** তখন হইতে শিশু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। তীব্র কণ্ঠস্বর কিংবা ক্রুদ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হইয়া পড়ে। মিষ্টস্বর এবং মধুর চাহনিতে তাহার আনন্দের সঞ্চার হয়। খাটি এবং কৃত্রিম জ্বোলের পার্থক্য বোঝার তখনও ক্ষমতা জন্মায় না। পঞ্চম মাসে শিশু পরিচিত মুখ স্মরণ করিতে পারে এবং চেনা-অচেনার পার্থক্য বোঝে। এই সময়েই শিশু অগ্নি শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

**ষষ্ঠ মাসে :** বয়স্কদের প্রতি শিশুর মনোভাব থাকে আক্রমণাত্মক। সে বড়দের চুল ছিঁড়িয়া নাকমুখ খামচাইয়া দিতে চায়, চশমা ও বজ্রাদি ধরিয়া টানে। এতদ্ব্যতীত মুখের নানাবকম ভঙ্গী করিতে পারে। ষষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে অচেনা মুখ দেখিলে তাহার মধ্যে একটা লজ্জা ও ভয় জাগে। অপরিচিতদের প্রতি যেমন লজ্জা ও ভয় থাকে অপরিচিতদের প্রতি তেমনি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখা যায়।

**অষ্টম কিংবা নবম মাসে :** শিশুর ভাষা শেখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বড়দের অঙ্কুরণ করিয়া সে হাতে তালি দিতে কিংবা টা টা করিতে পারে।

**দশম হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে** শিশু আয়নার প্রতিফলিত আপন প্রতিবিম্বের সহিত খেলে এবং উহাকে চুম্বন করে। এক বৎসর বয়সের সময় শিশুকে না না বলিয়া কোন কাজ হইতে বিরত করা যায়। এই বয়সে শিশু অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়। নবম-দশম মাসে শিশুর লজ্জা খুব বেশী থাকে এবং এই সময়টি **অচেনা বয়স** (strange age) বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্ধ্বে আবার একটি অচেনা অধ্যায় আসে। এই সময় অচেনা লোক শিশুকে কোলে নিতে চাহিলে সে একেবারে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া ফেলে। ১৫ মাস বয়সে শিশু বড়দের সঙ্গে খুব পছন্দ করে এবং নানা কাজে তাহাদের অঙ্কুরণ করিতে শেখে। দুই বৎসর বয়সে শিশু অপরের দেখাদেখি নিজেই খাইতে, পোশাক পরিধান করিতে এবং তাহার খেলাঘরের সামগ্রীগুলি গোছগাছ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করে। শুধু বড়দের নকল করিয়াই শিশু জীবনে এতখানি স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে।

### 1. গৃহশুশ্রূষার মূলনীতি ( Basic principles of home nursing ) :

প্রতি গৃহেই অল্পবিস্তর রোগপীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহিণী অথবা অপর কোন বর্ষীয়সী মহিলাকে শুশ্রূষার দায়িত্ব লইতে হয়। স্বতরাং গৃহশুশ্রূষার মূলনীতিগুলি সকলের জানা থাকা উচিত। গৃহশুশ্রূষার মূল কথা হইল (১) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা এবং (২) সংক্রামক রোগ হইলে রোগের বিস্তার বন্ধ করা।

(১) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলাই হইল সবচেয়ে প্রথম কাজ। একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি যেমন স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

(ক) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন : স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(খ) পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজন : বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো-হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(গ) চিকিৎসাগত ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজন :

- (i) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগনির্ণয়,
- (ii) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধপথ্য লাভ,
- (iii) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক শুশ্রূষা লাভ।

রোগীর উপরোক্ত প্রয়োজন যেটান এবং রোগীর আরোগ্যলাভে সাহায্য করা গৃহশুশ্রূষার প্রথম ও প্রধান কথা।

(২) ব্যাধির বিস্তার বন্ধ করা : পরিবেশকে রোগমুক্ত রাখা গৃহশুশ্রূষার অন্যতম মূলনীতি। সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাতেই রোগ ছড়াইয়া পড়ে। তাই শুশ্রূষাকারিণীকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় এবং ব্যাধির

প্রসার বন্ধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। রোগভোগকালে, ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগীর কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাব, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা, বাসনকোসন ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

রোগমুক্তির পর রোগীর দেহ নির্বীজিত করিয়া ফেলা এবং যতদিন রোগ ছড়াইবার সম্ভাবনা থাকে ততদিন রোগীকে গৃহে সংরক্ষণ রাখা গৃহগুপ্ততার অন্ততম মূলনীতি।

এই নীতিগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে গৃহগুপ্ততা সফল হইয়াছে বলা যায়।

## ২. রোগীর সাধারণ যত্ন

( General care of the Patient )

(a) রোগি-কক্ষ নির্বাচন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ( Selection of sick room & its other requirements ) :

২. রোগি-কক্ষ নির্বাচন : উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগি যাহাতে অবস্থান করিতে পারে তাহা দেখাই গুপ্ততাকারিণীর প্রধান কাজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, ধূলিধূমবাহিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাধ্য করিতে পারে। হাসপাতালের কক্ষগুলি সাধারণতঃ রোগীর স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়াই তৈয়ারী হয়, কিন্তু গৃহে রোগি-কক্ষ নির্বাচনের স্বযোগ সীমিত থাকে। বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেয়ে আলোহাতাসমৃদ্ধ ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ঔষধ, পথ্য এবং গুপ্ততা যতখানি প্রয়োজনীয়, স্বর্গালোক ও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয়। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, ‘আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগি চায় আলো। গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, প্রত্যেকটি রোগী তেমন স্বর্গালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া গুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে।’ রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীর সেই ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগী-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার সুবিধা এই যে রোগীর ব্যক্তিগত পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঐ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ ঐগুলি কাহারো নজরে আসে না।

আসবাব-পত্রের সংস্থান : অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে অপসারিত করিবে। দরজা-জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং

আড়ম্বরশূন্য, জানালায় কোন নকশা কিংবা আফ্রি কাটা থাকিবে না, কারণ তাহাতে ধূলাবালি ও মাকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোগি নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় না লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে টেবিলে ধুইবাব সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে। কঞ্চল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে পুরু ব্রাউন পেপারদিয়া কঞ্চল ঢাকিয়া দিবে। রোগি-কক্ষের অন্ত্যন্ত প্রয়োজনীয়

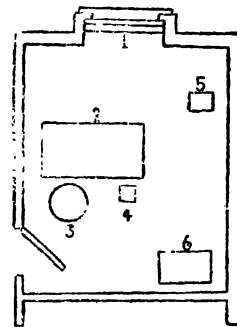
সরঞ্জামের মধ্যে রহিয়াছে—

- (১) একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার,
- (২) ঔষধ মাপিবার ও খাওয়াইবার

গ্রাশ,

- (৩) ফিডিং কাপ,
- (৪) কাপ, ডিশ, পীরিচ ও চামচ,
- (৫) মুখ ধোওয়াইবার গামলা,
- (৬) চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর

হাত মুছিবার জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র তোয়ালে,



রোগি-কক্ষ :—১. জানালা, ২. খাট, ৩. টেবিল, ৪. অংগস্তকদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার, ৫. শুশ্রূষাকারিণীর জন্য নির্দিষ্ট আসন, ৬. আলমারি।

- (৭) একটি কমোড এবং একটি বেড-প্যান,
- (৮) একটি গরম (hot water bag) ও একটি ঠাণ্ডা জলের বাগ (Ice bag),
- (৯) এক বালতি জল,
- (১০) একটি মগ,
- (১১) সাবান,
- (১২) এক কুজা পানীয় জল,
- (১৩) একটি নোটবুক ও পেন্সিল,
- (১৪) একটি ডুশ,
- (১৫) একটি সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি।

রোগীর ব্যবহারের চিকিৎসা, টয়লেটের সামান্য জিনিসপত্র, বাসনকোসন রোগি-কক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে রাখা যায়। আসবাবের বাহ্যিক যেমন রোগীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, একেবারে সম্ভাব্যহীন শূন্যকক্ষও রোগীর মনকে নিস্তেজ ও পীড়িত করিয়া তোলে। এইজন্য রোগি-কক্ষে সামান্য পুষ্পবিজ্ঞান দরকার। তবে ফুলের রং, বর্ণ, গন্ধ ও পরিমাণ নিরূপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুল রোগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতদ্ব্যতীত ফুলগুলি রাত্রে সরাইয়া ফেলা উচিত, কারণ ফুলের আকর্ষণে নানারকম কীট-পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। একমাত্র মানিপ্রান্ট ব্যতীত অন্য কোনরূপ গাছপালাও রোগীর ঘরে রাখা উচিত নয়।

**আলোর বন্দোবস্ত :** বৈজ্ঞানিক আলোই রোগি-কক্ষের পক্ষে উপযোগী। এই আলোকের প্রধান স্ববিধা এই যে ইহা বায়ুস্থিত অক্সিজেন টানিয়া লয় না। উপরন্তু প্রয়োজন হইলে বৈজ্ঞানিক আলো কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখা চলে। ইহাতে রোগীর চোখে তীব্র আলো লাগে না অথচ উদ্ভাসকামিনীরও কাজের স্ববিধা হয় না। রাত্রে আবার স্বল্প পাওয়ারের নীলবর্ণা সবুজ আলো জ্বালাইয়া রাখা চলে।

**রোগি-কক্ষে বায়ু সঞ্চালন :** রোগি-কক্ষে বায়ু সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঘরের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ভিতরে টানিয়া আনা। উত্তাপ পরিমাপের জন্য কক্ষে একটি থার্মোমিটার রাখা চলে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়া অনায়াসে কক্ষের উত্তাপ ঠিক রাখা যায়। কিন্তু সে স্ববিধা না থাকিলে সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষটি রোগীর জন্য নির্বাচন করাই শ্রেষ্ঠ। রোগীর পক্ষে দক্ষিণ, পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী ঘরই প্রশস্ত। এইরূপ ঘরে উন্মুক্ত হাওয়া ও পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ মেলে। উত্তরমুখী ঘর রোগীর একেবারে অসুপযুক্ত কারণ শীতকালে উত্তরে হাওয়া যেমন স্বথপ্রদ নয়, তেমনি উত্তরের ঘরে সূর্যালোক প্রবেশেরও সম্ভাবনা নাই। রোগি-কক্ষে বায়ু চলাচলের স্ববিধার জন্য রুজু কুজু জানালা থাকা উচিত এবং জানালাগুলি সর্বদাই খুলিয়া রাখিবে। রাতের হাওয়া রোগীর পক্ষে খারাপ এ খুবই ভুল ধারণা। শীতকালে সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব নয়। বায়ু-সঞ্চালনের ক্ষমতা ঘরে তাই ঘুলঘুলি অথবা স্বাইলাইট থাকা উচিত। একটি নোকের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রয়োজন। কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়ু না হইলে রোগীর চলে না। তাই রোগি-কক্ষটি হওয়া উচিত ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ।

(b) শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শুশ্রূষা ( Nursing of the patient at different age levels ) :

প্রতি গৃহেই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কোন-না-কোন সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়।

**শিশুর শুশ্রূষা :** শিশুদের শুশ্রূষা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ কারণ প্রথমতঃ খুব ছোট শিশুরা নিজেদের অসুস্থিয়ার কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। এই কারণে শিশুর নিদ্রা, ক্রন্দন, মুখের ভাব, জিহ্বা, মল, চর্ম ও নিঃশ্বাস পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয় এবং শিশুর অসুস্থতা অনুমান করিয়া লইতে হয়।

(১) নিদ্রা : শিশুর সুনিদ্রা হইয়াছে, না ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করিয়াছে।

(২) ক্রন্দন : ছোট শিশুর ক্রন্দন সাধারণতঃ অবস্থাজ্ঞাপক। নাকি স্বরে ক্রন্দন, ভীষণ চীৎকার, অনবরত কান্না শিশুর বিভিন্ন অসুস্থিধা প্রকাশ করে। শুশ্রূষাকারিণীকে এই ক্রন্দন পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সুস্থ শিশুরা সর্বদা সজোরে ক্রন্দন করে।

(৩) মুখের ভাব : বিভিন্ন রকম রোগে শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায়। রক্তিমভাষা জ্বর সৃষ্টি করে, হলদে ভাব জন্ডিস ( Jaundice ) রোগের সূচক। পরিশ্রমীল আভা তাহাব হৃৎপিণ্ডের ( heart ) কষ্ট প্রকাশ করে।

ভীষণ ভেদ বমি হইলে শিশুর মুখে উৎকর্ষা প্রকাশ পায়।

(৪) জিহ্বা : জিহ্বায় কোন আবরণ পড়িয়াছে কিনা।

(৫) মল : মলের পরিমাণ ও বর্ণে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। অসুস্থ হইলে শিশুর মলের ঘনত্ব, বর্ণ, সংখ্যা ও পরিমাণের দিকে নজর রাখিতে হয়।

(৬) চর্ম : দেহে তাপ অনুভব করা যাইতেছে কিনা অথবা চর্মে কোন র্যাশ বাহির হইয়াছে কিনা।

(৭) নিঃশ্বাস : নাক অথবা কান দিয়া কখন কখন নিঃশ্বাস হইতে থাকে। এই নিঃশ্বাস লক্ষ্য করিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে।

শিশুদের শুশ্রূষা করার দ্বিতীয় অসুস্থিধা হইল যে তাহারা সাধারণতঃ অবুধ্য। অসুস্থ হইলে আরও বেশী অবুধ্য হইয়া পড়ে এবং ঔষধ-পথ্য গ্রহণে আপত্তি জানায়। শুশ্রূষাকারিণীর তখন শিশুর আঙ্গার বা আপত্তিতে নরম হইতে নাই। তাহার যাহা করণীয় তিনি করিবেন।

**Premature baby-র শুশ্রূষা :** এইসব শিশুরা অত্যন্ত দুর্বল থাকে। তাই জন্মের পরে তাহাদের স্নানের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ তেল দ্বারা ঘষিয়া দিয়া নরম কাপড় দিয়া দেহ মুছাইয়া দিতে হয়। তারপর তুলা দিয়া জড়াইয়া একটি



জ্ঞানেন কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের জন্ত incubator প্রয়োজন হইতে পারে। Incubator না থাকিলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহ গরম রাখিবে।

**প্রাপ্তবয়স্কদের শুশ্রূষা :** একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শুশ্রূষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। অত্যন্ত পীড়িত না হইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে হাতের কাছে সব কিছু জোগাইয়া দিলে সে নিজেই তাহার মুখ ধোওয়া, গা স্পঞ্জ করা, ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করার কাজ করিতে পারে। বস্তুতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ না হইলে নিজের কাজ নিজেই করা পছন্দ করেন এবং অপরের হাতে মুখ ধুইয়া বা অপরের হাতে খাবার গ্রহণ করিয়া তাহার কখনো তৃপ্তি হয় না। অল্প অসুস্থ ব্যক্তির কাজগুলি শ্রুত্বাকারিণী করিয়া দিবেন না, কেবল তাহার দৈনন্দিন কাজগুলি সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবেন। তবে গুরুতর অসুস্থ হইলে তাহার সমস্ত ভারই গ্রহণ করিতে হইবে।

**বৃদ্ধদের শুশ্রূষা :** বার্ষিক্যে দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। শিশুর মতই বৃদ্ধদের শুশ্রূষাও কঠিন কাজ কারণ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শিশুর মতই অবুধ্য এবং আরও বেশী স্পর্শকাতর হইয়া পড়ে। সামান্য ক্রটি কিংবা অমনোযোগ লক্ষ্য করিলে তাহারা নিজেদের অবহেলিত মনে করে। শুশ্রূষাকারিণীকে তাই একদিকে যেমন রোগীর দৈহিক প্রয়োজনগুলির দিকে খেয়াল রাখিতে হয় অপর দিকে তেমনি আবার তাহার গণনর দাবীও মিটাইতে হয়।

সমস্ত কল্প ব্যক্তির বিশেষভাবে মুখের যত্ন লইতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পিঠেবও বিশেষ যত্ন লওয়া কতব্য।

**রোগীর পিঠের যত্ন :** দীর্ঘদিন বিছানায় শুইয়া থাকিলে রোগীর পিঠে অনবরত চাপ ও ঘষা লাগে বলিয়া পিঠে শয্যাক্ত হইতে চায়। এই ক্রত নিবারণের জন্ত রোগীর পিঠের যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সহজে বেড-সোর হইতে চায়।

**বেড-সোর বা শয্যাক্ত ( Bed sore ) :** বেড-সোর কথাটির অর্থ শয্যাজনিত চর্মের ঘা। দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবার ফলে রোগীর দেহের কোন কোন অংশের রক্ত চলাচল কমিয়া আসে এবং সেই সমস্ত জায়গায় বেড-সোর হইতে চায়। শরীরের যে সব অংশে অনবরত ঘষা ও চাপ লাগে সেই সকল স্থানেও বেড-সোর হইতে চায়। পিঠে এবং কোমরে সবচেয়ে বেশী শয্যাক্ত দেখা যায়। তাছাড়া যেসব অংশে চর্মের উপর হাড় বেশ উঁচু হইয়া থাকে সেই সব স্থানে বেড-সোর দেখা দেয়, যেমন—কঁধ, কনুই, নিতম্ব, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি। বেড-সোর নিবারণের জন্ত শুশ্রূষাকারিণীকে

সর্বদা সজাগ থাকিতে হয় কারণ একবার বেড-সোর দেখা দিলে উহা দ্রুত ছড়াইতে থাকে। এইজন্য বেড-সোরের চিকিৎসার চেয়ে বেড-সোর প্রতিরোধ করা সহজ কাজ।

**বেড-সোরের সূচনা ও কারণ :** বেড-সোর দেখা দিবার পূর্বে চর্মের সেই স্থানটি লালবর্ণ হইয়া ওঠে। তৎক্ষণাৎ উহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে বেড-সোর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার প্রসার বন্ধ করা শুষ্কাকারিণীর পক্ষে এক দুর্লভ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

### বেড-সোর হইবার কারণ প্রধানতঃ চারিটি :

(১) **অসাবধানতাবশতঃ রোগীকে নাড়াচাড়া করা :** শুষ্কাকারিণীর অসাবধানতা বেড-সোরের একটি কারণ। বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের ধারাল কিনারায় ঘষা লাগিয়া বেড-সোর হইতে পারে।

(২) **ঘর্ষণ :** চাদর জড় অথবা ভাঁজ হইয়া থাকিবার ফলে কিংবা বিছানায় রুটির গুঁড়া জমা হইয়া থাকিলে ঘর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। ঘর্ষণের ফলে সচরাচর জাহ্নবীর ভিতরের দিকে, মস্তকের পশ্চাভাগে, গোড়ালির ভিতর দিকে এবং কানে বেড-সোর হইয়া থাকে।

(৩) **চাপ :** বহুদিন ধরিয়া শয্যায় একইভাবে শুইয়া থাকিবার ফলে দেহের কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে অত্যন্ত চাপ পড়িতে পারে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া অবশেষে বেড-সোর সৃষ্টি করে।

(৪) **দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজা থাকিবার ফলে :** দেহের অংশবিশেষ অনবরত ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই স্থানের চামড়া নরম হইয়া আসে এবং সহজেই সেখানে ক্ষত হইতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম, মলমূত্র ধারণে অক্ষমতার জন্য, আবার স্নানের পরে রোগীর দেহ ভাল করিয়া না মোছাইয়া দিলেও শরীর ভিজা থাকে।

### বেড-সোর প্রতিরোধের উপায় :

(১) চাদরে কিংবা ম্যাকিনটোশে যেন ভাঁজ না পড়ে, কুঁচকাইয়া না যায় কিংবা রুটির গুঁড়া না থাকে।

(২) দিনে অন্ততঃ দুইবার করিয়া সাবানজল দিয়া পিঠ ও কোমর উত্তমরূপে মাখাইবে। শুষ্কাকারিণী সাবানজল লইয়া নির্দিষ্ট স্থানটিতে বৃত্তাকারে মাখাইবে। ঐ জল চর্মে শুষিয়া গেলে অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া সকলস্থানে ঘষিয়া দিবে এবং রোগীর গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে।

(৩) রোগি-দেহের কোন অংশে যাহাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অক্ষম রোগীদের পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া দিবে।

(৪) শরীরের কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না।

(৫) চর্মে কোনরূপ ক্রস্কতা দেখা দিলে স্পিরিট ও অলিভ অয়েল সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থানে মাখাইবে।

**বেড-সোরের চিকিৎসা :** প্রতিরোধের সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি বেড-সোর দেখা দেয় কিংবা চর্মের কোন অংশ লাল হইয়া ওঠে তবে শুষ্কবাকারিণীর প্রথম কর্তব্য হইবে পরদিন চিকিৎসক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে

(১) শুষ্কবাকারিণী এয়ার কুশন দিয়া বেড-সোরকে সব রকম চাপ ও ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করিবে।

(২) দেহের অগ্রভাগে যাহাতে বেড-সোর না ছড়াইতে পারে এইজন্ত ক্ষত-স্থানটি পরিষ্কার রাখিবে।

(৩) বেড-সোরের আশেপাশের উঁচু হাড়বিশিষ্ট স্থানগুলিতে দিনে অনেকবার অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে।

(c) **রোগীকে স্পঞ্জ দেওয়া (Sponging the patient) :** রোগীর স্থানের উদ্দেশ্যে এক পরিষ্কার বাখা এবং রোগীকে একটুখানি আরাম দেওয়া। বোগীর স্থানের জন্ত প্রয়োজন একটি বালতি, জলের গামলা, একটি ছোট এবং বড় ম্যাকিনটোশ, এক জগ গরম জল, সাবান, একটি ছোট তোয়ালে এবং একটি স্পঞ্জ কুথ, নখ কাটাণ কাঁচি, পাউডার, দুইখানি বড় বাথটাওয়ার।

**স্থানের প্রক্রিয়া :** স্থানের পূর্বে রোগীর মাথা ধোওয়াইবার কাজটি সমাধা করা উচিত। রোগীর খাটের নিকটে একটি বড় বালতিতে পরিষ্কার জল ধরিয়া রাখিবে। অপর একটি বালতি রোগীর মাথার নীচে স্থাপন করিবে এবং ম্যাকিনটোশটি রোগীর মাথার নীচে পাতিয়া দিবে। এইবার বালতি হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে রোগীর মাথা ধোওয়াইয়া দিবে।

মাথা ধোওয়ানো শেষ হইলে শুষ্ক তোয়ালে দিয়া রোগীর মাথা মোছাইয়া রোগীর স্থান শুক করিবে। পূর্বেই হাতের কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিবে। তারপর রোগি-কক্ষের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া লইয়া রোগীর দেহের সমস্ত আচ্ছাদন অপসারিত করিবে। প্রথমে বড় ম্যাকিনটোশটি পাতিয়া দিবে এবং উহার উপরে একখানি বড় বাথ-টাওয়ার বিছাইয়া লইবে।

তারপর দ্বিতীয় বাথ-টাওয়ালাখানি দিয়া রোগীর দেহ উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিবে। স্নানের প্রাথমিক প্রস্তুতির পরে রোগীর জামা-কাপড়ের বোতাম ও বাঁধনগুলি খুলিয়া বস্ত্রাদি একে একে খুলিয়া ফেলিবে। এইবার স্নানের কাজটি দ্রুত সমাধা করিবে। গরম জল ও সাবান দিয়া যথাক্রমে রোগীর মুখ, হাত, বুক, পেট ও পিঠ বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছাইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে এবং ঢাকিয়া দিবে। স্নানের সময় বিশেষ করিয়া নজর রাখিবে দেহের প্রতিটি ভাঁজ যেমন বগল, হাঁটু প্রভৃতি যেন পরিষ্কার করা হয়। রোগী নিতান্ত দুর্বল না হইলে নিজেই দেহের ঢাকা স্থানগুলি পরিষ্কার করিবে এবং শুশ্রূষাকারিণী রোগীর হাতে স্পঞ্জ রুখখানি তুলিয়া দিবে এবং প্রত্যেক অংশ পরিষ্কৃত হইবার পর গামছাখানি জলে নতুন করিয়া ভিজাইয়া দিবে।

রোগীর দেহের যে সমস্ত স্থানের হাড় বেশ উচু হইয়া থাকে সেই সমস্ত স্থানগুলি সাবান মাখান হাত দিয়া রগড়াইয়া দিবে। তারপর তোয়ালে দিয়া ভাল করিয়া মোছাইয়া রোগীর গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে। এইবার রোগীর বিছানা হইতে বাথটাওয়াল অপসারিত করিয়া তাহাকে বস্ত্রাদি পরাইয়া দিবে।

### উচ্চ তাপে কোল্ড-স্পঞ্জ ( Sponging High Fever ) :

জরের উচ্চ তাপমাত্রাকে কমাইবার জন্য বরফ জলের স্পঞ্জ দেওয়া হয়। ঠিকভাবে স্পঞ্জ দিতে পারিলে অতি দ্রুত জ্বর নামিয়া যায়। সাধারণতঃ  $102^{\circ}$  ডিগ্রীর উপর জ্বর হইলে আমরা কোল্ড স্পঞ্জ দিয়া থাকি।

**প্রস্তুতি :** কিছুটা বরফ, আইস ব্যাগ, দুইটি গামলা, দুইটি তোয়ালে, ম্যাকিনটোশ অথবা রবারক্লথ, কিছুটা পরিষ্কার শাকড়া এবং ছোট একটি বাটি।

রোগীর ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করিয়া দাও। ঘরে পাখা চালাইবে না। গায়ের সমস্ত বস্ত্রাদি ও চাদর অপসারণ কর। পিঠের নীচে ম্যাকিনটোশ পাতিয়া দাও এবং গায়ে একটি পাতলা চাদর দিতে পার। রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াও এবং মাথার বালিশ সরাইয়া ফেল। গামলায় বরফজল রাখ এবং ছোট বাটিতে বরফজল লইয়া একটু শাকড়া ভিজাইয়া লও। তারপর কোল্ড স্পঞ্জ দিবার জন্য প্রস্তুত হও।

**প্রণালী :** প্রথমে মাথায় আইস ব্যাগ স্থাপন কর এবং তলপেটে বরফজলে ভিজান শাকড়া স্থাপন কর। গামলার জলে তোয়ালে ভিজাইয়া সামান্য নিংড়াইয়া লইবে। তারপর স্পঞ্জ দিতে থাক। প্রথমে রোগীর মুখ মোছাইয়া দিবে। ভিজা তোয়ালেটি আবার বরফজলে ডুবাইয়া ডানহাতটি নোজাভাবে

কাঁধ হইতে আঙুল পর্যন্ত টানিয়া মোছাইয়া দাও। ভিজা তোয়ালেটি বগলের তলায় সামান্য চাপিয়া ধরিয়া বগল হইতে হাতের চেটো পর্যন্ত মোছাইয়া দাও। এইভাবে দুই হাত, বুক এবং পেট স্পঞ্জ করিয়া লইবে। জলের ঠাণ্ডা ভাব কাটিয়া গেলে নতুন বরফজল প্রস্তুত করিয়া লইবে। হাতের মতই পা দুইটি উপর হইতে টানিয়া আঙুল পর্যন্ত মোছাইয়া দিবে। তারপর রোগীকে কাত করিয়া শোয়াইবে। প্রথমে পিঠ মুছিয়া লইবে। শেষে পায়ের পিছন দিকটা লম্বাভাবে টানিয়া পায়ের পাতা পর্যন্ত মুছিয়া দিবে। শীতকালে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে ঈষৎ জল দিয়া রোগীকে স্পঞ্জ দিবে। নতুবা রোগীর ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে পারে।

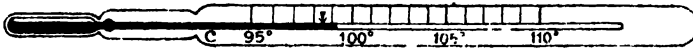
সর্বদা খুব বেশী জল দিয়া স্পঞ্জ দিবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ মুছাইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে। স্পঞ্জের সময় গা বগড়াইবে না বা শাবান ব্যবহার করিবে না। কারণ ঠাণ্ডা স্পঞ্জের উদ্দেশ্য দেহ পরিষ্কার করা নয়, দেহের উষ্ণতা কমান। পনের মিনিট ধরিয়া এই স্পঞ্জ দেওয়া উচিত। তারপর রোগীর গা মুছাইয়া দিবে।

স্পঞ্জ দিবার পূর্বে রোগীর দেহের তাপ দেখিয়া লইবে। তারপর স্পঞ্জ দিবার পরে পুনরায় তাপ দেখিয়া রাখিবে। একবার স্পঞ্জ যদি জর না নামে তবে আধ ঘণ্টা অন্তর দুই তিনবার স্পঞ্জ দিবে এবং প্রতিবার স্পঞ্জ দিবার পূর্বে এবং পরে রোগীর তাপমাত্রা লিখিয়া রাখিবে।

(d) তাপ লইবার প্রয়োজনীয়তা ও তাপ পরীক্ষার পদ্ধতি (Taking Temperature) : একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহের উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৮°৪' ডিগ্রী ফারেনহাইট। তবে বয়স, দিনের সময় এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী আমাদের দৈনিক উত্তাপের সামান্য তারতম্য ঘটে। সাধারণতঃ সকাল বেলাকার চেয়ে সন্ধ্যার সময়ে দেহের উত্তাপ বাড়ে। একটি শিশুর দেহের তাপ ৯৯° ফারেনহাইট হইতে পারে, আবার একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির তাপ ৯৭°—৯৮° ডিগ্রীও হইতে পারে। যদি কোন কারণে কাহারো দেহের এই স্বাভাবিক তাপ বাড়িয়া যায়, তবে আমরা বলি লোকটির জ্বর হইয়াছে এবং জ্বর অস্থিরের ইঙ্গিত দেয়। জ্বর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে একটি এনিমা কিংবা কোন রেচক ঔষধ দিয়া রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। দুধ, বার্লির জল ও ফলের রস ইত্যাদি হাল্কা পথ্য দিয়া রোগীকে বিশ্রামে থাকিতে দিবে।

জ্বর পরীক্ষার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরশীল যন্ত্র হইল একটি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার। উহার গায় ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে, কারণ জীবিত ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা ইহার ভিতরেই ঠাণ্ডানা

করে। সেইজন্য ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার অত্যন্ত থার্মোমিটারের চেয়ে আকৃতিতে অনেক ছোট। থার্মোমিটারের  $৯৮^{\circ}৪^{\circ}$  ডিগ্রীতে একটি Y চিহ্ন থাকে। উহা স্বাভাবিক ও স্বস্থ দেহের তাপমাত্রা বুঝায়। থার্মোমিটারের বাল্বে পারদ পেরা থাকে। দেহের উত্তাপের সংস্পর্শে আসিলে ঐ পারদ আয়তনে বাড়িয়া



ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার

ক্রমশঃ উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাল্ব হইতে থার্মোমিটারের দেহে পারদ প্রবেশের রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বাঁকা। (চিত্রের C অংশ লক্ষ্য কর।) ইহার ফলে পারদ একবার দেহের উত্তাপ অনুযায়ী উপরে উঠিয়া গেলে দেহের বাহিরে আনিলেও উহা আর বাল্বে ন মিয়া আসিতে পারে না। ইহার জন্য আমাদের তাপমাত্রা দেখিবার সুবিধা হয়। সাধারণ থার্মোমিটারের এই সুবিধা নাই। উত্তাপ দেখা হইয়া গেলে পারদ ঝাঁকাইয়া পুনর্বার  $৯৫^{\circ}$  ডিগ্রীতে নামাইয়া রাখিতে হয়।

### তাপ লইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে :

- (১) পারদ  $৯৫^{\circ}$  ডিগ্রীতে নামিয়া আসিয়াছে কিনা।
- (২) কোন খাচা কিংবা পানীয় গ্রহণের অন্তত ১৫ মিনিটের মধ্যে তাপ লইবে না। পানীয়ের শীতলতা মুখে শীতলভাব আনিয়া দেয়। ফলে রোগীর দেহের সঠিক তাপ জানা যায় না। একই কারণে মুখ, বগল কিংবা কুঁচকি দ্বারা করিবার অব্যবহিত পরে তাপ পরীক্ষা করিতে নাই।
- (৩) শুশ্রূষাকারিণী নিজে রোগীর দেহের তাপ লইবে—রোগীর হাতে কখনও থার্মোমিটার দিবে না।
- (৪) তাপ পরীক্ষার পরে থার্মোমিটার দেখিয়া জরের দৈনিক চাটে লিখিয়া রাখিবে। তারপর যন্ত্রটি ঝাঁকিয়া পারদ নামাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং যুদ্ধ জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজাইয়া রাখিবে।

### তাপ লইবার নিয়ম :

উপকরণ : ছোট ট্রেব উপরে একটি যুদ্ধ জীবাণুনাশক দ্রবণে থার্মোমিটার ডুবাইয়া রাখিবে এবং অপর একটি পাঞ্জে ঠাণ্ডা জল ও থানিকটা পরিকার

শুকনো কাপড়ের টুকরা লইবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন স্থানের তাপ লইতে হয়—

**মুখে :** বস্ত্রখণ্ড দিয়া থার্মোমিটারটি মুছিয়া লইবে, তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া আবার মুছিয়া লইবে। এইবার থার্মোমিটারের বাল্বটি জিহ্বার নীচে গুজিয়া দিবে। রোগীকে নাক দিয়া প্রশ্বাস লইতে বলিবে এবং লক্ষ্য রাখিও রোগী যেন যন্ত্রটি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া না ধরে।

**বগলে ( Axilla ) :** বগল শুষ্ক থাকা চাই। থার্মোমিটারটি মুছিয়া লইয়া রোগীর বগলে দাও। হাতখানি রোগীর বুকের উপর চাপিয়া রাখিতে বলিবে।

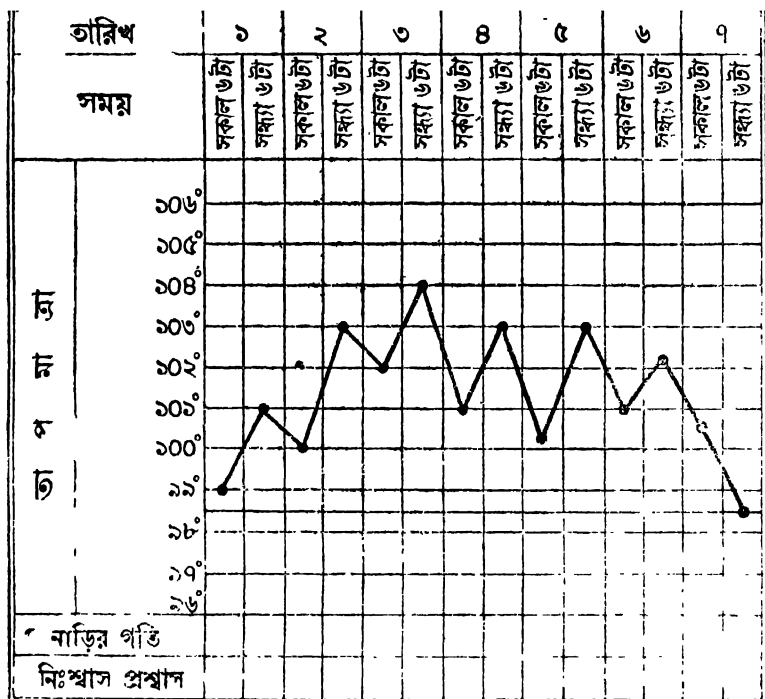
**কুঁচকিতে ( Groin ) :** বগলে এবং কুঁচকিতে একই পদ্ধতিতে থার্মোমিটার দিতে হয়। তবে থার্মোমিটার যাহাতে চর্মের সংস্পর্শে আসিতে পারে এইজন্ত হাঁটু চাপিয়া ধরিতে হয়।

**মলদ্বার ( Rectum ) :** কেবলমাত্র এক বৃৎসর বয়স্ক শিশুদেরই মলদ্বারে থার্মোমিটার দেওয়া যায়। তেল অথবা সামান্য ভেনিসলিন মাখাইয়া থার্মোমিটারের বাল্বটি মলদ্বারে স্থাপন কর। উত্তাপ পরীক্ষা হইয়া গেলে জলে ধুইয়া উহা জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজাইয়া রাখ।

**জ্বর লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ( Maintaining record charts ) :** রোগীর দেহের উত্তাপ নির্ণয়ের পরে উহা কাগজে ছক কাটিয়া লিগিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ কতিপয় রোগে জ্বরের গতি জানা থাকিলে রোগ নির্ণয়ের সুবিধা হয়। তাপমাত্রার ছক লিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। প্রথমে গ্রাফ পেপারের অমুকরণে কাগজে ছোট ছোট চৌকো ঘর কাটিয়া লইতে হয়। ছকের উপরিভাগে বা হইতে ডান দিকে তারিখ ও তাপ লইবার সময় দেওয়া থাকিবে এবং দিনে দুইবার জ্বর দেখিলে ছকে প্রতি দিনের জন্ত দুইটি করিয়া ঘর নির্দিষ্ট রাখিবে। ছকের বাম দিকে থার্মোমিটারের অমুকরণে ৯৬° হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্যন্ত দাগ কাটিয়া রাখিবে। এইবার জ্বর দেখিয়া ছকের ভিতরকার ঘরগুলিতে জ্বরের অঙ্ক বসাইবে। বিন্দুর সাহায্যে সচরাচর ঐ অঙ্ক নির্ধারিত হয় এবং একটি রেখা টানিয়া দিয়া বিন্দুগুলিকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলে জ্বরের গঠনানামা খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। সর্বনিম্নে প্রতিদিনকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি লিখিবার স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। ( পর পৃষ্ঠার ছক দেখ )।

সাধারণ রোগে আমরা দিনে সাধারণতঃ দুইবার জ্বর দেখিয়া থাকি। কিন্তু

টাইফয়েড প্রভৃতি পীড়ায় দুইবার জ্বর দেখিলে চলে না। সেইক্ষেত্রে প্রতিদিনের জ্বর দেখিবার জন্য দুইটি ঘর নির্দিষ্ট না রাখিয়া ছয়টি ঘর রাখিবে এবং সময় নির্দেশের স্থানে সকাল, সন্ধ্যা না লিখিয়া ৬, ১০, ২ লিখিয়া রাখিবে। জ্বরের চার্ট দেখিয়া চিকিৎসক বেলা ৬টা, ১০টা ও ২টায় রোগীর কত জ্বর ছিল জানিতে পারিবেন।



(e) বেড প্যান ব্যবহারের নিয়ম (Giving bed pan) : রোগীকে বেড প্যান দিবার পূর্বে উহা একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লইবে। প্রথমে রোগীকে জামা-কাপড় আলগা করিয়া দিবে। তারপর বেড প্যানের ঢাকনা ও কাপড়ের ঢাকনা তুলিয়া দিয়া রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইবে। বাম হাতে রোগীকে নিতম্ব উঠু করিয়া ধরিয়া ডান হাতে বেড প্যানটি বসাইয়া দিবে। কঠিন পীড়া হইলে এবং নড়াচড়া নিষিদ্ধ হইলে অথবা হ্রোগীর দেহ অত্যন্ত ভারি হইলে শুষ্কধাকারিণী অপর কোন ব্যক্তির সাহায্যে রোগীকে বেড প্যান দিবে। বেড-সোর প্রতিরোধের জন্য খুব দুর্বল রোগীর নিতম্ব ও বেড প্যানের মাঝখানে এক টুকরা কাপড় ভাঁজ করিয়া দিবে।

মল নিঃসরণের পর রোগীর শৌচাদি কাজ শেষ করিয়া ফেলিবে। শৌচকর্মের জন্য তুলা, কাগজ অথবা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা জলে ভিজাইয়া ব্যবহার করা



উচিত। ব্যবহৃত তুলা বা কাগজের টুকরা বেড প্যানে না ফেলিয়া অল্প কোন স্বতন্ত্র পাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে শোড়াইয়া ফেলিবে। ব্যবহারের পরেই বেড প্যান রোগিকক্ষের বাহিরে লইয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

মৃত্ত নিঃসরণের জন্য দুর্বল রোগীদের ইউরিণ্যাল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। প্রতিবার ব্যবহারের পর ইউরিণ্যাল ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং দিনে অন্ততঃ একবার শোভা ও গরম জল দিয়া ইউরিণ্যাল পরিষ্কার করিবে।

বেড প্যান দিবার পরে অনেক সময় রোগীর শয্যা পরিবর্তন করার দরকার হইতে পারে।

**শয্যা পরিবর্তন ( Changing bed ) :** রোগী সবল হইলে শয্যা পরিবর্তনের সময় তাহাকে অল্পত বসাইয়া রাখা চলে। অতিশয় পীড়িত রোগীদের শয্যা পরিবর্তনের জন্য দুই ব্যক্তির-প্রয়োজন হয়। খাটের দুই দিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। বিছানায় পাতা চাদর প্রথমে আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর গায়ের সমস্ত আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিবে। এইবার প্রথম ব্যক্তি পারদর চাদর ও ম্যাকিনটোশ পৃথকভাবে গুটাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীকে একপাশে কাত করিয়া পরিয়া রাখিবে। এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর গুটাইয়া অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ পাতিতে থাকিবে। বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদর পাতা হইল দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীর কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাদর ও ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ দ্রুত টানিয়া পাতিয়া দিবে। সবশেষে চাদরের কোণগুলি এনভেলপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের চাদর টানিয়া দিবে।

(f) **রোগীর ঔষধ ( Administration of drugs ) :**

রোগীর ঔষধ দিবার দায়িত্ব ও সতর্কতাবোধী। উপযুক্ত ঔষধ, পথ্য ও সতর্কতার সাহায্যেই রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা সম্ভব। দেহে ঔষধ প্রবেশ করাইবার নানারকম পথ আছে ; যথা—(ক) মুখ, (খ) নাক, (গ) ত্বক ও (ঘ) মলদ্বার।

(ক) **মুখের মধ্য দিয়া রোগীর দেহে ঔষধ দেওয়া :** রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে :—

(১) ঔষধ দিবার পূর্বে সর্বদা ঔষধের লেবেল দেখিয়া নাম পড়িয়া লইবে। শুধুমাত্র গন্ধ শুকিয়া বা ঔষধের বর্ণ দেখিয়া কখন কোন্ ঔষধ দিতে হইবে আন্দাজ করিতে যাইবে না।

(২) চিকিৎসক যদি ঔষধ দিবার কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ না করিয়া দেন তবে ঔষধ দিবার মোটামুটি নিম্নলিখিত সময় অনুসরণ করা যাইতে পারে :

ঔষধ দেওয়া হইবে	সময়	রাত্রি এবং	দিন
দুই ঘণ্টা অন্তর	২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২	"	"
তিন ঘণ্টা অন্তর	৩, ৬, ৯, ১২	"	"
দিনে তিন বার	১০, ২, ৬		দিন
দিনে চার বার	১০, ২, ৬, ১০	"	"

(৩) আহারের পর ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকিলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ দিবে এবং পূর্বে যদি ঔষধ দিবার নির্দেশ থাকে তবে আহারের অন্ততঃ ২০ মিনিট পূর্বে ঔষধ দিবে।

(৪) চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও কখনও ঘুম ভাঙাইয়া ঔষধ দিবে না।

(৫) ঔষধ দিবার পূর্বে ঔষধের বোতলটি কাঁকিয়া লইবে।

(৬) ঔষধ দিবার পত্রে রোগীকে সর্বদা ছোট এক গ্লাস জল পান করিতে দিবে। ঔষধ খাইবার পরে রোগীর মুখ যদি অত্যন্ত বিষাদ লাগে তবে এই বিষাদ ভাব দূর করিবার জন্ত মোরী বা জোয়ান ইত্যাদি যে কোন মুখরোচক জিনিস দিবে। রোগীর মুখ যদি শুকনা বোধ হয় তবে ঔষধ দিবার পূর্বে মুখে একটু জল দিয়া লইবে।

(৭) খাইবার ঔষধ ব্যতীত অল্প যে-কোন ঔষধ যদি বিষাক্ত নাও হয় তথাপি সর্বদা পৃথক করিয়া রাখিবে।

(৮) বিষাক্ত ঔষধ ও খাইবার ঔষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষাক্ত ঔষধের জন্ত রঙিন শিশি এবং খাইবার ঔষধের জন্ত সাদা শিশি ব্যবহার করিবে। বিষাক্ত ঔষধের শিশির গায় “বিষ” শব্দটি বড় করিয়া লিখিয়া দিবে।

(৯) সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র ও বস্ত্রাদির মতই তাহার ঔষধের গ্লাস, শিশি, মুখ ধুইবার গামলা ইত্যাদি পৃথক করিয়া রাখিবে।

(১০) ঔষধে লোহা থাকিলে দাঁত কালো হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য লৌহ-মিশ্রিত ঔষধ ঝুঁ দিয়া রোগীকে গ্লাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে।

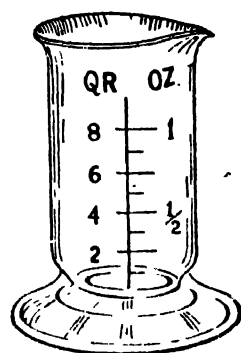
মুখ দিয়া যেসব ঔষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণতঃ ছয় প্রকার—তরল (liquid), বটিকা (pills), চূর্ণ (powder), ট্যাবলেট (tablet), ক্যাপসুল (capsules), তৈলজাতীয় (oil) ঔষধ।

**তরল ঔষধ (Liquid) :** রোগীর মুখে তরল ঔষধ দিবার পূর্বে উহা ঝাঁকিয়া লইবে। যে সব ঔষধের তলায় খিতানি পড়ে গ্লাসে ঢালিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে। তরল ঔষধ মেজার গ্লাসে ঢালিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ঔষধ ঢালিবার পরে শিশির ছিপি খুব ভাল করিয়া আঁটিয়া দিবে এবং ঔষধ খাওয়ানো হইয়া গেলে গ্লাসটি সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া শুকাইয়া ফেলিবে।

**বটিকা (Pills) :** সাধারণতঃ একবারে একটি গোটা বটিকা খাইয়া ফেলিবার নিয়ম।

অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে গলার ভিতরে বটিকা ফেলিয়া দিলে গিলিতে স্বেচছ। রোগীর মুখে প্রথমে শুধু একটু জল ঢালিবে। তারপর জিহ্বার অগ্রভাগে বটিকাটি রাখিয়া রোগীকে গিলিতে বলিবে।



মেজাব গ্লাস

**চূর্ণ (Powder) :** জলের সঙ্গে ঔষধের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। কখনও কখনও চিকিৎসক যথুর সঙ্গে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবার নির্দেশ দেন। শুষ্কস্বাকারিণীর কাজ হইল চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করা।

**ট্যাবলেট (Tablets) :** বটিকার মতই ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়া গিলিয়া ফেলা যায় নতুবা চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গেও খাওয়া চলে। গলা অথবা বৃকের কষ্টের জন্যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রোগীকে তাহা সর্বদা চুবিয়া খাইতে বলিবে।

**ক্যাপসুল (Capsuls) :** একটি খাপে ভরা ঔষধ। রোগীকে সর্বদা গিলিয়া খাইতে দিবে।

**তৈলাক্ত ঔষধ (Oil) :** যথা, ক্যাস্টর অয়েল অথবা কডলিভার অয়েল। গ্লাসের ভিতর এবং কিনারায় পাতিলেবু কিংবা কমলালেবুর রস মাখাইয়া লইয়া ঔষধ ঢালিবে। এইবার খানিকটা লেবুর রস প্রথমে গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া ঔষধ দিবে। তারপর আবার খানিকটা লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। এইবার গ্লাসের সমস্ত পদার্থ টুকু রোগীর মুখে ঢালিবে।

গরম দুধের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগীকে দেওয়া যায়। একটি কাঁটা (tork) দিয়া বেশ করিয়া ক্যাস্টর অয়েল ও দুধ কেটাইয়া লইবে। তারপর রোগীকে উহা খাইতে দিবে। তৈলাক্ত ঔষধ খাওয়াইবার অন্ত সর্বদা

একটি পৃথক্ গ্লাস ব্যবহার করিবে। লবণ ও জল দিয়া সহজেই ঐ গ্লাস পরিষ্কার করা চলে।

(খ) নাক : ঔষধ দিবার আর একটি পথ হইল নাক। অত্যন্ত পীড়িত রোগীদের নিঃশ্বাসের কষ্ট লাঘব করিবার জন্ত নাসাপথে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে শিক্ষিত (trained) শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত গৃহে সাধারণ লোকদের দিয়া এইরূপ অক্সিজেন দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(গ) ঝকু : দেহে ঔষধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল ঝকু। ইন্জেকশান ও মালিশ এই দুই ভাবে ঝকের মধ্য দিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী মালিশ করা কঠিন নয়, কিন্তু চিকিৎসক কিংবা শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অপর কেহ রোগীকে ইন্জেকশান দিবার চেষ্টা করিবে না।

(ঘ) মলদ্বার : মলদ্বার দিয়া রোগীকে এনিমা (enema) দেওয়া হয়।

অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সম্ভব হয় না বলিয়া মলদ্বার দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপভাবে খাওয়ানোকে এনিমা দেওয়া বলে। সাধারণ লবণ জলের (normal saline water) সঙ্গে গ্লুকোজ মিলাইয়া মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাওয়া দিবে : চিকিৎসকের নিকট হইতে লবণ জল ও গ্লুকোজের পরিমাণ জানিয়া লইবে। রোগীকে এনিমার সাহায্যে খাওয়াইবার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লইবে রোগীর তলপেটে কোন মল জমা হইয়া আছে কিনা। সাধারণতঃ মল দিয়া যদি গরম জল বাহির হইয়া আসে তবে বুঝিবে রোগীর তলপেটে মল জমিয়া নাই, স্বতরাং নির্ভয়ে খাওয়া চলিতে পারে।

রোগীর পথ্য (Administration of food) : শুধু ঔষধ ও শুশ্রূষাতেই রোগি সুস্থ হইয়া ওঠে না। তাহার সঙ্গে উপযুক্ত পথ্যও চাই। পথ্য রোগীর শরীর গঠনে সাহায্য করে। পথ্য রোগীর (১) ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে, (২) পেশাদমূহ গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে, এবং (৩) রোগীর দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। উপরোক্ত সব কয়টি কাজ সাধনের জন্ত আমাদের কাছে প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কার্বোহাইড্রেট, ধাতবলবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা দরকার। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পীড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা কি সুস্থ কি অসুস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের জন্ত উল্লিখিত সব কয়টি উপাদান থাকা প্রয়োজন।

রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিবে :

(ক) রোগীর বয়স, পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুযায়ী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত হইবে।

(খ) প্রত্যেকবারের খাওয়া রোগীকে তৃপ্তি দিবে, পরিমাণে বেশী হইবে না - অথচ পূর্ণ খাওয়ামূল্য থাকিবে।

(গ) খাওয়ামূল্য বিচার করিয়া বাজারের সস্তা জিনিসের মধ্য হইতে খাওয়া তালিকা তৈরী করিবে।

(ঘ) যে ঋতুতে যে শাক-সবজি ও ফল পাওয়া যায় সেই ঋতুতে সেই সব শাক-সবজি ও ফল খাইতে দিবে। সময়ের জিনিস স্বাস্থ্য ও দামে সস্তা হয় এবং উহার খাওয়ামূল্যও বেশী থাকে।

(ঙ) চিকিৎসক সম্মতি দিলে রোগীর পছন্দমাত্তিক বিভিন্ন রকমের খাওয়া দেওয়া উচিত।

**পথ্য পরিবেশন :** চিকিৎসক রোগীর জন্ম যে পরিমাণ খাওয়া নির্ধারণ করেন তাহা বিভিন্ন বারের আহারের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া খাওয়ান উচিত। রাত্রি বেলার চেয়ে দিনের বেলার আহারের মাত্রা বেশী হইবে। চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে কখনো রোগীর ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়ানো উচিত নয়।

রোগীর প্রত্যেক বার আহারের একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিবে এবং ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রোগীকে খাইতে দিবে। রোগীর নিকটে খাবার আনিবার পূর্বে তাহাকে একটি আরামদায়ক ভঙ্গীতে বসাইবে এবং তাহার হাত ও মুখ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া লইবে। সম্ভব হইলে রোগীর বিছানায় একটি বড় জলচৌকির উপরে খাওয়া পরিবেশন করিবে। রোগীর নিকট একবারে একটর বেশী পদ (dish) পরিবেশন করিবে না কিংবা খাইবার সময় রোগীকে কোন তাড়া দিবে না। আহার শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে এটো বাসন রোগী-কক্ষ হইতে সরাইয়া ফেলিবে।

**শয্যাশায়ী রোগীদের পথ্য :** নিতান্ত দুর্বল ও পীড়িত রোগীদের সাধারণতঃ তরল খাওয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যেসব রোগীর মাথা তুলিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের চায়না ফিডারের সাহায্যে খাওয়াইতে হয়। কোন কোন রোগী চায়না ফিডারের চেয়ে আইডিয়াল ফিডারে খাওয়া বেশী পছন্দ করে। সেইক্ষেত্রে একটি টিউব বা ষ্ট্র রোগীর মুখে লাগাইয়া দিলে রোগী নিজেই খাওয়াদ্রব্য মুখ দিয়া টানিয়া লইতে পারিবে। প্রতিবার আহারের পর ষ্ট্র পোড়াইয়া ফেলিবে।

## অষ্টম অধ্যায়

### সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ (Common Infectious diseases)

#### 1. শিশুদের সাধারণ রোগসমূহ (Common childhood diseases) :

আমাদের দেশের শিশুরা নানাবিধ রোগে ভুগিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অপুষ্টিজনিত রোগই হইল প্রধান।

**অপুষ্টিজনিত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ :** শিশুর বৃদ্ধি হ্রাস পাইলে কিংবা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে, চোখের উজ্জলতা নষ্ট হইলে, হাসিখুশিভাব কমিয়া আসিলে বা না থাকিলে, খেলাধুলায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে কিংবা শিশুর মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে না। তাহার দৈনন্দিন খাওয়া-তালিকা দেখিয়া তখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই দরকার।

পুষ্টির অভাবে শৈশবে যেসব রোগ দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রোগই হইল প্রধান :

- (১) প্রোটিন—ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন।
- (২) ভাইটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ।
- (৩) রক্তাঙ্গতা—লৌহ এবং ফোলিক অ্যাসিডের অভাবের জন্ম।  
ফোলিক অ্যাসিড ভাইটামিন 'বি'-র অন্তর্গত।

(১) **প্রোটিন—ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন :** ক্যালোরীর অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা প্রোটিনের অভাবে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কবলে পড়িলে শিশুদের ওজন বয়সের অনুপাতে কম হয়। তাছাড়া নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দেয় :

- (১) নিয়মিত শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ;
- (২) চামড়ার নীচের চর্বি কমিয়া যায় ;
- (৩) মাংসপেশী স্ফুটিত হয় না এবং শুকাইয়া যায় ;
- (৪) স্বক্ খসখসে হয় এবং বহুদিন ধরিয়া শিশু এই রোগে ভুগিতে থাকিলে স্বকে ঘা হইয়া যাইতে পারে ;

(৫) মাথার চুল পাতলা হইয়া যায় এবং রঙ ফ্যাকাশে হইয়া যায়। এই অপুষ্টি বেশীদিন ধরিয়া চলিলে চুলের রঙ অনেক সময় কটা হইয়া যায়। চুল ধরিয়া টানিলে শিশুর লাগে না এবং সহজেই উঠিয়া আসে।

(৬) এইসব শিশুদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও ক্ষুধা কমিয়া যায়।

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা ফুলিয়া যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চারা একেবারে শুকাইয়া যায়, চামড়া কুচকাইয়া যায় এবং মনে হয় শিশু যেন অস্থিচর্মসার। প্রথমটিকে (ক) কোয়াশিওরকর এবং দ্বিতীয়টিকে (খ) ম্যারাসমাস বলা হয়।

(ক) কোয়াশিওরকর (Kwashiorkor) : প্রোটিনের বিশেষ অভাব হইলে মাংসপেশী ক্ষয় করিয়া শিশুর দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে এবং শরীরে জল জমে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে শিশুকে মোটা-সোটা ও গোলগাল দেখায়। বাপ-মা মনে করে শিশু বেশ স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতেছে।



কোয়াশিওরকর

ফলে এই রোগ ধরা কঠিন হইয়া পড়ে এবং এই রোগে আক্রান্ত হইয়া শিশুরা মারা পড়ে।

(খ) ম্যারাসমাস (Marasmus) : শৈশবে উপযুক্ত মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে কিংবা বিকল্প খাদ্য দিতে বিলম্ব ঘটিলে শিশুর তাপ বা শক্তি উৎপাদক খাদ্যের অভাব ঘটে। শিশু আর আগেকার মত উজ্জ্বল আনন্দময় এবং ক্রীড়াচঞ্চল থাকে না। অনেক সময় খিটখিটে হইয়া পড়ে। না কাঁদিলেও বিছানায় শুইয়া থাকে এবং হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে না। গাল চূপসাইয়া যায়, ওজন হ্রাস পাইতে পাইতে শেবে। গায়ে শুধু হাড়মাস অবশিষ্ট থাকে। শৈশবের এই অপুষ্টিজনিত ব্যাধিটি ম্যারাসমাস নামে পরিচিত। এই ব্যাধিতে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

শুধু যে দারিদ্র্যের জন্য পুষ্টিিকর খাদ্যের অভাবে শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে তাহা নয়, অনেক সময় বাপমায়ের খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জগতও তাহারা এই রোগের বলি হইয়া থাকে। এই রোগ দূর করিতে হইলে

শিশুদের পাঁচ ছয় মাস বয়স হইতে বদলি খাতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে, শিশুর খাতে গরুর দুধ কিংবা গুঁড়া দুধের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাদের দুধ কিনিবার সামর্থ্য নাই তাহারা ছোলার ছাতুর সঙ্গে বাদাম গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া খাওয়াইতে পারেন।

(২) ভাইটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ : যে কোন বয়সের যে কোন লোকের ভাইটামিন 'এ'-র অভাব হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ ১ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের এই রোগটি বেশী দেখা যায়। ইহার অভাবে চোখ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমাদের



মারাসমাস

দেশে যত অন্ধ আছে তাহার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ লোক এই ভাইটামিনটির অভাবের জন্ত।

এই রোগের প্রথম উপসর্গ হইল রাতকানা অর্থাৎ কম আলোতে তাহারা ঠিকমত দেখিতে পায় না। 'এ'-র অভাব চলিতে থাকিলে চোখের সাদা অংশ শুকাইয়া যায়, অনেক সময় সাদা অংশে ফেনার মত দাগ পড়ে। অভাব আরও বাড়িলে চোখের মণি আক্রান্ত হয়, নরম হইয়া যায় এবং চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়। এই অবস্থাকে বলে ক্যারোটো-ম্যালেশিয়া। এরূপ অবস্থায় চোখ যদি ফাটিয়া যায় তবে সেই চোখ চিরকালের মত অন্ধ হইয়া যায়। কোন চিকিৎসায় তাহা ভাল করা যায় না।

প্রাণিজ খাদ্য যেমন দুধ, মাখন, ঘি, ডিম, মেটে, কডলিভার অয়েল এবং শার্ক লিভার অয়েলে 'এ' ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাছাড়া সবুজ শাক, গাজর, পাকা লাল কুমড়া, পাকা পেঁপে, পাকা আম ও পাকা টমেটোতেও প্রচুর পরিমাণে 'এ' ভাইটামিন পাওয়া যায়।

(৩) রক্তাক্ততা (Anaemia) : শিশুরা এই রোগের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। রক্তাক্ততার প্রধান কারণ লৌহ বা ফোলিক অ্যাসিডের অভাব।



এই অসুস্থ হইলে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দেয়, রঙ ফ্যাকাশে হইয়া যায়, জিভ ও নখ ফ্যাকাশে হয় এবং অতি সহজে ক্লান্তি আসে। হাত-পা-মুখও ফুলিতে পারে।

সবুজ শাক, নানারকম ডাল, মাছ, মাংস ও ডিমে লৌহ এবং ফোলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

(৪) **রিকেটস (Rickets)** : শিশুর দেহে ভাইটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসঘটিত লবণের অভাব হইলে বা উপযুক্ত অম্লপাতে না থাকিলে শিশু ভীক ও অস্থির-মতি হয়। তাহার মাংসপেশী শিথিল ও দুর্বল হয়। হাড় পুষ্ট হয় না বলিয়া অবয়ব বিকৃত হয়। ইহা রিকেট নামে পরিচিত। আমাদের দেশে প্রচুর স্বর্ষালোক আছে বলিয়া ভাইটামিন ডি'র অভাব হয় না কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হয়। উহাদের ক্রমাগত অভাবের ফলে শিশুর দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয় বা হ্রাস পায়, দাঁত খারাপ হয় এবং অকালে দাঁতের ক্ষয় হয়। দুধ, পানীয়, ডিমের কুসুম, ডাল বাদাম ও শস্তকণা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার।



রিকেট

### শিশুদের অসুস্থতা রোগসমূহ

(১) **কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)** : যে সকল শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হয় তাহারা অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যতায় কষ্ট পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য আঙুর, কমলালেবু অথবা অল্প কোন প্রকার ফলের রস পান করান উচিত। মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এক্ষেপ ক্ষেত্রে পথ্যস্হারা বা অল্প উপায়ে চিকিৎসা করিলে শিশুও আরোগ্য লাভ করিবে।

(২) **উদরাময় (Diarrhoea)** : ইহা সচরাচর দুগ্ধ ভৈরী করার ক্রটিবশতঃ অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। বার বার এবং প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়, পেটে ব্যথা থাকে। পেটে যন্ত্রণা নাও থাকিতে পারে।

(৩) **আমায় (Dysentery)** : ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। বার বার তবে পরিমাণে অল্প মল, পেটে যন্ত্রণা, কোথানি, আম, কখনো বা মলের সঙ্গে রক্ত পড়িতে পারে।

(৪) **সাধারণ সর্দিকাশি (Common colds)** : ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ভাইটামিনের অভাব বশতঃ শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে।

(৫) **টনসিলাইটিস (Tonsillitis)** : শিশুদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। টনসিলের প্রদাহকে টনসিলাইটিস বলে। টনসিলের স্বীতি, রক্তিমতা ও যন্ত্রণা রোগের প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে খাওয়ার বা তরল পদার্থ গিলিতে কষ্ট হয়, কখনো আবার ঢোক গিলিতেও কষ্ট হয়।

(৬) **থোসপাঁচড়া (Scabies)** : শিশুদের যেসব চর্মরোগ দেখা যায় উহাদের মধ্যে থোসপাঁচড়াই প্রধান। থোসপাঁচড়া একপ্রকার চর্মের ক্ষত। অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার মত একজাতীয় কীটপতঙ্গ হইতে পাঁচড়া জন্মায়। কীটগুলি দেহচর্ম ফুঁড়িয়া যখন বাসা করে তখন চর্মে দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। অনবরত চুলকাইতে চুলকাইতে স্থানটিতে প্রথমে ঘা দেখা যায়। তারপর ঐ ঘা হইতে রক্ত ও পুঁজ পড়িতে থাকে।

পাঁচড়ার ক্ষতগুলি গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া বেনজিক বেনজোয়েট প্রয়োগ করিলে স্বচ্ছল পাওয়া যায়। শিশুর দেহ ভালভাবে পরিষ্কার রাখিলে থোসপাঁচড়ার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায়।

(৭) **ক্রমি (Worms)** : ক্রমি নানা প্রকারের, যথা—রাউণ্ড ওয়ার্ম, থ্রেড ওয়ার্ম ও টেপ ওয়ার্ম। অধিক মিষ্টি, নোংরা অহুচিত খাবার, কখনো বা শারীরিক গঠনের গোলযোগের (constitutional defect) জন্য শিশুদের ক্রমি হয়। খাওয়া পানীয় যত্ন নিলে ও খাওয়ার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে বহুলাংশে ক্রমি প্রতিরোধ করা যায়।

## ২. সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান

(Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases)

যে সকল জীবাণুবাহিত ব্যাধি এক দেহ হইতে আরেক ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বিস্তারলাভ করে। উহাদিগকে বলে স্পর্শজ ব্যাধি (contagious diseases)।

### কডকগুলি সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়

**আমাশয় (Dysentery) :** একটি পানীয়বাহিত পেটের পীড়া। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর আমাশয় দেখা যায়—ব্যাসিলারি ও এমিভাজনিত।

**ব্যাসিলারি আমাশয়—রোগের লক্ষণ :** ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সঙ্গে খুব তাজা টকটকে রক্ত ও মিউকাস এই রোগের লক্ষণ সূচনা করে। জ্বর, দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গও থাকে। সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জন্ম সংক্রামিত হয়।

**রোগ সংক্রমণ :** রোগের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা পেটে প্রবেশ করে। রোগবিস্তারে মাছি প্রধান সহায়ক। ধূলাবালির মধ্যেও রোগের জীবাণু থাকে এবং ঐ ধূলা খাচ্ছে উড়িয়া আসিয়া খাদ্য জীবাণুহ্রষ্ট করে। রোগ বাহকের মারফতও রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

**প্রতিরোধের উপায় :** খাদ্য ও পানীয় জলেব বিশুদ্ধতা রোগ প্রতিরোধে অপরিহার্য। মাছি ও ধূলাবালির হাত হইতে খাদ্য ও পানীয় রক্ষা করিবে। গৃহে আমাশয় রোগী থাকিলে তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং মলমূত্র নির্বাসিত করিয়া অপসারণের ব্যবস্থা করিবে। কোঠকাঠিন্ত থাকিলে সর্বদা উহা রেচক দিয়া দূর করিবে।

**এমিভাজনিত আমাশয় রোগের লক্ষণ :** চার পাঁচবার তরল দান্ত হয়, দুর্গন্ধযুক্ত মিউকাস ও সঙ্গে রক্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও সঙ্গে জ্বর ও পেটে বেদনা থাকে।

রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাসিলারি আমাশয়ের অনুরূপ। তাছাড়া এমিভাজনিত আমাশয় প্রতিরোধ করিতে হইলে জল ফুটাইয়া পান করা উচিত।

**উদরাময় (Diarrhoea) :** ইহাও একটি পানীয়বাহিত ব্যাধি। মল তরল ও সংখ্যায় অধিকতর হয়। বমি, পেটের যন্ত্রণা ও ঘন ঘন তরল মল নির্গত হওয়া ইহার প্রধান উপসর্গ।

**প্রতিরোধের উপায় :** খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। দুধ ফুটাইয়া পান করিবে। খাদ্যদ্রব্য মাছি হইতে দূরে রাখিবে।

**কলেরা (Cholera)—রোগলক্ষণ :** ভেদবমি, হাত-পায়ের থিঁচুনি, প্রস্রাব বন্ধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ কলেরার প্রধান উপসর্গ। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বমির জন্য রোগীর পিপাসা মিটিতে চায় না। রোগী ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ত্বক্ বিবর্ণ হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চর্ম কুঞ্চিত হয় এবং দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকভাবে নামিয়া যায়।

**প্রতিরোধের উপায় :** প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা দরকার। বদহজম ও তীব্র উদরাময় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করিবে। পচা, বাসি, উন্মুক্ত খাবার, খোশাযুক্ত মাছ বর্জন করিবে। পেট খালি রাখিবে না। ধুলাবালি ও মাছি হইতে খাণ্ডদ্রব্য সাবধানে রাখিবে।

আইসক্রীম এবং স্তম্ভশ্রুত সোডাওয়াটার বর্জন করিবে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবে এবং দুধ ফুটাইয়া পান করিবে। বাসনপত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবে। সর্বসাধারণের টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। রথে ও মেলায় সকলকে টিকা দিবে এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করিবে।

**টাইফয়েড (Typhoid) —রোগের লক্ষণ :** কলেরার মতই টাইফয়েড একটি পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতে মাথা ধরা, অবসাদ এবং নাড়ীর মৃদুগতি লক্ষিত হয়। জ্বর প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান হইয়া প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে  $103^{\circ}$ - $108^{\circ}$  ডিগ্রীতে ওঠে এবং একইভাবে চলিতে থাকে। প্রাতে জ্বর প্রায়  $2^{\circ}$  ডিগ্রী নামিয়া যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া কমিয়া সাধারণ অবস্থায় আসে। জ্বর অপেক্ষা এই রোগের উপসর্গগুলি মারাত্মক।

**প্রতিরোধের উপায় :** পানীয়বাহিত ব্যাধি বলিয়া কলেরা রোগের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্য উত্তমরূপে নিবীজন করা প্রয়োজন। মলমূত্রাদি নিবীজিত করিয়া নিক্ষেপ করিবে অথবা পোড়াইয়া দিবে। টিএবিসি টিকা লইলে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ও কলেরার আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

**ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) —রোগলক্ষণ :** জ্বর, সর্বাস্থে দারুণ বেদনা-বোধ, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদই প্রধান উপসর্গ।

**প্রতিরোধের উপায় :** রোগীর সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। সর্বদা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষে শুইবে, ভিড় এড়াইয়া চলিবে এবং উপযুক্ত শীতবস্ত্র পরিধান করিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি সর্বদা মানিয়া চলিবে। ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পানাহার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত এবং পানাসক্ত ব্যক্তির সহজে এই রোগের কবলে পড়ে। মারীর সময়ে স্বস্থ ব্যক্তিদের লবণজলে গার্গল করা উচিত।

বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবে এবং দেহ গরম রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও ক্রমাল গরম সাবানজলে সর্বদা ফুটাইয়া নিবীজিত করিয়া লইবে। বায়ুর মধ্য দিয়া রোগী হাঁচি কাশির সঙ্গে রোগের জীবাণু

ছড়ায়। রোগীকে তাই উন্মুক্তভাবে হাঁচিতে কাশিতে বা যেখানে সেখানে থুথু ফেলিতে দিবে না। হাঁচিবার সময় সর্বদা কুমাল ব্যবহার করিবে।

**ডিপথেরিয়া (Diphtheria)**—রোগের লক্ষণ : নাসারন্ধ্র, টনসিল ও শ্বাসনালীতে পর্দার সৃষ্টি করে। ঐ পর্দা শ্বাসনালী বন্ধ পর্যন্ত করিয়া দিতে পারে। স্বংপিণ্ড দুর্বল করিয়া ফেলে।

**প্রতিরোধের উপায় :** রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবে। রোগীর স্লেমা ও গয়ের পোড়াইয়া ফেলিবে।

**যক্ষ্মা (Tuberculosis)**—রোগের লক্ষণ : ঘুঘুঘুে জ্বর, খুসখুসে অল্প কাশি, রাত্রে ঘাম হয় এবং ওজন দ্রুত কমিয়া যায়। শ্বাসপথ, মুখ ও স্বকের ভিতর দিয়া রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

**প্রতিরোধের উপায় :** প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে, যেমন—

- (১) রোগজীবাণুর বিস্তার নিবারণ ; (২) অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করা ;
- (৩) ব্যক্তিগত সাবধানতা ; (৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য।

রোগীর থুথু, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগজীবাণু নির্গত হয়। সুস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা বিপন্ন না হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা এই রোগ নিবারণের প্রধান অঙ্গ।

অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত বিসিজি টিকা দেওয়া। এই টিকা লইলে পাঁচ ছয় বছরের জন্ত যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

**ব্যক্তিগত সাবধানতা :** রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব পরিত্যজ্য। দুধ অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট ফুটাইয়া পান করিবে। বন্ধ আলোবাতাসহীন কক্ষে ঘুমাইবে না এবং যতদূর সম্ভব মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিবে।

**রাষ্ট্রের কর্তব্য :** দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাণ্ডের অভাব, আলোবাতাসহীন ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বাস, কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অতিরিক্ত পরিভ্রমের জন্ত যক্ষ্মারোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। জনবহুল শহরগুলিতে আলোবাতাসমুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মাণের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। কলকারখানার ধূম ও গ্যাস যাহাতে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জনসাধারণের জন্ত ভেজালশূণ্য খাণ্ডের ব্যবস্থা করা, যক্ষ্মারোগীদের জন্ত উপযুক্ত নিবাস নির্মাণ করা এবং জনসাধারণের জন্ত বিসিজি টিকা দিবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত।

**হাম (Measles)**—রোগের লক্ষণ : এক ধরনের তীব্র সংক্রামক রোগ। সর্বাপেক্ষে ফুসকুড়ি লইয়া এই জ্বর আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত সর্দি, নাক ও চোখ দিয়া জল পড়া, মাথার যন্ত্রণা ও শীত শীত ভাব হামের প্রধান উপসর্গ।

১০৪°—১০৫° ডিগ্রী পর্যন্ত দ্রুত উঠিতে পারে এবং ফুসকুড়ি অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। চতুর্থ দিবসে চুলের গোড়ায় এবং কানের পশ্চাত্তাগে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তারপর সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনদিন পর্যন্ত থাকিতে পারে। দশম দিবসে আঁশ উঠিয়া যায়। হাম সারিবার পরে অনেক রোগী নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

**রোগ-সংক্রমণ :** সাধারণতঃ এক জায়গায় হাম হইলে আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলে উহা ছড়াইয়া পড়ে। শৈশবেই হাম-জরের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। জনবহুল স্থান হাম বিস্তারের পক্ষে আদর্শস্থল বলিয়া গণ্য। রক্ত, কফ ও চর্মের মধ্যে হামের বীজাণু থাকে। রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলেই এই রোগ সংক্রামিত হয়। তবে রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্য দিয়াও হাম ছড়ায়। হামের গুটিকা বাহির হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উপস্থাবস্থায় হাম অত্যন্ত ছোঁয়াচে। উপস্থাবস্থা ৮-১৪ দিন।

**প্রতিরোধের উপায় :** হাম হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে পৃথক ঘরে মশারির নীচে রাখিবে। তবে হামের গুটিকা বাহির হইবার পূর্বেই রোগজীবাণু সংক্রামিত হইয়া যায়। উন্মুক্তভাবে রোগীকে স্পর্শে ফেলিতে দিবে না। রুমাল অথবা পরিষ্কার ছাকড়ায় ঐ স্পর্শ ফেলিতে দিবে এবং তারপর উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। সমস্ত বিছানা, আসবাব ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি নির্বীজিত করিয়া রোগীকে বাহিরে আনিবে। বাড়ির লোকেদের বাড়িতে কিছুদিন আটক রাখা ভাল। অগ্ন্যাগ্ন লোকেদেরও ঐ বাড়িতে আসাযাওয়া বন্ধ করা উচিত।

**বসন্ত (Pox)** দুই প্রকার—পানবসন্ত ও ইচ্ছাবসন্ত।

**পানবসন্তের রোগলক্ষণ :** সামান্য জ্বর, অস্থির ভাব এবং গিঠে ও পায়ে বেদনা দেখা দেয়। সর্বাস্থে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয় এবং ঐগুলি দ্রুত ফোঙ্কায় পরিণত হয়। ফোঙ্কাগুলি শুকাইয়া যায় এবং মামড়ি পড়ে এবং শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না।

**রোগ-সংক্রমণ :** অত্যন্ত ছোঁয়াচে তবে মারাত্মক নয়। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে রোগ হইতে পারে। রোগের মামড়ি বাতাসে মিশিয়া রোগ ছড়াইতে পারে। রোগীর স্পর্শ ইত্যাদিও সংক্রামক। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু ছড়াইতে পারে।

**প্রতিরোধের উপায় :** রোগীকে সর্বদা স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির নীচে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব এড়াইয়া চলিবে। টিকা

লইলে পানবসন্ত প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না। তবে একবার পানবসন্ত হইলে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

**ইচ্ছাবসন্তের (Small pox) রোগলক্ষণ :** প্রথম অবস্থায় বমি, মাথায যন্ত্রণা, পিঠে বেদনা এবং অত্যধিক জ্বর হয়। গায়ে ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয় এবং উহারা ছোট ছোট ফোঁসার আকার ধারণ করে, তারপর পুঁজ জমে এবং ফোঁসাগুলি গুটিকার আকার ধারণ করে।

**রোগ-সংক্রমণ :** রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে কিংবা বাসনপত্র ব্যবহারের দ্বারা রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়। মৃতদেহ সংস্কারকালেও রোগের সংক্রমণ সম্ভব। রোগীর শ্লেষ্মা ও মামড়ি ধূলিকণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইতে পারে। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু বহন করিতে পারে।

**প্রতিরোধের উপায় :** টিকা লইয়া ইচ্ছাবসন্ত প্রতিরোধ করা যায়। নাক ও মুখ দিয়া বসন্তের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। তাই গরমজলে ডেটল দিয়া গার্গল করা ভাল।

বাড়িতে বসন্ত রোগ দেখা দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির ভিতরে রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য, মলমূত্র ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া অপসারিত করিবে। মাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ হইতে সতর্ক থাকিবে। গুটিকার খোলস একটি পাত্রে জমা করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। আরোগ্য-লাভের পর রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করিয়া লইবে এবং নির্বীজক লোশন দিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। সর্বসাধারণকে টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে।

রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে তবে জলের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ ফর্মাליন সলিউশন মিশাইয়া উহাতে একটি চাদর কিংবা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া মৃতদেহ ভাল করিয়া জড়াইবে। তারপর দ্রুত অপসারিত করিবে। কফিনে চাপা দিলে উহা যেন বায়ু-নিরোধক হয়।

**৩. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) :** সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়—(১) প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় (early diagnosis), (২) স্বতন্ত্রীকরণ (isolation), (৩) প্রজ্ঞাপন (notification), (৪) নিরোধন (quarantine), (৫) প্রতিরোধ (prevention) (৬) অনাক্রম্যতা (immunisation), এবং (৭) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত শিক্ষার (health education) প্রসার।

(১) প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় (Early diagnosis) করিতে পারিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। শিশুরা যেমন হাম,

ডিপ্‌থেরিয়া, মায়স, হুপিং কফ ইত্যাদি রোগের করলে পড়িয়া থাকে। স্তত্ৰাং কাহারো গায় সামান্য ফুসকুড়ি দেখা দিলে, কিংবা গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভৃতি হইলে অবহেলা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় করা সহজ হয়।

(২) **অন্তর্ভুক্তিকরণ (Isolation) :** সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে স্বস্থ ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া রাখিবে। গৃহে স্বতন্ত্র রাখিতে হইলে রোগীকে একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে রাখিবে এবং তাহার বাসন-কোসন পৃথক্ করিয়া ফেলিবে। যে সমস্ত জিনিস রোগীর ব্যবহারে লাগিবে না তাহা সমস্ত সরাইয়া ফেলিবে। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র নিবীজিত করিয়া রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিবে এবং মলমূত্রে নিবীজক লোশন ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। অবশেষে রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে কিংবা মাটিতে পুঁতিয়া দিবে।

শুদ্ধীকারিণী ব্যতীত অপর কেহ রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিবেন না। তিনি সর্বদা নিবীজক লোশন দিয়া হাত-পা ধুইয়া ফেলিবেন এবং রোগি-কক্ষে ব্যবহৃত নিজ বস্ত্রাদি ফুটাইয়া নিবীজিত করিয়া লইবেন।

(৩) **প্রজ্ঞাপন (Notification) :** কোথাও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলেই ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিবার জ্ঞাত স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা হেলথ অফিসারকে সংবাদ দিতে হয়। ইহাকে বলে প্রজ্ঞাপন। এই সংবাদ দানের উদ্দেশ্য ব্যাধির বিস্তার নিবারণ। রোগ হওয়ামাত্র সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ আসিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সমস্ত লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং রোগীর পার্শ্ববর্তী এবং সংলগ্ন লোকদের প্রতিবেদক টিকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে। ফলে সংক্রামক রোগের জীবাণু আর স্বস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশের স্তযোগ পাইবে না।

(৪) **নিরোধন\* (Quarantine) :** রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যতদিন রোগ ছড়াইবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করা হয় ততদিন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম নিরোধন। শুধুমাত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এইরূপ নিরুদ্ধ রাখা হয়। নিরোধনও একপ্রকার স্বতন্ত্রীকরণ।

\* বিদেশ হইতে যাহাতে কোনবকম সংক্রামক রোগের জীবাণু আসিয়া অপর একটি দেশে ছড়াইতে না পাবে এইজন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেব বা রোগের বাহক হইতে পাবে এইরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদেব আটক করিয়া রাখাকেই নিরোধন বলা হইত। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশেব বন্দরগুলিতে নিরোধনেব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। কিন্তু ইহাতে যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ হইত বলিয়া আজকাল ভ্রমণকারীরা নিজ নিজ দেশ ছাড়িবার পূর্বে টিকা এবং ইনজেকশন ইত্যাদি লইয়াছে কিনা দেখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।



(৫) **প্রতিরোধ (Prevention) —নির্বীজন (Disinfection) :** শুষ্কাকারিণীর অন্ততম কর্তব্য হইল সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করা। রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভাল করিয়া নিবীজিত করিতে পারিলে রোগ ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে না।

(১) **সত্ত সত্ত নির্বীজন (Concurrent disinfection) :** কোন ব্যক্তি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমূত্র, থুথু ও বামন-পত্রাদির মধ্যে রোগের জীবাণু অদৃশ্যভাবে লাগিয়া থাকে। উহাদের নিবীজিত করার নামই সত্ত নির্বীজন। সত্ত নির্বীজন একান্ত প্রয়োজন কারণ উহার অভাবে নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে রোগ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে।

(২) **পরিশেষ নির্বীজন (Terminal disinfection) :** রোগী আরোগ্য হইবার পরে কিংবা, রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি নিবীজন করা দরকার হইয়া পড়ে।

**রোগি-কক্ষ এবং রোগীর ভৈজসপত্র :** কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে রোগি-কক্ষের দেওয়াল ও মেঝে সাধারণতঃ দূষিত হয়। রোগীর গৃহ নিবীজিত করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হইল fumigation অর্থাৎ গন্ধক পোড়াইয়া বাষ্প উৎপন্ন করা। কক্ষের সমস্ত আসবাব বাহির করিয়া লইয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তারপর একটি পাত্রে গন্ধক জালিয়া দিবে। গন্ধক পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। গন্ধকের পরিবর্তে ফর্মালিন ব্যবহার করা যায়। Fumigate করার তিন চার দিন পরে কক্ষের দরজা-জানালা খুলিয়া দিবে এবং কক্ষে বায়ু চলাচল করিতে দিবে। তখন উহা সম্পূর্ণ নিবীজিত হইয়া যাইবে এবং স্বস্থ লোকের বাসের উপযোগী হইবে।

বাড়িতে প্লেগ রোগ হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া কক্ষটি fumigate করিয়া চুনকাম করাইয়া লইবে।

**আসবাবপত্র :** ফিনাইল অথবা কার্বলিক লোশন দিয়া আসবাব ধোত করিয়া তার্পিন তেল দিয়া মুছিয়া লইলে আসবাবপত্র বিশোধিত হয় এবং উহার চাকচিক্য নষ্ট হয় না।

যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগীর ব্যবহৃত আসবাবে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রথর রোদে ফেলিয়া রাখিবে এবং সুবিধামত বার্ষিক করাইয়া লইবে।

**বিছানাপত্র ও বস্ত্রাদি :** ছিন্নবস্ত্র, কাঁথা ইত্যাদি দহন করা বিধেয়। যেসকল বস্ত্র সিদ্ধ করা যায় সেগুলি সাবান ও সোডা দিয়া ফুটাইয়া কাচিয়া প্রথর রোদে শুকাইয়া লইবে। সিদ্ধ ফার কিংবা মূল্যবান বস্ত্রাদি ড্রাইওয়াশ

করাইয়া লইবে। লেপ, তোশক ইত্যাদি প্রথমে রোজে দিয়া নিবীজিত করিয়া লইবে।

**পুস্তক ও কাগজপত্র :** কাগজপত্র প্রথমে রোজে ষণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখিবে। তারপর ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিবে।

(৬) **অনাক্রম্যতা (Immunisation) :** রোগজীবাণুর দেহে antigen নামে একপ্রকার প্রোটিন থাকে। প্রত্যেক সংক্রামক রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাসের নিজস্ব antigen থাকে ; তাহা জীবদেহে antibody সৃষ্টি করে। ঐ antibody ঐ বিশেষ সংক্রামক রোগের জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে। রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জীবদেহের এই সংগ্রাম করিবার শক্তিকে রোগ প্রতিরোধক বা অনাক্রম্যতা শক্তি ( Immunisation ) বলে।

কিছু কিছু মাহুষের জন্মগতস্বত্রে কোন কোন প্রকার রোগ-জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি থাকে। এইরূপ শক্তিকে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক শক্তি ( Natural immunisation ) বলে।

আবার স্বাভাবিক নিয়মেও দেহে কোন ব্যাধি যেমন হাম রোগ সংক্রামিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রোগের উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরোধ শক্তি বা antibody সৃষ্টি হয়। আরোগ্য লাভের পরেও ঐ antibody কিছু পরিমাণে থাকিয়া যায় এবং ঐ রোগের পুনরাক্রমণে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। রোগ প্রতিরোধের এই শক্তিকে বলে সক্রিয় অনাক্রম্যতা ( Active immunity )। এই অনাক্রম্যতা শক্তি স্থায়ী।

কৃত্রিম উপায়েও জীবদেহে অনাক্রম্যতা শক্তি সৃষ্টি করা যায়। রোগের জীবাণু ( bacteria ) অথবা ভাইরাস ( Virus ) লইয়া প্রথমে তাপ প্রয়োগ করিয়া অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহাদের মারিয়া ফেলিতে বা দুর্বল করিতে হয়। জীবাণুগুলি মরিয়া গেলে কিংবা দুর্বল হইয়া পড়িলেও উহাদের antigen অবিকৃত থাকে। এখন এই মৃত অথবা দুর্বলীকৃত জীবাণুর antigen শল্য সহকারে জীবদেহে অল্পপ্রবেশ করাইয়া অস্থায়ী অনাক্রম্যতা প্রদান করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা শক্তি ( Passive immunity ) বলে এবং এই পদ্ধতি ইনোকুলেশন ( inoculation ) নামে পরিচিত। এইভাবে টাইফয়েড, কলেরা, হাম ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া তোলা যায়।

**ভ্যাকসিনেশন ( Vaccination ) :** পরিবর্তিত পদ্ধতিতে বসন্ত রোগের হাত হইতে জীবদেহ রক্ষা করা যায়। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে গরুর দেহে বসন্ত রোগের বীজ প্রবেশ করান হয়। তারপর বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর লসিকা ত্বক সামান্য ছেদন করিয়া অল্প দেহে প্রবেশ করান হয় এবং সে বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করার শক্তি নিজ দেহে গড়িয়া তোলে। ল্যাটিন ভাষার Vacca শব্দের অর্থ গরু এবং এইভাবে vaccine কথাটির উৎপত্তি। ইংরেজ চিকিৎসক Edward Jenner এই যুগান্তকারী মানবহিতকর বসন্তের টিকা (১৭৯৬) আবিষ্কার করেন।

অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত জন্তর যেমন অশ্বের শরীরে রোগের জীবাণু কৃত্রিম উপায়ে অল্পপ্রবেশ করাইলে কয়েক দিন পরে ঐ জীবদেহে antibody সৃষ্টি হয়। তখন উহার বক্তমস্ত বাহির করিয়া লইয়া পরিশোধন করিয়া অল্প জীবদেহে প্রবেশ করাইলে ঐ বিশেষ রোগের অনাক্রম্যতা শক্তি প্রদান করা যায়। ইহাকে বলে সিরাম (serum) ইনজেকশন।

(৭) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা (Health education) : সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের আসল উপায় হইল জনশিক্ষার প্রসার। অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তাহাদের সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি ঠিক একভাবে ছড়ায় না। যেমন—ম্যালেরিয়া রোগের বাহন হইল মশা এবং কলেরা রোগের বাহন হইল মাছি। উহাদের অভ্যাসও স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, একই রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়াইতে পারে। যেমন—রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলে যক্ষ্মা হইতে পারে—আবার গরুর দুধও যক্ষ্মা রোগের বাহন হইতে পারে। আবার রোগীর মলমূত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ছড়ায় ইহাও অনেকে জানেন না। এই সব কারণে জনসাধারণ সুশিক্ষিত না হইলে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। সরকারের শিক্ষণ-প্রাপ্ত লোকেদের গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেমা দেখাইয়া, বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়া, প্যাম্ফলেট ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১. প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয় ?

কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে যে জ্ঞানের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যক্তির জীবন-রক্ষা কিংবা আরোগ্যের পথ সুগম করা যায় তাহারই নাম প্রাথমিক প্রতিবিধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কখনও চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে না। চিকিৎসক আসিলেই তাহার দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। তবে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে তাহাকে রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া লইয়া কি পরিমাণ প্রতিবিধান প্রয়োজন এবং কতটা প্রতিবিধান দেওয়া সম্ভব তাহা স্থির করিতে হয়। কম্পন, অচেতনতা অবস্থা, বিবর্ণতা, আঘাতের স্থানে ক্ষীতি কিংবা রক্ত জমা ইত্যাদি চিহ্নগুলি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী নিজের চোখে দেখিয়া রোগ আন্দাজ করিয়া লইতে পারে। এতদ্ব্যতীত রোগীর শীত শীত ভাব, বমির ইচ্ছা, তৃষ্ণাবোধ অথবা বাষা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা তাহা সে রোগীর নিকট হইতেই জানিয়া লইতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও উপস্থিতবুদ্ধি থাকা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরবৃত্ত ও শুষ্ক-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহত ব্যক্তি জীবিত কি মৃত সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আসা পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত।

প্রাথমিক প্রতিবিধান কোথায় প্রয়োগ করা হয় ? শুধুমাত্র দেহের বাহিরের অংশের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ( external injury ) প্রাথমিক প্রতিবিধান দেওয়া চলে।

### প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তব্য

১। দুর্ঘটনা গৃহেই ঘটুক কিংবা পথিপার্শ্বেই ঘটুক যাহা করণীয় তাহা অতি দ্রুত ও শান্তভাবে করিয়া যাইবে।

২। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনয়নের ব্যবস্থা করিবে।

৩। রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবে।

৪। আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করিবে এবং স্নায়বিক আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

৫। স্নায়বিক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা চালাইবে।

৬। রোগীর চারিদিকে অথবা ভিড় জমিতে দিবে না।

৭। অথবা বজ্র অপসারণ করিবে না।

৮। রোগীকে সম্বর চিকিৎসকের নিকট অথবা প্রয়োজন হইলে হাসপাতালে পাঠাইবে।

## ২. ব্যাণ্ডেজ

**ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজনীয়তা :** অস্থিভঙ্গ কিংবা রক্তপাতে দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়। সচরাচর যেসব কারণে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি এই—(১) সুপ্লিন্ট ও ড্রেসিং যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়। (২) রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য। (৩) আহত অঙ্গের স্নিগ্ধ হিসাবে। (৪) রোগীকে তুলিয়া বহন করিবার সুবিধার জন্য।

**ব্যাণ্ডেজের শ্রেণীবিভাগ :** গুটান ব্যাণ্ডেজ ( Roller bandage ), ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ ( Triangular bandage ), মেনি-টেল ( Many-tail ) ও টি-ব্যাণ্ডেজ ( T bandage ) প্রভৃতি নানা রকমের ব্যাণ্ডেজ আছে। উহাদের মধ্যে গুটান এবং ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়।

**গুটান ব্যাণ্ডেজ ( Roller bandage ) :** গুটান ব্যাণ্ডেজ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রস্থের গুটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, যেমন—

পদব্ধয় ৩—৩½ ইঞ্চি ( ৭'৬২—৮'৮৭ সে. মি. )

চক্ষু—২ ইঞ্চি ( ৫'০৮ সে. মি. ) বাহু—২½ ইঞ্চি ( ৬'৩৩ সে. মি. )

হাতের আঙুল ১—১½ ইঞ্চি ( ২'৫—৩'৭৫ সে. মি. )

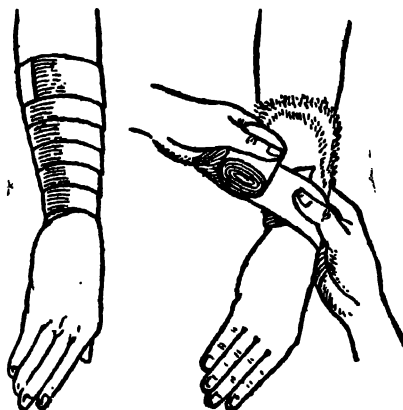
মস্তক—২½ ইঞ্চি ( ৬'৩৩ সে. মি. )

বক্ষঃস্থল—৪—৬ ইঞ্চি ( ১০'১—১৫'২৪ সে. মি. )

নানাভাবে গুটান ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যায়, যেমন

- (১) সর্পিল পাক ( Spiral ); (২) উল্টা পাক ( Reverse );
- (৩) বৃত্তাকার ( Circular ); (৪) বাংলা চার অক্ষরের আকার ( Figure of eight ) ও (৫) স্পাইকা ( Spica )।

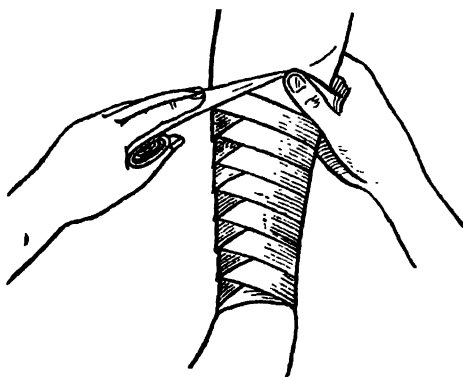
(১) সরল পাক (Spiral) : প্রত্যেকটি পাক এমনভাবে দিবে যাহাতে



সরল পাক

প্রত্যেকটি উপরের পাক নীচের পাকের ঠিক অংশ আবৃত করে সাধারণতঃ আঙুল, কব্জি ও বাহুতে ব্যবহার করা হয়।

(২) উল্টা পাক (Reverse) : পাকগুলি সরল পাকের অপরূপভাবে প্রত্যেকটি পাক উল্টাইয়া দেওয়া হয়। যে অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হইবে

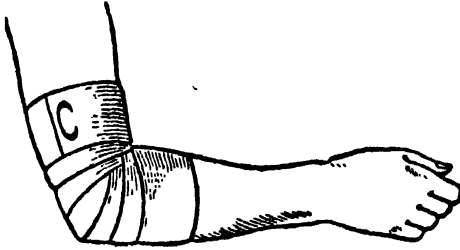


উল্টা পাক

তাহা সর্বত্র সমান স্থূল হইলে সরল পাক দেওয়া হয় পরন্তু অঙ্গের অসম স্থূলতার জন্য উল্টা পাক উপযোগী।

(৩) বৃত্তাকার (Circular) : এমনভাবে দুই তিনটি পাক দিতে হইবে যাহাতে একটি পাক অপরটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করে। সাধারণতঃ কব্জি অথবা গুলফের (ankle) ড্রেসিং-স্থির রাখিতে হইলে এইরূপ বৃত্তাকার গুটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়।

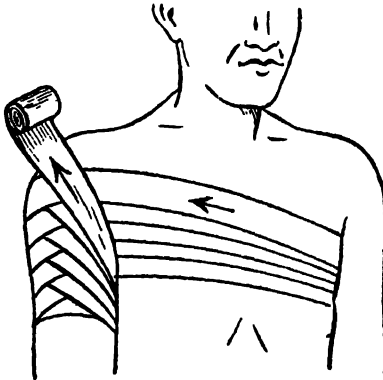
(৪) বাংলা চার অক্ষরের ছান্ন (Figure of eight) : আড়ভাবে উপর হইতে নীচের দিকে এবং নীচ হইতে উপরের দিকে পাক দিতে হইবে।



চার আকৃতি ব্যাণ্ডেজ

একটি পাক আরেকটি পাককে এমনভাবে ছেদন করিবে যাহাতে বাংলা চার অক্ষরের মত দেখায়। জাঁহু, কহুই, গুলফ ইত্যাদি সন্ধিতে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

(৫) স্পাইকা (Spica) : চার অক্ষরের অঙ্করূপ। সাধারণতঃ কাঁধ,

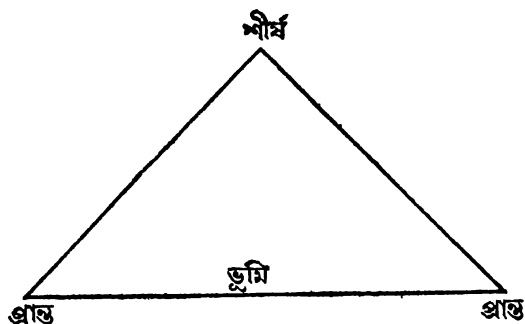


স্পাইকা ব্যাণ্ডেজ

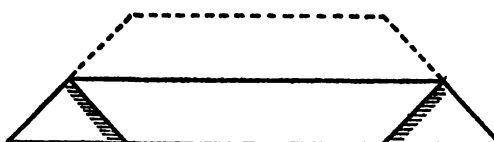
নিতম্ব, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি যেসব সন্ধিস্থল দেহের সঙ্গে সমকোণ ভাবে রহিয়াছে সেইসব স্থানে প্রয়োগ করা হয়।

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (Triangular bandage) : ইহা সচরাচর কোন অঙ্গকে ঝুলাইয়া রাখিবার ভগ্ন ব্যবহৃত হয়। এক টুকরা চোঁকা কাপড় লইয়া আড়কোণে কাটিয়া লইলে দুইটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত হইবে। ইহা মস্তক, বাহু, উরুসন্ধি এবং অস্ত্রাঙ্গ স্থানে প্রাথমিক প্রতিবিধানের অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। বাহু ঝুলাইয়া রাখিতে হইলে একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহার একটি প্রান্ত স্বন্ধের উপর রাখ এবং গ্রীবা বেঁটন করিয়া আহত স্বন্ধের উপর আন এবং

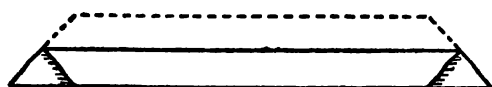
বুকের সামনের দিকে অল্প প্রান্তটি ঝুলাইয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় প্রান্তটি



এক ভাঁজ



চওড়া ব্যাণ্ডেজ



সরু ব্যাণ্ডেজ

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ

আনিয়া প্রথম প্রান্তের সঙ্গে বাঁধিয়া দাও। ব্যাণ্ডেজের শীর্ষটি কতই পর্যন্ত ভাঁজ করিয়া আনিয়া সেফটিপিন দিয়া আটকাইয়া দিবে।

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ একদিকে যেমন স্নিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় অল্পদিকে তেমনি মস্তক, হাত, কতই, জাহ্ন, উরু এবং পায়ের আঘাত রক্ষা করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### ৩. গৃহে বিষাক্ত ঔষধ সংরক্ষণ (Storage of poisonous medicines at home)

বিষাক্ত ঔষধাদি নিম্নলিখিত উপায়ে সংরক্ষণ করিবে :

(১) দোগীর সমস্ত ঔষধ একটি আলমারিতে রাখিবে। বিষাক্ত ঔষধগুলি



একটি স্বতন্ত্র আলমারিতে তালাচাবি দিয়া রাখিবে। আলমারির স্থবিধা না থাকিলে রোগী এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে কোথাও রাখা কর্তব্য।

(২) খাইবার ঔষধ এবং বিষাক্ত ঔষধের জন্য সর্বদা পৃথক্ আকৃতির বোতল ব্যবহার করিবে। তাছাড়া খাইবার ঔষধগুলি সাদা রঙের এবং মালিশের বিষাক্ত ঔষধের শিশিগুলি রঙীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) বিষাক্ত ঔষধের গায়ে একটি লেবেল লাগাইয়া ‘বিষ’ (Poison) কথাটি বড় করিয়া লিখিয়া রাখিবে এবং উহার নীচে রোগীর নাম, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে হইবে লিখিয়া রাখিবে।

(৪) অনেক সময় খাইবার ঔষধের গায়েও ‘বিষাক্ত’ কথাটি লেখা থাকে। উহার অর্থ এই যে রোগী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হইলে চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত উহা প্রয়োগ করিবে না। তাছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রোগীর পক্ষেও বিষের মত কাজ করিবে। এই জাতীয় বিষাক্ত ঔষধের গায়েও লেবেল লাগাইয়া রোগীর নাম, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিবে।

#### 4. গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের আবশ্যিক সরঞ্জাম (Maintaining a First Aid Box)

গৃহে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীর আরোগ্যলাভের পথ প্রশস্ত করা এবং তাহার অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে এইজন্য প্রতিয়োদমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের কিছু কিছু সরঞ্জাম রাখিতে হয়। সরঞ্জামের তালিকা খুশিমত দীর্ঘ করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি অপরিহার্যঃ—টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, ডেটল, মার্শুরি ক্রোম, জেনশান ভায়োলেট, বরিক তুলা, ঔষধের গ্লাস, কাঁচি—তীক্ষ্ণ ও ভোঁতা, স্কেটিপিন, স্কেলভোলেটাইল বা স্কেলিং সন্ট, এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট, বার্নল, এক ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, তিন ইঞ্চি গুটান ব্যাণ্ডেজ, গজ ও কয়েক প্রকার ড্রেসিং, গরম ও বরফ জলের ব্যাগ, তুলা জড়াইবার কয়েকটি কাঠি।

## অনুশীলনী

### প্রথম অধ্যায়

১। পারিবারিক জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। গৃহ আমাদের জীবনের কোন কোন মূল্যবোধগুলি তৃপ্ত করে ?

২। বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার লোকেদের বাসস্থানের পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত ?

৩। পরিবারের কি কি মূল দাবীগুলি গৃহের মিটান উচিত ? শিশু এবং বয়স্কদের জন্য গৃহে কি সংস্থান রাখা উচিত ? ( H. S. 1962 )

৪। বাসস্থান পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

৫। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি শয়ন কক্ষ ব্যবহার করা যায় ? জীবনে শয়ন কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। কত রকম উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকখানা ব্যবহার করা যায় আলোচনা কর।

৭। পারিবারিক জীবনে শিশু কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং একটি শিশুকক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৮। শিশুকক্ষে কি কি ধরনের খেলনা ও অগ্রাগ্র সরঞ্জাম রাখা উচিত। এইসব খেলনাগুলি কি শিশু জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় ? উপযুক্ত কারণ দেখাও।

৯। কারুশিল্পের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর। গৃহসজ্জার নিজস্ব নীতিগুলি বর্ণনা কর। এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

১০। গৃহপ্রসাধনে বর্ণের গুরুত্ব কতখানি ? বর্ণচক্র কাহাকে বলে ? একটি বর্ণচক্র আঁকিয়া দেখাও।

১১। মনের উপর বর্ণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে ? মিত্র ও বিবাদী বর্ণ, উষ্ণ ও শীতল বর্ণের পার্থক্য দেখাও।

১২। আলপনা সম্বন্ধে একটি নাস্তিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

১৩। দক্ষিণ ভারতীয়দের জীবনে আলপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। একটি দক্ষিণ ভারতীয় আলপনা আঁকিয়া দেখাও। গুজরাতে আলপনাকে কি বলে ?

১৪। পুষ্পবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণনা কর। খাবার ঘরে কিতাবে পুষ্পবিজ্ঞাস করিবে ? আপানী পুষ্পবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি আলোচনা কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

- ১। বাহিরে কর্মরতা একজন গৃহিনীর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত কর।
- ২। গৃহপরিকল্পনায় সময় পরিকল্পনার গুরুত্ব নির্দেশ কর। সময় পরিকল্পনায় সময় কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখিবে?
- ৩। গৃহের সাধারণ কয়েকটি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের নাম কর। এসব কীটপতঙ্গের হাত ইহতে কিভাবে রেহাই পাইতে পার? কয়েকটি পতঙ্গ-নাশকের নাম কর। (H. S. 1963)
- ৪। গৃহে ইঁদুর ও মাছি কেন বিনষ্ট করিবে এবং কিভাবে উহাদের বিনষ্ট করিবে? (H. S. 1961)
- ৫। টিকা লিখ: (ক) আসবাব পরিষ্করণ (খ) গৃহের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ (H. S. 1964)।
- ৬। তুমি একটি হোটেলের সুপার নিযুক্ত হইয়াছ। ডিশ ধোওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে তোমাকে ভৃত্যদের নির্দেশ দিতে হইবে। অল্প ব্যয়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধুইবার কি নির্দেশ দিবে? এক প্রস্থ ডিশের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষ-গুলি রহিয়াছে:

(ক) কাচের গামলা; (খ) চারিধার নকশা কাটা ডিশ; (গ) রূপার কাটাচামচ; (ঘ) হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি; (ঙ) সোনার কাঁজ করা চীনা মাটির বাসন; (চ) পিতল ও তামার তৈলাক্ত বাসন; (ছ) অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ও ট্রে। বাদন ধোওয়ার জন্য ৫০১ বার সাবান, তেঁতুল, সোভা, রিঠা ও ছাই দেওয়া হইয়াছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

- ১। জীবনে পোশাক পরিচ্ছেদের গুরুত্ব কি? পোশাকের ক্রটি বলিতে কি বুঝায়? একটি কিশোরী কণ্ঠার বিবাহ বাড়িতে যাইবার উপযুক্ত পোশাক কি?
- ২। পোশাকের উপাদান নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিবে?
- ৩। জীর্ণবস্ত্র সংস্কার করিয়া কিভাবে কাজের উপযোগী করিয়া তোলা যায়। রিপু ও তালি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

- ১। তত্ত্ব কাহাকে বলে? কিরূপ তত্ত্ব দ্বারা বস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া মনে কর?

- ২। তক্তের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাও।
- ৩। রেশম তক্ত কাহাকে বলে? রেশম তক্ত চিনিবার উপায় কি?
- ৪। পশম তক্ত কাহাকে বলে? একটি পশম তক্তের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
- ৫। কৃত্রিম তক্ত কাহাকে বলে? রেশমকে ঠিক সাংস্লেষিক তক্ত বলা চলে না কেন?
- ৬। বাড়িতে একটি সাদা সূতির শাড়ী কিভাবে ধুইবে? সূতির কাপড়ে সাদার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় কর।
- ৭। সাদা রেশমের ব্লাউজ কিভাবে ধুইবে? একটি নাইলনের রঙিন শাড়ি ধুইবার প্রণালী বর্ণনা কর।

### পঞ্চম অধ্যায়

- ১। চিত্রের সাহায্যে মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্রিয়া বর্ণনা কর। (H. S. 1961)
- ২। মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং উহাদের মাধ্যমে দেহে কিরূপে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে তাহা বর্ণনা কর। (H. S. 1966)
- ৩। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কক্ষের মাধ্যমে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (H. S. 1963)
- ৪। জনাকীর্ণ স্থানের বায়ু ও বন্ধ বায়ুর পার্থক্য কি? তোমার জানা কয়েকটি বায়ুবাহিত ব্যাধির নাম কর। (H. S. 1961)
- ৫। অতিরিক্ত ভিড়ের বিপদ এবং যাত্রিপরিবাহী যানবাহনের মধ্যে বাঁচার কুফল কি? (H. S. 1963)
- ৬। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৭। বায়ুর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু বিশোধন পদ্ধতির উল্লেখ কর। (H. S. 1964)
- ৮। বায়ু সঞ্চালন কাহাকে বলে? নৈসর্গিক উপায়ে বায়ু-বিশোধনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। (H. S. 1966)
- ৯। স্বাস্থ্যের জন্ত জলের প্রয়োজনীয়তা কি? বিশুদ্ধ পানীয় জলের গুণসমূহ বর্ণনা কর। দূষিত জল পানের কুফল কি? (H. S. 1965)
- ১০। বিশুদ্ধ জল কাহাকে বলে? পানের জন্ত তুমি কিভাবে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করিবে? বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্ত তুমি গৃহে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? (H. S. 1961)

গৃহ-পରିଚালনা ও গৃহশুশ্রূষা  
**Home Management & Home Nursing**

● দ্বিতীয় পত্র ●



**A. সার্থক গৃহ-পরিচালনা**  
( Effective Management of a Home )

**1. গৃহ পরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং সমীক্ষার ভূমিকা**

( Role of planning, co-operation, guidance and evaluation in the field of home management )

**গৃহ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা :** গৃহের কর্তব্যকর্ম যথাযথরূপে অল্পাধিত হইবার জন্ত গৃহ পরিচালনার দরকার। গৃহে অল্পাধিত যে সকল কাজে পরিচালনার গুণস্ব অল্পাধিত করা যায় তাহা এই—

- (১) সময় ও শক্তির স্পষ্ট ব্যবহারের দ্বারা গৃহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং জীবনের দাবী মিটান ;
- (২) পারিবারিক অর্থের স্পষ্ট প্রয়োগের দ্বারা সকলের মঙ্গলবিধান করা ;
- (৩) উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ;
- (৪) প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম ক্রয় করা ;
- (৫) প্রত্যেকের জন্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা ;
- (৬) গৃহের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যরক্ষা করা ;
- (৭) প্রত্যেকের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষলাভের ব্যবস্থা করা ;
- (৮) সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা ;
- (৯) পরিবারের সকলের মধ্যে সম্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা করা ;
- (১০) সর্বোপরি একটি জীবনদর্শনে পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা ।

**গৃহ পরিচালনা কাকে বলে ?** গৃহ পরিচালনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা বলা হয়। পরিচালকের শক্তি ও দক্ষতার জোরে এই প্রশাসন চলে। পারিবারিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি ঈঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছান এবং গৃহের সকলের দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তিবিধান করাই গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্য।

**গৃহ পরিচালনা ও গৃহ পরিকল্পনা ( Home management and planning ) :** কোন একটি ঈঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্ত মাহুয মনে মনে কিংবা কাগজে-কলমে যে ছক আঁকে তাহাকেই পরিকল্পনা বলে। সার্থক গৃহ পরিচালনার জন্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি পরিবারের উদ্দেশ্য হইল কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছান যেমন সকলের জন্ত দৈহিক স্বাস্থ্যবিধান, প্রাক্কোভিক তৃপ্তিলাভ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এইসব ঈঙ্গিত বস্ত্তলাভের পথ বত সহজ হয় পরিকল্পনা

গ্রহণ করাও ততই সহজসাধ্য হয়, পরন্তু পথটি যদি দুর্লভ হয় তবে পরিকল্পনা করাও ততই কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ পথে যেসব বাধা অতিক্রম করিতে হয় পরিকল্পনাকারীকে সেইসব বাধার কথাও চিন্তা করিতে হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঈপ্সিত বস্তুগুলির মূল্য বিচার করিয়া দেখিতে হয়। কোন বস্তুটি পরিবারের অধিক কামা, কোনটি পাওয়ার মত উপযুক্ত সম্পদ (resources) মজুত আছে ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিতে হয়। পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ। এই সিদ্ধান্তগ্রহণের পরই কাজ শুরু হয়। এ যেন কর্মের দ্বার খুলিয়া দেয়।

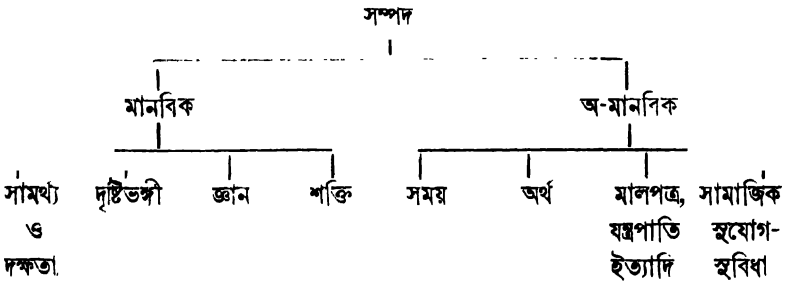
গৃহ পরিকল্পনার সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, যেমন

(১) গৃহ পরিকল্পনাকে কিভাবে কার্যকরী করিব? অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি বা কৌশল (method) কি হইবে?

(২) কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করিব? অর্থাৎ পরিকল্পনার লক্ষ্য (goals) কি?

(৩) পরিকল্পনা কতখানি সফল হইল? অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পরে একটি মূল্যায়ন (evaluation) করিয়া দেখিতে হইবে।

(১) পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি (Method of planning): গৃহ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইল ঘরোয়া সম্পদকে কাজে লাগান। এই সম্পদকে মানবিক (human resources) ও অ-মানবিক (non-human resources) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।



মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের কাজ করার সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও শক্তি। অ-মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে সময়, অর্থ, মালপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ অর্থাৎ পরিবহনের সুবিধা, রাস্তাঘাট, পার্ক, লাইব্রেরী প্রভৃতি। এই সমস্ত সম্পদ কাজে লাগাইয়া গৃহপরিচালনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হয়।

**সহযোগিতা (Cooperation):** গৃহপরিকল্পনাকে কর্মে রূপায়িত করিতে হইলে পরিবারের লোকদের সহযোগিতা দরকার। পরিবার হইল একটি যৌথজীবন। সকল ব্যক্তির সহযোগিতার উপর এই যৌথজীবনের সাক্ষ্য নির্ভর করে। সহযোগিতা



একদিকে চায় নেতৃত্ব, অতীতকে চায় পারিবারিক কাজগুলি সমাধা করার জন্য যৌথ উত্তম। সকলের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে সকলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একজন গৃহ-পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবে কিন্তু অপরের উপর তাহার নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবে না। এইরূপ পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন কাজের পরিকল্পনা স্থির হয় তখন কোন আকস্মিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, কোন অতিথি-অভ্যাগত আসিলে কিংবা হঠাৎ কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িলে প্রয়োজনমত ঐ পরিকল্পনা বদলান যায় এবং স্বেচ্ছায় কেহ না কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে আগাইয়া আসে। সহযোগিতার অর্থ হইল চিন্তায় ও কর্মে নমনীয়তা এবং ব্যক্তির ইচ্ছা নয়, পরিবারের মঙ্গলবিধানই গৃহ পরিচালনার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

সহযোগিতালাভের আরেকটি উপায় হইল সময়সম্বন্ধ (coordination)। যেকোন পারিবারিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে পরস্পরের কাজের মধ্যে সময়সম্বন্ধ করা দরকার। যাহারা কাজে অংশ গ্রহণ করিবে তাহারা গোটা পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে এবং কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন অস্বত্ব করিবে। উপমা হিসাবে স্নান দেহের উল্লেখ করা যায়। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের স্নান জিম্মার উপর যেমন স্বাস্থ্য নির্ভর করে তেমনি গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর সার্থক পরিচালনা নির্ভর করে।

### গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্য (goals) কি ?

প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি ঐঙ্গিত বস্তু থাকে। ঐসব বস্তু প্রাপ্তিকেই জীবনের লক্ষ্য বলা যায়। গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্য হইল ঐসব ঐঙ্গিত বস্তু লাভ করা।

সমস্ত পরিবারের ঐঙ্গিত বস্তুগুলি মোটামুটি এক ধরনের, যেমন—

(১) প্রেম : জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসার সঞ্চার। দাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্য, ভ্রাতাভগিনীর পরস্পরের অমুরাগ সবই ইহার অন্তর্গত।

(২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য : পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ।

(৩) স্বাচ্ছন্দ্য : জীবনকে সুন্দর ও বাঁচার অমুকুল করিয়া তোলা।

(৪) উচ্চাকাঙ্ক্ষা : অর্থাৎ নানাদিকে সাফল্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠা।

(৫) জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

(৬) কর্মে দক্ষতা অর্জন।

(৭) গঠনমূলক ও শিল্পকাজে আগ্রহ সৃষ্টি।

(৮) সৌন্দর্যপ্রীতি এবং জীবনে তাহার প্রয়োগ।

(৯) ধর্মের অমূল্য অর্থ্যাৎ সত্য এবং জ্ঞানের প্রতি অমুরাগ এবং সমগ্র জীবনকে সত্য ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করা।

**নির্দেশনা (Guidance) :** উল্লিখিত ঐঙ্গিত বস্তুগুলি লাভের জন্ত উপযুক্ত নির্দেশনা দরকার। সাধারণতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং ছোটদের জীবন ঐ নির্দেশ অনুসারে গড়িয়া ওঠে। দৈনন্দিন কাজগুলি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় সাধিত হয় তাহার জন্তও গৃহ পরিচালিকাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হয়।

**সমীক্ষা (Evaluation) :** পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আবার গৃহ পরিচালিকাকে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় কাজে কতখানি সাফল্য ঘটিল। এই সমীক্ষা দুই রকমের—প্রথমতঃ প্রতিদিনের কাজের একটি সমীক্ষা। সারাদিনে যতখানি কাজ করিব ভাবিয়াছি তাহা করা গেল কিনা। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি এইভাবে নিজ নিজ কাজের একটি সমীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ আত্মসমীক্ষা (self-evaluation) ছোটদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর। জীবনের ঐঙ্গিত বস্তুগুলি লাভের ব্যাপারেও একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। এইরূপ সমীক্ষা দ্বারা গৃহ পরিচালিকা বুঝিতে পারেন তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী কাজে কতখানি সাফল্যলাভ হইয়াছে, যেমন—

(১) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমীক্ষা হইতে পারে। গৃহের প্রত্যেক লোকের স্বাস্থ্য কেমন বাইতেছে।

(২) প্রত্যেকটি লোকের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি সমীক্ষা করা যায়।

(৩) পারিবারিক সম্পর্কের একটি সমীক্ষা চলিতে পারে। সকলের সঙ্গে সকলের সম্ভাব আছে কি ?

(৪) প্রতি গৃহে অর্থসংক্রান্ত একটি সমীক্ষা হওয়া দরকার। গৃহে উপযুক্ত অর্থান্বয় হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োজন মিটিতেছে কিনা; প্রত্যেককে শিক্ষা এবং আনন্দ-প্রমোদেরই বা কতখানি সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

(৫) উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্ত পারিবারিক সম্পদকে কতখানি কাজে লাগান হইতেছে উহাও সমীক্ষার একটি বিষয়বস্তু হইবে।

উপসংহারে বলা যায় গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য (বা লক্ষ্য) এবং উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ অঙ্গাদীভাবে জড়িত।

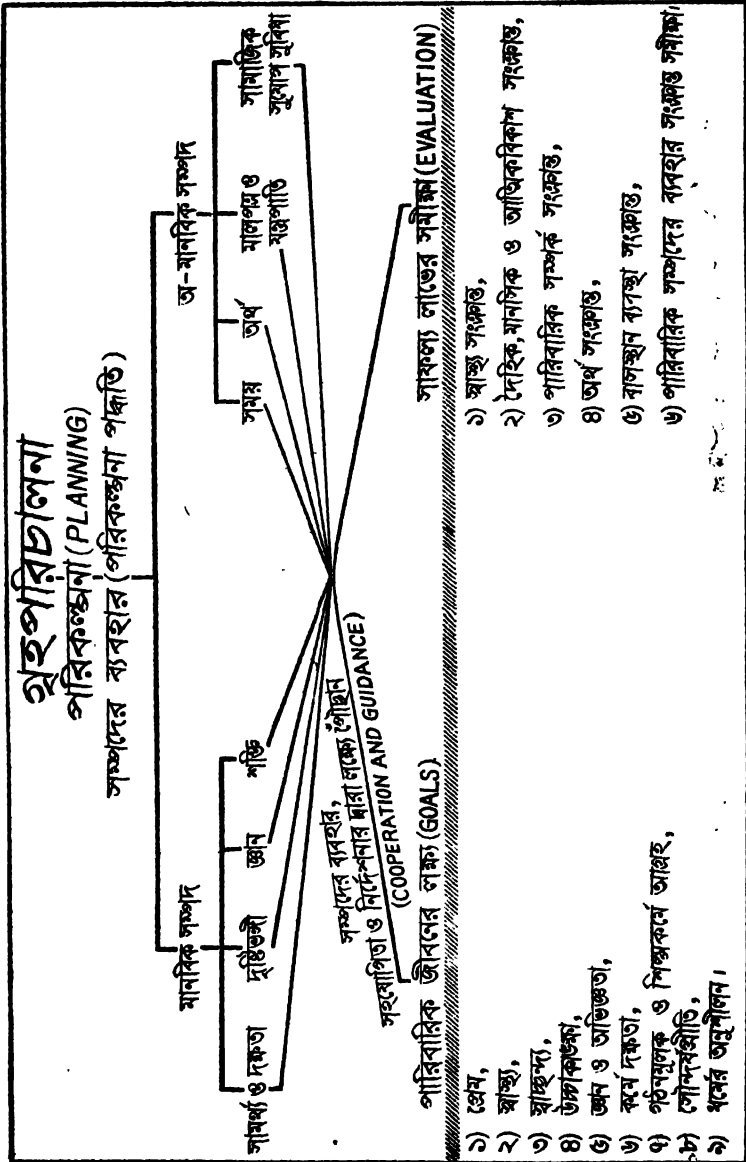
## ২. গৃহ পরিচালনায় মানুষের ভূমিকা

( Human factors in home management )

গৃহ পরিচালনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ হইল মানুষ। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া একেটি পরিবার গঠিত হয়। তবে কোন কোন পরিবারে দুই একজন

## সাধক গৃহ-পরিচালনা

কিংবা ততোধিক অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়স্বজনও থাকে। অর্থ উপার্জনের প্রধান দায়িত্ব থাকে গৃহকর্তার এবং গৃহ পরিচালনার ভার নেন স্বয়ং গৃহিণী। সম্ভাবনায় বড়-হইলে আবার



গৃহকর্মে বাপ-মাকে সাহায্য করে। তবে প্রত্যেক গৃহে গৃহরচনার মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন গৃহিণী।

বটেল ও গ্রস\* গৃহিণীর ছয়টি ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) **গৃহপরিচালিকা (Manager)** : গৃহ পরিচালিকারূপে তাহার কাজ হইল

(ক) পরিবারের একটি সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলা।

(খ) সকলের মধ্যে সম্ভাব রক্ষা করা।

(গ) অর্থ, সময় ও শক্তির ব্যবহারের পরিকল্পনা করা।

(ঘ) পরিবারের সকলের জ্ঞান পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের পরিকল্পনা করা।

(ঙ) প্রত্যেকের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এক কথায় গৃহ প্রশাসনের দায়িত্ব থাকে গৃহপরিচালিকার উপর।

(২) **গৃহিণী (Wife)** : গৃহিণীর দায়িত্ব হইল গৃহের প্রশাসন ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপদান করা।

(৩) **পরিবারের একজন সভ্য (Family member)** : অর্থাৎ আর পাঁচ-জনের মতই তিনিও একজন।

(৪) **জননী (Mother)** : সন্তানদের প্রতি তাহার কতগুলি বিশেষ কর্তব্য থাকে।

(৫) **জাম্না (Wife)** : স্বামীর প্রতি তাহার বিশেষ কর্তব্য থাকে।

(৬) **মানুষ হিসাবে (Individual)** : অর্থাৎ পরিবারের বাইরেও তাহার একটি নিজস্ব সভ্য এবং বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে এবং প্রত্যেক গৃহিণীই পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পরে নিজের ব্যক্তিগত শখ, পড়াশুনা এবং চিত্তবিনোদনের জগৎ কিছুটা সময় নিজের হাতে রাখিবেন।

শুধু গৃহিণী নয় গৃহের প্রতিটি মানুষ তাহার **নৈপুণ্য**, বিশেষ **দৃষ্টিভঙ্গী**, বিভিন্ন বিষয়ের **জ্ঞান** এবং **শক্তি** লইয়া গৃহ পরিচালনায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে গৃহিণীর দায়িত্ব হইল এই মনুষ্যসম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলা। নীচে এই মনুষ্যসম্পদ ও তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(ক) **দক্ষতা (Ability and skill)** : একটি গৃহে নানা রকমের কর্ম অচ্যুত হইয়া থাকে যেমন খাদ্য প্রস্তুতি, শিশুপালন, গৃহের লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা, পোশাক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এইসব নানাবিধ কাজে দক্ষতা অর্জনের উপরেই গৃহ-রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে। সম-আর্থিক শ্রেণীর পরিবারগুলির জীবনযাত্রায় যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ তাহাদের কর্মে দক্ষতার তারতম্য।

(খ) **দৃষ্টিভঙ্গী (Attitudes)** : মানুষমাত্রই যখন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তাহার মনে একটা অহুঙ্কল কিংবা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এইভাবে

নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে ; তারপর উহা তাহার জীবন তথা সমগ্র পারিবারিক সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত করে ।

থমসনের মতে ব্যক্তির বংশধারা, অভিজ্ঞতা এবং সাময়িক উদ্দেশ্য মিলিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করে ।

থার্স্টোন ও চেভ (Thurstone and Chave) যে কোন ব্যাপারে ব্যক্তির ঝোঁক ও অনুভূতি, সংস্কার ও বাস্তবিক, আগেকার গড়া ধারণা, চিন্তা, ভয়, শাসানি এবং দৃঢ়বিশ্বাসের সমষ্টিকে দৃষ্টিভঙ্গী আখ্যা দিয়াছেন ।

...“the sum total of a man's inclinations and feelings, prejudices and bias, preconceived notions, ideas, fears, threats and convictions about any topic ”

মানুষমাত্রই জীবন সঙ্ক্ষে নিজ নিজ ধারণা পোষণ করে । তাহাদের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ জীবনে অত্যন্ত আসক্ত, আবার কেহ বা উদাসীন । কাহারো জীবনে স্থির লক্ষ্য থাকে এবং তাহার নিকট জীবনযাপনের উদ্দেশ্যই হইল ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, আবার কেহবা উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কেহ আবার এই দুইটি চরম অবস্থার একটি মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করে । মোটের উপর প্রতিটি মানুষেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সঙ্ক্ষে একটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গীই তাহার জীবনকে পরিচালিত করে ।

নববিবাহিত দম্পতি যখন প্রথম সংসাবে পদার্পণ করে তখন দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়া তাহারা জীবনসাগরে মিলিত হয় । তারপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবনযাত্রার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে । উহার উপর নির্ভর করে তাহাদের দাম্পত্য সুখ ও সম্ভানদের ভবিষ্যৎ ।

গৃহপরিবেশ বিশেষতঃ বাপ-মায়ের চিন্তাধারা সম্ভানগণের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে । বাপ-মার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের ভালমন্দ, হায়-অহায় বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের বোধ, সম্ভানদের প্রতি মনোভাব, প্রতিবেশীদের সহিত আচরণ ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করে, তাহাদের সামাজিক জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করে । অবশ্য গৃহপরিবেশ ব্যতীত চারিপাশের সামাজিক জীবন, সংবাদপত্রের প্রচার, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, বিশেষতঃ চলচ্চিত্র কিশোর-কিশোরীদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । কোন দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে কাজে আগাইয়া দেয়, বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হইতে সাহায্য করে, আবার কোন দৃষ্টিভঙ্গী তাহাকে পিছাইয়া আনে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত করে । ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী গৃহরচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ অর্থ সামর্থ্যের চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গীই মানুষের জীবনযাত্রার মান স্থির করে ।

**জ্ঞান (Knowledge) :** মানুষ তাহার জ্ঞানের জগতই সমস্ত প্রাণি-জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিবারের লোকের জ্ঞান যত বেশী সেই পরিবার তত সুন্দর হইতে পারে।

বস্তুতঃ গৃহ পরিচালনার কাজে বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার। পরিবারের নিকটে গৃহ পরিচালিকা একাধারে চিকিৎসক, শিক্ষাকারিণী, সুপকার, মনস্তাত্ত্বিক, পোশাক নির্মাতা, শিক্ষয়িত্রী, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজসেবিকা ; সর্বোপরি তিনি স্নেহশীলা জননী, জায়া এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বন্ধু ও সহচরী।

গৃহিণীর দায়িত্ব প্রচুর। খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। পুষ্টিকর অথচ রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য এবং অমৃত্য ব্যাপারে শিশুদের সঙ্গভ্যাস গঠন করা—এ সবই নির্ভর করে গৃহিণীর জ্ঞানের উপর। তাছাড়া পোশাক নির্বাচন, পোশাক প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটি তাহার দখলে থাকা চাই। কিন্তু তাহার সবচেয়ে বেশী জ্ঞান থাকা দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে। অবহেলিত এবং বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালিত শিশু কখনই স্ব-নাগরিক হইয়া উঠিতে পারে না। শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন এবং বর্ধস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মতাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্বন্ধে গৃহিণীর জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে কিশোরদের স্বস্থ মানসিক বিকাশ।

গৃহ পরিচালনার জন্ত যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলি এই : (১) খাদ্যবস্তু ও পুষ্টি, (২) শিশুপালন, (৩) স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান, (৪) গৃহসজ্জা, (৫) পোশাক প্রস্তুতি, (৬) গৃহপরিকরনা (৭) গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও (৮) সমাজসেবা। তাছাড়া মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কিছু সাধারণ জ্ঞানও থাকা চাই। এই সকল বিষয়ের উপযুক্ত জ্ঞান গৃহিণীকে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে, অপচয় নিবারণে এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সাহায্য করিয়া থাকে। তবে এইসব ব্যবহারিক জ্ঞানই গৃহরচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য সম্বন্ধেও পরিবারের ব্যক্তিদের সচেতন থাকিতে হয়। বর্তমানের এই বস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমন্বয়-সাধন করিয়া জীবনকে পূর্ণতা দান করিতে পারে ব্যক্তির জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি।

**শক্তি (Energy) :** দৈনন্দিন গৃহকাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানাক্রম প্রয়োগের দরকার হয় এবং তাহার জন্ত তাপ ও শক্তি ব্যয় হয়।

এইসব প্রয়োগেরই একটি তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :

\* Frederick J. Kiesler পাঁচ রকম প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন—Mental effort, visual effort, manual effort, toral effort এবং pedal effort.

## সার্থক গৃহ-পরিচালনা

(১) মনের প্রয়াস	চিন্তা, যুক্তি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশ দান, দুর্ভাবনা, কথা বলা	(৩) হাতের প্রয়াস	নাগাল পাওয়া, তুলিয়া ধরা, উঠান, বহন করা, হাত প্রসারিত করা, ধাক্কা মারা, ঠেলা।
------------------	---	-------------------	--

(২) চোখের প্রয়াস	চোখ নাড়ান, স্থিরভাবে তাকাইয়া থাকা, দেখা, খোঁজা, পর্যবেক্ষণ করা, দূরের জিনিস নজর করা, আলোর সঙ্গে দৃষ্টিকে থাপ থাওয়ানো।	(৪) দেহের প্রয়াস	ছুইয়া পড়া, ঝোঁকা, ওঠা, কাত হওয়া, পাশ ফেরা, বসা, হাঁটি গাড়া।
-------------------	--	-------------------	---

(৫) পায়ের প্রয়াস	হাঁটা, নড়া, দাঁড়াইয়া থাকা।
--------------------	-------------------------------------

কোন কাজে মানুষ কতটা শক্তি ব্যয় করিবে উহা নির্ভর করে তাহার বংশগতি, দেহের অভ্যাস এবং মনের প্রস্তুতির উপরে। উপযুক্ত অভ্যাস ও অল্পশীলন দ্বারা মানুষ একদিকে যেমন শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াইতে পারে তেমনি স্বেচ্ছাসিদ্ধ পরিকল্পনার সাহায্যে তাপ-সংরক্ষণেও সমর্থ হইতে পারে।

পরিবার পরিচালনায় ব্যক্তি তাহার সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি খাটাইয়া জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ করিয়া তুলিতে পাবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### B. আদর্শ গৃহপরিচালিকা ( An ideal home-maker )

#### 1. গৃহপরিচালিকার গুণ ও ব্যবহার

( Her personality and behaviour pattern )

বুদ্ধি, উৎসাহ, মাহুষের চরিত্র অমুখাবনের ক্ষমতা, কল্পনা, বিচারশক্তি, অধ্যবসায়, স্থাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি—এইগুলি হইল গৃহপরিচালিকার সর্বপ্রধান গুণ। আমাদের দেশে গৃহিণীরাই সাধারণতঃ গৃহপরিচালনা করেন। সুতরাং উপরোক্ত গুণগুলি গৃহিণীর গুণ বলিয়া ধরা যায়।

(১) **বুদ্ধি** : কোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাহা বিশ্লেষণ করা, অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা এসবই বুদ্ধির কাজের অন্তর্গত। মূল সমস্যাকে অমুখাবন করা, সমস্ত দিক হইতে একটি পরিস্থিতিকে বিচার করা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সময়মত কাজে লাগান—এসবই বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। মোটের উপর বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বুদ্ধি আখ্যা দেওয়া যায়। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলির মোকাবিলায় জ্ঞান উপযুক্ত বুদ্ধির দরকার।

(২) **উৎসাহ** : প্রত্যেক গৃহপরিচালকের এই গুণটি থাকে। সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মনে বেশী উৎসাহ দেখা যায়। তবে উৎসাহী মেজাজের লোক হইল আলাদা জাতের। যখন যে কাজ হাতে আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উহা সম্পন্ন করার চেষ্টাকে বলে উৎসাহ। একের উৎসাহ সহজেই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। জননীর উৎসাহ সন্তানদের অনায়াসে প্রভাবিত করে। মাঝে মাঝে অতি উৎসাহ আবার নিরুৎসাহ হওয়ার চেয়ে আগাগোড়া একটি স্বাভাবিক উৎসাহের ভাব থাকা গৃহপরিচালিকার বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) **মানবচরিত্র অমুখাবনের ক্ষমতা** : প্রত্যেক পরিবারেই বিভিন্ন ধরনের লোক থাকে। সকলের দক্ষতা এবং কাজ করার শক্তি সমান নয়। প্রত্যেকের স্বভাব, রুচি এবং পছন্দ-অপছন্দও আলাদা থাকে। গৃহপরিচালিকা যদি প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ্য অমুখাবে কাজ বণ্টন করিয়া দেন, প্রত্যেকের স্বভাব তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হন তবে সংসারের অনেক সংঘাত এড়ান যায় এবং অবিচার করা হইয়াছে ভাবিয়া কোন ব্যক্তি হতাশায় ভোগে না।

(৪) **কল্পনা** : নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করিতে হইলে কিংবা কোন অজানা পথে পা বাড়াইতে হইলে গৃহপরিচালিকার কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন



হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা তখন সামান্যই কাজে লাগে। যাহাদের প্রবল করুণা-শক্তি আছে তাহারা বহুপূর্ব হইতে অনেক সমস্তা আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন এবং উহা মোকাবিলা করার জগ্গ প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি যাহার করুনায় যত স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে জীবনের সাক্ষালাভও তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য হয়।

(৫) **অধ্যবসায় :** ইহাও গৃহ-পরিচালিকার একটি বিশেষ গুণ। কোন কাজ শেষ না হওয়া পর্বন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের জোরে মানুষ যেকোন দুর্ভাগ্য কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রুটিনবান্ধা কাজের অতিরিক্ত কাজ হাতে লইতে স্ব-গৃহিণী ভয় পায় না।

(৬) **বিচারবুদ্ধি :** গৃহপরিচালনায় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। নিজ অভিজ্ঞতা অমূল্যবান করিয়া দেখিতে, কোন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলা, পারিবারিক সম্পদ সুরূপভাবে বিনিয়োগের জগ্গ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের সাক্ষা সমীক্ষা করিয়া দেখার সময় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধির দরকার।

(৭) **খাপ খাওয়ানো :** গৃহপরিচালিকাকে প্রতিদিন নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, নানারকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হয়, এইসব বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার মত মনের নমনীয়তা গুণটি তাহার থাকা প্রয়োজন। জীবন একটি ময়ূর ছাঁচে ঢালা পথ নয়, এখানে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। নানারকম সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে আরেকটি সমস্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না পারিলে, সকল লোকের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া চলিতে না পারিলে গৃহবিবাদ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

(৮) **আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি :** গৃহ একটি যৌথজীবন। সকলের চেষ্টায় এই জীবন চলে এবং প্রত্যেকে উহাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু গৃহের হাল ধরিয়া থাকেন গৃহিণী। সুতরাং তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি নিজেই যদি এই ক্ষমতা হারান কিংবা আপন ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে অগত্যা পরিচালনা করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

### গৃহপরিচালিকার ব্যবহার

( Her behaviour pattern )

গৃহপরিচালিকার ব্যবহারে সর্বদা নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইবে। আপনার সম্মান হইতে শুরু করিয়া আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী অথবা অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তি সকলের সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিবেন, নতুবা হুবিচার ও সমব্যবহার না পাওয়ায় অনেকের মনে ক্ষোভ থাকিলে, কেহ কেহ হতাশায় ভুগিবে।

স্ব-গৃহিণী অবশ্যই ধৈর্য দেখাইবেন এবং তাঁহার কাজের মধ্যে সেবার ইচ্ছা দেখা যাইবে। শিশুদের সহস্র রকমের উপদ্রব, রোগী ও বৃদ্ধদের সকল রকম আবদার তিনি হাসিমুখে সহ্য করিবেন।

গৃহিণীর ব্যবহার হইবে হাসিখুশি, মেজাজ থাকিবে সদা-প্রফুল্ল। তাঁহার প্রফুল্লতা সংসারের অনেক অভাব-অনটন, অনেক গ্লানি ঢাকিয়া দিতে পারে।

স্ব-গৃহিণীর ব্যবহার সর্বদা সংযত হইবে। সম্ভানদেরও তিনি বাড়াবাড়ি আদর করিবেন না কিংবা নিজের ভাবাবেগের অতিরিক্ত প্রকাশ দেখাইবেন না।

যে গৃহের গৃহিণী ব্যবহারে নিরপেক্ষ, ধাঁহার কাজে সেবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, যিনি সদা প্রফুল্ল এবং সম্পদে-বিপদে স্থির ও সংযত থাকেন তিনি সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

### পার্শ্বিক, মানব ও অর্থ প্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পরিচালনা ও উহাদের ব্যবহার

(Management and use of different resources including material, human and financial resources)

#### পার্শ্বিক সম্পদ (Management and use of material resources):

গৃহপরিচালনায় নানারূপ পার্শ্বিক সম্পদের ব্যবহার হয়। তাহাদের মধ্যে সময় ও অর্থই হইল সবচেয়ে মূল্যবান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে তথা পরিবারে পরিবারে অর্থসম্পদের ব্যাপারে একটা বৈষম্য দেখা যায় কিন্তু সময়ের ব্যাপারে এই বৈষম্য নাই। ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের লোকেরদের দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে। উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার সময়ের সদ্যব্যবহার করিতে পারে।

**সময় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :** সময়ের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইলে প্রথম হইতেই মানুষ নিজ নিজ করণীয় কাজগুলি সঙ্ক্ষে সচেতন থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে, অবসর সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করার সুযোগ পায় এবং কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সেই সঙ্ক্ষে ভাবিবার সময় পায়। ফলে একটি সমাধান খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ হয়। বাহার জীবনে এইরূপ একটা স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ চলিতে থাকে তাহার কাজের মধ্যে একটা বেগ আসে এবং সে নিজের কাজে সহজেই দক্ষতা অর্জন করিতে পারে।

**সময় এবং কাজের অভ্যাস :** প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন এবং অভ্যাসগুলি স্বতন্ত্র, জীবনের নানা দিকে আগ্রহও প্রত্যেক পরিবারের একরূপ নয়। সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের সময় পরিকল্পনা একরূপ হইতে পারে না। নববিবাহিত দম্পতির সময়

পরিকল্পনা একরূপ পরজ্ঞ বাহাদুরের জীবনে একটি সম্ভাব্য আগমন হইয়াছে তাহাদের সময় পরিকল্পনা হইবে অন্তরঙ্গ। কোন পরিবারে ছুটির দিনগুলিতেই কাজের চাপ বেশী থাকে আবার কোন পরিবার সারা সপ্তাহ ধরিয়া বেশী খাটিয়া ছুটির দিনগুলি চিত্তবিনোদনের জন্য রাখিতে চান। কাজের অভ্যাস এবং পরিমাণের উপর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তাও নির্ভর করে। কোন পরিবারের লোকেরা কাজের শেষে কিছুটা বিশ্রাম চান আবার কেহ কেহ কাযান্তরকেই বিশ্রামরূপে মনে করেন।

প্রত্যেক পরিবার তথা ব্যক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন এবং আগ্রহ তাহার সময় পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

**কাজের চাপ :** প্রতি গৃহেই একটা সময় কাজের চাপ পড়ে। প্রতিদিন সাধারণতঃ সকালবেলা যখন প্রধান আহাৰ্য প্রস্তুত হয়, বাড়ির লোকেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যায় তখনই কাজের চাপ থাকে বেশী। দিনের মতই সপ্তাহে, মাসে, কোন কোন ঋতুতে এবং বৎসবের কোন একটা সময়ে কাজের চাপ পড়ে। এইজন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক কাজের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইলে সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা যায়, কোন সময়ে অতিরিক্ত খাটুনি পড়িলেও পরে আবার কিছুটা হাল্কা কাজ এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে কাজে অবসাদ আসে না এবং সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহার হয়।

**কাজের পরম্পরা :** কাজের পরম্পরা অর্থাৎ কোন কাজ আগে এবং কোন কাজ পরে করা হইবে সময় তালিকায় তাহা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সব কাজের এক্সপ সময় নির্দেশ করা থাকিলে কোন কাজ শেষ করিতে অতিরিক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না কিংবা কাজে কোন তাড়াহুড়া লাগিবে না।

**সময় ও শক্তি বাঁচাইবার পরিকল্পনা :** গৃহীণীকে যেসব কাজগুলি নিজহাতে করিতে হয় যেমন বামা, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচার জায়গাগুলি খুব কাছাকাছি হইলে তাহার সময় ও শক্তি বাঁচে। আবার কোন কোন কাজ যখন একসঙ্গে করা যায় যেমন ইকমিক কুকার চাপাইয়া কাপড়গুলি কাচিয়া ফেলা যায় কিংবা ঘর পরিকার করা যায় তবে ঐরূপ কাজগুলি একই সময়ের মধ্যে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সময় বাঁচে।

**বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় :** প্রতিদিন কতটা কাজ করিতে হইবে এবং কোন কাজে কতটা সময় ব্যয় হইতে পারে তাহা জানা থাকিলে সময়ের পরিকল্পনা করা সহজ হয়। প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হইবে। উহাতে কাজ ভাল ভাবে করা যায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য সময়ের অভাব হয় না।

**জরুরী অবস্থার জন্য সময় :** দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক কাজের পরিকল্পনা সর্বদা কাটায় কাটায় অনুসরণ করা যায় না। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, কাজে

হঠাৎ কোন বিষয় ঘটিলে, বাড়িতে কোন অতিথির আগমন হইলে কিংবা কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে নির্ধারিত কাজ বাদ দিয়া সময়ের দাবী মিটাইতে হয় এবং তার জন্ত প্রতিদিনের কিছুটা সময় ফাঁকা রাখিতে হয়।

**শ্রমবিভাগ :** গৃহের প্রত্যেকটি লোকের শক্তি, সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুযায়ী কাজ বণ্টন করিয়া দিবে। উহাতে সকলেরই কাজ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ জাগিবে, সময়ের কাজ সময়ে অমুষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেকে বিশ্রামের সুযোগ পাইবে।

### সময় পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশ

- (১) সময় তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির সর্বাধিক প্রাধান্য দিবে।
- (২) গৃহের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজের পরস্পর নির্ধারণ করিবে।
- (৩) সময় বাঁচানো পরিকল্পনা করার চেষ্টা করিবে।
- (৪) প্রতিটি কাজ সম্ভাব্যজনক ভাবে করার জন্ত উপযুক্ত সময় দিবে।
- (৫) শ্রমবিভাগের নীতি অনুসরণ করিবে এবং প্রত্যেকটি লোকের সময়কে কর্ম, বিশ্রাম এবং চিন্তাবিনোদন এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া দিবে।
- (৬) পরিবারের সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং প্রত্যেকে যেন আবার একক-ভাবে চিন্তাবিনোদনের সুযোগ পায়।
- (৭) সময় পরিকল্পনার নমনীয়তা থাকা দরকার অর্থাৎ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে উহার মোকাবিলা করার জন্ত প্রতিদিন সকলের হাতে কিছুটা ফাঁকা সময় রাখিতে হইবে।

### কাজের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরবিভাগ :

প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সময় ও কাজের পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে গড়িয়া তুলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি প্রতি গৃহেই পরিকল্পনার নিম্নলিখিত চারটি স্তর অমুহুরিত হইতে পারে :

**প্রথম ধাপে** দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কাজগুলির একটা তালিকা করিতে হইবে।

**দ্বিতীয় ধাপে** দৈনন্দিন কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সকলের মধ্যে কর্মবিভাগ করিয়া দিতে হইবে। কাজগুলিকে প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া একেকটি ভাগের জন্ত কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে। যেমন আহাৰ্শ দ্রব্য প্রস্তুত করা সংক্রান্ত কাজগুলি এবং দৈনন্দিন গৃহপরিষ্কারের কাজগুলিকে একটি প্রধান ভাগে ক্লেয়া যায় এবং সেইভাবে কাজের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। তারপর সকাল-বিকালের ফাঁকা সময়ে অন্যান্য কাজগুলি বিতাস করিতে হইবে।

**তৃতীয় ধাপে** আসিবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজগুলি সমাপ্ত করার পালা। এখানে দিনের ফাঁকা জায়গায় মাসের এবং ঋতুবিশেষের কাজের সময় নির্দিষ্ট হইবে।

**চতুর্থ ধাপে** আসিবে সময় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা-আলোচনার পালা। কোন কাজের দায়িত্ব কে লইবে আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনা অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের পরিকল্পনা করা যায়।

কাজের উপরোক্ত পরিকল্পনা করা সহজ, স্মরণ রাখা সহজ এবং কাজে রূপান্তরিত করাও সহজ।

### সময় পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ

সমীক্ষার জ্ঞান নিজেকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবে ?

(১) বাড়ির কাজে কি আমি খুব বেশী সময় ব্যয় করিতেছি ? আমার ব্যক্তিগত কাজের জ্ঞান কি যথেষ্ট সময় হাতে থাকিতেছে ?

(২) আমার পরিকল্পনা কতখানি সময় বাঁচায় ?

(৩) গৃহের প্রতিটি লোক কি পারিবারিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, না কাহারো ঘাড়ে কাজের বোঝা বেশী চাপিয়াছে ?

(৪) যে কাজে আমি সময় ব্যয় করিতেছি বাড়ির লোকদের নিকট কি তাহা মূল্যবান মনে হইতেছে ?

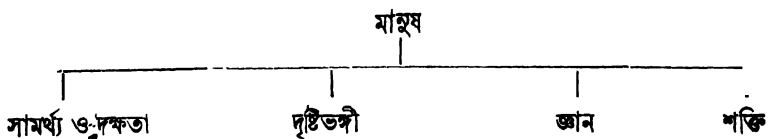
(৫) গৃহের লোকদের কি আমি যথেষ্ট সঙ্গ দিতে পারিতেছি ?

(৬) আমার সময়ের সদ্যবহারের জ্ঞান উন্নততর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হাইতে পারে ?

### (খ) মনুষ্যসম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

( Management and use of human resources )

গৃহপরিচালনার প্রধান উপাদান হইল মানুষ। পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজ নিজ সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে আপন আপন গৃহকে একটি বিশিষ্টতা দান করে।



মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলির কিভাবে ব্যবহার ও পরিচালনা করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

**সামর্থ্য ও দক্ষতা :** দক্ষতা বলিতে বুঝায় কোন কাজ অনায়াসে এবং স্বচাঞ্চল্যে করার ক্ষমতা। আর. এস. উডওয়ার্থ দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারটি তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন :

- (১) অন্বেষণ বা আগ্রহ-সৃষ্টির স্তর ( the exploratory stage ) ;
- (২) আনাড়ি অবস্থা এবং শিক্ষানবিশীর স্তর ( the awkward and effortful stage ) ;
- (৩) দক্ষতা অর্জনের এবং সহজভাবে কর্মস্থানের স্তর ( the skilled and free running stage ) ।

গৃহপরিচালিকা গৃহের প্রত্যেকটি লোকের দক্ষতা অনুসারে কর্মবিভাগ করিয়া দিবেন। দক্ষতা অর্জনের জগ্ন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত :

- (১) প্রথম হইতেই কাজের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (২) কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং মনোযোগই হইল শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন।

(৩) যে কোন কাজকে টুকরা টুকরা ভাবে না দেখিয়া সমগ্ররূপে দেখিবে এবং সেইভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, যেমন কাপড় ধোওয়ার কাজটি ধোওয়া, মাড় দেওয়া, ও ইঞ্জি করা এই তিনটি কাজ হিসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র কাজরূপে দেখিতে হইবে।

(৪) সময়ের উপযুক্ত ব্যবধান রাখিয়া মাঝে মাঝে কাজটি অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে কাজে ক্লান্তি আসে না কিংবা কাজ একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় না অথচ উহা ভুলিয়া যাইবার ভয়ও থাকে না।

(৫) যে কোন কাজ মোটামুটি আয়ত্ত হইলেই শিক্ষা শেষ হইয়াছে ভাবা ভুল। বারবার চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে ( trial and error ) উহাতে দক্ষতা অর্জন করিতে হয়। কাজে একবার পাকা হইয়া গেলে কাজের সময় ও শ্রম বাঁচে এবং দেহচালনা তখন সুযম ও চন্দ্রাবদ্ধ হয়।

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কাষে দক্ষতা অর্জন করে গৃহপরিচালনা তবে সহজ ও সুন্দর হয়।

**দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান :** গৃহপরিচালিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান গৃহরচনাতে একটি সৌন্দর্য ও সাফল্য সঞ্চার করে। কিছুটা বংশধারা এবং কিছুটা পঠনপাঠন ও অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান অর্জিত হয়। গৃহপরিচালিকা গৃহের সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী জানিয়া লইবেন এবং গৃহকর্মে প্রয়োজনমত প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন।

[ দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান সম্বন্ধে ৬—৮ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ]

**শক্তি :** দৈনন্দিন কাজের জন্য আমাদের প্রতিদিন তাপ ও শক্তি ব্যয় হইতেছে। সময় পরিকল্পনার মত শক্তি ব্যয়েরও একটা পরিকল্পনা করিতে হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল গৃহের দৈনন্দিন কাজগুলি করার পরেও বাহিরের কাজে অথবা সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করার মত শক্তি রাখা।

**শক্তি নিয়ন্ত্রণ :** শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শক্তি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা একটি কঠিন কাজ। মানুষ ঘড়ি দেখিয়া সময়ের মাপ করিতে পারে এবং কাজের অগ্রগতি বুঝিতে পারে কিন্তু দৈনিক শক্তি মাপার মত অল্পরূপ কোন যন্ত্র নাই। শুধু অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শক্তিখরচের অনুমান করিতে পারে।

তাপ ও শক্তিখরচের পরিকল্পনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার :

- (১) দৈনিক কোন্ কাজে কতটা শক্তি খরচ হয় ?
- (২) কোন্ কাজগুলি সবচেয়ে অসমাপেক্ষ ?
- (৩) অবসাদের পরিণাম কি ?
- (৪) বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ?
- (৫) সবশেষে শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা গ্রহণ।

(১) দৈনন্দিন সমস্ত কাজ-একরূপ শক্তি ব্যয় হয় না। বশা কাজের তুলনায় হাঁটা-চলার কাজে কিংবা যেসব কাজে অধিক অঙ্গসঞ্চালন হয় তাহাতে বেশী শক্তি ব্যয় হয়। ঘরের কাজগুলিকে আমরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করিতে পারি—(১) হালকা কাজ যেমন হাতে সেলাই করা, পশম বোনা, তরকারি কোটা ইত্যাদি কাজে চেয়ারে বসিয়া থাকার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী শক্তি ব্যয় হয়। (২) সাধারণ পরিশ্রমের কাজ যেমন—ছোটখাটো জিনিস ইস্ত্রি করা, হালকা জামা-কাপড় কাচা, কাপ-ডিশ ধোওয়া, কলে সেলাই করা ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ২৪ ক্যালোরী মেটাবলিজম বাড়ে। (৩) কঠিন পরিশ্রমের কাজ যেমন—ঘর ধোওয়া-মোছা, ভারি কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, বাসন মাজাঘসা করা ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ৫০ ক্যালোরী শক্তি ব্যয় হয়। কাজের গতি বাড়াইলে শক্তি খরচের পরিমাণও বেশী হয়।

অতিরিক্ত শক্তি খরচ হইলে অবসাদ আসে। এই অবসাদ দুই রকমের—শারীরিক ও মানসিক। শরীর অবসন্ন হইলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় আর মন যখন অবসন্ন থাকে তখন কোন কোন বিশেষ কাজে বিরক্তি আসে ফলে কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় না।

ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমতঃ মানুষমাত্রই যেমন কাজ পছন্দ করে তেমনি বিশ্রামও ভালবাসে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে কাজ

করার আগ্রহ বাড়বে এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না পাইলে দেহ শীত লাগিয়া পড়ে। যে সকল গৃহিণীরা বাহিরে কাজ করেন না মধ্যাহ্নে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বিশ্রামের কাল পরন্তু কর্মরতা মহিলারা নিজ নিজ সুবিধামত বিশ্রামের সময় বাছিয়া লইবেন।

### তাপ ও শক্তি সংরক্ষণের উপায় :

(ক) কাজে আগ্রহ থাকিলে স্বাভাবিকই তাপ ও শক্তি কম ব্যয় হয়। অনেক সময় অশুভ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কাজে আগ্রহ জাগান যায়।

(২) দক্ষতা অর্জন করিতে পারিলে কাজ ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে এবং তাপ ও শক্তি কম খরচ হয়।

(৩) কাজের প্রক্রিয়া সরল করিলে এবং

(৪) অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করিতে পারিলে তাপ ও শক্তি কম খরচ হয়।

**কাজের প্রক্রিয়া সরল করা :** নানাভাবে কাজের প্রক্রিয়া সরল করা যায়, যেমন :

(১) রন্ধনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নতুন সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় ;

(২) নানা রকমের পদ রান্না না করিয়া দুই একটি ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিলে এবং

(৩) প্রতিদিনের আহাৰ্য বস্তুর সঙ্গে কিছু কাঁচা শাকসবজি স্ট্রালাভ হিসাবে গ্রহণ করিলে রন্ধনের পদ্ধতি সহজ করা যায়।

### অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করিবার উপায় :

নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করা যায়, যেমন :

(১) মিতশ্রম যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা,

(২) রান্নাঘর এবং কাজের নির্দিষ্ট স্থানগুলির পুনর্বিষ্ঠাসের দ্বারা। সামান্য অর্থব্যয়ে রান্নাঘরের পুনর্বিষ্ঠাস করা যায়। উহ্নের সমান উচ্চতায় একটি আরামদায়ক বসিবার আসন তৈয়ারী করান, রান্নাঘরে কয়েকটি ভাল তাক নির্মাণ করান যাহাতে জিনিসপত্র নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, উহ্নের পাশেই বাসন ধোওয়ার জন্য একটি সিক্ত তৈয়ারী করান খুব ব্যয়সাধ্য কাজ নয়। অথচ এইরূপ ব্যবস্থা করিলে গৃহিণীর হাঁটাইটি প্রম বাঁচে

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া কিছু বাসনপত্র এবং আবহুয্যিক জিনিস ক্রয় করিলে যেমন কাঁসার বাসনের পরিবর্তে একপ্রস্থ স্টেনলেস স্টীলের বাসন কিনিলে, ইঞ্জির প্রয়োজন হয় না এইরূপ বস্তাদি ব্যবহার করিলে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচিয়া যায়।

**সমীক্ষা :** শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিবে :

(১) জীবনের ঈশিত বস্ত্রলাভের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমার শক্তি ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে ?



- (২) যারোয় কোন কাজের জন্য অধিক শক্তি ব্যয় হইতেছে ?
- (৩) আমি কি আমার শক্তির যথাযথ ব্যবহার করিতেছি ?
- (৪) পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া শক্তি ব্যয় হইতেছে কি ?
- (৫) কোন কাজ শেষ করার জন্য কি আমার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী সময় লাগিতেছে এবং ফলে বেশী শক্তি ব্যয়িত হইতেছে ?
- (৬) কোন কাজ আমার সবচেয়ে ভারি মনে হয় ?
- (৭) আমি কি সহজে শ্রান্ত হইয়া পড়ি ? এই শ্রান্তি কি ধরনের ?
- (৮) অবসাদ দূর করার জন্য আমার কি চাই—কর্মাস্তর না পূর্ণ বিশ্রাম ?

### অর্থসম্পদের পরিচালনা ও ব্যয়

(Management and use of financial resources)

পারিবারিক জীবনে অর্থসম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী কারণ উহার উপর নির্ভর করে খাওয়া, বস্ত্র, বাসস্থান, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা। অর্থের সম্ভাবহার না হইলে পারিবারিক জীবনে অনেক মানসিক উদ্বেগ এবং দুর্ভোগ দেখা দেয়। পার্থক্য সম্পদের অন্তর্গত হইল অর্থ।

পরিবারের অর্থসম্পদ বলিতে কেবল নগদ টাকাকড়ি বুঝায় না। নগদ টাকাকড়ি ব্যতীত ভবাসত্তার, সেবা এবং এই সমস্ত মিলিয়া যে সম্ভাষণ লাভ হয় সবকিছু অর্থসম্পদের অন্তর্গত। অর্থসম্পদের পরিচালনা বলিতে বুঝায় অর্থের পরিকল্পনা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে একটি সমীক্ষা গ্রহণ।

অর্থপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল ত্রিবিধ :

- (১) পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশসাধন করা ;
- (২) সমগ্র পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা ; এবং
- (৩) সমাজ-কল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করা।

অর্থের সুপরিকল্পনার জন্য ছয়টি স্তর পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে পারে। এই স্তরগুলি নিম্নরূপ :

(১) **লক্ষ্য স্থির করা** এবং উহার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। যেসব পরিবার লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের হাতে যেমন যেমন অর্থ আসে ঠিক তেমন খরচ হইয়া যায়। পরন্তু লক্ষ্য স্থির থাকিলে ব্যয়ের মাত্রা সংযত হয়, অর্থের সম্ভাব্যব্যয় ঘটে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিয়া মানুষ সর্বাধিক সম্ভাষণ লাভ করে।

(২) **আয়বিশ্লেষণ করা**। আয় প্রধানতঃ দুই প্রকার—

(ক) আর্থিক আয় ( money income ) ও (খ) প্রকৃত আয় ( real

income)। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক সম্পদ, মালপত্র, যন্ত্রপাতি ও মাছবের সেবাজনিত যে সম্ভোষণাভ হয় উহাও পারিবারিক অর্থসম্পদের অন্তর্গত। উহাকে সম্পদের মনস্তাত্ত্বিক দিক বলা যায়।

(ক) **আর্থিক আয়** বলিতে বুঝায় পরিবারের ভাণ্ডারে কতটা নগদ অর্থ আসিল। বেতন, মজুরী, ব্যবসায়ের মুনাফা, বাড়ি ভাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ, লগ্নি টাকার হ্রদ, বার্ষিক্য ভাতা, রয়্যালটি (royalty) ইত্যাদি নানাভাবে অর্থের আগমন হইতে পারে। এই নগদ অর্থের বিনিময়ে আমরা সচরাচর প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং লোকের সেবাকার্য্য ক্রয় করিয়া থাকি এবং সাধামত কিছুটা ভবিষ্যতের জন্ম সঞ্চিত রাখি।

(খ) **প্রকৃত আয়** বলিতে বুঝায় নগদ টাকা, তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আগত বস্তু কিংবা সুযোগ-সুবিধা যেমন—খেতের ফসল, শাক-সবজি ও ফলমূল, মাল, যন্ত্রপাতি, নিজস্ব বাড়িতে বাস করার সুবিধা ইত্যাদি।

গৃহের লোকদের বিশেষতঃ গৃহপরিচালিকার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাও প্রকৃত আয়ের অন্তর্গত। কোথায় কখন কোন্ জিনিসটি সস্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী হ্রদ আসিবে কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিসটি সস্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিস ও আসবাবপত্রের যত্ন লইতে হইবে এই ব্যবহারিক জ্ঞান পারিবারিক অর্থ বাঁচাইতে কিংবা অর্থ আগমনে সাহায্য করে।

(গ) **আর্থিক আয় এবং প্রকৃত আয় ব্যতীত আরেক শ্রেণীর আয়ের উল্লেখ করা যায়—উহা হইল অর্থ এবং সেবাকাজ হইতে লব্ধ সম্ভোষণা।** সম্ভোষণা লাভের ব্যাপারটি যদিও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথাপি গৃহপরিচালনার উৎকর্ষ যাচাই হয় ঐ সম্ভোষণার মাপকাঠির দ্বারা।

(৩) **নগদ টাকা কতটা আসিতেছে :** অর্থ পরিকল্পনার সময় গৃহে নগদ অর্থ আসার পরিমাণ জানিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ বেতনভোগী ব্যক্তিদের সারা বৎসরের আয় নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা কিংবা বৃত্তিতে যাহারা নতুন যোগ দিয়াছেন তাহাদের আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। তাহারা সারা বৎসরের আয়ের একটা গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া লইয়া বারো মাসের মধ্যে উহাকে বিভক্ত করিয়া লইতে পারেন।

(৪) **প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনচক্র কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে।** অর্থ পরিকল্পনার সময় এই স্তরগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন বিবাহের পরেই নবদম্পতি যখন প্রথম সংসার পাতে তখন হইল জীবনের প্রথম স্তর বা প্রথম অধ্যায়। তারপর সন্তানের আগমন, শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার্থে তাহাকে প্রেরণ করা, কন্যার বিবাহ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ ইত্যাদি একটির পর একটি অধ্যায় আসিতে থাকে। জীবনের এই অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অর্থপরিকল্পনা করা সহজ হয়।

(৫) বর্তমানের স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা যেন ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অনুসারী হয়। অর্থ পরিকল্পনার এইটি সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। পার্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে জীবনে যে সম্ভাব্য আসে তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ।

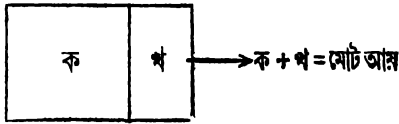
(৬) অর্থব্যয়ের একটি হুঁই পছন্দ উদ্ভাবন করা যাহাতে গ্রহের সকলের সম্ভাব্য বিধান হয়।

অর্থব্যয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে :

(১) বাজেট পদ্ধতি ( Budget method ) : এই পদ্ধতি অনুসারে (১) খাণ্ড, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪) যাতায়াত, (৫) শিক্ষা এবং (৬) আমোদ-প্রমোদ এইরূপ প্রধান প্রধান খাতে অর্থ বণ্টন করিয়া দিতে হয়।

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

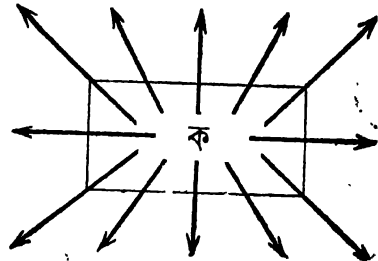
(২) অংশবণ্টন পদ্ধতি ( Allowance method ) : এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রহস্বামী কতগুলি খরচ মিটাইবার জগ্গ আয়ের কিছুটা অংশ পক্ষীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন



ক অংশটি গ্রহস্বামীর হাতে থাকিবে এবং  
খ অংশটি গৃহিণীর হাতে বেগুর হইবে।

যেমন ছেলেমেয়েদের মাসের বেতন, গোয়ালী এবং ধোপার খরচ, ভৃত্যদের মাহিনা ইত্যাদির ভার পক্ষীর উপর থাকিবে এবং আয়ের বাকী মোটা অংশটি তিনি নিজের হাতে রাখিবেন।

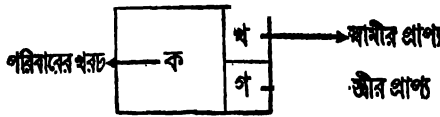
(৩) ডোল পদ্ধতি ( The handout or doling method ) : বাড়ির প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় গ্রহস্বামীর হাতে তুলিয়া দিবে এবং তিনি যাহার যেমন প্রয়োজন মনে করেন খরচের জগ্গ তাহার হাতে সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন। ভারতের অনেক যোথ পরিবারে অর্থব্যয়ের এইরূপ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলিয়া আসিতেছিল।



উপরিউক্ত পদ্ধতি ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আরও দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রথমটি হইল সমান বেতন পদ্ধতি (Equal wages method ) এবং দ্বিতীয়টি হইল আধা-আধি ব্যবস্থা পদ্ধতি ( Fifty-fifty system )।

‘ক’ দ্বারা আয় এবং ছোট-বড় তীরগুলি  
নানারকম ব্যয় বুঝাইতেছে

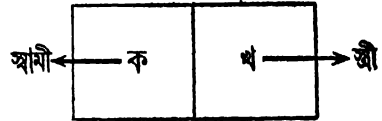
(গ) সমান বেতন পদ্ধতি (Equal wages method) : এই পদ্ধতি



অনুসারে পরিবারের সমস্ত অর্থ ব্যয় হইবার পর যাহা উদ্ধৃত থাকে স্বামী-স্ত্রী সমান ভাগে নিজেদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া লইবে।

(জ) আধা-আধি ব্যবস্থা

( Fifty-fifty system ) : স্বামী-স্ত্রী প্রথমেই পরিবারের অর্থ এবং দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন এবং নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ হইতে সংসারের অর্ধেক খরচ মিটান।



**সমীক্ষা :** অর্থব্যয়ের পর উহার সাক্ষ্য সম্বন্ধে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে

হয়। সমীক্ষার মানদণ্ডরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে :

(১) মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ কত এবং ঐ অর্থ পরিবারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান রক্ষা করিতে পারিতেছে কিনা।

(২) পরিবারের সকলের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা মিটিয়াছে এবং প্রত্যেকের কতখানি সন্তোষবিধান হইয়াছে ?

(৩) ব্যয়ের পরিকল্পনায় সঞ্চয়ের স্বযোগ আছে কিনা ?

(৪) পরিকল্পনা কার্যকরী করা বাস্তবে সহজ কিনা ?

## তৃতীয় অধ্যায়

### C. পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ( Operation of Family Finance )

#### 1. পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পরিচালনা

( Family budgeting and income management )

পূর্বেই বলিয়াছি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক পরিবারই কোন-না-কোন পদ্ধতি\* গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে বাজেট হইল অর্থব্যয়ের অগ্রতম উৎকৃষ্ট পন্থা। একটি তহবিল হইতে যখন পরিবারের সকল দাবী মিটাইতে হয় তখন সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে ব্যয় সঙ্কলান করাটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং খরচ করার পূর্বেই ব্যয় সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা করা দরকার হয়। বাজেট হইল অর্থব্যয়ের এইরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা।

বাজেট করার পূর্বে পরিবারের আয়ের একটি যথাযথ হিসাব করিয়া লইতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে পড়িবে মোট আর্থিক আয় ( total money income ) এবং প্রকৃত আয় ( real income ) অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে আয় তাছাড়া যন্ত্রপাতি ও মানুষের কর্ম ও সেবাজনিত আয়।

#### বাজেটের প্রয়োজনীয়তা :

(১) বাজেট করার ফলে একটি পরিবারে কতটা অর্থ ব্যয় হয় তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

(২) আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা যায়। বস্তুতঃ এই ভারসাম্য বজায় রাখাই বাজেট করার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ভারসাম্য আনার জন্য গৃহের জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের শ্রম পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয়।

(৩) বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হইল আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা। যাহার যাহা কিছু প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিবার সামর্থ্যকে বলে আর্থিক স্বচ্ছলতা। অনেক সময় আর্থিক অভাবই ঠিক অস্বচ্ছলতার প্রধান কারণ নয়। টাকাটা ঠিক প্রয়োজনের সময় মজুত থাকে না বলিয়া অভাব দেখা দেয়। বছরের গোড়াতাই যদি একটি বাজেট করিয়া লওয়া যায় তবে এই অসুবিধা দূর করা যায়।

(৪) অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও বাজেট করার অগ্রতম উদ্দেশ্য।

ঠিক ঠিক বাজেট করিতে পারিলে আয়ের প্রত্যেকটি পয়সার সদ্যবহার হয় এবং গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সন্তোষ ও তৃপ্তি ঘটে।

---

\* (১) বাজেট পদ্ধতি, (২) অংশবন্টন পদ্ধতি, (৩) ডোল পদ্ধতি, (৪) সমান বেতন পদ্ধতি এবং (৫) আধাআধি ব্যবস্থা—অর্থব্যয়ের এই পাঁচটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের : মানসম্মত (standard) এবং আদর্শ (ideal) । কোন দুইটি পরিবারের প্রয়োজন কখনও এক হইতে পারে না । সুতরাং একের বাজেট অণ্ডের পক্ষে অমুকরণ করা সম্ভব নয় । তাই সম আর্থিক-সামাজিক মর্যাদার লোক, যেমন—অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদি, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা যায় । এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট । মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পরিবার আপন আপন প্রকৃত বাজেট ( actual budget ) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে । আদর্শ বাজেটে আবার সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট অর্থ কিভাবে ব্যয় করিলে তাহার সম্ভাবহার হইবে তাহাই দেখান হয় । আদর্শ বাজেট প্রস্তুত করাতে বিশেষ দুরদৃষ্টি দরকার ।

**বাজেটের খাত ( budget headings ) :** প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন্ কোন্ খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হয় । ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অল্পমর্যাদী উহাদের পর পর সাজাইয়া লইয়া প্রত্যেকটি খাতের মধ্যে আবার কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে । আগেই বলিয়াছি প্রত্যেকটি পরিবারের চাহিদা একরূপ নয় । তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে স্বতন্ত্র । তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল । প্রথমেই আমরা খাদ্য, বস্ত্র, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সঞ্চয়, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিভাগগুলি স্থির করিয়া লইলাম । তারপর উহাদের অন্তর্গত উপ-বিভাগগুলি দেখান হইল :

## ১। খাদ্য

মুদি

মাছ, মাংস

টাকা সবজি

ফল

ডিম

দুধ

গৃহের বাহিরে কেনা খাবার ব্যয়

## ২। বস্ত্র

শাড়ি

ধুতি

জামা ইত্যাদি

অথবা

স্বামী

স্ত্রী

সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য ব্যয়

## ৩। বাসস্থান

(ক) ভাড়া বাড়ি

ভাড়া

মেরামত বাবদ ব্যয়

অগ্নি ব্যয়—যেমন ট্যাক্স

## (খ) নিজস্ব বাড়ি

ধার শোধ

সুদ

ট্যাক্স

ইনস্যুরেন্স

মেরামত

৪। বাড়ি পরিচালনার ব্যয়

জল

বিদ্যুৎ

গ্যাস

৬। টেলিকোন

কোনের ভাড়া

অতিরিক্ত কল

ট্রান্স কল ও টোল কল

৮। যাতায়াত

গাড়ি

ট্যাক্সি

ট্রাম, বাস

ট্রেনের ভাড়া

১০। স্বাস্থ্য

চিকিৎসকের ফি

বিশেষজ্ঞের ফি

ওষুধের দাম

১২। সঞ্চয়

লাইফ ইন্স্যুরেন্স

অগ্রাণু উপায়ে সঞ্চয়

৫। জালানি

কয়লা

ঘুঁটে

কেরোসিন

৭। খোপা

সাধারণ কাপড়

অথবা

গরম বস্ত্র

৯। শিক্ষা

স্কুল-কলেজের বেতন

গৃহশিক্ষক

বই খাতা

যাতায়াতবাবদ ব্যয়

• নৃত্যগীতবাবদ ব্যয়

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও

মাসিক পত্র পত্রিকা

১১। আমোদ-প্রমোদ

পরিবারের জন্ম

অগ্রাণু লোকদের জন্ম

শিশুদের খেলনা

১৩। অগ্রাণু খরচ

দান

উপহার

**বাজেট প্রস্তুত করিবার নিয়ম :** বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি নিয়ম অমুসরণ করা যায়। প্রথমটি হইল **আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতি** ( Live within your income method )। এই রীতি অমুসারে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া লইবে :

(১) সর্বপ্রথমে আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়ের একটা হিসাব করিবে।

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি নির্ধারণ করিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবিকার মানই ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধনী পরিবারের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহাই আবার একান্ত দুর্লভ এবং বাজেটে তাহাদের কোন স্থানই থাকে না।

(৩) প্রধান খাতগুলি নির্ণীত হইবার পরে কোন্ খাতে মোটামুটি কত ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিয়া লইবে।

(৪) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপ-বিভাগগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের ব্যয়ও স্থির করিবে। উপ-বিভাগ করিবার সুবিধা এই যে ইহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পরিবারের গৃহকর্তার ধূমপানের অভ্যাস আছে এবং গৃহিণীর আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিবারের খাতের খাতে সিগারেট, পান ও জর্দার একটি উপবিভাগ রাখিলে হিসাব করার সুবিধা হয়।

(৫) সমস্ত হিসাবের পরে যদি দেখা যায় কোন একটি বা একাধিক খাতে প্রয়োজনের অমুরূপ অর্থ নাই তখন অত্র খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রয়োজন মিটান যায় কি না দেখিবে।

উপরোক্ত নিয়ম অমুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সত্ত্ববিবাহিত দম্পতি যাহারা সবেমাত্র নিজেদের সংসার পাতিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম অমুযায়ী বাজেট করা প্রশস্ত।

**জীবনকে যেভাবে গড়িতে চাই পদ্ধতি** ( The 'Make-life-what-I-would-like-it' method ) : এই পদ্ধতিতে বাজেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) প্রথম কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করিবে তাহা স্থির করিবে। তারপর যে জিনিসগুলি কেনা দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কয়টা ব্লাউজ, সন্তান ও অগ্রাগ্রা পরিজনদের প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতা, মোজা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করিবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ বাজেটের প্রত্যেকটি বিভাগের জিনিসগুলি গুরুত্ব অনুসারে সাজাইয়া যাইবে, যেমন খাতের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ফল, মাখন, ডিম এইভাবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উপ-বিভাগগুলি স্থাপন করিতে হয়।

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বস্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নির্দেশ করিবে। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির বোঁক থাকিলে সম্ভাব্য বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধরিতে হয়। কতকগুলি ব্যাপার, যেমন—চিকিৎসার খরচ, কোন আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতি, অভিশি অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তবে এইসব বাবদ কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়।

দ্বিতীয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরিউক্ত নিয়মে বাজেট করা চলে। দরিদ্র পরিবারের আবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতিই অনুসরণ করা উচিত।



## পারিবারিক হিসাব

( Maintaining household accounts )

পারিবারিক হিসাব রাখা গৃহ সুপরিচালনার অন্তর্গত। কত আয় হইল এবং প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য কত খরচ হইল এই হিসাব রাখা না হইলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাজেট করাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের পরিবারগুলিতে সাধারণতঃ মাসের প্রথমেই মুদিখানার জিনিসগুলি কিনিয়া লওয়া হয়। রেশন দ্রা হয় সপ্তাহে সপ্তাহে, আনাড়পত্র, ফলমূল দৈনিক আসে। দৈনিক দুধ আসিলেও মাসের প্রথমে কিংবা মাসের শেষে দুধের দাম মিটাইয়া দিতে হয়। স্নৃগৃহীণীর কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি জিনিসের পুঞ্জাহুপুঞ্জ হিসাব লিখিয়া রাখা এবং যাহার যাহা প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে মিটাইয়া দেওয়া। মাসের সম্ভাব্য খরচের একটি আন্দাজ পাইবার জন্য তিনি—

(১) রেশনবাবদ মাসে কত খরচ হইতেছে তাহা লিখিয়া রাখিবেন। কোন মাসে ৪ বার এবং কোন মাসে ৫ বারও রেশন আনিতে হয়। গৃহীণীর খবচের খাতায় উহার উল্লেখ থাকিবে।

(২) মাসিক মুদির খরচেরও একটি খাতা থাকা দরকার।

(৩) গৃহ পরিচালনা অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি, টেলিকোন, বাড়ির ট্যাক্স, দাসদাসীদের বেতন, এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-প্রকল্পে ব্যয়, ইনসুর্যওরেন্সের প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ও হিসাবের খাতায় লিখিতে হইবে।

(৪) গোয়াল, ধোপা, খবরের কাগজের জন্য আলাদা আলাদা হিসাবের খাতা রাখিতে হইবে।

দৈনিক বাজার খরচের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা চাই।

মাসিক ব্যয় ও দৈনিক ব্যয়ের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর দুইটি হিসাব মিলাইয়া লইলে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে।

## হিসাব রাখার উপকারিতা

দৈনিক হিসাব রাখার কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন—

(১) মাসে মাসে কোন্ জিনিস কতটা প্রয়োজন।

(২) কোন্ জিনিসের কত দাম এবং বাজার দর কতটা চড়ার দিকে।

(৩) দাসদাসীরা অপচয় করিতেছে কিনা এবং অপচয়ের পরিমাণ কত।

(৪) দাসদাসীরা কবে কাজে যোগ দিল, কবে ছাড়িয়া গেল, তাহাদের কোন অগ্রিম দেওয়া হইল কিনা তাহারও হিসাব থাকিবে।

(৫) বাড়ির ট্যাক্স, আয়কর, ইনসুর্যওরেন্সের প্রিমিয়াম ঠিক সময়ে দেওয়া হইল

কিনা, কাহারও নিকট দেনা থাকিলে শোধ দেওয়া হইল কিনা, পাওনা আদায় হইল কিনা, এসবও খেয়াল থাকে।

(৬) চলতি মাসের ব্যয় কত এবং আগামী মাসগুলিতে কোন প্রকারে ব্যয়সঙ্কুচ করা সম্ভব কিনা জানা যায়।

### 3. জীবনযাত্রার মান ও পারিবারিক ঋণ

( Understanding the concept of standard of living and family credit )

**জীবনযাত্রার মান :** মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকগুলি চাহিদা আছে। এই চাহিদাগুলি তিন শ্রেণীর—(১) পান্থ, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি জীবনধারণের অতি আবশ্যক দ্রব্যাদির চাহিদা। (২) কর্মদক্ষতা বাড়াইবার জ্ঞান প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের চাহিদা এবং (৩) বিলাসের বস্তুর চাহিদা। এইসব চাহিদা পূরণের জ্ঞান প্রতিটি সমাজে ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত হইতেছে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে। প্রতিটি পরিবারের ভাগ্যে কতটা ভোগ্য পণ্য জুটিল এবং তাহাদের জীবনধারণের কতটা চাহিদা মিটিল তাহা দ্বারা ঐ পরিবারের জীবনযাত্রার মান (Standard of living) স্থির হয়।

প্রত্যেকটি দেশের জীবনযাত্রার মান ঐ দেশের (১) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং (২) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য একটি পরিবারের জীবনের মান নির্ভর করে ঐ পরিবারের আয়ের উপর। ধনী এবং অগ্রসর দেশগুলির সাধারণ মানুষের আয় বেশী এবং তাহাদের জীবনের মানও দরিদ্র এবং অনগ্রসর দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ। তবে আর্থিক ব্যবস্থার জ্ঞান ধনতাত্ত্বিক দেশগুলিতে মানুষে মানুষে জীবনের মানে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকিয়া যায়। পরন্তু সমাজতাত্ত্বিক দেশগুলিতে বণ্টনের সূত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মানে একটা সমতা আনার চেষ্টা করা হইতেছে। আমদেব দেশের লক্ষ্য যদিও এই সমতা আনা তথাপি এখনো আমবা সেই সমতা আনিতে পারি নাই।

জীবনযাত্রার মানকে আমরা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কবিতে পারি—নিম্নমান, মধ্যমান ও উচ্চমান।

(১) **নিম্নমান :** যেসব পরিবারের জীবনযাত্রার মান অতিশয় নিম্ন তাহাদের পক্ষে পেট ভরাইবার মত মোটা ভাত, লজ্জা নিবারণের মত মোটা কাপড় এবং মাখা শুঁজিবার মত যে কোন একটু ঠাইই যথেষ্ট। ইহার চেয়ে বেশী কিছু তাহারা আশাও করেন না।

(২) **মধ্যবিত্ত :** মধ্যবিত্তদের মান নিম্নবিত্তদের তুলনায় উচ্চ অর্থাৎ তাহাদের ভাগ্যে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ জোটে আরও বেশী। [ তবে মধ্যবিত্তদের আবার নানা রকম

শ্রেণীবিভাগ আছে, যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ইত্যাদি।] জীবনের অতি আবশ্যিক দ্রব্যগুলি তাহারা পায়। তাছাড়া কর্মক্ষমতা বাড়াইবার উপকরণ যেমন পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগও তাহাদের অনেকের থাকে।

(৩) উচ্চবিত্ত : উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেদের আবশ্যিক বস্তুগুলি এবং কর্মক্ষমতা বাড়াইবার সামগ্রীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট পরিমাণে থাকে উপরন্তু সমাজের নানারকম সুযোগ-সুবিধা যেগুলি সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে সেইসব এবং বিলাসের উপকরণগুলিও তাহাদের সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি একটি পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ভর করে উহার প্রকৃত আয়ের উপর, তবে পরিবারের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গীও এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

**পারিবারিক ঋণ ( Family credit ):** কোন পরিবারের জীবনযাত্রার মান দেখিয়াই ঐ পরিবারের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। কারণ কোন পরিবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার নীতি অনুসরণ করিতে পারে আবার কোন কোন পরিবার বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য ঋণের আশ্রয় নিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় বাধা হইয়াও অনেকে ঋণ গ্রহণ করে। মোটের উপর জীবনযাত্রার সঙ্গে ঋণের প্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাখিয়াছে। ঋণ কাহাকে বলে, পরিবারের অর্থনীতির উপর উহা কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক পরিবারের লোকেদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

**ঋণ কাহাকে বলে ?** ভবিষ্যতে পরিশোধ করার পরিবর্তে বর্তমানে যে নগদ অর্থ, দ্রব্যাদি কিংবা অল্প কোন প্রকার সেবালাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহাকে ঋণ বলে। ঋণ হইল বর্তমানে কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে উহা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

হাতে যে নগদ টাকা মজুত আছে ঋণ তাহার তুলনায় আমাদের অধিক ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করে। ঋণ পাওয়া একটি সুবিধা বিশেষ তবে অনেক সময় অতি উচ্চ মূল্যে এই সুবিধা ক্রয় করিতে হয়। ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ঘটিলে আসল অর্থের তুলনায় হ্রাসের পরিমাণ অনেক সময় বেশী হইয়া পড়ে।

### কি কি পরিস্থিতিতে একটি পরিবার ঋণ করে ?

(১) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজন অথবা দায় মিটাইবার জন্য অনেক সময় পরিবারকে ঋণ করিতে হয়।

তাছাড়া কোন বস্তু ক্রয় করার মোট খরচ যদি খুব বেশী হয় এবং পরিবারের পক্ষে ঐ টাকাটা সঞ্চয় করা সম্ভব না হয় তখন অনেক পরিবার কিছু টাকা সঞ্চয় করে এবং বাকী টাকাটা ঋণ করিয়া উহা ক্রয় করে। ইহার সুবিধা এই যে মোট দাম পরিশোধ করিলে

পূর্বেই জিনিসটি হাতে আসিল এবং উহা ভোগ করার সম্ভাব্য হইল। গৃহনির্মাণের জন্য বহু পরিবারই এইভাবে ঋণ করে।

(২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাব, কখনো বা একটি শৌখিন দ্রব্য লোকে কিস্তিতে ক্রয় করে। কিস্তিও একপ্রকার ঋণ।

(৩) অনেক জায়গায় ছোট ছোট অনেক দেনা হইয়া গেলে উহা পরিশোধের জন্য লোকে একটু মোটা রকমের দেনা করে। বহু লোকের নিকট ঋণ রাখার তুলনায় কোন এক ব্যক্তি কিংবা একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ করা অনেকে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করে।

(৪) গৃহে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেও অনেক সময় ঋণ করিতে হয়। সাধারণতঃ স্বচ্ছল পরিবারগুলি পূর্ব হইতে এইসব অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকে বলিয়া আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে উহার মোকাবিলা করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের সেইরকম সঞ্চয়ের সুবিধা নাই তাহারা ঋণ করিতে বাধ্য হয়।

### ঋণ পাইবার ভিত্তি কি ?

যে কোন পরিবারের ঋণ পাইবার ভিত্তি হইল দুইটি : (ক) পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য এবং (খ) গ্রহীতার চরিত্র। উভয়ে মিলিয়া ঋণদাতার মনে যে বিশ্বাস উৎপন্ন করে তাহারই ফলে ব্যক্তি তথা পরিবার ঋণ পায়।

$$\left. \begin{array}{c} \text{সামর্থ্য} \\ + \\ \text{চরিত্র} \end{array} \right\} \text{বিশ্বাস} \rightarrow \text{ঋণ}$$

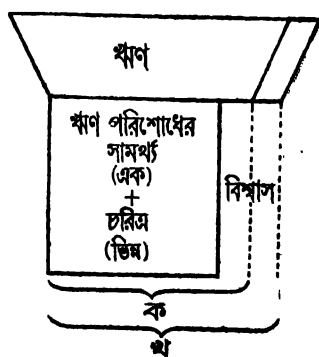
(ক) পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য নির্ভর করে চারটি জিনিসের উপর :

- (১) পরিবারের আয় ;
- (২) বন্ধক রাখার মত সম্পত্তি যেমন বাড়ি বা ইনস্যুরেন্সের পলিসি ইত্যাদি ;
- (৩) অগ্ৰাণ্য মূলধন ;
- (৪) গৃহ পরিচালিকার যোগ্যতা।

(খ) গ্রহীতার চরিত্র : ঋণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ্য থাকিলেই

চলে না সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকদের চারিত্রিক ধ্যাতি থাকা চাই।

দুইটি পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য সম্পূর্ণ একরকম কিন্তু চারিত্রিক ধ্যাতি পৃথক্। ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে।



ক এবং খ কতটা ঋণ পাইতে পারে দেখান ইহা হচ্ছে।

**ঋণের ব্যবহার :** ঋণকে আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। তবে এই আয় কখন ব্যয় করা হইবে ঋণ সে সময় নির্ধারণ করিতে পারে। তাছাড়া ঋণ কতকগুলি স্বযোগ সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্য চিন্তিয়া ঋণ করিলে প্রত্যেকে ঐ স্বযোগের দ্বারা লাভবান হইতে পারে।

(১) গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন ঋণ করে তখন সম্পূর্ণ নগদ টাকাটা হাতে আসার পূর্বেই জিনিসটি ভোগ করা গেল। এই ভোগজনিত সন্তোষই হইল পরিবারের ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

(২) মনে কর পরিবার কিস্তিতে একটি সেলাইএর মেশিন কিনিল। উদ্দেশ্য উহা দ্বারা কিছু অর্থ রোজগার করা। কিস্তির টাকা শোধ হইবার মধ্যে ঐ মেশিনের রোজগার যদি কিস্তিতে দেয় টাকার তুলনায় বেশী হয় তবে উহা হইবে পরিবারের পক্ষে একটি বিশেষ স্বযোগস্বরূপ। নগদ টাকার মাপেই এই সুবিধা মাপা যাইতেছে।

(৩) আবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন একটি মিতশ্রম যন্ত্র ক্রয় করার সময় আমরা অগ্রাধিকার চিন্তা করি। এখানে যন্ত্রটি পরিবারের কতটা সময় ও শ্রম বাঁচাইতে পারিবে উহাই হইবে বিবেচ্য বিষয়। সময় ও শ্রম বাঁচানোটা হইবে পরিবারের পক্ষে লাভজনক। পরিবারের বিশেষ সুবিধাটা এখানে সময় ও শ্রমের ভিত্তিতে দেখিতে হইবে, অর্থের ভিত্তিতে নয়।

(৪) তবে একটি শখের কিংবা বিলাসের জিনিস ক্রয় করার সময় চিন্তা করিতে হয় জিনিসটি বাজারে সোজাসুজি কিনিতে গেলে কত দাম লাগিত। কিস্তিতে কিংবা ধার করিয়া কেনার ফলেই বা কত দাম লাগিতেছে। অর্থাৎ বাজার দরের তুলনায় ক্রেতা কি উহা স্থলভে পাইতেছে? যদি পায় তবে ঋণের সদ্যব্যহার হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

**পরিবারে কি কি ধরনের ঋণ অনুপ্রবেশ করিতে পারে?**

একটি পরিবারে তিন ধরনের ঋণ অনুপ্রবেশের স্বযোগ পায়—(১) বিনিয়োগমূলক ঋণ, (২) ব্যবসা-সংক্রান্ত ঋণ ও (৩) পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জ্ঞাত ঋণ।

(১) **বিনিয়োগমূলক ঋণ (Investment credit) :** পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিনিয়োগমূলক ঋণের ব্যবস্থা আছে। এইসব বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞাত বিনিয়োগ করা যায়। যেমন ধর দশ হাজার টাকা দশ বৎসরের জ্ঞাত বিনিয়োগ করা হইল। যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে পরিবারের নিকট তাহা মজুত নাই তাই একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা ঋণ করিল এবং মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক কিংবা বাৎসরিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করার চুক্তিবদ্ধ হইল। মেয়াদ অন্তে ঋণদাতা ঐ টাকা কিছু লাভসমত ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে।

সরকারের সমস্ত জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি সরকারকর্তৃক জনসাধারণকে এইরূপ ঋণদান। এই ঋণের সুবিধা লইয়া পরিবার নিজ নিজ মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারে।

(২) **ব্যবসা-সংক্রান্ত ঋণ (Commercial credit)** : ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন পরিবার সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সোজাহুজি ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) **পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্ম ঋণ (Consumer's credit)** : দোকান হইতে বাকীতে জিনিস ক্রয় করার ব্যবস্থাকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-সংক্রান্ত ঋণ বলে। বহু পরিবারই মুদির দোকান, গোয়ালী প্রভৃতির নিকট হইতে সারা মাস বাকীতে জিনিস ক্রয় করে। এইরূপ ঋণ করার সময় সকল পরিবারকে অভ্যস্ত সাবধান হইতে হয় কারণ মানুষের ত ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। একবার ঋণ করার অভ্যাস হইয়া গেলে ঋণের বোঝা বাড়িতেই থাকে।

**ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ** : একটি পরিবার ঋণ গ্রহণ করিবে কিনা, করিলে ও কতটা ঋণ গ্রহণ করা উচিত এসব সম্বন্ধে কোন বাধাধরা নিয়ম তৈরী করা সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্তা আলাদা এবং এক পরিবারের সমাধান অন্য পরিবারের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তবে ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারিবে। নির্দেশগুলি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হইল :

(১) একটি পরিবারের কতটা ঋণ থাকা উচিত অর্থাৎ পরিবারের লোকেরা কতটা ঋণের বোঝা বহিতে পারিবে ?

(২) ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? কোন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ করা না শুধু কিছু শখ মিটান ?

(৩) ঋণ গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবন হইতে আবশ্যিক সামগ্রী কতটা বাদ পড়িবে ?

(৪) অনাবশ্যক বস্তুর জন্ম ঋণ করিয়া কি কোন আবশ্যিক জিনিস হইতে পরিবারের লোকেরা বঞ্চিত হইতেছে ?

(৫) দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ করিবার সময় আবার ভাবিতে হয় ঋণ শোধ করিতে গিয়া পরিবারের লোকেরা কতটা ক্লান্ততা সহিতে হইবে এবং ঐ ক্লান্ততা সাধন আদৌ সম্ভব কি না ?

(৬) ঋণের বর্তমান পরিস্থিতি কি ? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঋণের চুক্তির শর্তই বা কি ?

(৭) কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে ঋণ গ্রহণ করা কি আদৌ সমর্থনীয় ?

#### ৪. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ

( Investing family funds )

দুর্নী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকল পরিবারই আজকাল সাধামত অর্থ সঞ্চয় করে এবং উহা বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হইল : (১) ব্যক্তি তথা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা এবং (২) অল্পদিকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগের সুবিধা হইয়াছে। অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তিনটি জিনিস দেখিয়া লইবে :

- (১) ধনের নিরাপত্তা আছে কিনা।
- (২) প্রয়োজনের সময় উহা পাওয়া যাইবে কিনা।
- (৩) উহা কতখানি বাড়ানো সম্ভব।

প্রথমেই আমরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আলাচনা করিব।

(a) **ব্যাঙ্কের সাহায্যে অর্থ সঞ্চয় :** ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেনা এই দুইটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। আরও সরল করিয়া বলা যায় জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত রাখে। এই গচ্ছিত অর্থ থাটাইয়া ব্যাঙ্ক উহা বহুস্ত্রণে বৃদ্ধি করে। তারপর অর্থ গচ্ছিতকারীকে কিছু সুদ দেয় এবং সম্পত্তি বৃদ্ধক রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। সোজা কথায় পরের ধনে পোন্ধরির মত ব্যাঙ্কার অগ্রের টাকায় ব্যাঙ্কি করে। শুধু টাকাই নয়, ব্যাঙ্কে আমরা বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও কাগজপত্রও গচ্ছিত রাখিতে পারি। এইসব জিনিসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া ব্যাঙ্কারকে আমাদের কিছু অর্থ দিতে হয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া আমরা কিছু সুদ পাই এবং অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কে কিছু সুদ দিতে হয়।

**মক্কেল (Customer) :** যাহারা ব্যাঙ্ক হিসাব খোলেন তাহাদের ব্যাঙ্কব মক্কেল বলা হয়। হিসাব খোলার সময় ব্যাঙ্ক আমানতকারীর নিকট হইতে আবেদন-পত্র গ্রহণ করে এবং ঐ পত্রে তাহার পেশিমেদন সহি জমা রাখে। এই সহিটি আমানতকারী এবং মক্কেল উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পরে টাকা জমা দিবার জন্য ব্যাঙ্ক মক্কেলকে একখানি জমার বই দেয়। ঐ বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিপত্র থাকে। উহাতে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যাঙ্কের অর্থ জমা দিয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারীকে মক্কেল করিয়া লয়। টাকা জমা দিবার সময়ে মক্কেলের নাম, ব্যাঙ্কের একাউন্ট নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ জমার খাতায় লিখিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক বাম দিকের প্রতিপত্র সহি করিয়া রসিদ স্বরূপ মক্কেলকে ফেরত দেয় এবং ডান দিকের প্রতিপত্রখানি হিসাব মিলাইবার জন্য রাখিয়া দেয়।

**পাশ বই ( Pass Book ) :** ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একখানা পাশ বই দেয়। কত টাকা জমা পড়িল কত টাকা তোলা হইল এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে যে হিসাব রাখা হয় পাশ বই শুধু তাহার নকল মাত্র।

**চেক বই ( Cheque Book ) :** ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পর আমানতকারী তাহার দরকার মত টাকা তুলিতে পারেন। নিজের নামে টাকা তুলিতে হইলে কিংবা

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইলে আমানতকারী কর্তৃক সর্বদাই ব্যাঙ্কে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদান করে। কাহাকেও অর্থ দিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নির্দেশ-পত্রকে বলে চেক। আমানতকারীর স্পেশিমেন সহি মিলাইয়া দেখিয়া ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ প্রদান করে। চেক বই, জমার বই ও পাশ বই ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে আমানতকারীকে দিয়া থাকে।

চেক তিন প্রকার : বেয়ারার, অর্ডার ও ক্রসড চেক।

(১) **বেয়ারার চেক (Bearer Cheque)** : চেকের উপর লেখা থাকে Pay...or Bearer ; যাহার অল্পকূলে চেক কাটা হয় Pay শব্দটির পরে তাহার নাম বসাইয়া আনুষঙ্গিক তথ্য এবং চেকদাতার নাম সহি করিয়া দিতে হয়। চেকের বেয়ারার যে কোন ব্যক্তি [ অর্থাৎ যাহার হাতে ঐ চেক রহিয়াছে ] ঐ চেক সোজাসুজি ভাঙাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ঐ চেক-গ্রহীতার পরিচয় নেয় না।

(২) **অর্ডার চেক (Order Cheque)** : যাহার অল্পকূলে চেক কাটা হইবে Pay শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়া or Bearer শব্দটি কাটিয়া দিলে উহা অর্ডার চেক বলিয়া গণ্য হইবে। বেয়ারার চেকের মত অর্ডার চেক সোজাসুজি ব্যাঙ্কের কাউন্টারে ভাঙান যায় তবে চেকের গ্রহীতা ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি হওয়া চাই।

(৩) **ক্রসড চেক (Crossed Cheque)** : সাধারণ চেকের বাম দিকে কোণাকূর্ণি ভাবে সমান্তরাল দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং ( & Co ) অথবা একাউন্ট পেয়ী ( A/c Payee only ) লিখিয়া দিলে উহা ক্রসড চেকে পরিণত হয়।

ক্রসড চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা দিতে হয় এবং সোজাসুজি ভাঙান যায় না ; 'এণ্ড কোং' লেখা ক্রসড চেক endorse করা যায় কিন্তু একাউন্ট পেয়ী চেক endorse করা যায় না। ক্রসড চেক সর্বদা নিরাপদ।

**এন্ডোর্সমেন্ট অব চেকস ( Endorsement of cheques )** : endorsum এই ল্যাটিন শব্দ হইতে encorsement কথাটির উৎপত্তি। Endorsement-এর অর্থ হইতেছে কোন বস্তুর পশ্চাদ্দেশে কাহারও নাম লিখিয়া দেওয়া। চেকের স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়াই হইল endorsement-এর আসল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি চেক হস্তান্তর করে তাহাকে বলে endorser এবং যে ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল তাহাকে বলে endorsee ; endorsement চারি প্রকারের :

- (১) Blank endorsement ;
- (২) Special endorsement ;
- (৩) Restrictive endorsement ;
- (৪) Qualified endorsement ;



### চেক কাটিবার সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা গ্রহণ করিবে :

- (১) গচ্ছিত অর্থের তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকার চেক কাটিবে না ;
- (২) চেকের সহি এবং স্পেশিয়েন সহি যেন এক হয় ;
- (৩) চেকে কোন কাটাছুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে স্পেশিয়েন সহি করিয়া দিবে।
- (৪) সর্বদা কালি দিয়া চেক সই করিবে।
- (৫) টাকা তোলা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে উহা যেন লঙ্ঘিত না হয়।

### চেক গ্রহণে সতর্কতা :

চেক কাটিতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, চেক গ্রহণেও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন।

- (১) চেক কালি দিয়া লেখা কিনা ;
- (২) চেকে কাটাছুটি থাকিলে উহার পাশে চেক দাতার সুহি আছে কিনা ;
- (৩) চেকে প্রদত্ত তারিখ ঠিক আছে কিনা। পরবর্তী তারিখ-যুক্ত চেক ( Post-dated cheque ) গ্রহণ না করাই বিধেয়।
- (৪) অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে যথাসাধ্য চেক গ্রহণ করা এড়াইয়া চলিবে কারণ অনেক সময় প্রতারিত হইবার ভয় থাকে।

**বদ্ধ আমানত ( Fixed Deposits ) :** বদ্ধ আমানত অল্পসারে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয় এবং তাহার জন্য নির্ধারিত সুদ পাওয়া যায়। কম দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে কম সুদ এবং বেশী দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। বর্তমান নিয়ম অনুসারে ৬১ মাস পর্যন্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিলে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা গ্রহণ করা যায় কিন্তু মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে টাকা তোলা যায় না। তবে প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ধার হিসাবে নেওয়া যায়।

ব্যাঙ্কে আজকাল আরও এক ধরনের বদ্ধ আমানতের প্রচলন হইয়াছে। ৬১ মাস, ৭ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর কিংবা ২৫ বৎসরের মেয়াদে অর্থ আমানত করা যায়। আমানতের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের পরিমাণ তত বেশী হইবে। এইরূপ বদ্ধ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে সুদ কিংবা আসল কিছুই তোলা যাইবে না। মেয়াদ অন্তে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত আসল টাকা ফেরত দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বিবাহ, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী জমার সুযোগ গ্রহণ করে।

(ii) **পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সঞ্চয় (Post Office accounts) :** দূরদূরান্তের আমাদের যে সকল আত্মীয় বন্ধু পরিচিতরা রহিয়াছে তাহাদের খবর আদানপ্রদানের কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর। উহার ঐ কাজের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তবে পোস্ট অফিসের অগ্রতম কাজ হইল জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখা।

**পোস্ট অফিস সেভিংস একাউন্ট (Post Office Savings accounts) :** একটি নূনতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু করিয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ পোস্ট অফিসে জমা রাখা যায়। পোস্ট অফিস অর্থ গচ্ছিতকারীর একটি স্পেশিয়ল সহি রাখিয়া দেয়। টাকা উঠাইতে গেলে পোস্ট অফিস ঐ সহি মিলাইয়া গচ্ছিতকারীকে টাকা দেয়। কত টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হইল এই সকল হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট অফিস গচ্ছিতকারীকে বিনামূল্যে একটি জমাব বহি দেয়।

পোস্ট অফিসের স্বদের হার বাৎসরিক ৫% টাকা।

(iii) **সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট (Savings Bank account) :** প্রত্যেক ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব এবং সেভিংস হিসাব—এই দুইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। সেভিংস হিসাবের মূল উদ্দেশ্য গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের টাকা জমা রাখিবার সুবিধা দেওয়া।

চলতি হিসাবের তুলনায় সেভিংস হিসাবে স্বদের হার বেশী। তবে যখন তখন ঐ গচ্ছিত অর্থ তোলা যায় না এবং প্রতি ব্যাঙ্কেই মাসে টাকা তোলার দিনের সংখ্যা (যেমন কোথাও মাসে ৫ বার) বাধিয়া দেওয়া হয়। সেভিংস হিসাবে চেক বইএর সুবিধা পাওয়া যায়। তবে উহার জন্য একটি নূনতম অঙ্কের অর্থ সর্বদা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। চেক বই না দিলে withdrawal slip-এর সাহায্যে টাকা তুলিতে হয়।

(iv) **জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (National Saving Certificates) :** ১২ বৎসর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, ১০ বৎসর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট ও ১০ বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পর্যায়) বিক্রয় ১৪ই মার্চ, ১৯৭০ হইতে বন্ধ হইয়াছে। এগুলির বদলে নিম্নলিখিত ৪ শ্রেণীর নূতন সার্টিফিকেট প্রচলিত হইতেছে :

(১) **৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (২য় পর্যায়)**

মূল্যমান ১০, ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, আয়করমুক্ত এবং স্বদের হার শতকরা ৬ টাকা।

(২) **৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৩য় পর্যায়)**

মূল্যমান ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, আয়করমুক্ত স্বদ ৬% হারে প্রতি বছর দেওয়া হয় এবং মেয়াদ অন্তে আসিল টাকা কেন্দ্রত দেওয়া হইবে।

(৩) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৪র্থ পর্যায় )

মূল্যমান ১০০, ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, সুদের হার ১০.২৫% টাকা। আয়কর দিতে হয় এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাইবে।

(৪) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৫ম পর্যায় )

প্রতি মাসে সাত বৎসরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট কেনা যায়। বৎসরে শতকরা ১৪ টাকা সরল সুদ বা শতকরা ১০.২৫ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জমে। মেয়াদ অস্তে সব টাকা এক সঙ্গে নেওয়া যায় কিংবা মাসিক কিস্তিতেও গ্রহণ করা যায়। আয়কর দিতে হয়।

## V. জীবনবীমা

অর্থ সঞ্চয় করিবার অত্যন্ত উপায় হইল জীবনবীমা। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার সুবিধা আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন লাগিয়াই থাকে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সঞ্চিত থাকিলে অভাবের সময় ঐ টাকা উঠাইয়া লইবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাকা উঠাইবার কোন অসুবিধা নাই। এই জুগুই বহু বায়সকোচ করিয়া যে সামান্য অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহা সহজেই পরচ করিয়া ফেলে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া জমান আর হইয়া ওঠে না। ফলে গৃহস্থামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় বহু পরিবার দারুণ অভাবে পড়িয়া দুঃখদর্দনা ভোগ করে। জীবনবীমার টাকা মেয়াদ ( maturity ) ফুরাইবার পূর্বে তোলা যায় না বলিয়া টাকাটা জমানো থাকে। বীমা কোম্পানী আবার বীমাকারীর জীবনের ঝুঁকি লইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের তুলনায় জীবনবীমা তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সঞ্চয়ের উৎকৃষ্টতম পন্থা। জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এবং পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজকে আকস্মিক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে জীবনবীমার বহুল প্রচলন দরকার।

ভবিষ্যতের জ্ঞাত আর্থিক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত জীবন বীমা কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation সংক্ষেপে L. I. C. ) বীমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তি-পত্রটিকে বলা হয় পলিসি ( Policy ) এবং যাহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের বলা হয় বীমাকারী ( Policy holder )। এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারী কত টাকার বীমা করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক কিস্তিতে নির্ধারিত বৎসরের মধ্যে বীমার টাকা শোধ করা হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করাকে বলে প্রিমিয়াম দেওয়া।

বীমা সাধারণত দুই প্রকারের—(১) মেয়াদী বীমা ( Endowment Policy ) এবং (২) আজীবন বীমা ( Whole Life Policy ) ।

(১) **মেয়াদী বীমা** : এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ অর্থ নিজেই পাইবেন ।

(২) **আজীবন বীমা** : এইরূপ বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পরেও টাকাটা পাইবেন না । বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি ( Nominee ) ঐ অর্থের মালিক হইবে ( claim by death ) ।

**বীমা করিবার সুবিধা** : বীমা করিবার অনেকগুলি সুবিধা আছে । এই সুবিধাগুলিই বীমার বৈশিষ্ট্য । বীমার সুবিধা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাক ।

(১) **বাধ্যতামূলক সঞ্চয়** : ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের মত বীমার অর্থ যখন তখন তোলা যায় না । বীমাকারী কর্পোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাকা ধার পাইতে পারেন । তবে এই ধার হ্রদসমেত শোধ দিতে হয় । তাই সহজে কেহ বীমার বিনিময়ে ধার নিতে চান না ।

(২) **বীমাকারী ইচ্ছা করিলে হ্রদ ব্যতীত কর্পোরেশনের নিকট হইতে লাভও ( Profit ) পাইতে পারেন ।** লাভহীন ( without profit ) বীমা এবং লাভসমেত ( with profit ) বীমার পার্থক্য এই যে, লাভহীন বীমাতে মোট প্রিমিয়ামের অঙ্ক বীমার টাকার তুলনায় কম ; সুতরাং ইহার প্রিমিয়াম রেটও কম ।

(৩) **কিস্তিতে টাকা দিবার সুবিধা** : যে টাকা সঞ্চয় করিতে চাই উহা এককালীন জমা রাখিতে হয় না । কিস্তিতে বীমার টাকা দিতে হয় । নির্ধারিত সময়ে প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে বীমা বাতিল ( lapse ) হইয়া যায় ।

(৪) **বীমার আর একটি সুবিধা** এই যে নির্ধারিত সময় পার হইবার পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে যে পরিমাণ অর্থ বীমা করা হইয়াছে কর্পোরেশন সেই অর্থ বীমাকারীর মনোনীত ব্যক্তিকে ফেরত দেয় । জীবনবীমা করিবার এই বিশেষ সুবিধাটি কম নয় । কোন ব্যক্তি অকালে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মারা গেলে তাহার অভাবে সমস্ত পরিবারকে কষ্ট পাইতে হয় না ।

(৫) **প্রয়োজন হইলে বীমার পলিসি বন্ধক রাখা যায় ।** সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার সমবায় সমিতির সদস্যরা এইরূপভাবে বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন ।

### প্রিমিয়াম রেট কিস্তাবে স্থির হয় ?

বীমা করিবার সময় বীমা কর্পোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিৎসক দিয়া বীমাকারীর স্বাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষা করাইয়া লয় ; পরীক্ষিত ব্যক্তির জীবন যদি নির্দিষ্ট মানসম্মত

( standard life ) বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাকে বীমা করিতে দেওয়া হয়। অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার পূর্ণবয়স্কদের তুলনায় কম। অল্প বয়সেই তাই বীমা করা বাঞ্ছনীয়। যাহারা আবার বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত, যেমন—রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি বা বিমান পরিচালকদের প্রিমিয়ামের হার অনেক বেশী। কারণ, বীমা কর্পোরেশন এই সকল ব্যক্তির জীবনের ঝুঁকি লইতেছে।

নানা রকমের বীমা করা যায়, যথা :

(১) **বিবাহ বীমা** : কন্যার বিবাহের জন্য মাতাপিতা অথবা অভিভাবকদের সঞ্চয় করা প্রয়োজন। শিশুকন্যার জন্মের পরেই পিতা কন্যার নামে এমন একটি বীমা করিতে পারেন যাহাতে কন্যা বিবাহযোগ্য হইয়া উঠিলে বীমাও পরিণত হইয়া উঠিবে। এইরূপ বীমায় কন্যা যদিও বীমার মালিক তথাপি কার্যত পিতার জীবনকেই বীমা করা হইতেছে। কর্পোরেশন পিতার জীবনের উপর বীমা করিবে এবং প্রিমিয়ামের হার নির্ধারিত করিবে তবে অর্থের মালিকানা কন্যার। বীমা পরিণত হইবার পূর্বেই যদি পিতার মৃত্যু ঘটে তবে কর্পোরেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অর্থই দিতে বাধ্য। তবে বীমা পরিণত হইবার সময় পর্যন্ত উত্তরাধিকারীকে জ্ঞাপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণ বীমার মত বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না।

মনোনীত ব্যক্তির যদি পূর্বাঙ্কে মৃত্যু ঘটে তবে বীমাকারী অপর কোন সন্তানকে মনোনীত করিতে পারেন অথবা যে অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থ কেবলতও লইতে পারেন।

(২) **শিক্ষা-বীমা** : বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক কিংবা পিতা সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীমা করিতে পারেন। এখানেও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে মনোনীত ব্যক্তি অর্থের মালিকানা পায়।

(৩) **বৃত্তিবীমা** : চাকরি হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার আশা নাই তাহাদের পক্ষে এই বীমা খুবই সুবিধাজনক। বীমাকারী এমন একটি বীমা করিবেন যে তাহার চাকরি হইতে অবসর পাইবার সময় বীমাও পরিণত হইয়া আসিবে। তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া প্রতি মাসে বৃত্তির মত পাইতে থাকিবেন। এইরূপ একটি বীমা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার বীমা আছে। উহার নাম দুর্ঘটনা বীমা ও ক্ষতিপূরক বীমা। দুর্ঘটনা বীমা করিলে বীমাকারী কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বীমার দ্বিগুণ অর্থ পাইবেন। দুর্ঘটনা বীমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। ক্ষতিপূরক বীমা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বীমাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর বীমা না করিয়া কোন মূল্যবান সম্পত্তি, যথা—গাড়ি, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ের উপর বীমা করিয়া থাকেন। এই

সকল মূল্যবান সম্পত্তি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে বীমাকারী বীমার অর্থ পাইয়া থাকেন।

**কোম্পানীর শেয়ার (Shares in companies) :** সাধারণ লোকেরা সঞ্চিত মূলধন ব্যবসারে খাটাইয়া বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক সময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার কেনা নিরাপদ। ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসটা কি? এক একটি বড় ব্যবসায় চালাইতে হইলে প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় সর্বদা এই বিরাট মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তখন যোথ উত্তমে ব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন হয়। কয়েকজন উद्यোগী ব্যক্তি মিলিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের কোম্পানীর অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। অধিকাংশ কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ স্থির করা থাকে। এই মূলধনকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে (unit) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মূলধনের এই এককের নাম শেয়ার। শেয়ার বিক্রির সময় সর্বদা শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ধর একটি কোম্পানীতে ৫০ হাজার টাকা মূলধন প্রয়োজন। এক একটি শেয়ারের ১০০ টাকা করিয়া দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানীর শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়াইল ৫০০ খানা এবং কোম্পানী ৫০০ খানা শেয়ার বিক্রয় করিবে।

শেয়ারের দর যেমন বাঁধা থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও তেমনি বাঁধা থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার কিনিতে পারিবে না। শেয়ারের টাকা এককালীন দিতে হইবে না কিন্তু দিতে হইবে তাহাও কোম্পানী স্থির করিয়া দেয়। তাহাদের এইরূপ শেয়ার আছে তাহাদের বলে শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডাররা নিজ নিজ শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানীর লভ্যাংশের ভাগ পাইয়া থাকেন।

শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করিলে শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারেন অথবা বিক্রি করিতে পারেন। যে দামে কেনা হইয়াছে তাহার তুলনায় অধিক দামে বিক্রি করিতে পারিলে শেয়ারহোল্ডার লাভসমেত (at premium) শেয়ার বিক্রয় করিলেন। লোকসান দিয়া শেয়ার বিক্রয় করিলে অর্থাৎ যে দামে কোনো হইয়াছে তাহার তুলনায় কম দামে বিক্রয় করার নাম এ্যাট ডিসকাউন্ট (at discount)। যে দামে কেনা হইয়াছে ঠিক সেই দামেই শেয়ার বিক্রয় করাকে বলে এ্যাট পার (at par)।

## D. পরিবাবের জন্য তত্ত্ব নির্বাচন

### (Selecting fibres for the family)

#### 1. তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান (Knowledge of fabrics)

##### তত্ত্ব চিনিবার উপায় ( Identification of Fibres )

তোমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে পড়িয়াছ। এখন একখানি কাপড় কি প্রকার তত্ত্ব দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা একখানি কাপড়ের তত্ত্ব প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই উহা স্থির করা হয়। এইজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে তাহা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) ভৌত পরীক্ষা ( Physical test ), (২) রাসায়নিক পরীক্ষা ( Chemical test ), (৩) আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ( Microscope test ).

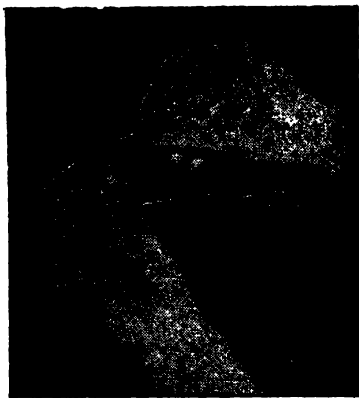
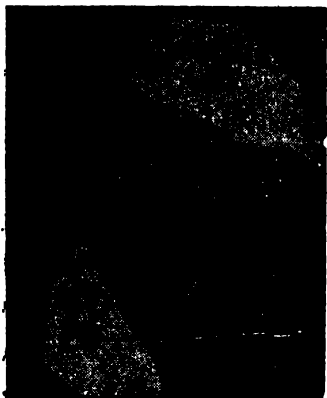
**ভৌত পরীক্ষা :** এই সকল পরীক্ষার উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার তত্ত্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস দেয় মাত্র, সঠিকরূপে প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে পারে না। ভৌত পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ :

**ভাঁজ করা ( Creasing ) :** একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে চাপিয়া ধর। লিনেনের কাপড় হইলে ভাঁজের দাগ বেশ স্পষ্ট হইবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না। সূতির কাপড়েও ভাঁজের দাগ পড়িবে, কিন্তু এই দাগ লিনেনের মত স্পষ্ট হইবে না এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। কাপড়ে খুব বেশী কলপ দেওয়া হইলে এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন ও সূতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাঁজ পড়িবে না।

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে সূতি, লিনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে।

**পাক খোলা ( Untwisting the Fibre ) :** কাপড় হইতে কয়েকটি সূতা বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল। কাপড়খানি পশমদ্বারা নির্মিত হইলে ঐ সূতায় পশমের গায় স্বাভাবিক ভাঁজ দেখা যাইবে। সূতির বা অন্য কোন কাপড়ে ঐ ভাঁজ দেখা যাইবে না। এইবার পাকখোলা সূতার একটি দুইহাতে টানিয়া দুইভাগে বিভক্ত কর। যেখানে তত্ত্বটি ছিঁড়িয়া যাইবে সেই অগ্রভাগ যদি দেখিতে সূচের গায়

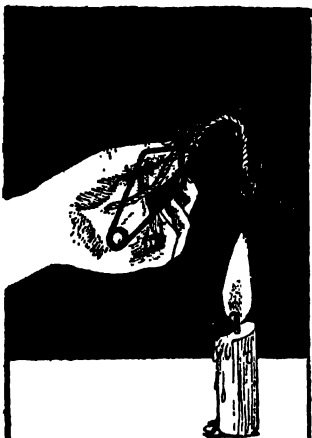
সরু হয়, তবে উহা লিনেনের দ্বারা প্রস্তুত বুলিতে হইবে। অগ্রভাগ যদি অগ্রভাগ দেখিতে একটি তুলির অগ্রভাগের দ্বারা মোটা হয় তবে উহা সূতি তন্ত বুলিয়া জানিবে।



হুতার পাক খোলা

হুই ভাগে ভাগ করা

**সিস্কু করা ( Moisture test ) :** এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন অগ্রভাগ তন্ত হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটি অঙুলি জলে ভিজাইয়া কাপড়খানির উপরে রাখ। যদি সহজেই জল অঙুলি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তবে কাপড়খানি লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বুলিতে হইবে।



রেশম ও পশমের তন্ত পোড়ান হইতেছে

হুতির তন্ত পোড়ান হইতেছে

**পোড়ান ( Burning test ) :** যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে কয়েকটি তন্ত বাহির করিয়া একটি জলন্ত শিখায় ধর। পশম ও রেশম ধীরে ধীরে পুড়িবে



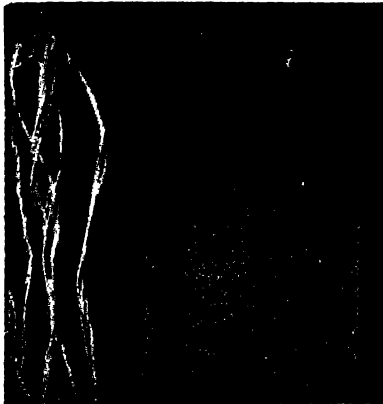
এবং পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে। পুড়িবার পর একটি কালো গুটি বা দানা প্রস্তুত হইবে। সূতির তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পোড়ে। ইহা শিখাসহ জ্বলিতে থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর একটু হালকা ছাই পড়িয়া থাকে। অ্যাসিটেট তত্ত্ব ছাড়া অগ্ন্যাত্ন রেয়ন তত্ত্ব সূতির দ্বারা পোড়ে। অ্যাসিটেট তত্ত্ব আগুনে ধরিলে গলিয়া একটি শক্ত গুটি বা দানা প্রস্তুত হয়। পশম বা রেশমের গুটির মত এই গুটি সহজে ভাঙা যায় না। এই পরীক্ষার ফলাফল পর-পৃষ্ঠার চার্টখানিতে দেওয়া হইল।

**গরম ইস্পি দ্বারা পরীক্ষা (Hot iron test):** এই পরীক্ষার সাহায্যে অ্যাসিটেট, নাইলন ও ডেক্রন তত্ত্ব অগ্ন্যাত্ন তত্ত্ব হইতে পৃথক্ করা যায়।

একটি ইস্পি খুব গরম করিয়া কাপড়গুলির উপর চাপিয়া ধর। যদি কাপড়খানি অ্যাসিটেট, নাইলন বা ডেক্রন তত্ত্বের হয় তবে উহা একেবারে গলিয়া যাইবে। সূতি, লিনেন, রেশম, পশম, বা রেয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে, গলিয়া যাইবে না।

**রাসায়নিক পরীক্ষা:** ভোঁত পরীক্ষা অপেক্ষা এই সকল পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ:

**‘লাই’ পরীক্ষা (Lye test):** এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে রেশম ও পশম, সূতি ও লিনেন হইতে পৃথক্ করা যায়।



সূতি ও পশমের তত্ত্ব দ্বারা প্রস্তুত কাগজে ‘লাই’  
পরীক্ষার করেকটি সূতির তত্ত্ব পড়িয়া থাকে

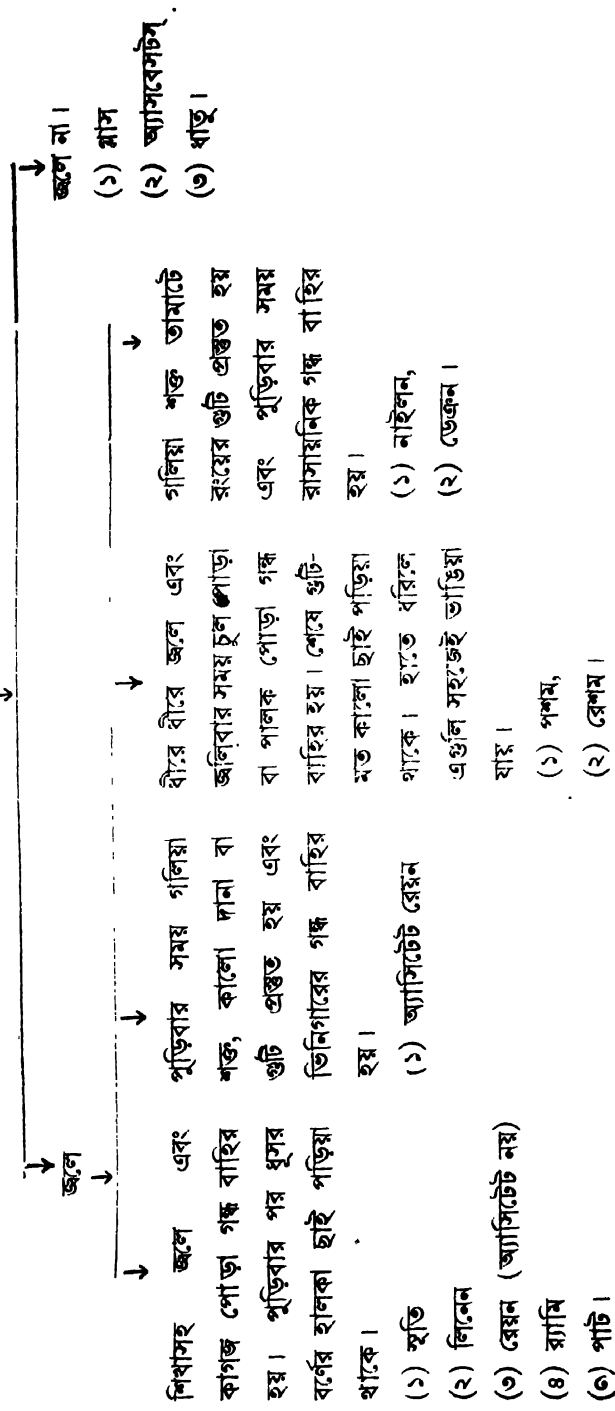
একশত সি. সি. জলীয় দ্রবণে ৫ গ্রাম কঠিক সোডা বা কঠিক পটাশ দ্রবীভূত করিয়া ‘লাই’ প্রস্তুত করা হয়।

একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের পাত্রে কাপড়ের টুকরাখানি ‘লাই’ দ্রবণের সহিত ১০ মিনিট ফুটাইও। ফুটাইবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

রেশম ও পশম সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। সূতি ও লিনেন অবিকৃত থাকিবে। কাপড়খানি যদি সূতি এবং পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে উহা হইতে পশমের অংশটুকু দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রের তলায়

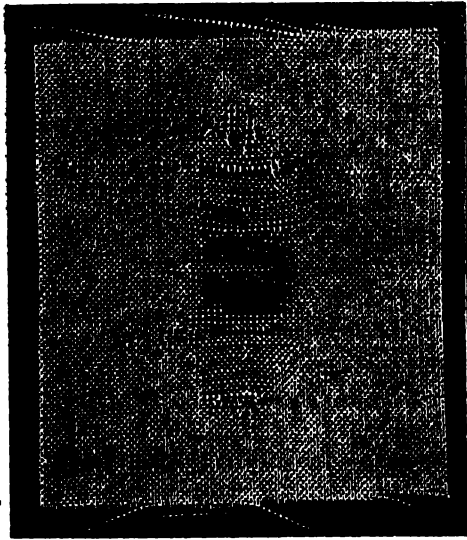
কতকগুলি সূতির তত্ত্ব পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে একখানি মিশ্র তত্ত্বের কাপড় এই পরীক্ষা দ্বারা চিনিতে পারা যায়। নাইলন তত্ত্ব ‘লাই’ দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।

କଣ୍ଠେକଟି ତନ୍ତୁ ପ୍ରଞ୍ଜଳିତ ଶିଖାୟ ଧର



**অ্যাসিড পরীক্ষা ( Acid test ) :** একশত সি. সি. জলীয় দ্রবণে দুই সি. সি. স্বন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া একটি অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুত কর।

প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খানি রাখ। একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ অ্যাসিড দ্রবণ ঐ কাপড়ের উপরে ফেল। এইবার একখানি কাগজ উপরে রাখিয়া একটি গরম ইন্দ্রি ঐ কাগজের উপর চাপিয়া ধর। কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার কর।



ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে

কাপড়খানি সূতি বা রেয়নে প্রস্তুত হইলে ঐ অ্যাসিডযুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে। ইহাতে পশম বস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না। কাপড়খানি সূতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইলে সূতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পশম অবিকৃত থাকিবে। কলে কাপড়খানি ফুটো ফুটো মনে হইবে।

**জাবক পরীক্ষা (Solvent test) :** সাধারণতঃ বিভিন্ন তত্ত্ব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। যেমন, অ্যাসিটেট তত্ত্ব ম্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হয়। অগ্নাত তত্ত্ব উক্ত দ্রবণে দ্রবীভূত হইবে না। সুতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তত্ত্ব অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইলে উহা অ্যাসিটেট তত্ত্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেক

সময় একই দ্রাবক একাধিক তন্তু দ্রবীভূত করে ; যেমন—সুইডজার দ্রাবক রেয়ন, সূতি ও রেশম দ্রবীভূত করে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সহিত অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়। নিম্নে কয়েকটি তন্তু এবং উহাদের যে যে দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

অ্যাসিটেট তন্তু—অ্যাসিটোন,  
গ্যাসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড।

ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম  
রেয়ন—সুইডজার দ্রবণ

কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

সূতি— ঐ

রেশম— ঐ

পশম—২০% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট

নাইলন—১০% কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল

ভিনিয়ন—ক্লোরোফর্ম

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়তায় তন্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

**আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা :** এই পরীক্ষাটি বস্তুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সাহায্যে অতি সহজেই বিভিন্ন প্রকারের তন্তু চিনিতে পারা যায়। যখন একখানি কাপড় বিভিন্ন প্রকার তন্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

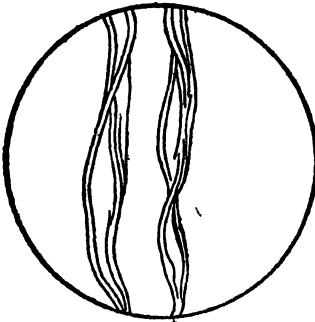
এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া আণুবীক্ষণ যন্ত্রের ‘স্লাইডে’ পরীক্ষা করিতে হয়। ‘স্লাইডে’ একবারে চার-পাঁচটির বেশী তন্তু রাখিতে হয় না।

তোমরা বিভিন্ন প্রকার তন্তু দেখিতে কিরূপ তাহা পূর্বেই পড়িয়াছ। সুতরাং আণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া উহাদের সহজেই চিনিতে পারিবে। লিনেন তন্তু চিনিবার জগৎ এই পরীক্ষাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। লিনেন তন্তু দেখিতে সোজা এবং লম্বা, মাথার দিকটা ধীরে ধীরে সরু হইয়া সূঁচের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত গাট দেখিতে পাওয়া যায়। র‍্যামী তন্তু দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই। তবে লিনেন অপেক্ষা ইহা আরও মোটা এবং অসমান্ত (irregular)। রেশম তন্তু দেখিতে একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মসৃণ এবং উহা হইতে আলো-বিকীর্ণ

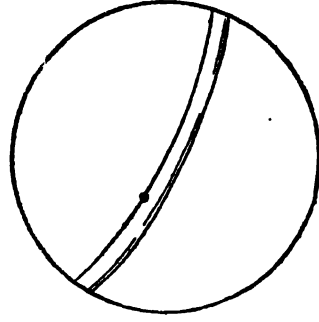


বাস্তব পরীক্ষার পূর্বে হুতি ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত  
কাপড়ের অবস্থা। ডাইনে অ্যাসিড পরীক্ষার  
পরে ঐ কাপড়ের অবস্থা

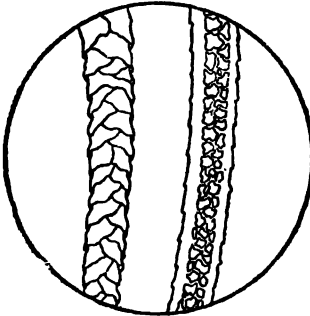
হয়। বস্ত্র রেশম কৃত্তিক রেশম অপেক্ষা মোটা এবং উহা কতকগুলি সমান্তরাল রেখার সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। রেয়ন তত্ত্ব দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা রেশম অপেক্ষা প্রায় চারগুণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালম্বি কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দেখিতে অনেকটা রেয়নের মতই। সুতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের চিনিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রকার তন্তুর ছবি নিম্নে দেখান হইল।



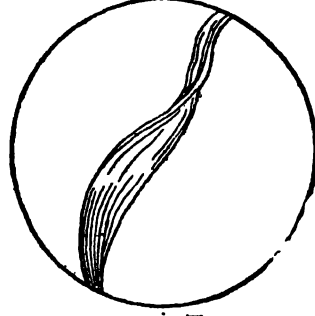
মুতী



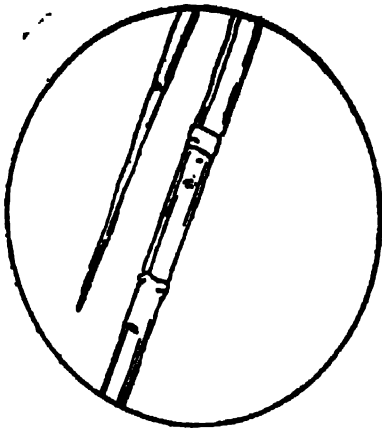
রেশম



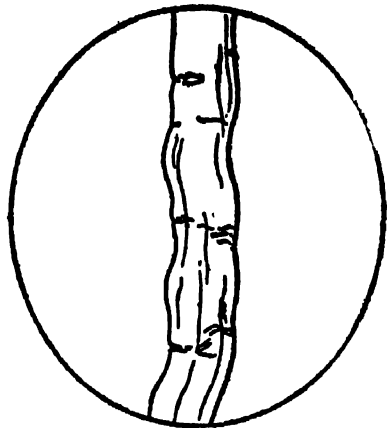
পশম



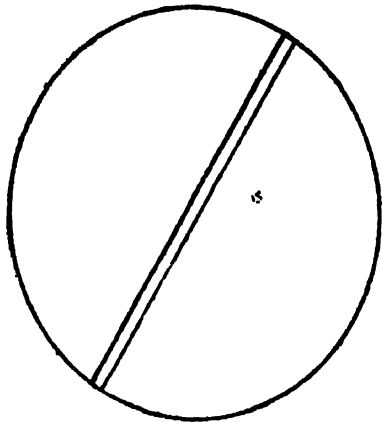
বন্য রেশম



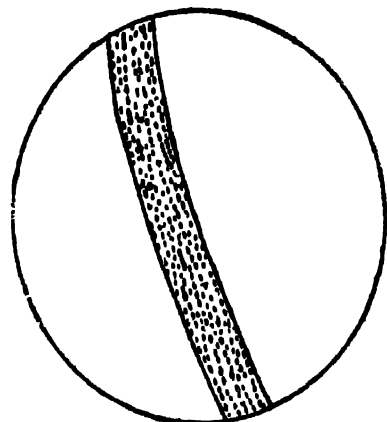
লিনেন



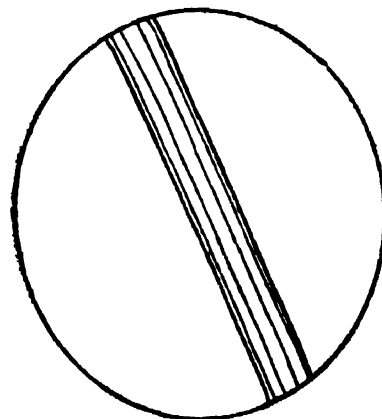
ব্রহ্মগী



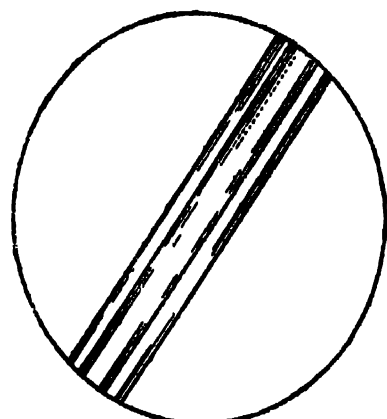
গ্লাস



নাইলন



রেসিন



অ্যাসিটেটে তন্তু

**উদ্ভিদ, প্রাণিক, সাংশ্লেষিক ও খনিজ তত্ত্ব ত্রিণ্নয় পদ্ধতি**  
( Identification of Vegetable, Animal, Synthetic and Mineral Fibres )

পরীক্ষা	উদ্ভিদ (বৃক্ষ, শিল্প, রাসায়নিক ইত্যাদি)	প্রাণিক (বৈশ্য, পশু)	সাংশ্লেষিক (নাইলন, ডেক্রন)	খনিজ (গ্লাস ও অ্যান্‌থ্রাসাইট)
(১) কয়েকটি তত্ত্ব একটি ক্রমশে বিশ্লেষণ কর।	শিখারসহ জলিবে এবং কাগজ গোড়া গুলি বাহির হইবে। যুগ্ম বর্ণের হালকা ছাই পড়িয়া থাকিবে।	পুড়িবার সময় পালক গোড়া বা ছাল গোড়া গুলি বাহির হইবে। শেষে কালো উল্লম্ব ছাই পড়িয়া থাকে এবং হাতে ঘরিলে সহজেই ভাঙিয়া যায়।	শিল্পী গুলি তামাটে গুলি বা দানা গুলি হইবে এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গুলি বাহির হয়।	মোটেই জলিবে না।
(২) একটি খুব সরল ইন্ডি তত্ত্ব উপর চাপিয়া কর।	লালচে গোড়া দাগ পড়িবে।	লালচে গোড়া দাগ পড়িবে।	শিল্পী বাহিবে।	কোন পরিবর্তন হইবে না।
(৩) একটি তত্ত্ব অণুগুণ বস্তুর সাহায্যে পরীক্ষা কর।	পাক পেতরা ফিটার হস্ত-পুড়ি। মাথার দিকটা সর হইতে হস্ত-মাঝে মাঝে ধানের গাঠের হস্ত বন্ধী—শিল্প। সেখানে অনেকটা শিল্পের হস্ত, কিন্তু আরও মোটা এবং জারাল—রাসায়নিক।	সেখানে একটি হস্ত কাঠের শলাকার হস্ত; আলো বিকীর্ণ হয়—বৈশ্য। তত্ত্ব উপরটি সাহায্যে জাঠের হস্ত একত্রকার আবরণে ঢাকা—পশু।	নাইলন ও ডেক্রন তত্ত্ব সেখানে হস্ত শলাকার হস্ত। অণু-বীক্ষণ যন্ত্রে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যায় না।	হস্ত, সর, সরল ও হস্ত শলাকার হস্ত—অ্যান্‌থ্রাসাইট। সর, হস্ত এবং বস্ত শলাকার হস্ত—গ্লাস।
(৪) শতকরা ৫ ভাগ কঠিন গোড়া জলে ডুবিয়া একটি তত্ত্ব গুলি কর এবং ইহাতে কয়েকটি তত্ত্ব সেলিয়া হাট।	অবীভূত হইবে না।	অবীভূত হইবে।	অবীভূত হইবে না।	অবীভূত হইবে না।

**সূতি ও লিনেনের তত্ত্ব চিহ্নিত পদ্ধতি**  
( Identification of Cotton and Linen Fibres )

পরীক্ষা	সূতি	লিনেন
(১) একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে জোরে চাপিয়া ধর।	অল্পট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ অবিকল্প দ্বারা হইবে না। [ কাপড়ে কলপ থাকিলে অল্পট ভাঁজের দাগ পড়িবে ]	অল্পট ভাঁজের দাগ পড়িবে এবং এই দাগ সহজে মিলাইয়া যাইবে না।
(২) একটি তত্ত্ব দুই হাতে টানিয়া দুই ভাগ কর এবং উহাদের হিন্ন অগ্রভাগ লক্ষ্য কর।	অগ্রভাগ তুলির অগ্রভাগের দ্বায় মোটা।	অগ্রভাগ দেখিতে খুঁচের দ্বায় সর।
(৩) কয়েকটি তত্ত্ব জলে কিছুক্ষণ বুটাইয়া সাপ কিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে দুই মিনিট-কাল ফেলিয়া রাখ।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	অগ্নিবর্জিত থাকিবে।
(৪) সিলভার-নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে থায়োসালফেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইয়া একটি পরিকার দ্রবণ প্রস্তুত কর। উক্ত দ্রবণে কঠিক সোডার দ্রবণ মিশাইলে <b>রোডাই জেবল</b> (Rohdal Solution) পাওয়া যাইবে। এই রোডাই দ্রবণে কয়েকটি তত্ত্ব ভাল করিয়া নাড়।	বেগুনী বর্ণ ধারণ করিবে।	বেগুনী-নীল ( Violet-Blue ) বর্ণ ধারণ করিবে।



**রেশম ও পশম চিনিবার পদ্ধতি**  
( Identification of Real Silk and Wool )

পরীক্ষা	রেশম	পশম
(১) কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল।	তন্তু সরল মনে হইবে, উহাদের মধ্যে কোন ভাঁজ দেখা যাইবে না।	তন্তুর মধ্যে কোঁকড়ান চুলের মত ভাঁজ দেখা যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মংশ কাচের শলাকার মত আলো বিকীর্ণ করে। আড়াআড়িভাবে কাটা তন্তু সমবাহু ত্রিভুজের মত।	উপরিভাগ মাহের আঁশের মত আঁবরণে ঢাকা। আড়াআড়িভাবে কাটা তন্তু—বৃত্তাকার।
(৩) ঘন হাই ড্রো ক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণে কয়েকটি তন্তু আধ মিনিটকাল সিদ্ধ কর।	দ্রবীভূত হইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।

রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের স্বাভাবিক মসৃণতা এবং চাকচিক্য হইতে চিনিতে পারা যায়। পশমের বস্ত্রাদিতে রেশমের চাকচিক্য দেখা যায় না।

**খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি**  
( Identification of Real Silk and Artificial Silk )

পরীক্ষা	খাঁটি রেশম	কৃত্রিম রেশম (ভিসকোস ও কিউপ্রোনিয়াম)
(১) কয়েকটি তন্ত একটি জলন্ত শিখার ধর।	পুড়িবার সময় পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।	পুড়িবার সময় কাগজ পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে।
(২) কয়েকটি তন্ত অণুবীক্ষণ বস্তুর সাহায্যে পরীক্ষা কর।	মৃদু কাচের শলাকার মত আলো বিকীর্ণ করে।	দেখিতে অনেকটা খাঁটি রেশমের মতই কিন্তু উহা অপেক্ষা চারগুণ ঘোটা এবং গারে কতকগুলি সমান্তরাল রেখা দেখা যায়।
(৩) শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিক সোডা জলে গুলিয়। একটি ত্রণ প্রস্তুত কর এবং ইহাতে কয়েকটি তন্ত কেলিয়া নাড়।	দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।	দ্রবীভূত হইবে না।
(৪) সোডিয়াম নাইট্রাইট (Sodium Nitrite) এবং হাইড্রোক্সিক অ্যাসিডের ঠাণ্ডা ত্রবে কয়েকটি তন্ত কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে ঐ তন্ত অল্প একটি পাত্রে রক্তিত বিটা নাপথল (Beta Naphthol) এবং কষ্টিক সোডার ত্রবে ভাল করিয়া নাড়। এই পরীক্ষাকে <b>কাপলিং</b> (Coupling) পরীক্ষা বলে।	লাল বর্ণ ধারণ করিবে।	হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

**বিভিন্ন প্রকার রেনন ও অ্যাসিটেট তত্ত্ব চিনিবার উপায়**  
(Identification of Rayon and Acetate Fibres)

পরীক্ষা	ভিনকোল	কিউআনোনিয়াস	অ্যাসিটেট
(১) একটি তত্ত্বকে আড়াআড়ি ভাবে কাটনা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা পরীক্ষা কর।	অসমান ধারবিশিষ্ট গাতার মত।	বৃত্তাকৃতি	অসমান ধারবিশিষ্ট গাতার মত।
(২) এক টুকরা কাগড়ের উপর একটি খুব সরল ইঙ্গিত রাখ।	সামান্য গোড়া দাগ পড়িয়ে।	সামান্য গোড়া দাগ পড়িয়ে।	পরিমাণ বাইরে।
(৩) একখানি কাগড় হইতে কয়েকটি তত্ত্ব বাহির করিয়া একটি অগ্নিশিখার উপরে দা।	বৃত্তির তার শিখার পড়িয়ে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিয়ে। কাগজ গোড়া দাগ পড়িয়ে।	বৃত্তির তার শিখার পড়িয়ে এবং হালকা ছাই পড়িয়া থাকিয়ে। কাগজ গোড়া দাগ পড়িয়ে।	পরিমাণ কাগজ নত উঠির মত হালকা প্রস্তুত হইবে। তিনিম্বায়ের মত গাওয়া বাইরে।
(৪) কয়েকটি তত্ত্ব ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (Glacial acetic Acid) মধ্যে বেশিলা ভাগ করিয়া দাড়া।	প্রবীকৃত হইবে না।	প্রবীকৃত হইবে না।	প্রবীকৃত হইবে না।
(৫) উপরোক্ত পরীক্ষার ঘন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে কিউআনোনিয়াস হাইড্রোজাইড (Cuprammonium hydroxide) ব্যবহার কর।	প্রবীকৃত হইবে।	প্রবীকৃত হইবে।	প্রবীকৃত হইবে না।
(৬) একটি পাত্রে কিছু অ্যাসিটোন (Acetone) মইয়া উহাতে কয়েকটি তত্ত্ব উত্তমরূপে দাড়া।	তত্ত্ব প্রবীকৃত হইবে না।	তত্ত্ব প্রবীকৃত হইবে না।	তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রবীকৃত হইবে।
(৭) হাইড্রোফোরিক অ্যাসিড এবং আয়োডিন সম্মিশ্রনে বিশদীকৃত উদ্ভাটন কয়েকটি তত্ত্ব বেশিলা দাড়া।	তত্ত্ব ঘন নীল বর্ণ ধারণ করিয়ে।	তত্ত্ব হালকা নীল বর্ণ ধারণ করিয়ে।	তত্ত্ব হালকা বর্ণ ধারণ করিয়ে।






উপরের পরীক্ষা হইতে লক্ষ্য করিয়ে যে অনুবীক্ষণ পরীক্ষার সাহায্যে ভিনকোল এবং কিউআনোনিয়াস রেননের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। সন্তোষ পরীক্ষাটিও এই নিয়মে সাধন্য করিয়ে।

**রেসল, নাইলন ও ডেকন চিনিয়ার পদ্ধতি**  
( Identification of Rayon, Nylon and Dacron Fibres )

পরীক্ষা	রেসল	নাইলন	ডেকন
(১) কয়েকটি তক্ত একটি কলত অধিশিখায় বস।	নিখাসহ-কসিবে এবং কাগজ গোড়া বস গোড়ায় বাইরে। পুড়িবার পর হালকা ধূসর বর্ণের ছাই পড়িয়া থাকিবে।	পলিমা ট্যান রংয়ের (Tan Colour) নক্ত দানা এতদন্ত হইবে। পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধ পাওয়া যায়। বার্নার বোঁমা বাহির হইবে।	নাইলনের নক্তই পলিমা ট্যান রংয়ের দানা এতদন্ত হইবে এবং পুড়িবার সময় রাসায়নিক গন্ধের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় তক্ত পুড়িবার সময় কোনো বোঁমা বাহির হয়। পলিমা বস্তু কাজে কাজেই হইবে।
(২) একটি কাগড়ের উপর একটি ধূসর রঙি চাপিয়া বস।	লালচে গোড়া দাগ পড়িবে।	পলিমা বস্তু কাজে কাজেই হইবে।	বুজাকার
(৩) একটি তক্ত আড়াআড়িভাবে কাটিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখ।	(১) ডিসকোন—পাতিল নক্ত (২) ফিউজারানিয়ার—বুজাকার	বুজাকার	বুজাকার
(৪) ফিউজারানিয়ার হাইড্রোজাইড প্রাথক কয়েকটি তক্ত উত্তপ্তরূপে রাখ।	অবীভূত হইয়া থাকবে।	অবীভূত হইবে না।	অবীভূত হইবে না।
(৫) জলের সহিত শক্ত করা ১০ ডাগ কার্বনিক অ্যাসিড বিশায়া একটি প্রবণ এতদন্ত কর এবং এই প্রবণে কয়েকটি তক্ত উত্তপ্ত করণে রাখ।	অবীভূত হইবে না।	অবীভূত হইবে।	অবীভূত হইবে না।

একটি পরীক্ষার সাহায্যে নাইলন ডেকনের পার্থক্য করা যায়। পুড়িবার সময় নাইলন তক্ত হইতে ধূসর বর্ণের বোঁমা এবং ডেকন-হইতে কোনো বোঁমা বাহির হইবে। পক্ষ পরীক্ষার সাহায্যেও নাইলন ডেকন হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়। ডিসকোন ও ফিউজারানিয়ার প্রেরণের পার্থক্য তিন মন্তর পরীক্ষার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

**কয়েকটি প্রধান প্রধান তন্তুর তুলনামূলক আলোচনা**  
( Comparative study of a few important fibres )

বে মৌলিক পদার্থ পট ( Elements present )	মতি	সিনে	শেখ	পশ	বের	নাইল
রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical Nature)	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ( গরু )	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন
বীণের দৈর্ঘ্য (Length of the fibre)	১ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি	১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি	৪০০ গজ হইতে ১৪০০ গজ	১১ ইঞ্চি হইতে ১৪ ইঞ্চি	—	—
বীণের আকৃতি (Shape of the fibre)	মোটামুট কিতার মত,	নলের মত, মাঝে মাঝে বীণের গাঠন মত বকুনীযুক্ত	নলের মত, একপ্রান্ত মত, কোন বকুনী নাই, মত	মাছের বীণের মত উপরে খোলস থাকে	অনেকটা বেষণের মত কিন্তু উহা অশেফ এবং তারতম্য মোটা এবং গায়ে লম্বাঘি ব্রশা দেখা যায়।	আর কেবল মত,
বীণের প্রস্থের আকৃতি (Shape of cross section )	একদিক অবতল অপরদিক উত্তল, 	মেঘিতে এক একটি বহুভুজের মত 	মেঘিতে ত্রিভুজের মত 	বৃত্তাকৃতি, বীণমুত ধার 	ভিসকোস—পাতার মত, কিট্রামোনিয়া —বৃত্তাকৃতি, অ্যানিটট—পাতার মত	বৃত্তাকৃতি 
ফুল (Shrinkage)	বীণের কোন ফুল নাই, কিন্তু মূলের ক্ষত কাপড় খাপসা হয়।	সাধারণত ফুল না।	ফুল হয় না	পাতা, চাপ এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শ ইহা ফুলিত হয় (Swelling)	ফুল হয়।	ফুল হয়।
চাকটিক্য (Lusture)	চাকটিক্য নাই।	চাকটিক্য আছে।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকটিক্য নাই।	অত্যন্ত চকচকে।	চাকটিক্য আছে।

কলীর বাপ শোষণ কমতা (Moisture absorbancy)	স্থিতি	সিনেন	রেশ	পদম	রেন	মাইন
	কলীর বাপ শোষণ করিতে পারে, কিন্তু ধারণ করিবার শক্তি কম, এইজন্য বর্ষাকালে স্থতির বাপড় স্যাঁত- সেঁতে মনে হয় (leak damp)	স্থিতি অপেক্ষা কলীর বাপ ধারণ কমতা বেশী।- ইহা সহজেই কলীর বাপ শোষণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এইজন্য ভোয়ালে এবং ক্রমাল একত্রিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।	কলীর বাপ শোষণ ও ধারণ করিবার কমতা স্থিতি ও সিনেন অপেক্ষা বেশী।	সকল তত্ত্বের অধিক কলীর বাপ শোষণ করিতে পারে। ইহা নিম্নের ওজনের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কলীর বাপ ধারণ করিতে পারে এবং ইহাতে পদম ভিজা (wet) মনে হইবে না।	স্থিতি ও সিনেন অপেক্ষা অধিকতর কলীর বাপ শোষণ করিতে পারে, কিন্তু এই বাপ উহাদের মত তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া মিতে পারে না।	কলীর বাপ শোষণ কমতা কম। এইজন্য মাইন শোষণে ভেদম আদাম বোধ হয় না।
জোর (Strength)	স্থতির বাপ বেশ শক্ত এবং জলে ভিজাইলে ইহার জোর শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। এইজন্যই এই জাতীয় বস্তাদি জলে রগড়াইয়া পরিষ্কার করিলে কোন ক্ষতি হয় না।	ইহা স্থতির তত্ত্ব অপেক্ষা প্রায় বিশগুণ শক্ত। প্রকৃতগতক বস্তাদি ব্যবহৃত তত্ত্বের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা শক্ত তত্ত্ব। স্থতির জোর জলে ভিজাইলে ইহার জোর বাড়িয়া যায়।	ইহা স্থিতি অপেক্ষা অধিকতর শক্ত, কিন্তু জলে ভিজাইলে ইহার জোর অনেক কমিয়া যায়।	পদম-তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বল। জলে ভিজাইলে ইহার শক্তি আরও কমিয়া যায়। এইজন্য পদমের বস্তাদি খুঁইবার সময় রগড়াইতে হয় না।	পদম অপেক্ষা শক্তি- শালী কিন্তু স্থিতি অপেক্ষা দুর্বল। জলে ভিজাইলে জোর কমিয়া যায়।	মাইনও খুব শক্ত তত্ত্ব। কিন্তু সিনেন অপেক্ষা ইহার জোর কম, জলে ভিজাইলে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।
স্থিতিহাপকতা (Elasticity and Resiliency)	স্থিতিহাপকতা শক্তি কম। এইজন্য স্থতির কাপড়ে ভাঁজ পড়িলে খা কুঁকরিয়া গেলে উহা সহজে মিলাইয়া যায় না।	সিনেন তত্ত্বের স্থিতি- হাপকতা শক্তি সর্বা- পেক্ষা কম।	স্থিতি ও সিনেন অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিহাপক	অত্যন্ত স্থিতিহাপক, ইহাতে কোন ভাঁজের দাগ পড়ে না। ভিজা অবস্থায় এই স্থিতিহাপ- কতা গুণ কিছুটা কমিয়া যায়।	স্থিতিহাপকতাশক্তি রেশম ও পশম হইতে কম।	অত্যন্ত স্থিতিহাপক এবং ইহাতে সহজে ভাঁজের দাগ পড়ে না।

	হুতি	গিনেন	ক্ৰেপন	পদম	রেন	নাইলন
তাপ পরিবাহিতা (Heat Conductivity)	তাপ স্থপরিবাহী। এই ক্ষত্ৰ স্ৰীতকালে হুতির বস্ত্ৰে আৱায় পোষ হয়।	হুতি অপেক্ষা; অধিক-তর তাপ স্থপরিবাহী।	তাপ স্থপরিবাহী, এই ক্ষত্ৰ শ্ৰেণম বস্ত্ৰে পদম বোষ হয়।	তাপ স্থপরিবাহী, এই ক্ষত্ৰ নীতকালে পদমের বস্ত্ৰ ব্যবহার করা হয়।	হুতি অপেক্ষাও অধিক-তর তাপ স্থপরিবাহী।	তাপ স্থপরিবাহী।
তাপের প্রভাব (Effect of heat)	স্বাভাবিক তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্যই হুতির বস্ত্ৰ সোতা বা শয়ান করে হুতাইয়া পরিষ্কার করা যায় এবং পদম ইহা ব্যবহার করা চলে।	হুতি তর হুতই স্বাভাবিক তাপে কোন ক্ষতি হয় না।	উত্তাপ প্রয়োগে হুতই ইয়া যায়।	বেগী উত্তাপে তর নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং সোতা বা শয়ান করে।	হুতি এবং গিনেনের সহুই রেন তর সাধারণ উক্তার কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে পদম ইহা প্রয়োগ করা যায়। তবে ধূব পদম ইহা ব্যবহার করিলে সোতা বা শয়ান পদম (অ্যাসিটিউ রেনে করিলে গিনিনা যায়।)	নাইলন তর উত্তাপ প্রয়োগে নষ্ট ইয়া যায়। তবে উক্ত বা সানাত পদম জনে নাইলন বস্ত্ৰ পারকার করা চলে।
রূ বাস ক্রমতা (Admity to dye)	গিনেন অপেক্ষা রূ বাস ক্রমতা বেগী, কিন্তু রেশম এবং পদম অপেক্ষা কম। Most dye এর সাহায্যে রূ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	এই প্রকার তর সন্তে রূ বস্ত্ৰে না, হুতায় রূ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।	অতি সহজই রূ করা যায়।	অতি সহজই রূ করা যায়।	হুতি এবং গিনেনে বে সকল রূ ব্যবহার করা হয় সেই সকল রূ অতি সহজই রেন তর ধারণ করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে হুতি অপেক্ষা রেন তর রূ করা অনেক সহজ। (অ্যাসিটিউ তর হুতি ও গিনেনে ব্যবহৃত রূ বাস করিতে পারে না।)	নাইলন তর সহজই রূ করা যায়, কিন্তু এই রূ রেনে পাকা হয় না। হুতের আয়ো এবং পরিষ্কার করিবার সময় এই রূ কিছুটা নষ্ট ইয়া যায়।

অ্যাসিডের ক্রিয়া (Action of Acids)	মুতি	মিনেব	রেশব	পশব	-রেশব	নাইলন
	পাট অ্যাসিডের সল্শনে মুতির তত্ত্ব প্রত্ন নষ্ট হইয়া যায়। লবু অ্যাসিড তত্ত্ব দুর্ল হইয়া যায় এবং ইহা কাপড়ে ভকাইয়া গেলে কাপড় ফুটাই হইয়া যায়।	মুতির তত্ত্ব অম্লরূপ। মুতির তত্ত্ব অম্লরূপ।	পাট অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লবু অ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি হয় না।	পাট অ্যাসিডে পশব নষ্ট হইয়া যায়। লবু অ্যাসিডে এই তত্ত্ব কোন ক্ষতি করে না।	অ্যাসিড রেশব তত্ত্ব ক্ষতি সাধন করে। লবু এবং কি লবু অ্যাসিডেও এই সর্বল তত্ত্ব দুর্ল হইয়া পড়ে। (অ্যাসিডে তত্ত্ব অ্যাসিডিক অ্যাসিডে এবং ক্রমিক অ্যাসিডে স্বীকৃত হইয়া যায়)	লবু অ্যাসিডে নাইলন তত্ত্ব কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু পাট অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।
কারের ক্রিয়া (Action of Alkalies)	মুতির তত্ত্ব যে কোন একার কার নির্ভরে ব্যবহার করা চলে, কার ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।	মিনেবের নির্ভরে যে কোন একার কার ব্যবহার করা চলে। তবে মুতির তুলনার মিনে- বের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।	রেশবতত্ত্ব তাঁর কারের সল্শনে নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু লবু কার, রেশব বোরাক্স, সোডা- শিলা ইত্যাদি নির্ভরে ব্যবহার করা চলে।	রেশবের তাঁর পশব তত্ত্বও তাঁর কারের এভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বোরাক্স, অ্যাসোনিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা চলে।	মুতি এবং মিনেব অপেক্ষা ইহার কার প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। এইজন্য পাট কার এই তত্ত্ব ব্যবহার করা চলে না, লবু কার সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা বাইতে পারে।	নাইলন তত্ত্ব কার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, সুতরাং লবু কার ইহার কোন ক্ষতি করে না।
ব্রিচি দ্রব্যাদি দ্বারা (Effect of bleaching agents)	মুতির তত্ত্ব ব্রিচি দ্রব্যাদিতে নষ্ট হয় না। সুতরাং একার ব্রিচি দ্রব্যাদি সাধা মুক্তিতে ব্যবহার করা চলে।	মুতির তত্ত্ব তাঁর যে কোন একার ব্রিচি দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা চলে। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা মুতির তুলনার কম।	ফ্লোরিন ব্রিচি ব্রিচি পাউডার, হাই- সোডারাইট বা সোডালী দ্রব্য রেশব- তত্ত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে, লবু ব্রিচি দ্রব্যাদি লবু হাইড্রোজেন পার- সাইড ইত্যাদি নির্ভরে ব্যবহার করা চলে।	রেশবতত্ত্ব সত্যিই উপর ফ্লোরিন ব্রিচি ব্যবহার করা চলিবে না। হাইড্রোজেন পার- সাইড, ইত্যাদি লবু ব্রিচি দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়।	উপর ফ্লোরিন ব্রিচি তত্ত্ব ক্ষতি করে। সুতরাং হাইড্রোজেন পারসাইড ইত্যাদি লবু ব্রিচি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে হয়।	রেশব তত্ত্ব অম্লরূপ



	দৃষ্টি	শ্রবণ	স্পর্শ	ক্রিয়	মাইলন
দৃষ্টি (Individ- uality)	দৃষ্টি তত্ত্ব সহকেই অগ্নি উঠে এবং শিখা- সহ জ্বলিত থাকে। দৃষ্টির সত্ত্ব কামল গোড়া সহ বাহির হয় এবং স্পষ্ট হালকা হাই গড়িয়া থাকে।	এই তত্ত্ব গীত গীত জনে এবং দৃষ্টির সত্ত্ব গান-গোড়া সহ বাহির হয়।	শ্রবণের দ্বারা গীত গীতের সত্ত্ব এবং গানক গোড়া সহ বাহির হয়। গানতত্ত্ব কয় গণিত। গানবের কখন আত্ম নিজাইতে ব্যবহার করা হয়।	দৃষ্টি ও শ্রবণের অনুরূপ। (আগিষ্ট তত্ত্ব দৃষ্টির সত্ত্ব গণিত নষ্ট কালো হানা প্রস্তুত হয়।)	দৃষ্টি তত্ত্ব তত্ত্ব যদি না আত্ম অভাবে ইহা গণিত হয়।
গোকার কাটা (Action of Moths, midway and other insects)	দৃষ্টি তত্ত্ব সহ (solid) গোকার কাটা না। কিন্তু ইহা midway এবং হবের (solid) দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, midway ও হবের দৃষ্টি তত্ত্ব বাত, কলী হাল এবং উজাপের একাত্ম। দ্বারা কাপড় বিনা কখন তক হানে ঘূর্ণিত হবের midway এবং হবের হাত হইতে করা যায়।	শ্রবণ তত্ত্ব সহ গোকার কাটা না কিন্তু ইহা midway এবং হবের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে।	গান তত্ত্ব সহ দৃষ্টি ইহা তত্ত্ব সহ গোকার। দ্বারা ইহা দৃষ্টি গানতত্ত্ব সহিত করা করিতে হয়। এই একাত্ম তত্ত্ব midway এবং হবেরও আত্ম করিতে পারে।	দৃষ্টি তত্ত্ব অনুরূপ। (আগিষ্ট তত্ত্ব midway দ্বারা দৃষ্টি হয় না।)	দৃষ্টি তত্ত্ব সহ midway এবং হবের ইহা গণিত কোলকার গোকার দ্বারা ইহা হয় না।

## ২. পোশাক প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব

( Management responsibilities in clothing a family ) :

একটি পরিবারের পোশাক পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব একটি মন্ত বড় দায়িত্ব। অল্প এবং বস্ত্র এই দুইটি জিনিস যদিও আমাদের জীবনে অপরিহার্য তথাপি উহাদের সামাজিক মূল্য সমান নয়, খাওয়া আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়া কি খাইল তাহা কেহ দেখে না কিন্তু গৃহের বাহিরে, পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আসিয়া পোশাকের উপর পড়ে। পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তিগত রুচি যদিও প্রাধান্যলাভ করে তথাপি অন্তের মনের প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। উপযুক্ত পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আশেপাশের লোকদের প্রতিক্রিয়া যদি পরিধেয় পোশাকের অনুকূল হয় তবে পরিধানকারীর মনে একটা সন্তোষ সৃষ্টি করে ও আত্মবিশ্বাস জাগায়। গৃহের সকলের জ্ঞান পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করাতে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার।

গৃহ পরিচালিকার পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা হইল। তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল :

(১) বাড়ির ছোট ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনে পোশাক সম্বন্ধে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলা। পোশাকের মান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করা অর্থাৎ কখন কিরূপ পোশাক মানানসই, বিভিন্ন তত্ত্বের গুণাগুণ কি? বাহ্যিক বর্জন করিয়া চলা অথচ প্রয়োজনমত পোশাক রাখা ইত্যাদি।

(২) পরিবারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা।

(৩) পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে পোশাকের জ্ঞান অর্থ বরাদ্দ করা।

(৪) নির্ধারিত অর্থের মধ্যে পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করা অর্থাৎ কতটা পোশাক দাঁজকে দিব, কতগুলি তৈরী পোশাক ( readymade ) ক্রয় করা হইবে এবং বাড়িতে কতটা সেলাই করা সম্ভব স্থির করা।

(৫) স্থলভে ভাল পোশাক ক্রয়ের জ্ঞান বাছার নির্বাচন করা।

(৬) পোশাকের উপাদান পছন্দ করা ও ক্রয় করা।

(৭) অনুষ্ঠান অনুযায়ী শিশুদের পোশাক নির্বাচনের শিক্ষা দেওয়া।

(৮) পোশাকের উপযুক্ত যত্ন লওয়া এবং সংরক্ষণ করা এবং সে সম্বন্ধে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া।

(৯) নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পোশাক পরিকল্পনা ও ক্রয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

(১০) বাড়িতে যদি সেলাইএর কিছু ব্যবস্থা করা হয় তবে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।

(১১) সেলাইয়ের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করুক।

(১২) উহাদের যত্ন ও সংরক্ষণ করা।

পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার সময় গৃহ পরিচালনার সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ সময়, শক্তি, অর্থ, গৃহের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাইতে হয়।

**সময় :** বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেনাকাটা করা, দর্জির কাছে যাওয়া অথবা ঘরে সেলাই করা এসবের জন্য যথেষ্ট সময় দরকার।

**শক্তি :** পোশাক কাটা, ইস্ত্রি করার জন্য যথেষ্ট তাপ ও শক্তি খরচ হয়।

**অর্থ :** সকল ঋতু এবং সকল রকম সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী পোশাকের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন।

**দৃষ্টিভঙ্গী :** অর্থ থাকিলেই উপযুক্ত পোশাক ক্রয় করা যায় না। সমকালীন ক্যাসানের সঙ্গে সুরুচি বজায় রাখিয়া পোশাক নির্বাচনে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার।

**জ্ঞান :** পরিবারের কাহার কেমন রুচি, কাহার কতটা পোশাক প্রয়োজন এ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, কেনাকাটার জ্ঞান, কোন্ বাজারে ভাল জিনিস পাওয়া যায়, বছরের কোন্ সময়ে বস্ত্রাদির উপরে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় এইসব জ্ঞান পোশাক পরিকল্পনায় অপরিহার্য।

যিনি পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবেন তাঁহার নিজের যে উপরোক্ত সমস্ত যোগ্যতা ও সময় থাকিবে তাহা নয় তবে তিনি গৃহের সকলের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সময় বিচার করিয়া কাজ বণ্টন করিয়া দিবেন। এই বণ্টনের কাজও পোশাক পরিকল্পনার অন্তর্গত।

## B. বস্ত্রাদি ধোওয়া এবং পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি

### শুক্ক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোল

( Different methods of washing and cleaning of clothing including dry cleaning and removal of stains ) :

বস্ত্রাদি ধোওয়া ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে শুধু শুক্ক ধোলাইএর কথা বলা হইল।

### শুক্ক ধোলাই ( Dry cleaning )

তোমরা জান যে, কোন কোন বস্ত্র ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। জর্জেট, ক্রেপ-ডি-সীন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি জলে ধুইবার সময় এই অসুবিধা প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে উহাদের আকৃতি বদলাইয়া যাইবে। আবার রঙিন এবং ছাপার কাপড়ের

রঙ অনেক সময় সাবান-জলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় বস্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে শুষ্ক ধোলাই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে

- (১) বস্ত্রাদি কুঁচকাইয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং
- (২) রঙিন ও ছাপা কাপড়ের রঙ, চটিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় না।

সাধারণতঃ রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি, ভেলভেট ও অগ্নাত রঙিন এবং ছাপা বস্ত্রাদিই শুষ্ক ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগী।

সকল তরল পদার্থ ই শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহার করা যায় না। কোন কোন তরলে কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয়। আবার কোন কোন তরল অতিশয় উদ্বায়ী এবং মুক্ত অবস্থায় রাখিলে উড়িয়া যায়। এই ধরনের তরলে ধোলাই করিলে বেশী ধরচ হয়। আবার তরল যদি খুব কম উদ্বায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অশ্রুবিধা হয়। সুতরাং মাঝামাঝি উদ্বায়ী (moderately volatile) তরল শুষ্ক ধোলাইয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবার কোন কোন তরলদ্রব্য বাষ্পীভূত করিলে পাত্রের নীচে তলানি পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত আদর্শ তরলের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে :

- (১) ইহাতে কাপড় সঙ্কুচিত হইবে না বা রঙিন কাপড়ের রঙ নষ্ট হইবে না।
- (২) কাপড় হইতে দ্রুত ময়লা দ্রবীভূত করিবে।
- (৩) বাষ্পীভূত করিলে নীচে কোন তলানি পড়িয়া থাকিবে না।
- (৪) মাঝারি রকমের উদ্বায়ী হইবে।
- (৫) ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না।
- (৬) অদাহ্য বা সামান্য দাহ্য হইবে।
- (৭) বিষাক্ত হইবে না।
- (৮) সহজলভ্য এবং সস্তা হইবে।

অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তরল একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল ধোলাই হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং বেনজিন একত্রে ব্যবহার করিলে যে কোন একটি তরল অপেক্ষা ভাল ধোলাই হইবে। বেনজিন, পেট্রল ইত্যাদির সহিত আজকাল বেনজিন সাবানও (Benzene soaps) ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ময়লা বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়। বিভিন্ন প্রকারের বেনজিন সাবান বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্যাপোনিন (Saponine), লিকুইড সোপ (Liquid soap) এবং ওয়েরালিন (Weralin) বিদেশে প্রস্তুত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান।

**পরিষ্কারক দ্রব্যাদি :** যে সকল তরল শুক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ।

(১) দাহ্য, যথা—পেট্রল, বেনজিন ইত্যাদি,

এবং

(২) অদাহ্য, যথা—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইথিলিন ইত্যাদি । নিম্নে শুক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ করা হইল :

**পেট্রলিয়াম ইথার ( Petroleum ether ) :** ইহা অতিশয় উদারী তরল । মুক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয় । ইহা একটি সহজ দাহ্য তরল । স্মৃতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ।

**টারপেনটাইন ( Turpentine ) :** ইহা ময়লা দূর করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের স্রষ্ট হয় । ইহা একটি দাহ্য তরল । এই সকল কাৰণে শুক ধোলাইয়ে-টারপেনটাইন ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ( Carbon tetrachloride ) :** ইহা একটি অদাহ্য তরল পদার্থ । স্মৃতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই । রঙিন কাপড়ের রংও ইহাতে নষ্ট হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের স্রষ্ট হয় না । স্মৃতরাং ইহা একটি আদর্শ পরিষ্কারক দ্রব্য । কিন্তু এই তরলটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ ।

**বেনজল ( Benzol ) :** পরিষ্কারক দ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহা খুব বেশী উদারী নয়, অথচ বস্ত্রাদি হইতে সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের স্রষ্ট করে না । এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রঙ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে ।

**বেনজিন ( Benzene ) :** ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিষ্কারক দ্রব্য এবং শুক ধোলাইয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা একটি দাহ্য তরল এবং ধোলাইয়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ।

**পেট্রল ( Petrol ) :** শুক ধোলাইয়ে এই তরলটিই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অগ্ৰাণ্ড তরল পদার্থের তুলনায় ইহা অনেক সস্তা । ইহাও একটি দাহ্য তরল । স্মৃতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় । সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে এই তরলটি বিশেষ উপযোগী ।

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে **ট্রাইক্লোরোইথিলিন ( Trichloroethylene )** এবং **পারক্লোরোইথিলিন ( Perchloroethylene )** এই দুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে শুক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের সুবিধা এই যে ইহারা আগুনের সংস্পর্শে জলিয়া উঠে না এবং অপেক্ষাকৃত কম উদারী, ফলে কাছাকাছি আগুন থাকিলেও জ্বরের কোন কারণ থাকে না এবং কম উদারী বলিয়' ধরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে ।

**ঘোত প্রণালী :** প্রথমে কাপড় হইতে আলগা ধূলা বা ময়লা বাড়িয়া বা ব্রাশ করিয়া যথাসম্ভব দূর কর। কাপড়ে জল বা জলীয় বাষ্প থাকিলে পরিষ্কারক তরলের সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অস্বীকৃত হয়। সুতরাং কাপড় ভিজা থাকিলে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। পরিষ্কারক তরলটিও একেবারে জলশূন্য হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ঐ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। একথণ্ড শুকনো তুলা তরলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা তরল হইতে জল শোষণ করিয়া লইবে। এইরূপে জলশূন্য তরল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিন-চারিটি তরলের পাত্র পর পর সাজাইয়া লও। প্রথম পাত্রে একটু বেনজিন সাবান গুলিয়া লইলে ভাল হয় (প্রতি ৪০ গ্যালনে ১ পাউণ্ড সাবান)। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান-গোলা তরলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর কর। যখন অধিকাংশ ময়লা দ্রবীভূত হইবে, তখন কাপড়খানি হাতে চাপিয়া যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পাত্রে কাপড়খানি ডুবাইয়া অবশিষ্ট ময়লা দূর কর। ময়লা দূর হইলে কাপড়খানি পর পর তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়া ধুইয়া লও। ধুইবার পর ভাল করিয়া একটি খোলা ঘরে বা ছায়ায় শুকাইতে দাও। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে টানিয়া উহা পূর্বাকৃতিতে আনিয়া শুকাইবে। তাহা হইলে কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইবে না। বস্ত্রাদি শুকাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া একটি ভিজা কাপড় মাঝখানে রাখিয়া ইঙ্গি করিবে। খুব গরম ইঙ্গি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন রেশম পশমের কাপড় ভাঁজ করিয়া চাপিয়া লইলেই হয়, ইঙ্গি করিবার প্রয়োজন হয় না।

শুক খোলাইয়ের সময় নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিবে :

- (১) যে ঘরে কাপড় ধুইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে।
- (২) ঘরে বা কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে।
- (৩) কাপড়খানি একটি পাত্রে হইতে অন্য পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ যেন মেঝেতে না পড়ে।

## কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি

### ( Removal of Stains )

**দাগ কাকে বলে ?** অপরিষ্কার জামা-কাপড় সাবান, সোডা ইত্যাদি সাধারণ পরিষ্কারক দ্রব্যাদির সাহায্যে ধুইলেই উহাদের ময়লা দূর হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন দ্রব্যাদির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের বা চিহ্নের সৃষ্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা সহজে মিলাইয়া যায় না। উহা অপসারিত করিতে এক বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। জামা-কাপড়ের এই প্রকার , রং বা চিহ্নকেই দাগ ( stain ) বলে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে চেষ্টা

না করিলে ঐ দাগ উঠানো অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে রাখিবে পুরানো দাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া দাগ অনেক দিন কাপড়ে থাকিলে কাপড়খানি নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহা মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) **উগ্র অপসারক দ্রব্যাদি**, যথা—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ, কাপড় কাচা সোডা, জাভেলী-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদি। ইহারা অনেকরূপ কাপড়ের সংস্পর্শ থাকিলে কোন কোন তন্তুর ক্ষতি করিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয়।

**মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি**, যথা,—অক্সালিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বেকিং সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স, হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইত্যাদি।

এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণতঃ কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। এই জন্য মিহি এবং দামী কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দ্রব্যাদি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্র অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু অপসারক দ্রব্যাদি হইতেই আরম্ভ করা উচিত। ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড, উভয়ই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বলিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাতে দাগ না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আবার বিভিন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যে প্রণালীতে রক্তের দাগ উঠানো হয় তাহা লোহার দাগ উঠাইবার উপযোগী নয়। সুতরাং কি ভাবে দাগ লাগিয়াছে জানিতে পারিলে দাগ অতি সহজেই দূর করা যায়। তাহা না হইলে একের পর এক বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যতক্ষণ না ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে কাপড়ের তন্তু নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

অপসারক দ্রব্যগুলি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কোন কোন অপসারক সূতি এবং লিনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহারা হয়তো রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং দাগ উঠাইবার পূর্বে কাপড়খানি সূতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইবে।

সূতি বা লিনেনের উপর সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারের (যথা, সোডি-বাই-কার্ব বা খাইবার সোডা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) কোন প্রকার ধারণা ক্রিয়া হয় না। এমন

কি কাপড় কাচা সোডা, সাবান ইত্যাদিও অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। অ্যাসিড কিন্তু এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ কোন ক্রমেই এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না। এমন কি অক্সালিক বা হাইড্রোক্সালিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করিলেও কাপড়খানি তখনই প্রচুর জলে ধুইয়া সমস্ত অ্যাসিড দূর করিতে হয়। একবার ঐ অ্যাসিড কাপড়ে শুকাইলে কাপড়খানি নরম হইয়া ঐ স্থান ফাঁসিয়া যাইবে। ব্লিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সহিত এই জাতীয় কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পশম এবং রেশমের বস্ত্রাদি ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি মৃদু ক্ষারীয় দ্রব্যাদিও (যথা, অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। গাঢ় অ্যাসিড ইহাদের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না এবং অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফুটন্ত এবং অত্যধিক গরম জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া পশমের আঁশগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্তবরাং গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার না করিয়া ঈষদ্ভৃষ্ণ জলই ব্যবহার করা কর্তব্য।

রেয়ন বা আর্টিকিয়ারাল সিল্ক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় অ্যাসিড বা ক্ষার ব্যবহার করা উচিত নয়। মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষার নির্ভয়ে উহাদের উপর ব্যবহার করা চলে। জলের সংস্পর্শে বেয়নের তন্তুগুলি সাধারণতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য এই শ্রেণীর কাপড়ের দাগ উঠাইতে জল ব্যবহার না করাই ভাল। বোরাক্স এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। এমন কি ক্লোরিন এবং ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণও সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অ্যাসিটেট রেয়ন অগ্নাজ রেয়ন হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহা অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং গরম ইন্ধি ব্যবহারে গলিয়া যায়। স্তবরাং এই জাতীয় অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিবার পূর্বে কাপড়খানি অ্যাসিটেট রেয়নে প্রস্তুত কি না তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিন্থেটিক তন্তু অ্যাসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। স্তবরাং এই প্রকার অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই। জলীয় বাষ্প এই জাতীয় তন্তুতে খুব কম শোষিত হয়। এই জন্য চা, কফি বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে দুই একবার ধুইয়া ফেলিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায়। ভিনিয়নের বস্ত্র অ্যাসিটেট রেয়নের মত অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্রব্য ভিনিয়ন বস্ত্রের দাগ উঠাইতে ব্যবহার করা যায় না। নাইলনের কাপড়ে অল্প গরম ইন্ধি ব্যবহার করা যায়।

রঙিন বস্ত্রাদির দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ, অনেক সময় রঙিন বস্ত্রের রং চটিয়া যায়। অ্যাসিডে রং নষ্ট হইয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রেই



ঐ রং অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণের সাহায্যে কিরাইয়া আনা যায়। ক্লোরিন ব্যবহারে রং নষ্ট হইলে উহা আর কিরাইয়া আনা যায় না।

**বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে :—**

(১) কাপড়খানি কোন শ্রেণীর তন্তু দ্বারা নির্মিত তাহা জানা কর্তব্য; কারণ, অপসারক দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে।

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জানা প্রয়োজন। ভুল অপসারক দ্রব্য ব্যবহারে অনেক সময় দাগ না উঠিয়া একেবারে স্থায়ীভাবে বসিয়া যায়।

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানো অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য।

(৪) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল ব্যবহার করিবে না। গরম জলে কোন কোন দাগ স্থায়ীভাবে বসিয়া যায়।

(৫) কোনও রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্রব্যটি ঐ রং নষ্ট করিয়া ফেলে কিনা তাহা দেখা কর্তব্য। কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্য একটু অপসারক দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয়।

(৬) প্রথমে মৃদু অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করিবে। দাগ না উঠিলে তবেই উগ্র অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে।

(৭) দাগ উঠিয়া গেলে কাপড় হইতে অপসারক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে।

(৮) অপসারক দ্রব্য যদি আসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন লঘু ক্ষার দ্বারা প্রশমিত করিবে। অম্লরূপভাবে কোন ক্ষারযুক্ত অপসারক দ্রব্য লঘু আসিড দ্বারা প্রশমিত করিতে হয়।

(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাড়ি কাপড়খানি শুকাইয়া লইবে।

## দাগের শ্রেণী বিভাগ

( Classification of stains )

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কোন কোন দাগ, যথা—খি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চর্বি জাতীয় দাগের শ্রেণীভুক্ত, তেমনি উহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের প্রাণিজ দাগ-শ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে। মোমের ( Paraffin wax ) কথাই ধরা যাউক। ইহা পেট্রোলিয়াম হইতে উৎপন্ন এক বৈজ্ঞানিক মতে চর্বি জাতীয় পদার্থ নহে। ইহা প্রাণিজও নয় এবং উদ্ভিজ্জও নয়;

প্রকৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণীর দাগকে **খনিজ দাগ** বলাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ঘি, মাখন ইত্যাদি চর্বি জাতীয় দাগ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইহাও দূর করা যায়। বলিয়া মোমের দাগকে চর্বি জাতীয় দাগ বলা হয়। আবার ‘আয়োডিন’-এর দাগকে অনেকে **ধাতব দাগ** বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে অধাতু (non-metal) বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব দাগ—ইহাই বিজ্ঞানসম্মত।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দাগগুলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল :

(১) **উদ্ভিজ্জ দাগ** : ইহার উদ্ভিজ্জগৎ হইতে উৎপন্ন, যথা—

(ক) বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ—চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ—বাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজ দাগ** : ইহার প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন; যথা—রক্ত, কক, ডিম ইত্যাদির দাগ।

(৩) **তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ** : যথা—ঘি, মাখন, মোম, বিভিন্ন প্রকার তেল ইত্যাদির দাগ।

(৪) **রাসায়নিক পদার্থের দাগ** : রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে এই দাগের সৃষ্টি হয়; যথা—সিলতার নাইট্রেট, আয়োডিন বা টিংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ।

(৫) **রংয়ের দাগ** : যথা—লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল পলিশ প্রভৃতির দাগ।

(৬) **বিশেষ ধরনের দাগ** : যথা—লোহা বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ।

**বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী** : চা, কফি, কোকো, ইত্যাদি পানীয় দ্রব্যে ট্যানিন (tannin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। কাপড়ে এই জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণতঃ ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ট্যানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা বাদামী রং ধারণ করে, বিশেষতঃ সাবান জল দিয়া ঐ দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিলে আরও স্থায়ীভাবে কাপড়ে বসিয়া যায়। গরম ইষ্টির সংস্পর্শেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয়।

প্রথমে দাগযুক্ত অংশটিকে একটি শুষ্ক কাপড়ের প্যাড-এর উপর টান করিয়া চাপিয়া ধর। অন্ত একটি শ্রাকড়া জলে ভিজাইয়া এইবার ধীরে ধীরে ঐ দাগের উপর বসিতে থাক। দাগের বাহিরের দিক হইতে বৃত্তাকারে বসিতে বসিতে উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার বসিবার পরও যদি মিলাইয়া না যায় তবে শ্রাকড়াটি একটি সম্মপরিমাণ অ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণে ভিজাইয়া পুনরায় ঐরূপে বসিতে থাক।

কয়েকবার ঘষিবার পর কয়েক ফেঁটা গ্লিসারিন ঐ জায়গায় ঢালিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া রগড়াইয়া দাও। আধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেল। দাগ সম্পূর্ণ না মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢালিবে। বস্ত্রটি রেশম বা পশমের হইলে ফুটন্ত জল না ঢালিয়া ঈষৎ জল প্রয়োগ করিবে ; অনেক সময় ট্যানিনের দাগ উঠিয়া গিয়া জায়গাটিতে একটি তৈলাক্ত ভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি গ্রাকডায় কার্বন টেট্রাক্লোরাইড মাখাইয়া ঘষিয়া দিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। এইভাবে সুতি, রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায়।

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। রেশম ও পশমের বস্ত্রে ঐ দাগযুক্ত স্থানে একটি গ্রাকডা হাইড্রোজেন পারক্সাইড-এ ভিজাইয়া কয়েকবার ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। ইহাতেও দাগ না উঠিলে দাগযুক্ত স্থানটি জলে ভিজাইয়া বোরাক্স পাউডার উত্তমরূপে মাখাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল।

রঙিন বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ। ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠিয়া গেলে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

**সুতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পুরানো দাগ :** জাভেলী অপসারকের ( Javelle water ) মধ্যে এক মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে কাপড়খানি কিছুক্ষণ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপো'র দ্বারা ধুইয়া রাখিলেই দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

**জাভেলী অপসারক কখনও রেশম, পশম বা রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করিবে না।** কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন ঐ জাতীয় কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

**জাভেলী অপসারক প্রস্তুতি :** প্রায় আধ সের ঠাণ্ডা জলে এক পোয়া কাপড়কাচা সোডা গুলিয়া উহাতে আধ পোয়া ব্লিচিং পাউডার ধীরে ধীরে নাড়িয়া মিলাইয়া লও। দ্রবণটিকে একটি পরিষ্কার গ্রাকডায় ছাকিয়া একটি আট ছিপিয়ুক্ত বোতলে ভরিয়া রাখ।

**সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো দ্রবণ প্রস্তুতি—**প্রায় এক পো জল চা চামচের দুই চামচ ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উহাতে অর্ধ চামচ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপো' দ্রবীভূত করিলেই এই দ্রবণ প্রস্তুত হইবে।

**বিভিন্ন প্রকার কলের দাগ উঠাইবার প্রণালী :** কলের রসের দাগ টার্টার থাকিতেই উঠাইতে হয়। অধিকাংশ কলের দাগ ফুটন্ত জলেই উঠিয়া যায়। কাপড়খানি সুতি বা লিনেনের হইলে একটি গামলার মুখে উহা আঁট করিয়া পাতিয়া

উপর হইতে ঐ দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে থাক ; দাগ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে। পশম বা রেশমের বস্ত্রে ফুটন্ত জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের দাগ, যথা—জাম ফলের দাগ সাবান ব্যবহারের ফলে স্থায়ী দাগে পরিণত হয়। আঙুর, কমলালেবু বা সাইট্রাস ফলের ( Citrus fruits ) দাগ গরম সাবানজল ব্যবহারে অনায়াসেই উঠিয়া যায়। যে সকল ফলের দাগ গরম বা ফুটন্ত জলে উঠে না, তাহা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া মিসারিন বা soapless shampoo ভাল করিয়া মাখাইয়া উত্তমরূপে রগড়াইতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড মাখাইয়া দুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যায়। সাদা, রঙিন, পশম, সূতি ইত্যাদি যে কোন প্রকার কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ উঠানো যায়।

দাগ পুরানো হইলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব বর্ণিত উপায়ে রেশম এবং পশমের বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স ব্যবহার করিয়া এবং রঙিন বস্ত্রে শুধু বোরাক্স ব্যবহার করিয়াই দাগ উঠাইতে পারা যায়। সূতি, লিনেন ও রেয়নের কাপড়ে ঐ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট-এর দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক-পোয়া ঈষৎ গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ হাইড্রো সালফাইট গুলিয়া এই দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় ফলের রসে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। সেইক্ষেত্রে ঐ রং চটা অংশটি অ্যামোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে রং ফিরিয়া আসে। অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে ঐ অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্রবণ লাগাইলেও ঐ রং ফিরিয়া আসিবে।

ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ উঠাইবার প্রণালী : যদি কাপড়খানি সূতি বা লিনেনের হয় তবে ঐ দাগটি সাবান এবং গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ সাবান জলে না উঠিলে ব্লিচিং অপসারক ব্যবহার করিবে। দাগটি প্রথমে জাভেলী দ্রবণে এবং পরে 'হাইপো'র দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। ইহাতেই সূতি, লিনেন এবং রেয়নের কাপড় হইতে দাগ মিলাইয়া যাইবে।

রঙিন কাপড়ের দাগ প্রথমে গরম জল এবং সিনথেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার-এর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে। দাগ না উঠিলে বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল অথবা বোরাক্স পাউডার একটু গরম জলে গুলিয়া উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ।

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিবে না। সিনথেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার এবং ঈষদুষ্ণ জলে প্রথমে দাগটি ধুইয়া ফেল। ইহাতে

দাগ না উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং শেষে বোরাক্স পাউডার ব্যবহার করিবে।

**রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী :** দাগযুক্ত কাপড়খানি কয়েকবার ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া দাও। কখনও অত্যধিক গরম বা ফুটন্ত জল ব্যবহার করিবে না। টাটকা দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া যাইবে। দাগটি পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। প্রায় পাঁচ সের জলে বড় চামচের দুই চামচ অ্যামোনিয়া মিশাইয়া এই লঘু দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হয়। অ্যামোনিয়ার দ্রবণের পরিবর্তে প্রায় পাঁচ সের জলে দুই কাপ লবণ গুলিয়া ঐ জলেও কাপড়খানি ভিজাইতে পার। ইহাতে দাগটি আলগা ও নরম হইয়া আসিবে। এখন সাবান এবং ঈষৎ গরম জলে কাচিয়া দিলেই দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে। খুব পুরানো দাগ উঠাইতে অনেক সময় ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। একটি ছাকড়া হাইড্রোজেন পারক্সাইডে ভিজাইয়া ঐ দাগের উপর বৃত্তাকারে ঘষিয়া দাও। ইহাতেও দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ কেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। **রঙিন কাপড়ে পারক্সাইডের পরিবর্তে বোরাক্স ব্যবহার করিবে।** এইরূপে **সূতি, লিনেন, রেশম, পশম, সাদা, রঙিন যে কোন কাপড়ের দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

**কঙ্কাল ইত্যাদি জল ধোওয়া ঠিক নয়।** উহাতে রক্তের দাগ লাগিলে স্টার্চ এবং ঠাণ্ডা জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়া ঐ জায়গায় লাগাইতে হয়। মলমটি শুকাইয়া আসিলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশ দ্বারা ঐ মলম পরিষ্কার করিতে হয়। এইভাবে কয়েকবার মলমটি লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

**তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী :** সূতি এবং লিনেনের কাপড় হইলে দাগটি সাবান এবং গরম জল দিয়া ঘষিয়া দিলেই উঠিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শোষক দ্রব্যের ( absorbents ) সাহায্যেও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে পারে। দাগের উপর চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল জাতীয় দ্রব্যটি ঐ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার পাউডার ব্যবহার করিলেই দাগটি প্রায় মিলাইয়া আসিবে। আবার ঐ দাগটি ব্লিচিং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি চালিয়া ধরিলেও ঐ তৈল জাতীয় পদার্থ ঐ ব্লিচিং পেপারে চলিয়া আসিবে এবং দাগটি মিলাইয়া যাইবে। অ্যাসিটেট রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেট্রল এবং বেনজিন দ্বারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানো যায়। দাগযুক্ত স্থানটি একটি পরিষ্কার ছাকড়ার প্যাডের উপর রাখিয়া আর একটি ছাকড়া উক্ত তরলে ভিজাইয়া ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঐ দাগের উপর ঘষিলেই দাগটি মিলাইয়া যাইবে। দাগটি তরলে ভিজাইয়া

রাখিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়। চকের গুঁড়া, গরম ইত্ৰি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে অবশিষ্ট দাগটুকু এই প্রকার তরলের দ্বারা উঠাইতে হয়। **রেশম, পশম, সূতি, লিনেন, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠাইতে পারা যায়।**

**আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী :** সূতি এবং লিনেনের কাপড়ে আয়োডিনের দাগ লাগিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাবান-জল দিয়াই উঠাইতে পারা যায়। দাগ পুরানো হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি শ্রাকড়া অ্যালকোহলে ভিজাইয়া ঐ দাগের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয়। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং রঙিন কাপড়ে অ্যালকোহলের লঘু দ্রবণ (একভাগ অ্যালকোহল দুইভাগ জল) ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা একটি হাইপোর দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে।

**বিভিন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী—**অধিকাংশ রংয়ের দাগই ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া যায়। সূতি এবং লিনেনের কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে ব্লিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং পরে বোরাক্স ব্যবহার করিয়া দেখিবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং ‘হাইপো’ ব্যবহার করিবে। রেশম, পশম ও রঙিন কাপড়ে জাভেলী দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না।

**নেল পলিশ (Nail Polish) উঠাইবার প্রণালী :** একটি শ্রাকড়ায় অ্যাসিটোন মাখাইয়া ঐ দাগটি ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঘষিতে থাক। দেখিবে দাগটি মিলাইয়া যাইতেছে। অ্যাসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে অ্যাসিটোন ব্যবহার করা চলিবে না। নিম্নলিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দাগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে।

দাগটিকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা পেট্রল এবং পরে কয়েক ফোঁটা অ্যামাইল অ্যাসিটেট দিয়া ভিজাইয়া একটি শ্রাকড়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘষিয়া দিলেই উহা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে।

**লোহা বা মরিচার দাগ উঠাইবার প্রণালী :** একটি ফুটন্ত জলের পাত্রের মুখে দাগ সমেত কাপড়খানি আঁট করিয়া পাতিয়া লও। একটি কাগজি লেবুর রস নিংড়াইয়া ঐ দাগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া ফেল। এইভাবে কয়েকবার লেবুর রস দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেশী লাগিলেও কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরানো হইলে উহাতে কিছু লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লও। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। ইহাতেও দাগ না উঠিলে এক-পোয়া জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া পরম

করিয়া লও এবং ঐ গরম দ্রবণে দাগটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। দাগ উঠিয়া গেলে কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। রঙিন কাপড়ের রং চট্টয়া গেলে উহাতে অ্যামোনিয়া বা বাইবার সোডার লঘু দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আসিবে।

**এইরূপে রেশম, পশম, সাদা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।**

**ঘামের দাগ উঠাইবার প্রণালী :** অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার দাগ পড়ে। দাগটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাখিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে মেলিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উঠিয়া যায়। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে না। সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাউডার ঐ আর্দ্র দাগের উপর ছড়াইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। বোরাক্সের পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণেও দাগটি ভিজাইয়া রাখিলে উহা উঠিয়া যাইবে। **এইভাবে রেশম, পশম ইত্যাদি যে কোন কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।** হুতি এবং লিনেনের দাগ সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইটের দ্রবণে ভিজাইয়াও উঠাইতে পারা যায়।

অনেক সময় **রঙিন জামা-কাপড়ে** ঘামের দাগ লাগিয়া রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে ঐ দাগটি জলে ভিজাইয়া অ্যামোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধরিলেই রং ফিরিয়া আসিবে। দাগ পুরানো হইলে অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে একটি ভিনিগার লাগাইতে হয়।

**কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী :** বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন। স্বতরাং একই প্রণালীতে সকল প্রকার দাগ দূর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রণালীর সাহায্য লইতে হয়।

**ইন্ডিয়া বা ড্রইং কালি ( India or drawing ink ) :** দাগসমেত কাপড়খানি একটি গ্রাকডার প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া উহার উপর কয়েক ফোঁটা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেনজিন দাও। একটি গ্রাকডার সাহায্যে দাগটি বৃত্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও। কয়েকবার এইভাবে ঘষিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে। পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট ও জল দিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। **এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড়ের দাগ উঠানো যায়।** হুতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গাঢ় সাবান জল এবং অ্যামোনিয়ার দ্রবণে রগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়া যায়।

**ছাপার কালি ( Printing ink ) :** দাগসমেত কাপড়খানি তুর্পিন তেলে ( Oil of turpentine ) কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে কাপড়খানি নিংড়াইয়া দাগটি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন বা পেট্রল-এর গ্রাকডায় ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। **এইরূপে সকল প্রকার কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায়।**

চটের খলে হইতে দাগ উঠাইতে হইলে খলোটি কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে সাবান জলে কাচিয়া রোস্ত্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

**লিখিবার কালি ( Writing ink ) :** কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্লটিং পেপারে উহা যথাসম্ভব শুষিয়া লইতে হয়। পরে চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ পাউডার কয়েকবার ঐ দাগে লাগাইয়া একটি ব্রাশ দ্বারা বাড়িয়া ফেলিলেই কালি উঠিয়া যাইবে। দাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে অ্যালকোহলের একটি মলম লাগাইতে হইবে। একভাগ জল এবং একভাগ অ্যালকোহলের মিশ্রণে চকের গুঁড়া বা টেলকম পাউডার মিলাইয়া একটি মলম প্রস্তুত কর। এই মলম দাগের উপর লাগাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শুকাইয়া গেলে ব্রাশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। এইভাবে কয়েকবার মলম লাগাইয়া বাড়িয়া ফেলিলেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। এই প্রণালীতে সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায়।

সূতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ মিসারিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও উঠিয়া যায়।

কোন কোন কালির দাগ উঠাইতে অক্সালিক অ্যাসিড ব্যবহার করিতে হয়। এক পোয়া ফুটন্ত জলে তিন চামচ অক্সালিক অ্যাসিড গুলিয়া উহাতে দাগটি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া অ্যামোনিয়ার দ্রবণে প্রশমিত করিতে হয়। এইরূপে রেশম, পশম, রঙিন বস্তাদি হইতে কালির দাগ উঠাইতে পারা যায়।

**সূতি, লিনেন এবং রেশমের কালির দাগ খুব দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জাভেলীর দ্রবণ ব্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে।** রঙিন সূতির বস্তাদিতে এই দ্রবণ ব্যবহার করা চলিবে না। উহা অক্সালিক অ্যাসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয়।

**রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে কয়েকটি সাবধানতা :** তোমরা বিভিন্ন প্রকার কাপড় হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ কি ভাবে উঠাইতে হয় পড়িলে। ইহাদের মধ্যে রঙিন কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, দাগের সঙ্গে সঙ্গে অপসারক দ্রব্যসমূহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং কি কি অপসারক দ্রব্যাদি কাপড়ের রং নষ্ট করিতে পারে তাহা জানিলে তোমরা সহজেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে।

**সাধারণতঃ** উগ্র-স্ফারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। তাই স্ফারয়ুস্ত সাবান, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার পূর্বে রঙিন কাপড়ের এক প্রান্তে ঐ সাবান বা সোডা ঘষিয়া দেখিবে যে রং উঠিয়া যাইতেছে কিনা। যুঁহু সিন্থেটিক আঙ্গকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল ডিটারজেন্ট নির্ভয়ে রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শোধক দ্রব্যাদি, যথা—চকের গুঁড়া, টেলকম



পাঁউডার, স্টার্চ ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষতি করে না। হুতরাং সম্ভব হইলে ইহাদের সাহায্যে দাগ তুলিতে চেষ্টা করিবে। অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে অ্যালকোহল, ইথার এবং অ্যাসিটোন ব্যবহারে কাপড়ের রং নষ্ট হইয়া যায়। হুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার না করাই ভাল। একভাগ অ্যালকোহল এবং দুইভাগ জল একত্রে ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পেট্রল, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন, তার্পিন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। হুতরাং রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ উঠাইতে অনেক সময় বিভিন্ন অ্যাসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মৃদু অ্যাসিড সাধারণতঃ রঙিন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশীক্ষণ ঐ অ্যাসিডের সংস্পর্শ থাকিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লেবুর রস, ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে রং চটয়া গেলে কাপড়ের ঐ স্থানটি অ্যামোনিয়াম একটি খোলা বোতলের মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। লঘু বা মৃদু ক্ষার অল্প সময়ের মধ্যে রঙিন কাপড়ের ফোন ক্ষতি করে না। যদি রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে ঐ জায়গায় একটু ভিনিগার লাগাইয়া দিলেই রং অনেক সময় ফিরিয়া আসে। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের মধ্যে জাভেলী অপসারক ক্ষতিকারক। ইহা ব্যবহারে রং স্থায়ীভাবে উঠিয়া যায়। রঙিন কাপড়ের পক্ষে বোরাক্সই সর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ। ইহাতে রং চটয়া যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণও অল্প সময়ের জন্য রঙিন কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

**অপসারক দ্রব্যাদি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা**—ইহা ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখিও কাছাকাছি যেন কোনও অগ্নিশিখা না থাকে। ইহা সহজেই গ্যাস হইয়া যায়। তরল এবং গ্যাসীয় ইথার সহজেই জলিয়া উঠে। পেট্রল, বেনজিন, তার্পিন তেল, অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে জলিয়া উঠে। হুতরাং খুব সতর্কতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে। বিভিন্ন অ্যাসিডের মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড বিষাক্ত এবং ইহা হাতে ধরিলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলিবে।

বিভিন্ন প্রকার দাগ উঠাইবার জন্য যে যে প্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

দাগ	দাগের অবস্থা	স্থিতি ও গিনেনের সাদা বস্ত্র	স্থিতি ও গিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও গশম (সাদা ও রঙিন) (১) সাদা বস্ত্রের অত্মরূপ	রেশম, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি সাদা বস্ত্রের অত্মরূপ
পানীয়ের দাগ (চা, কফি, কোকো 'ইত্যাদি)	নতুন	(১) জল (২) জল ও অ্যালকো- হলের মিশ্রণ (৩) গ্লিসারিন (৪) কার্বন টেট্রাক্লো- রাইড (৫) জাভেলী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) সাদা বস্ত্রের অত্মরূপ	(১) হাইড্রোজেন পার- স্বাইড ও বোরাক্স পাউডার (সাদা বস্ত্রে) (২) বোরাক্স পাউডার (রঙিন বস্ত্রে)	
	পুরাতন	(১) ফুটন্ত জল (২) গরম সাবান জল (জাম কলের লাগে সাবান ব্যবহার করিবে না) (৩) গ্লিসারিন এবং তিনি- গার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) গরম জল (২) গ্লিসারিন এবং তিনি- গার বা অক্সালিক অ্যাসিড	(১) ঈষদুষ্ণ জল (২) গ্লিসারিন এবং তিনিগার বা অক্সালিক অ্যাসিড	রেশম ও গশম বস্ত্রের অত্মরূপ
বিভিন্ন প্রকার ফল, মদ (wine), ভাবের জল ইত্যাদির দাগ	নতুন				রেশম ও গশম বস্ত্রের অত্মরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	স্থিতি ও শিননের সাদা বস্ত্র	স্থিতি ও শিননের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও গশম ( সাদা এবং রঙিন )	রেশম, নাইলন, ডেকন ইত্যাদি
ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ	পুরাতন	(১) জাতেনী অপসারক (২) সোডিয়াম হাইড্রো- সালফাইট	(১) বোরাক্স পাউডার	(১) হাইড্রোজেন পার- ক্সাইড ও বোরাক্স পাউ- ডার ( সাদা বস্ত্রে ) (২) বোরাক্স পাউডার ( রঙিন বস্ত্রে )	রেশম ও গশম বস্ত্রের অঙ্করণ
	নতুন	(১) সাবান ও গরম জল (২) জাতেনী অপসারক ও 'হাইপো'	(১) গরম জল ও সিন্থে- টিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স পাউডার (২) বোরাক্স পাউডার	(১) ঈষৎ জল ও সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট (১) হাইড্রোজেন পার- ক্সাইড ( সাদা বস্ত্রে ) ও বোরাক্স	রেশম ও গশম বস্ত্রের অঙ্করণ
রক্তের দাগ	নতুন পুরাতন	(১) ট্রাণ্ডা জল (১) অ্যামোনিয়ার দ্রবণ বা লবণ জল (২) হাইড্রোজেন পার- ক্সাইড (৩) বোরাক্স পাউডার	(১) ট্রাণ্ডা জল (১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার	(১) ট্রাণ্ডা জল (১) লবণ জল (২) বোরাক্স পাউডার (যে সকল বস্ত্র জলে ধুইলে নষ্ট হইয়া যায় তাহাতে স্টার্চের মতম লাগাইতে হয়)	(১) ট্রাণ্ডা জল (১) রেশম ও গশম বস্ত্রের অঙ্করণ

দাগ	দাগের অবস্থা	স্থিতি ও সিনেনের সাদা বস্ত্র	স্থিতি ও সিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেশম, নাইলন, ডেক্রন ইত্যাদি
তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ	নূতন	(১) গরম সাবান জল (২) চকের গুঁড়া, টেল- কম পাড়িয়ার বা স্টার্চ	সাদা বস্ত্রের অঙ্করূপ	(১) চকের গুঁড়া, টেল- কম পাড়িয়ার, বা স্টার্চ (২) নিউট্রাল ডিটারজেন্ট স্থিতি ও সিনেনের অঙ্করূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
	পুরাতন	(১) ব্লটিং পেপার ও গরম ইয়ি (২) কার্বন টেট্রাক্সো- রাইড, পেট্রল, বেনজিন	সাদা বস্ত্রের অঙ্করূপ		রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
আয়োডিনের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(২) সাবান জল	(১) আলকোহল	(১) অ্যালকোহলের কাষু দ্রবণ
	পুরাতন	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ	(১) 'হাইপো'র দ্রবণ
রংয়ের দাগ	নূতন	(১) সাবান জল	(২) সাবান জল	(১) ঈষৎ গরম জল ও নিউট্রাল ডিটারজেন্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
	পুরাতন	(১) জাভেলী দ্রবণ	(১) বোরাক্স পাড়িয়ার	(১) হাইড্রোজেন পার- ক্সাইড (২) বোরাক্স পাড়িয়ার	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	স্থিতি ও লিনেনের সাদা বস্ত্র	স্থিতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম ( সাদা ও রঙিন )	রেয়েন, নাইলন, ডেকেন ইত্যাদি
নেল পাশ	নূতন ও পুরাতন	(১) অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন	অ্যাসিটোন, ( অ্যাসিটেট রেয়েন ও ভিনিয়নের কাপড়ে কার্বন টেট্রাক্লো- রাইড ও অ্যামাইল অ্যাসিটেট ব্যবহার করিতে হয় ) ।
লোহার দাগ	নূতন পুরাতন	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি- লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (২) লবণ ও কাগজি- লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (১) লবণ ও কাগজি- লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড	(১) কাগজি লেবুর রস (২) লবণ ও কাগজি- লেবুর রস (২) অক্সালিক অ্যাসিড
ঘাসের দাগ	নূতন পুরাতন	(১) সাবান ও রৌদ্র (১) বোরাক্স পাউডার (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (৩) জাভেলী দ্রবণ	(১) প্রথমে অ্যামোনিয়াম লবু দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরপর লবু হাই- ড্রোজেন পারক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইপোসাল- ফাইটের দ্রবণে ভিজাইতে হইবে ( নূতন ও পুরাতন) (২) বোরাক্স পাউডার ও রৌদ্র	স্থিতি ও লিনেনের রঙিন বস্ত্রের অন্তরূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অন্তরূপ

দাগ	দাগের অবস্থা	স্থিতি ও গিনেনের সাদা বস্ত্র	স্থিতি ও গিনেনের রঙিন বস্ত্র	রেশম ও পশম (সাদা ও রঙিন)	রেশম, নাইলন, ডেকন ইত্যাদি
ইন্ডিয়া বা ড্রাইং কালি	নূতন	(১) কার্বন টেট্রাক্লো- রাইড বা বেনজিন	(১) সাদা বস্ত্রের অঙ্করূপ	(১) স্থিতি ও গিনেনের বস্ত্রের অঙ্করূপ	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
	পুরাতন	(১) গাঢ় সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) গাঢ় সাবান জল ও অ্যামোনিয়া	(১) ঈষৎ গরম জলে সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট	(১) রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
ছাপার কালি	নূতন ও পুরাতন	প্রথমে তার্পিন তেলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন বা পেট্রল প্রয়োগ করিতে হয়।	সাদা বস্ত্রের অঙ্করূপ	স্থিতি ও গিনেনের বস্ত্রের অঙ্করূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
নিষিবার কালি, (লাল, নীল, কাল, সবুজ ইত্যাদি)	নূতন	(১) ব্লুটিং পেপার (২) চকের গুঁড়া, টেল- কম পাউডার বা স্টার্ট (৩) অ্যালকোহল ও টেলকম পাউডারের মিশ্রণ	সাদা বস্ত্রের অঙ্করূপ	স্থিতি ও গিনেনের বস্ত্রের অঙ্করূপ	রেশম ও পশম বস্ত্রের অঙ্করূপ
	পুরাতন	(১) জাতিলী দ্রবণ	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) ব্লিচিং পাউডারের লঘু দ্রবণ	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড	(১) অক্সালিক অ্যাসিড (২) হাইড্রোজেন পারক্সাইড

N.B, কখনও কখনও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে সোডিয়াম পারবোরেটের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সোডিয়াম পারবোরেট জলের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সুতরাং ইহা হাইড্রোজেন পারক্সাইড অপেক্ষা উগ্রতর অশাসক।

## E. গৃহ-শুশ্রূষাকারিণীরূপে গৃহপরিচালিকা ( Home maker as a Home Nurse )

### 1. উত্তম শুশ্রূষাকারিণীর গুণাবলী

( Qualifications of a good nurse )

মানুষ মাত্রই উত্তম সেবক কিংবা সেবিকা হইতে পারে না। উত্তম শুশ্রূষাকারিণী হইতে হইলে কতকগুলি সহজাত গুণের অধিকারী হইতে হয়, আবার কতগুলি গুণ তাহাকে অর্জন করিতে হয়। দৈর্ঘ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, সেবার ইচ্ছা এবং স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তাহার সহজাত গুণের অন্তর্গত।

১। দৈর্ঘ্য হইল শুশ্রূষাকারিণীর প্রথম ও প্রধান গুণ। অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষের মেজাজ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। রুগ্ন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা অত্যন্ত দুর্লভ কাজ এবং শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য সুস্থ ব্যক্তির সেবকদের চেয়ে কঠিন।

২। কষ্টসহিষ্ণুতা ও সেবার ইচ্ছা শুশ্রূষাকারিণীর অগুণ্যতম গুণ। প্রয়োজন হইলে রাত জাগিতে এবং অকম রোগীর নোংরা কাজগুলি করিতে তিনি যদি অনিচ্ছুক হন তবে তাহার পক্ষে রোগীর সেবা করা সম্ভব নয়।

৩। শুশ্রূষাকারিণীর মেজাজ হইবে শান্ত অথচ প্রফুল্ল। দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের ফলে রোগীর মন প্রায়ই বিমর্ষ থাকে। শুশ্রূষাকারিণী আপনার চিন্তের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দিয়া রোগি-চিন্ত সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবেন। এইজন্য শুশ্রূষাকারিণী রোগীর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করিয়া কাটাইবেন, অবসর সময়ে বই পড়িয়া শোনাইবেন।

উপরোক্ত সহজাত গুণগুলি ব্যতীত একজন শুশ্রূষাকারিণীর কতকগুলি অর্জিত গুণও থাকা চাই, যেমন—

১। বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠুরতা : এই দুইটির মধ্যে বিশ্বস্ততা অধিক বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসকের সমস্ত নির্দেশ তিনি নিষ্ঠুরভাবে পালন করিবেন। তাহার মৌখিক কিংবা লিখিত রিপোর্টের মধ্যে অসত্যের ছায়া পর্যন্ত থাকিবে না এবং অতি সামান্য কাজও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করিবেন। শুশ্রূষাকারিণীর কোন কাজে ভুল হইতে পারে এবং ভুল সর্বদা সংশোধন করা যায় কিন্তু নিজের ত্রুটি ঢাকিবার জন্য তিনি যদি অসত্য বলেন তবে তাহা ক্রমার অযোগ্য।

২। বাধ্যতা : চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য শুশ্রূষাকারিণীর অপর গুণ। তিনি তাহার কাজে কিংবা কথায় এমন কোন ব্যবহার দেখাইবেন না যাহাতে চিকিৎসক, বাড়ির লোকেরা এবং বিশেষতঃ রোগী তাহার প্রতি আস্থা হারায়।

৩। **সহানুভূতি :** রোগীর সহিত ব্যবহারে শুশ্রূষাকারিণীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইবে কিন্তু সেই সঙ্গে দৃঢ়তা থাকিবে। অবশ্য তিনি রোগীর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার প্রকাশ করিবেন না কিংবা তাহার ব্যবহারে ক্রোধ প্রকাশ পাইবে না। সজ্জের সীমা অতিক্রম করিলেও তিনি স্থিরভাবে তাহার কর্তব্য সমাধা করিবেন এবং কল্পনায় নিজেকে সর্বদা রোগীর আসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন।

### শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য

মাহুমমাজেরই একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য থাকে তেমনি নিজের প্রতিও তাহার কতকগুলি কর্তব্য থাকিয়া যায়। শুশ্রূষাকারিণীর বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তাহার কর্তব্যগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) নিজের প্রতি কর্তব্য ও (২) রোগীর প্রতি কর্তব্য।

**শুশ্রূষাকারিণীর নিজের প্রতি কর্তব্য :** রোগীর সেবা করিতে গিয়া শুশ্রূষাকারিণী নিজে যাহাতে কোনরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া না পড়েন এইজন্য তাহাকে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের প্রতি ইহাই তাহার সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। কোনরকম অসুস্থতা অনুভব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা জানাইবেন যাহাতে অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। হাতে কোন প্রকার আঁচড়, কাটা ক্ষত অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করিবেন। অবহেলা করিলে হাত বিবাক্ত হইতে পারে এবং দীর্ঘদিন রোগীর সেবা করিতে পারিবেন না। অসুস্থরূপে পাই দুইখানিকেও তিনি বিশ্রাম দিবেন। নিয়মিতভাবে দৈনিক স্নান করিবেন এবং হাত ও নখের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ যত্ন লইবেন।

শুশ্রূষাকারিণী স্বীয় কামরার জানালা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবেন এবং যতদূর সম্ভব খোলামেলা জায়গায় শয়ন করিবেন। সুযোগমত উন্মুক্ত স্থানে একটু ব্যায়াম করিবেন। যদি কাজ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া না থাকেন তবে কোন একটি শারীরিক পরিশ্রমের খেলা করা যুক্তিসঙ্গত। এই সব বিষয়ে মন আকৃষ্ট থাকিলে তিনি নানা চিন্তা ও উৎকণ্ঠা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবেন।

শুশ্রূষাকারিণী নিজের শারীরিক সুস্থতা ও সবলতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। নিয়মিতরূপে আহার করিবেন এবং আহাৰ্য সামগ্রী সহজ পরিপাচ্য এবং রুচিকর হইবে। অসময়ে আহার করিবেন না, দাঁত পরিষ্কার রাখিবেন এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের অবিলম্বে প্রতিকার করিবেন।

**রোগীর প্রতি কর্তব্য :** একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য



ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন—স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(২) পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজন—বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত।

(৩) চিকিৎসাগত ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজন—

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগ নির্ণয়,

(খ) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধ পথ্য লাভ,

(গ) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক শুশ্রূষা লাভ।

রোগীর প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় একজন শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্যগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর :—

(১) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি,

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি,

(৩) চিকিৎসকের প্রতি।

(১) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি : রোগ-কক্ষে নীরবতা রক্ষা করা শুশ্রূষাকারিণীর প্রথম ও প্রধান কাজ। শুধু যে বাহিরের গোলমালই রোগীকে গীড়িত করে তাহা নয়, শুশ্রূষাকারিণীর চলাফেরা ও কাজকর্ম, জামাকাপড়ের খসখসানি, জুতার মচমচ শব্দ, বাসনপত্রের ঠুং ঠাং আওয়াজ, দরজা-জানালা বন্ধ করিবার শব্দ রোগীর পক্ষে অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয়। তাই চলাফেরায় তিনি সাবধান ও সতর্ক হইবেন এবং স্বাভাবিক অনুচ্চস্বরে কথা বলিবেন।

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি : রোগীর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, নিয়মিত দাঁত মাজান, গা স্পঞ্জ করা, মাথা ধোয়ানো, রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া, বিছানা-পত্র পাল্টান, মলমূত্র ত্যাগ কবানো প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

শুশ্রূষাকারিণী রোগীর আরামের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। প্রয়োজনে রোগীর গায় হাত বুলানো কিংবা একটু বাতাস করা শুশ্রূষাকারিণীর অগ্রতম কাজ। তবে অতিরিক্ত মনোযোগও রোগীর পক্ষে পীড়াদায়ক হইতে পারে। বারংবার রোগীর বিছানা টানিলে কিংবা মাথার বালিশ সোজা করিয়া দিলে, গরম জলের ব্যাগ যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে রোগী বিরক্তি বোধ করে।

(৩) চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য : রোগীর সারা দিনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসকের নিকট পেশ করা এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন

করা শুশ্রূষাকারিণীর অগ্রতম প্রধান কাজ। চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগত প্রয়োজনেরই অন্তর্গত।

চিকিৎসক দিনে একবার আসেন। শুশ্রূষাকারিণী তাই একটি চার্টে রোগীর জ্বর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি, মলমূত্র ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবেন। রোগীর দৈনন্দিন অবস্থা একটি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিখিয়া রাখিবেন।

**পরিশেষ নির্বীজন :** রোগভোগ কালেই যে শুধু শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য থাকে তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ব থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব গুরুতর।

ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাব, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি নির্বীজিত করিয়া লইতে হয়। রোগি-কক্ষ নির্বীজিত করাও একান্ত প্রয়োজন।

রোগমুক্তির পর রোগীর দেহ নির্বীজিত করিয়া ফেলা শুশ্রূষাকারিণীর অগ্রতম কাজ। প্রথমে বিশোধিত সাবান দিয়া রোগী গাত্রমার্জনা করিয়া লইবে। তারপর গরম জলে লবণ অথবা ডেটল কিংবা পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া স্নান করিয়া ফেলিবে। শুশ্রূষাকারিণী নিজেও এইভাবে স্নান করিয়া ফেলিবেন।

## ২. রোগি-কক্ষ ( The sick room—choice of the room and its arrangement )

**রোগি-কক্ষ নির্বাচন :** উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে পারে তাহা দেখাই শুশ্রূষাকারীর প্রধান কাজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, ধূলিধূমবর্জিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ঔষধ, পথ্য এবং শুশ্রূষা যতখানি প্রয়োজনীয়, স্থ্যালোকও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয়। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, ‘আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগী চায় আলো।’ গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, প্রত্যেকটি রোগী তেমনি স্থ্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে। রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীকে সেই ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগি-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাতের পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্ট কিংবা অগ্নান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঐ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ ঐগুলি কাহারো নজরে আসে না।

২. **আসবাব-পত্রের সংস্থান :** প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগী-কক্ষ হইতে অপসারিত করিবে। দরজা জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বরশূন্য, জানালায় কোন নজা কিংবা জাক্রি কাটা থাকিবে না, কারণ তাহাতে ধূলাবালি মুকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই রোগী-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোগী নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-বাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় না লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর ঘরের জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে টেবিলে ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া মুড়িয়া দিবে। কঞ্চল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে পুরু ব্রাউন পেপার দিয়া কঞ্চল ঢাকিয়া দিবে।

### 3. রোগীর শয্যা

শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া। শয্যার পারিপাট্য দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশী পরিপাটি করিতে গিয়া যেন রোগীকে বিরক্ত করা না হয়। রোগীর শয্যা রচনার সাধারণ নিয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেকার চাদর যেন বেশ মশৃণ ও আঁটসাঁট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আচ্ছাদন হইবে হাল্কা ও ঢিলেঢালা। শয্যা রচনায় গুরুত্বপূর্ণতারূপে যদি অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করে তবে খুব অল্পায়াসে চমৎকার শয্যা রচনা করা যায়। অতিশয় পীড়িত ব্যক্তির শয্যা রচনার জন্য সর্বদাই দুই জন লোক চাই।

#### রোগীর শয্যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

- (১) ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া একটি খাট।
- (২) একটি শতরঞ্জি ;
- (৩) ২২ ইঞ্চি বা ৩ ইঞ্চি পুরু একটি ওয়াড়যুক্ত তোশক ;
- (৪) ১ গজ বা ২ গজ একটি ম্যাকিনটোশ ( Mackintosh ) ;
- (৫) দুইখানি চাদর—একখানি ম্যাকিনটোশের তলায় পাতিবার জন্য ( undersheet ) এবং অপরখানি ম্যাকিনটোশের উপরে পাতিবার জন্য ( drawsheet ) ;
- (৬) পরিষ্কার ওয়াড়যুক্ত দুইটি বালিশ ;
- (৭) গায়ে দিবার জন্য একটি সাফা চাদর ( Top sheet ) ;
- (৮) শীতকাল হইলে লেপ অথবা দুইটি হাল্কা কিন্তু গরম কঞ্চল।

**শয্যা রচনার নিয়ম ( Bed making without the patient ) :** খাটের উপরে শতরঞ্জি বিছাইয়া দাও। তোশকটিতে যেন ওয়াড় লাগানো থাকে। এইবার একটি চাদর তোশকের উপর পাতিয়া দাও। চাদরের কেন্দ্রস্থল যেন তোশকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। চাদরটি চারপাশে বেশ শক্ত করিয়া গুঁজিয়া দিতে হয় যাহাতে বিছানায় কোনরকম ভাঁজ না পড়ে। চাদরের কোণগুলি ঠিক এনভেলোপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া লইবে। এইরূপ কোণ করিলে চাদর বেশ আঁটসাঁট থাকে।

এইবার বিছানার উপরে ম্যাকিনটোশ বিছাইয়া দিবে। শিশু, বৃদ্ধ, অচেতন কিংবা মলমূত্রের বেগধারণে অক্ষম ( incontinent ) রোগীদের বিছানায় ম্যাকিনটোশ অপরিহার্য। এইবার সাদা একখানি চাদর দিয়া ম্যাকিনটোশ ঢাকিয়া দাও। ম্যাকিনটোশের ঠাণ্ডা ভাব সাধারণতঃ রোগীর ভাল লাগে না। তাই উহার উপরে একখানি চাদর পাতিয়া দুই পাশে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিবে। বালিশ দুইটি যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

তৃতীয় চাদরখানি দিয়া রোগীর দেহ ঢাকিয়া দিবে। রোগীর পায়ের দিকে তোশকের নীচে উহা আলতোভাবে গুঁজিয়া দিবে। কোণগুলি এনভেলোপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে, তাহা হইলে রোগী নড়াচড়া করিলেও গা হইতে চাদর খুলিয়া পড়িবে না। শীতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে দুইখানি হাল্কা অথচ বেশ গরম কবল চাপাইয়া দিবে।

**রোগীকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া শয্যা রচনা ( Bed making with the patient ) :** শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা পরিবর্তন করিতে হইলে দুইজন লোক দরকার। খাটের দুই দিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। চাদরের এনভেলোপের মত কোণগুলি প্রথম আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর গায়ের উপরকার সমস্ত আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিবে। এইবার প্রথম ব্যক্তি পরিষ্কার চাদর, ম্যাকিনটোশ লম্বালম্বিভাবে গোল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জগ্ন প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীকে একপাশে কাত করিয়া ধরিয়া রাখিবে। এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর একসঙ্গে গোল করিয়া গুটাইয়া অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ পাতিতে থাকিবে। বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদর পাতা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগীর কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাদর ও ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ প্রস্তুত টানিয়া পাতিয়া দিবে। সর্বশেষে চাদরের কোণগুলি এনভেলোপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিবে।

#### ৪. গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ( Home management and family health )

(i) মাতা এবং শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন (Medical care for mothers and infants )

**গর্ভবতী নারীর যত্ন :** শিশু গর্ভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাগত যত্নের প্রয়োজন দেখা দেয়। রুগ্ন ও দুর্বল নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদেহে ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং তাহার টক্সেমিয়া ( Toxemia ) ও ইক্ল্যাম্পসিয়া ( Eclampsia ) নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং গর্ভে আসিবার প্রাকালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইবে গর্ভস্থ ভ্রূণের। ইহার ফলে অপরিশ্রুত, বিকলাঙ্গ এমন কি মৃত সন্তানও জন্মিতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেমন ইক্ল্যাম্পসিয়া রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবেও ঐ রোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায়। গর্ভের প্রথম তিনমাস ২ পাউণ্ড, দ্বিতীয় তিনমাসে ৪ পাউণ্ড এবং শেষের তিন মাসে ৬ পাউণ্ড মোটামুটি এই হারে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইলেই গর্ভবতী নারী তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দৈনিক খাদ্যের ক্যালোরী বা তাপমূল্য কমানিয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে পারে। একজন গর্ভবতী নারীর প্রথম চিকিৎসাগত যত্নের মধ্যে পড়ে তাহার নিয়মিত ওজন লওয়া এবং তাহার জন্য যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

**খাদ্য :** খাদ্যের তাপমূল্য—গর্ভের প্রথম কয়েক মাস খাদ্যের তাপমূল্য স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে তাহার দেহের ওজন যদি স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে ( underweight ) তাহা হইলে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। গর্ভের নবম মাসে মোটাবলি জন্ম বৃদ্ধি পায়, এইজন্য এই সময় অধিক তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয় ( ২২০০+৩০০ ) কিন্তু গর্ভের শেষের দিকে আবার হাঁটা চলা ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কমিয়া আসে তখন তাহাকে একজন অল্প পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক নারীর স্বাভাবিক অল্পমূল্য অর্থাৎ ২২০০ ক্যালোরী তাপমূল্যের খাদ্য দিলেই চলিবে।

**প্রোটিন :** নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য গর্ভাবস্থায় নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হয়

এবং প্রোটিন প্রাণিক প্রোটিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। খাণ্ডে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকিলে টিউবেরিয়া রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে।

**খাতব লবণ :** ক্রণের অস্থি-র পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত খাতব লবণের প্রয়োজন। লোহাযুক্ত লবণের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর রক্তান্ধতা (anemia) রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দৈনিক খাণ্ডে যথেষ্ট লোহাযুক্ত খাতবের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদি হইতে এই সকল খাতব লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

**ভাইটামিন :** ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাণ্ডে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন 'ডি'-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইহার অভাবে ক্রণের অস্থি পরিপুষ্ট হইবে না। মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

ভাইটামিন 'এ' ও 'বি'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শরীর সুস্থ রাখিতে ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex) বিশেষতঃ ভাইটামিন 'বি' বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। খাণ্ডে এই সকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে গা-বমি করা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুলি দেখা যায় না। এই ভাইটামিন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করে। গর্ভের শেষ মাসে গভিনীর খাণ্ডে ভাইটামিন 'কে' যুক্ত খাণ্ডের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

একজন গর্ভবতী নারীর খাণ্ডে প্রতিদিন কিছু খাতবশস্য অর্থাৎ ভাত, রুটি ইত্যাদি দুধ, মাছ বা মাংস, সবুজ শাকসবজি, অম্লান্ত তরকারি, লেবু জাতীয় ফল, মাখন ও ১টি ডিম থাকা কর্তব্য।

**গা-বমি :** অনেক গভিণী নারীর প্রথম অবস্থায় গা বমির ভাব দেখা দেয়। সকালে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাতবসব, যথা—রুটি, চিনি, জেলী, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয়।

**চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখা ও মাথা ঘোরা :** এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে তাহার রক্তের চাপ পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ লইবে।

**হাত পা ফোলা :** হাত বিশেষতঃ পা ফোলা শুরু হইলে বুঝিবে তাহার শরীরে জল জমিতে শুরু করিয়াছে। ফোলা শুরু হইবামাত্র নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে—

- (১) তাহার খাত হইতে লবণ হ্রাস করিতে হইবে ;
- (২) তাহাকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে বলিবে ;
- (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াইয়া চলিতে নির্দেশ দিবে।

**মূত্র-পরীক্ষা :** গর্ভিণী নারীর মূত্র পরীক্ষা করাইয়া যদি এ্যালবুমিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে খাত হইতে প্রোটিন কমাইবে এবং ডিম বাদ দিয়া দিবে।

অকালে বাহাদের গর্ভপাত হয় পুনরায় গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিবে।

ভাবী মায়ের আরও কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে। তাহার বিশ্রাম, ব্যায়াম ও স্নানও হইবে উদ্দেশ্যপূর্ণ।

**বিশ্রাম :** ভাবী মায়ের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন। প্রতিদিন তিনি অন্ততঃ নয় ঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন এবং দিনের বেলাতেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চিত হইয়া বিশ্রাম লওয়া উচিত। সবারকম উৎকর্ষা ও কাজের চাপ হইতে তাহাকে রেহাই দিতে হইবে।

**ব্যায়াম :** বিশ্রাম যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমনি। ভাবী মাতা তাহার লঘু গৃহকর্ম করিয়া যাইবেন তবে কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলি তিনি করিবেন না। ধাহারা কোনরূপ গৃহকর্ম করেন না তাহাদের অবশ্য কিছু ব্যায়াম করিতে হইবে। সটান চিত হইয়া শুইয়া প্রথমে এক পা তারপর আরেক পা তুলিয়া রাখিয়া পায়ের আঙুলগুলি ছড়াইয়া দিবেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া পা নামাইয়া আনিবেন। পুনরায় চিত হইয়া শুইয়া পা দুখানি যতদূর সম্ভব ফাঁক করিয়া দিবেন, পরে শুটাইয়া আনিবেন এবং ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যায়াম চলাইবেন। উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে মাংসপেশী সবল ও নরম থাকে এবং প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় নী।

**স্নান :** স্নানের উদ্দেশ্য কেবল পরিষ্কার হওয়া নয়, গর্ভাবস্থায় স্নান টনিকের কাজ করে। ঈষদুষ্ণ জলে কিছুক্ষণ বসিয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গাত্র মার্জনা সহকারে স্নান করিলে দেহে রক্ত চলাচল হয় এবং ভাবী মায়ের মাংসপেশীর নমনীয়তা অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থায় শেষ মাসে বসিয়া স্নান করা নিষিদ্ধ কারণ এই সময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে এবং যোনিপথে জল প্রবেশের সঙ্গে কোন সংক্রামক পদার্থও শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। তাই এই সময় বর্ষণ স্নান বাঞ্ছনীয়। যে সকল স্থানে তাহার সুযোগ নাই সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নান করিতে হইবে।

গর্ভাবস্থার শেষের তিন চারি মাস কুচকি ও তলপেটে অলিভ অয়েল কিংবা সরিষার তেল গরম করিয়া মাখিলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং তলপেটে দাগ পড়ে না।

ভাবী জননী উপরোক্ত নিয়মে নিজ দেহের যত্ন লইবেন এবং সন্তান প্রসবের পর অন্ততঃ দুই দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে পূর্বকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবেন।

**সন্তানদানকারী মাতার চিকিৎসাগত যত্ন :** জন্মের পর অনেকদিন পর্যন্ত শিশু মায়ের স্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। খাওয়ার জন্ত মায়ের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। শিশুর এই খাওয়ার জন্ত মায়ের খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় নারী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে—(১) তাহার নিজের

দেহের অভাব পূরণের জন্য এবং (২) শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য। শিশুর জন্য মায়ের স্তনে যে দুধ সৃষ্টি হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। এক গ্রাম দুধের প্রোটিন প্রায় দুই গ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শিশুর খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। খাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর গ্রহণ করা দরকার। এই সময় নারীর ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। দেখা গিয়াছে দৈনিক একটি শিশুকে ১ পাউণ্ড দুধ পান করাইতে মায়ের ৬০০ ক্যালোরী তাপ বা শক্তি প্রয়োজন হয়। সুতরাং একজন স্তন্যদানকারী জননীর খাদ্যে প্রায়  $২২০০ + ৭০০ = ২৯০০$  ক্যা. তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়।

গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে যে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় দুধের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে। অতিরিক্ত তাপ বা শক্তির অভাব পূরণের জন্য মা তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী ভাত, রুটি, জেলী ইত্যাদি যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্য পরিবর্তন করিয়া পূর্বকার স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে নুতরা মেদ এবং চর্বি সৃষ্টি হইবে এবং obesity রোগের লক্ষণ দেখা দিবে।

মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপরোক্ত কারণে সন্তানের জন্মের পরে এবং স্তন্যদান বন্ধ করিবার পরে আবার ওজন লইয়া দেখিতে হয়।

**শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন :** ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই শিশুর চিকিৎসাগত যত্নের প্রয়োজন অল্পভূত হয়। শিশু মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে জননী যদি যথোপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ওজন বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া থাকে তবে শিশুরও উপযুক্ত চিকিৎসাগত যত্ন লওয়া হইয়াছে বলা যায়।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে চিকিৎসক ও দাত্তী তাহার প্রাথমিক যত্নের ব্যবস্থা করিবেন। তারপর জননীকে তাহার দৈনিক প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটাইতে হইবে। এই দৈনিক প্রয়োজন হইল প্রধানতঃ পাচক—উপযুক্ত আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম, আলো, উত্তাপ ও পরিচ্ছন্নতা। ওজন লইলেই বোঝা যাইবে শিশুর প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটিতেছে কিনা। একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর চিহ্ন হইল :

- (১) শিশুর ওজন বয়সের অনুপাতে যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে ;
- (২) মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও স্ফুটিত হইবে ;
- (৩) মল স্বাভাবিক ও নিয়মিত হইবে ;
- (৪) শিশু সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার স্থনিদ্রা হইবে।

সুতরাং চিকিৎসাগত প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে ওজন লওয়া। শিশুর অত্যন্ত চিকিৎসাগত প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে অনাক্রম্যতা শক্তি বা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা



সৃষ্টি করা। এইজন্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাথমিক টিকা, পোলিওর টিকা, ট্রিপল এ্যান্টিজেন, টি.এ.বি.সি. ও টাইফয়েডের ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি তাহার মধ্যে কোন অসুস্থতা দেখা যায় বা সব কিছু স্বাভাবিক থাকিয়াও তাহার ওজন ঠিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইতে হইবে।

## (ii) শিশুর অনাক্রম্যতা ও দাঁড়ের যত্ন

( Immunisation and dental care for children )

আমরা নানারকম রোগজীবাণুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছি। আমাদের দেহের শোণিতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা না থাকিলে মানুষ নানারকম রোগের কবলে পড়িয়া অচিরে প্রাণ হারাইত। কৃত্রিম উপায়ে টিকা দিয়া ব্যাধি প্রতিরোধ করার শক্তি আরও বাড়াইয়া তোলা যায়।

তোমরা জান যে সংক্রামক রোগের জীবাণু বা ভাইরাসের দেহে নিজ নিজ antigen নামে প্রোটিন থাকে। কোন রোগজীবাণু যখন দেহে প্রবেশ লাভ করে তখন উহা শরীরে বিষ ( toxin ) সৃষ্টি করে। ঐ রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাস যদি মৃত কিংবা দুর্বলীকৃত অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহে অল্পপ্রবেশ করান যায় তবে দেহ নিজের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বা antibody সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। এইভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শক্তিকে বলে অনাক্রম্যতা ( immunisation )। কতকগুলি রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা শক্তি অর্জন করার শৈশবই প্রকৃষ্ট সময়। সাধারণতঃ বসন্ত, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, টিটেনাস, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগের জন্য শিশুকে টিকা দেওয়া হয়।

(১) বসন্তের টিকা : বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর দেহের দুর্বলীকৃত ভাইরাস লইয়া শিশুর দেহে অল্পপ্রবেশ করান হয়। জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে একবার এবং তিন বছর পরে দ্বিতীয় বার টিকা দিতে হয়। তারপর প্রতি বছরই টিকা দেওয়া চলে। কেবলমাত্র প্রাথমিক টিকা ( Primary Vaccination ) দিবার পর প্রবল জ্বর, ষিচুঁনি এবং টিকার স্থানে প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। যত কম বয়সে প্রাথমিক টিকা দেওয়া যায় তত কম প্রতিক্রিয়া হয়।

(২) ট্রিপল এ্যান্টিজেন ( Triple Antigen ) : হুপিং কফ, ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্ঠকারের প্রতিষেধক টিকা। হুপিং কফের সঙ্গে ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্ঠকারের vaccine মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে Triple Antigen ; প্রাথমিক টিকা দিবার ২৩ মাস পরেই অথবা ছয় মাস বয়সে প্রথমবার ইনজেকশন দিতে হয়। এক মাস পর পর আরও দুইটি ইনজেকশন দিতে হয়। তারপর চার-পাঁচ বছর বয়সে একটি booster dose দিলেই চলে।

(৩) পোলিও বা শিশু পক্ষাঘাত ( Polio myelitis ) : যে জাতের ভাইরাস পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিতে অক্ষম ( non paralytic strains of polio virus ) এই জাতের ভাইরাস একখণ্ড চিনির মধ্যে পুরিয়া শিশুকে খাওয়ান হয়। ইহা Sabin Vaccine নামে পরিচিত।

ট্রিপল এ্যাটিজেন শেষ হইবার তিন চার মাস পরে কিংবা এক বছর বয়সে প্রথমবার এবং তিন মাস পর পর মোট তিনবার খাওয়াইতে হয়। সাত আট বছর বয়সে আবার একটি booster dose দিতে হয়।

উপরোক্ত প্রতিষেধক টিকাগুলি সর্বদা ৩।৪ মাসের ব্যবধান রাখিয়া দিতে হয় এবং উহাদের একসঙ্গে দেওয়া চলে না।

(৪) টি. এ. বি. সি. ( Typhoid, Paratyphoid A and B and Cholera ) : আজকাল টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড এবং কলেরারোগের জীবাণু মিশ্রিত করিয়া টি. এ. বি. সি. ইনজেক্সন দেওয়া হইতেছে। শিশুদেরও এই টিকা দেওয়া যায়।

(৫) বি. সি. জি. টিকা : প্রায় এগার বছর বয়সে বালক-বালিকার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় শরীরে েরাগ প্রতিরোধক antibody উপস্থিত আছে কি না। যদি না থাকে তবে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হয়, নতুবা দিবার প্রয়োজন নাই।

কালমেন্-গেরা ( Bacillus Calmette Guérin ) আবিষ্কৃত এই টিকা বিসিজি ( BCG ) নামে পরিচিত।

**শিশুর দাঁতের যত্ন :** জন্মের পূর্ব হইতেই শিশুর দাঁতের যত্ন শুরু হইয়া যায়। সন্তানসম্ভবা মায়ের খাণ্ডে সেজন্ত ক্যালসিয়াম, ভাইটামিন ডি, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। জননীর খাণ্ডের উপর শিশুর সাধারণ পুষ্টি ও দাঁতের সুস্থতা নির্ভর করে। জন্মের পর শিশুর নিজের দাঁতের দিকে নজর দিতে হয়। সাধারণতঃ ৫।৬ মাস বয়সে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং শেষ হয় বছর দুই বয়সে। প্রথম দাঁত যাহাকে আমরা দুধের দাঁত বলি তাহার সংখ্যা হইল বিশ। এই দুধের দাঁত পড়িয়া গিয়া প্রায় বারো বছরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং স্থায়ী আটাশটি দাঁত উঠিয়া যায়। বাকি চারটি বড় বা আক্কেল দাঁত ৩৫ আর্থ আর্থ অনেক পরে। দুধের দাঁতের সম্যক যত্ন নিতে পারিলে পরে স্থায়ী দাঁতও সুস্থ এবং সবল হয়। শিশুর দাঁত ভাল রাখিতে হইলে দাঁত পরিষ্কার রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্য এ ছুয়ের দিকেই সমান নজর দিতে হইবে।

(১) খাদ্য : সমগ্র দেহের মতই দাঁতের পুষ্টিও নির্ভর করে খাণ্ডের উপর। দেহে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ধাতবলবণাদির অভাব হইলে দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হয় না। বিশেষতঃ এ ও ডি ভাইটামিন দাঁতের পক্ষে অপরিহার্য। শিশুর দাঁত যাহাতে ভাল থাকে এইজন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, কলের রস ও কডলিভার অয়েল অথবা শার্ক লিভার অয়েল দিতে হইবে।

## গৃহশরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য

(২) **দাঁতের পরিচ্ছন্নতা :** অপরিষ্কার রাখিলেই দাঁত খারাপ হয় রোগ দেখা দেয়। আহারের পর ভাল করিয়া মুখ না ধুইলে মুখে খাদ্যকণা পচিয়া অন্ন সৃষ্টি করে এবং দন্তকত (caries) দেখা দেয়। তাছাড়া দাঁতের গোড়ায় লাল ও খাদ্যকণা জমিয়া থাকিলে মুখে সহজেই রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়। তখন দাঁত দিয়া পুঁজ ও রক্ত পড়ে। ইহাকে পাইওরিয়া (Pyorrhoea) বলে।

**ছোট শিশুদের দাঁত কিতাবে খারাপ হয় :** ছোট বাচ্চারা বিস্কুট, চকোলেট, আইসক্রীম ইত্যাদি জিনিস খাইতে ভালবাসে। এইসব জিনিসগুলি দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকে এবং তাহাদের দাঁত খারাপ করে।

**দাঁতের যত্ন :** দাঁত ওঠার আগে পর্যন্ত জলে কয়েক ফোটা লিস্টারিন দিয়া মুখ ধুইয়া দিতে হয়। দাঁত ওঠার পর প্রতিদিন দুইবার প্রত্যুষে ঘুম হইতে ওঠার পর এবং রাত্রে নিত্রা যাইবার পূর্বে আরেকবার বাচ্চার দাঁত মাজানোর অভ্যাস করাইবে। প্রথমে আঙুল দিয়া দাঁতের মাড়ি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। তারপর ব্রাশ কিংবা দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিতে বলিবে। ব্রাশের তুলনায় দাঁতনই উৎকৃষ্ট। সর্বদা ভাল জাতের মাজন ব্যবহার করিবে। তাছাড়া প্রতিবার আহারের পর ভুল করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলার অভ্যাস জন্মাইতে হইবে।

সম্ভব হইলে মাঝে মাঝে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল। দাঁত হইতে শরীরের বহু রোগ ধরা পড়ে। দাঁত যেন একটি ল্যাবরেটরি। একজন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক বলিয়াছেন দাঁত শরীরের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ। শরীরে কিছু হইলে মুখের ভিতর তাহার লক্ষণ মেলা সহজ আবার মুখের ভিতর কিছু হইলে শরীরে তাহার উপসর্গ দেখা যায়।

### (iii) গৃহে অসুস্থতার লক্ষণ চিনিবার উপায়

( Recognising symptoms of illness at home )

দৈনিক স্বাস্থ্যচন্দ্র্য বোধই অসুস্থতার বা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খাবারে অকচি ইত্যাদিরূপে এই স্বাস্থ্যচন্দ্র্য প্রকাশ পায়। আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাহাদের নিজ নিজ কাজ সুস্থভাবে সম্পন্ন করে তখন আমাদের দেহের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যবোধ আসে এবং আমরা তখন নিজেকে সুস্থ বলিয়া মনে করি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুস্থভাবে কাজ করিলে তাহাদের উপস্থিতি আমরা অনুভব করি না। আমাদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অনবরত সক্রিয় ও প্রসারিত হইয়া যথাক্রমে দেহে রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু আমাদের কখনো তাহাদের উপস্থিতি বা কাজের কথা মনে হয় না। কিন্তু ইহাদের কোন একটি যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে সেই অসুস্থ অঙ্গটি তাহার নিজের কার্য সুস্থভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, ফলে দেহের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং

আমরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অসুস্থ হুপিও রক্ত পরিচালনার কাজটি সুস্থভাবে পরিচালনা করিতে পারে না। ফলে বৃক্ক ব্যথা, বৃক্ক ধড়কড় করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া হুপিওর অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয়। তেমনি ফুসফুসটি অসুস্থ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয় এবং হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ফুসফুসের অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয়। এইরূপে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ হইতেই আমরা রোগলক্ষণ বুঝিতে পারি এবং লক্ষণসমূহের প্রকৃতি হইতে উহাদের চিনিতে পারা যায়। যে যে লক্ষণ দ্বারা উহাদের চিনিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। চিকিৎসকরাই কেবল কোন একটি রোগ সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহিণীরই যদি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তবে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া ওঠে না এবং সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে উহার প্রসার বন্ধ করা যায়। এইরূপ কয়েকটি সাধারণ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

**জ্বর :** দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলেই জ্বরের উপস্থিতি বোঝা যায়। জ্বর আবার নানাবকমের—সবিরাম জ্বর, অবিরাম সন্ধ্যা জ্বর, অবিরাম জ্বর, ঘুমঘুমে জ্বর, জ্বরের সঙ্গে আবার সর্দি-কাশি, গা হাত পা ব্যথা, গায়ে ফুসুড়ি অথবা র্যাশ দেখা দিতে পারে। এইসব বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত জ্বর বিভিন্ন রোগ সূচনা করে।

**সাধারণ সর্দি-কাশি :** নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি রোগের লক্ষণ।

**ইনফ্লুয়েঞ্জা :** জ্বরের সঙ্গে সর্দি কাশি ও গা ব্যথা থাকিবে।

**টাইফয়েড :** একটানা জ্বর চলিবে। ভোলের দিকে জ্বর কম থাকে এবং দুপুরের পরে বাড়িতে শুরু করে। নাড়ির গতি মৃদু এবং জিহ্বা অপরিষ্কার দেখা যায়।

দুই তিন দিন ধরিয়া যদি জ্বর না কমে এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইতে হয় কারণ ঐ জ্বর টাইফয়েডের দিকে বাইতে পারে।

**হাম :** জ্বরের সঙ্গে কিংবা জ্বর ছাড়াই দেহে র্যাশ দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক রাখিবে। শিশু ও বালকরাই সাধারণতঃ ইহার কবলে পড়ে।

**বসন্ত :** অল্প জ্বর, গা হাত পা ব্যথা, গায়ে দুই একটি ফুসুড়ি বাহির হইলে বসন্ত হইতে পারে মনে করিয়া রোগীকে পৃথক রাখা উচিত।

**ডিপথেরিয়া :** অল্প জ্বরের সঙ্গে গলা ব্যথা, মুখ দিয়া নাল পড়া, মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি থাকিলে ডিপথেরিয়া রোগের সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হয়। নতুবা রোগীর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

**বদহজম :** খাওয়ার পর খাণ্ড দ্রব্য হজম হইল না, বা সঙ্গে চোঁয়া ঢেকুর বদহজম নির্দেশ করে।

**কলেরা :** ভেদ-বমি যদি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ঘাম দিয়া রোগী ঠাণ্ডা হইয়া নিভেজ হইয়া আসে তবে উহা কলেরার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে।

**আমায় :** পেটে কামড় দিয়া পায়খানা হয়। ঘন ঘন পায়খানা কিন্তু মলের পরিমাণ কম, সঙ্গে মিউকাস, কখনও রক্তের ছিটায়ুক্ত বা দুর্গন্ধপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ আমায় রোগের সূচনা করে।

হুতরাং জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, হাঁচি-কাশি, পেট ফাঁপা, বারবার পায়খানা হওয়া, ভেদ-বমি ইত্যাদি কতগুলি সাধারণ রোগলক্ষণ। আরও নানাপ্রকার রোগলক্ষণ আছে কিন্তু সবগুলি একজন গৃহিণীর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। মোটের উপর কোন গুরুতর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেই উহা অসুস্থতার লক্ষণ মনে করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে আবার তাহাদের ক্রন্দন, চীৎকার ও মলের বর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

ম্যারাসমাস রোগে শিশুর নাকি হুসে ক্রন্দন করে। আবার মেনেনজাইটিস হইলে ভীষণ চীৎকার করে। অবশ্য ক্ষুধা পাইলে কিংবা জলভৃগু বোধ করিলেও তাহার ক্রন্দন করিয়া থাকে।

**মলের বর্ণ :** শিশুর খাণ্ডে প্রোটিনের আধিক্য ঘটিলে মল নরম, সবুজ এবং ছানার টুকরার মত হয়।

Sugar বেশী হইলে মল জলের মত এবং অল্প গন্ধযুক্ত হয়। মলদ্বারের পার্শ্বস্থ চর্ম উঠিয়া যায় এবং শিশু শূলবেদনা বোধ করে।

ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ বেশী হইলে মল নরম থাকে এবং ছানার মত সাদা টুকরা দেখা যায়।

মলের বর্ণ দেখিয়া জননী শিশুর খাণ্ড সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অসুস্থতা শব্দটি আজকাল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যহৃত হইতেছে। অসুস্থ বলিতে আজকাল আমরা দৈহিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক অসুস্থতাও বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ মানসিক ব্যাধি অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক অসুস্থতার চেয়ে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। গৃহের আবহাওয়া যাহাতে সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হয় এইজন্য গৃহিণীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা প্রাক্ষোভিক দৃন্দ দেখা দিলে গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হইবেন এবং ঐ জট ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন। প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ লইবেন।

(iv) গৃহে বৃদ্ধ ও অশক্তদের যত্ন করা

(Care of the old and infirm at home)

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্ন রাখা ভারতের পারিবারিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য।

বার্ধক্যকে মাহুবেস দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। এই সময় শিশুর মতই তাহার দেহ মন দুর্বল হয় এবং অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ফলে একটি শিশুর স্নানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেমন সতর্কতা পালন করিতে হয় গৃহে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্নের বেলাতেও অল্পরূপ নিয়মশৃঙ্খলা পালন করিয়া চলিতে হয়।

**খাদ্য :** বৃদ্ধবয়সে দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যের পরিমাণও এই সময় কমাইতে হয়। তেমনি বৃদ্ধের খাদ্যব্যবস্থায় তাহার দৈনিক ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সময় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণের জন্তই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়া খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে হয়। স্নেহপদার্থ হজমের শক্তিও এই বয়সে অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ কমাইয়া সহজপাচ্য স্নেহ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাকিবে। দুধের স্নেহ সহজপাচ্য। সুতরাং স্নেহের অভাব তেল, দালদা ইত্যাদি খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন প্রভৃতি হইতে পূরণ করাই ভাল। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও এই বয়সে কমাইতে হয়। বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, যথা—চিনি, মিশ্রি ইত্যাদি কম খাইয়া অল্প পরিমাণ রুটি, ভাত ইত্যাদির সাহায্যেই কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ কর্তব্য। বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ। খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবনকাল অধিক দিন স্থায়ী হয়। এইজন্ত দুগ্ধকে বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগ্ম রক্তাশ্রিতও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধের খাদ্যের অত্যাवশ্যক অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত। মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে এই উদ্বেগ সাধিত হইতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। সুতরাং বৃদ্ধের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ফলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শাক-সবজির পরিমাণ একটু কমাইয়া দেওয়া ভাল, কারণ শাক-সবজির চুষ্পাচ্য সেলুলোজ (cellulose) অজীর্ণ ও বদহজমের সৃষ্টি করিতে পারে। ফলমূল এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্ত্রের (cereals) অপেক্ষাকৃত যুগ্ম সেলুলোজই বৃদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে। এই সকল খাদ্যশস্ত্রের সহিত প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করিতে হইবে।

শারীরিক সুস্থতার জন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য দিতে হইবে—

এক পোয়া হইতে আধ সের দুধ,

৩-৪ আঃ বিভিন্ন ফল,

৩-৪ আঃ তরি-তরকারি,

.একদিন অন্তর একদিন ১টি করিয়া ডিম, কিছু মাছ, মাংস, কর্মলালেবু ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি' জাতীয় ফল,

সামান্য মিষ্টি, অভ্যাস অনুযায়ী চা বা কফি। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদি।

বুদ্ধের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং অজীর্ণতা নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে :

- (১) শাক-সবজি বা ফলের পরিবর্তে ইহার স্থান খাওয়া।
- (২) খাওয়া-দ্রব্য গরম অবস্থায় খাওয়া।
- (৩) খাওয়া-দ্রব্য তিন বারের পরিবর্তে ৪।৫ বারে অল্প অল্প খাওয়া।
- (৪) রাত্ৰিতে অল্প পরিমাণ এবং সহজপাচ্য খাওয়া।

(৫) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১ গ্লাস গরম দুধ পান করা। স্নেহজাতীয় খাওয়া, বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং ও অত্যধিক মিষ্টি জাতীয় খাওয়া-দ্রব্য বৃদ্ধবয়সে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সকল খাওয়া-দ্রব্য খাওয়া হইতে বাদ দিতে হইবে।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপরোক্ত নিয়মে খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সারাজীবন তাহার আহারের অভ্যাস যাহাই থাকুক না কেন বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু প্রতিদিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার রাত্ৰির খাওয়া হইবে অতিশয় লঘু, পরিমাণে অল্প এবং সহজপাচ্য। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই তিনি তাহার নৈশ আহার শেষ করিবেন এবং নৈশ ভোজনের পর অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা জাগিয়া থাকিবেন। ইহাতে ভাল হজম হইবে।

আহারের মতই বৃদ্ধ ব্যক্তিদের স্নানের নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। ঠাণ্ডার দিনগুলিতে তাকে স্নানের জন্য ঈষৎ জল দিতে হইবে। পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে পরিষ্কার, মসৃণ ও আরামদায়ক। পোশাক যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। সারাজীবন তিনি হয়ত বিশ্রামের স্বযোগ পান নাই অথবা তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কিন্তু বার্ধক্যে তাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর উপযুক্ত বিশ্রাম লইতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে ঘুম সাধারণতঃ কমিয়া আসে। তিনি অধিকরাত্রি জাগিবেন না এবং গৃহের একটি নির্জন ও আলোবাতাস-যুক্ত কক্ষে তাঁহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিদ্রা ও বিশ্রামের মত তাহার উপযুক্ত ব্যায়াম ও চিত্তবিনোদনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণই হইল উপযুক্ত ব্যায়াম। যতদিন তাঁহার সামর্থ্য থাকিবে তিনি একাই ভ্রমণ করিবেন, তবে প্রয়োজন হইলে তাঁহার ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী

ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিত্তবিনোদনের জন্ত ঘরে একটি রেডিও, কিছু ভাল পড়ার বই, ও পত্রিকা রাখা দরকার।

দৈনিক যত্নের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মানসিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে, গৃহের নানা ক্রিয়াকর্মে তাঁহাদের মতামত লইলে এবং অবসর সময়ে সকলে মিলিয়া দিনের কিছুটা সময় তাঁহার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মন শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে এবং নিরাপত্তাবোধ বিস্তৃত হয় না।

**অশক্ত ব্যক্তিদের যত্ন :** বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতই অশক্ত ব্যক্তিদের যত্নও গৃহকর্ম ও গৃহশুশ্রূষার অন্তর্গত। মানুষ কেবল বার্থকাবশতঃ অশক্ত হয় না, রোগগ্রস্ত হইয়া অকালেও অশক্ত হইয়া পড়িতে পারে। বৃদ্ধদের তুলনায় এইসব অশক্ত ব্যক্তিদের যত্ন করার ব্যাপারে আরও বেশী সতর্ক হইতে হয়। কারণ অশক্ত ব্যক্তিদের দিনের সমস্ত কাজগুলি করিয়া দিতে হয় এবং তাহার প্রতি সর্বদা নজর রাখিতে হয়। বিছানাতেই হয়ত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, বেড প্যান দিতে হয়। মলমূত্রের বেগধারণে যাহারা অক্ষম তাহাদের বিছানায় সর্বদা ম্যাকিনটোশ পাতিয়া রাখিতে হয় এবং অনবরত শুইয়া থাকার ফলে যাহাতে শম্ভ্যাক্ত বা বেড-সোর না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাছাড়া চিকিৎসক তাহার খাওয়া ও অত্যাগ্ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দেন সেগুলি যথাযথ পালন করিতে হয়।

5. দুর্ঘটনা, মচকানো, অস্থিভঙ্গ, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রক্তপাত, দহন, বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ, দংশন, হলবিদ্ধ করা, মুছা ও অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা।

( Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and fainting. )

গৃহে কিংবা পথে-ঘাটে চলিতে গিয়া আমরা নানাভাবে আঘাত পাইয়া থাকি। এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে এমন একটি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে দেহের কোন অঙ্গ মচকানো, অস্থিভঙ্গ কিংবা সন্ধিচ্যুতি ইত্যাদি নানাজাতীয় বিপদ দেখা দিতে পারে। প্রথমেই মচকানো সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

### মচকাইয়া যাওয়া ( Sprains )

মচকাইয়া যাওয়া আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থল, যেমন—পায়ের গোড়ালি, হাতের কঙ্গি, হাতের আঙুল ইত্যাদি আমাদের মাঝে মাঝে



মচকাইয়া থাকে। স্বভাবতঃই মনে প্রাণ জাগে মচকাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে? কোন আকস্মিক আঘাতের ফলে আমাদের হাড়ের সন্ধিস্থানের চারিদিককার স্নায়ুতন্তুর উপর অত্যধিক টান পড়িয়া স্নায়ুতন্তুগুলি অথবা সন্ধিবন্ধনীগুলি ( Ligaments ) ছিঁড়িয়া যায়। হাড় যদি না ভাঙে অথবা স্থানচ্যুত না হয় তবে হাড়ের সংযোগস্থলের এই তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যাওয়াকেই বলে মচকান ( Sprain )।

**মচকাইবার লক্ষণ :** (১) সন্ধিতে ব্যথা অসহ্য হইবে।

(২) সন্ধি নাড়াইবার চেষ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে।

(৩) মচকানো স্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিবে।

**প্রতিবিধান :** (১) রোগীকে মচকানো স্থানটি সামান্য তুলিয়া ধরিতে বল এবং উহা নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর।

(২) মচকানো স্থানটি উন্মুক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বান্ধ।

(৩) ব্যাণ্ডেজ ভিজাইয়া বাঁধিবে এবং শুকাইয়া আসিলে পুনর্বার ভিজাইয়া দিবে।

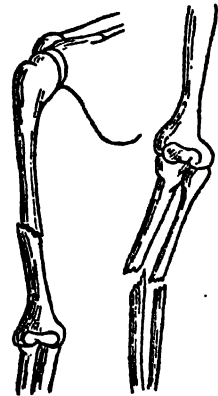
(৪) বাড়ির বাহিরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জুতা না খুলিয়া বাংলা ৪ সংখ্যার মত দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও।

## অস্থিভঙ্গ ( Fractures )

আকস্মিক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙিয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার নাম অস্থিভঙ্গ বা ‘ফ্রাকচার’। বিভিন্ন কারণে অস্থি ভাঙিতে পারে। অস্থি ভাঙিবার কারণ :—

(১) অস্থিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আঘাত লাগিলে উহা ভাঙিতে পারে। পতনের ফলে, চাকায় পিষিয়া কিংবা কোন ভারি জিনিসের আঘাত লাগিয়া নানাভাবে প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙিতে পারে।

(২) পরোক্ষ আঘাতেও অস্থি ভাঙিতে পারে। যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না ভাঙিয়া যদি অগ্র স্থানের অস্থি ভাঙে তবে তাহাকে পরোক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙা বলে। পায়ের উপর ভর দিয়া পতনের ফলে যদি হাঁটুর অস্থি ভাঙে তবে উহা পরোক্ষ অস্থিভঙ্গের পর্ষায়ে পড়ে।



সরল অস্থিভঙ্গ বিশ্ল অস্থিভঙ্গ

(৩) এতদ্ব্যতীত পৈশিক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের সংলগ্ন মাংসপেশীগুলির প্রবল সঙ্কোচন হয় এবং তাহার ফলে অস্থি ভাঙিতে পারে।

**বিভিন্ন প্রকারের অস্থিভঙ্গ :** অস্থি সর্বদা একরূপে ভাঙে না। অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ আছে :

(১) **সরল অস্থিভঙ্গ ( Simple or closed ) :** এইরূপ ভঙ্গে শুধু অস্থি ভাঙিয়া থাকে, আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না।

(২) **মিশ্র ভঙ্গ ( Compound or open ) :** এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থি ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং বাহিরের রোগজীবাণু ঐ ক্ষতস্থান দিয়া সহজেই আহত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে।

(৩) **জটিল ভঙ্গ ( Complicated ) :** এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শরীরযন্ত্র, যথা—মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল অস্থিভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে।

(৪) **বহু ভঙ্গ ( Comminuted ) :** একই অস্থি কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙিয়া যায়।

(৫) **পরস্পর সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ ( Impacted ) :** ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ 'অপর অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে।'

(৬) **গ্রীনস্টিক ফ্রাকচার ( Green stick fracture ) :** অস্থি না ভাঙিয়া থাকিয়া অথবা কাটিয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে।

(৭) **ডিপ্রেসড ফ্রাকচার ( Depressed fracture ) :** মাথার খুলি ভাঙিয়া নীচের দিকে বসিয়া যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার।

**অস্থিভঙ্গের লক্ষণ :** অস্থি ভাঙিলে আঘাতের স্থানটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে। ভগ্ন অস্থির চারিপাশে ফুলিয়া উঠিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভগ্ন অস্থি স্থানভ্রষ্ট হয় বলিয়া স্থানটি অসম ও অস্বাভাবিক দেখায়।

**অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান :** অস্থিভঙ্গে প্রতিবিধানকারিণীর প্রথম কাজ হইল আহত অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সহজ হয়। ব্যাণ্ডেজ ও স্প্লিন্ট এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে ভগ্ন অস্থিকে স্থিতিশীল রাখা যাইতে পারে।

**ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার :** ঠিক অস্থিভঙ্গের স্থানটিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে না। ব্যাণ্ডেজ কখনও এমনভাবে আঁট করিয়া বাঁধিবে না যাহাতে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হইতে পারে। গোড়ালি ও হাঁটু একসঙ্গে বাঁধিতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়া লইবে।

**স্প্লিন্টের ব্যবহার :** অভ্যাঙ্গস্থির উপরের ও নীচের সন্ধিস্থল মিলাইয়া বাঁধিবার জন্য স্প্লিন্ট (splint) ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ভগ্নস্থানের বস্তুর উপর স্প্লিন্ট বাঁধিবে এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও স্প্লিন্টের মাঝখানে প্যাড বা পটি দিয়া লইবে।

স্প্রিণ্ট যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি যে কোন শক্ত জিনিসই স্প্রিণ্টরূপে ব্যবহার করা চলে।

### দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিভঙ্গ

মাথা, হাত, পা, কোমর, মেরুদণ্ড, বুকের পাজরা ইত্যাদি দেহের নানা অংশ নানাভাবে ভাঙিতে পারে। অস্থিভঙ্গের পূর্ণ চিকিৎসা প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ইহার জন্ত সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয়। তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর অবস্থার যাহাতে অবনতি না ঘটে সেইজন্য পার্শ্ববর্তী লোকেরদের চেষ্টা করা উচিত।

**মস্তক ভঙ্গ (Fracture of skull) :** মস্তক ভঙ্গ এক গুরুতর অবস্থা। মস্তকের উর্ধ্বভাগ কিংবা নিম্নভাগ ভাঙিতে পারে। **উর্ধ্বভাগ** ভাঙিলে আহত স্থান ক্ষীত হইয়া ওঠে, শরীরে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী সংজ্ঞা হারায়। **নিম্নভাগ** ভাঙিলে রোগীর কান দিয়া একরকম তরল পদার্থ বাহির হয়, কখনও বা নাক দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে।

**প্রতিবিধান :** মাথা ও কাঁধে সামান্য উচু করিয়া ও ঠেস দিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও। মাথা একপাশে কিরাইয়া দিবে এবং কোন কান দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে কানের দিকে মাথা ঘুরাইয়া কানটি নীচের দিকে করিয়া রাখ। তারপর চিকিৎসককে সত্বর সংবাদ দাও।

**চোয়াল ভঙ্গ (Fracture of the jaw) :** চোয়ালের অস্থি ভাঙিলে রোগী কথা বলিতে, চোয়াল নাড়িতে এবং কোন কিছু গিলিতে বেদনা বোধ করে। তাহার মুখে বেশী থুথু আসে এবং থুথুর সঙ্গে রক্তের ছিটা দেখা যায়। আঘাত গুরুতর হইলে দাঁত স্থানচ্যুত হইতে পারে।

**প্রতিবিধান :** রোগীকে কথা বলিতে দিও না এবং সামনের দিকে খুঁকিয়া বসাও। একটি সফ্র ব্যাণ্ডেজ লইয়া কানের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দাও।

**মেরুদণ্ড ভঙ্গ (Fracture of spine) :** মেরুদণ্ড ভঙ্গ খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা।

**প্রতিবিধান :** রোগীকে শোয়াইয়া দাও এবং কোনরূপ নড়াচড়া করিতে দিও না। রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে জিহ্বা আটকাইয়া বাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখ। কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লও।

**পঞ্জর ভঙ্গ (Fracture of Ribs) :** বুকের পাজর ভাঙিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়। কাশির সঙ্গে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণা উপশমের জন্ত রোগী ঘনঘন ও অগভীর শ্বাস লইতে থাকে।

**প্রতিবিধান :** অস্থি ভাঙিয়া পত হইলে অস্থি স্থিতিশীল রাখিবার জন্ত বন্ধোদেশ

নেটন করিয়া দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। তারপর একটি স্লিং-এর সাহায্যে হাতখানি ঝুলাইয়া রাখিবে। ব্যথার উপশম না হইলে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিবে।

**হস্ত ভঙ্গ :** অগ্রবাহু এবং উর্ধ্ববাহু—এই দুই জায়গায় হাত ভাঙিতে পারে।

**অগ্রবাহু** ভাঙিলে উর্ধ্ববাহুর সঙ্গে সমকোণ করিয়া বৃকের উপর আড়া-আড়িভাবে হাতখানি রাখিতে হইবে। কমুই হইতে আঙ্গুল পর্যন্ত অগ্রবাহুর সামনে ও পিছনে স্পিণ্ট দিয়া লইতে পার। তারপর হাত ও কব্জি জড়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে এবং একটি স্লিং-এর সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখিবে।

**উর্ধ্ববাহু** ভাঙিলে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি বৃকের উপর রাখ, আঙ্গুলগুলি যেন বিপরীত দিকের কাঁধ স্পর্শ করে। বস্ত্রাদি অপসারণের প্রয়োজন নাই। বাহু ও বৃকের মাঝখানে প্যাড্জি দিয়া দুইটি চাওড়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া বৃকের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। তারপর স্লিং দিয়া হাত ঝুলাইয়া দিবে।

**কব্জি** ভাঙিলে উপরের নিয়মে প্রতিবিধান দিবে। তবে স্লিং দিয়া হাত ঝুলাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

**শ্রোণীচক্র ভঙ্গ (Fracture of the Pelvis) :** ইহা ভাঙিলে নিতম্ব ও কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। নড়াচড়া ও কাশিতে যন্ত্রণা বাড়ে। রোগী দাঁড়াইতে পারে না। অভ্যন্তরীণ রক্তস্রাব হইলে প্রস্রাবের রঙ কালো দেখায়।

**প্রতিবিধান :** হাঁটু সোজা রাখিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও। রোগী হাঁটু মুড়িতে চাহিলে হাঁটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়া দিবে। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

**উরু, জানুফলক এবং পদভঙ্গ (Fracture of the thigh bone, kneecap, and leg) :** ইহাদের যে কোন একটি ভাঙিলে আহত ব্যক্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে। আঘাতের স্থানে স্পিণ্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। ভগ্নস্থান নিয়া বেশী নড়াচড়া করিবে না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

**পিষ্ট পদ (Crushed foot) :** পা পিষ্ট হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে। ক্ষত দেখা দিলে জুতা খুলিয়া ফেলিবে। জুতা খুলিতে অস্ববিধা হইলে উহা কাটিয়া ফেলিবে। তারপর আহত পাখানি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং ক্ষতের চিকিৎসা চালাইবে। পা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য একটি স্পিণ্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

পায়ে ক্ষত না হইলে মোজা খুলিবার প্রয়োজন নাই। আহত পাখানি উঁচু করিয়া রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল।

**বেদনা (Pain) :** নানাকারণে এবং শরীরের নানা জায়গায় বেদনা দেখা দিতে পারে। ইহা কোন অস্বাভাবিক নয় তবে অস্বাভাবিক পূর্বলক্ষণ সূচনা করে। বাতের জন্য হাত-পায়ের গিটে, আবার অজ্ঞান, গুরুভোজন, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি কারণে অল্প কতকগুলি

রোগের পূর্বলক্ষণ হিসাবে পেটে বেদনা দেখা দিতে পারে। লক্ষণ অনুযায়ী বেদনার চিকিৎসা চালাইতে হইবে, যেমন কোষ্ঠকাঠিন্যজনিত বেদনায় কোন laxative-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরন্তু গুরুভোজন হইলে লেবুজল পান করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। বেদনার সঠিক কারণ বোঝা না গেলে সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

## কাটিয়া যাওয়া ( Cuts )

আমাদের দেহচর্ম কোন ধারাল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়া যাইতে পারে। এইভাবে শরীরের কোন অংশ আঁচড়াইয়া বা ছড়িয়া যাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এইরূপ আঘাতের প্রতিবিধান খুবই সহজ। পরিকার তুলা কিংবা বস্ত্রখণ্ডে আয়োডিন, বেঞ্জিন কিংবা ডেটল মাখাইয়া ক্ষতস্থানটিতে বুলাইয়া দিলেই নিশ্চিত হওয়া যায়। ক্ষতস্থানটি যদি অপরিষ্কার হয়, অথবা উহাতে ধারাল কাচ, পুরাতন ভাঙা টিন কিংবা কোন কাঁটা ফুটিয়া থাকে তবে প্রথমে সম্ভবপূর্ণে ঐ বিজাতীয় বস্তুটি বাহির করিয়া লইয়া পরিকার বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজাইয়া ধুলাবালি মুছিয়া লইবে। তারপর আয়োডিন কিংবা বেঞ্জিন মাখাইয়া তুলার প্যাড দিয়া আঘাতের স্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেই চলিবে। বিজাতীয় পদার্থ টি যদি বাহির করা সম্ভব না হয়, তবে আঘাতের স্থানের উপরে প্রথমে তুলা দিয়া তারপর উহার চারিপাশে প্যাড দিবে। ঐ প্যাড যেন ক্ষতস্থান হইতে যথেষ্ট উপরে থাকে। এইবার প্যাডের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

দেহচর্ম সামান্য কাটিয়া গেলে শক্তি হইবার কারণ নাই। কিন্তু আমাদের দেহের সর্বত্র কতকগুলি তন্তু ছড়াইয়া আছে। এই তন্তুগুলি যদি কোন কারণে কাটিয়া গিয়া ছিদ্র বা ক্ষত উৎপন্ন করে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, ছিদ্রপথ গভীর হইলে উহা দিয়া অবিরাম রক্তক্ষরণ হইতে থাকে এবং ঐ পথে নানারূপ রোগজীবাণু দেহে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। এইরূপ ক্ষত নানা প্রকারের :—

(1) কর্তনজনিত ক্ষত ( Incised wound ) : কোন ধারাল অস্ত্র, যেমন— ছুরি, বাঁটি, ক্ষুর বা ব্লেড দিয়া আমাদের শরীরের অংশবিশেষ কাটিয়া গিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে কর্তনজনিত ক্ষত। এইরূপ ক্ষতে সাধারণতঃ অবিরাম রক্তপাত হয়।

(2) ছিন্নভিন্ন ক্ষত ( Lacerated wounds ) : কলকজা, শেলের অংশ অথবা জীবজন্তুর নখের আঘাতে আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া কাটিয়া যায়। রক্তনালী-গুলি ছিন্নভিন্ন হয় বলিয়া উহাতে কর্তনজনিত ক্ষতের মত অবিরাম রক্তপাত হয় না।

(3) পিষ্ট হইয়া ক্ষত ( Contused wounds ) : ইহাতে ক্ষেঁড়নিত তন্তুগুলি ছিঁড়িয়া যায় না তবে খেঁতলাইয়া বা পিষ্ট হইয়া যায়। কোন ভোঁতা যন্ত্রের আঘাতে বা পেঘে পিষ্টকতের সৃষ্টি হয়।

দেহ এইভাবে পিষ্ট হইলে বা খেঁতলাইয়া গেলে ঝক্‌ হয়ত কাটিয়া যায় না কিন্তু

অকের অভ্যন্তরে কৈশিক নালী দিয়া প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। যে স্থানে আঘাত লাগে সেই স্থানটি নীল বর্ণ ধারণ করে এবং ক্ষীত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাকেই বলে কালশিরা ( Bruise )।

**কালশিরার প্রতিবিধান :** স্পিরিট ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া আঘাতের স্থানে ঠাণ্ডা সেক (compress) লাগাও। চোখে কালশিরা পড়িলে স্পিরিট ব্যবহার করিও না। শুধু জলপটি লাগাও।

(৪) বিদ্ধ ক্ষত (Punctured wound) : ইহাতে ক্ষতের মুখ ছোট কিন্তু খুব গভীর হইতে পারে। সাধারণতঃ হুচ, ছুরি, বন্দুকের ছুঁচলো অগ্রভাগের আঘাতে এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়।

### রক্তক্ষরণ ( Bleeding )

ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতস্থান দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। প্রতিবিধানকারীর এইক্ষেত্রে প্রধান কাজ হইল রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকিলে রোগীকে প্রথমমেই শোয়াইয়া দিবে এবং ক্ষতস্থানটি উঁচু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। তারপর যথাসম্ভব বস্তাদি অপসারণ করিয়া ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখিবে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে কিনা। রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা অপসারিত করিবে না। ক্ষতস্থানে ধুলাবালি লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইয়া কেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া ড্রেসিং করিয়া ফেলিবে।

আঘাতের পরিমাণ গুরুতর হইলে অনেক সময়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ সকল ক্ষেত্রে আঘাতের স্থানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে হয়।

#### (১) প্রত্যক্ষ চাপসৃষ্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

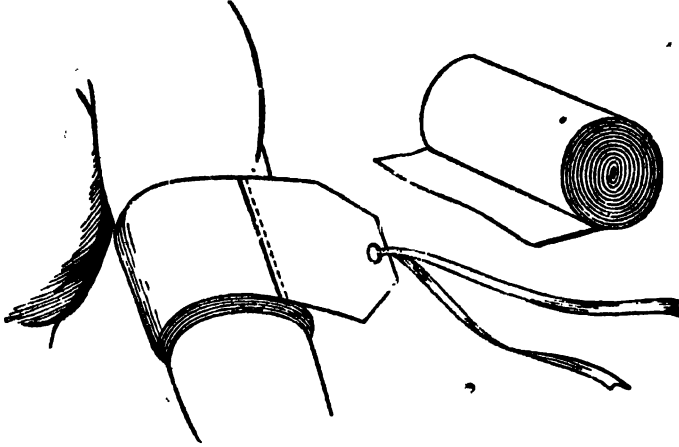
ক্ষতস্থানের যেখান হইতে রক্ত পড়িতেছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধর। যদি রক্তক্ষরণের স্থানটি দেখিতে বা ধরিতে পারা না যায় তবে সমগ্র ক্ষতস্থানটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিবে। এইরূপভাবে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ। রক্তক্ষরণ কমিয়া আসিলে আঘাতের স্থান ড্রেস করিয়া দিবে।

#### (২) পরোক্ষ চাপসৃষ্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষ চাপ বার্থ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যেমন ক্ষতস্থানে যদি কোন নিজাতীয় বস্তু থাকিয়া যায় তবে সেই সকল স্থানে পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। পরোক্ষ চাপ দুই প্রকারে সৃষ্টি করা যায়—(ক) প্রেসার পয়েন্ট চাপ দিয়া কিংবা (খ) কনট্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিয়া।

(ক) প্রেসার পয়েন্ট : রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্ত যেখানে কোন ধমনী কিংবা শিরাকে উহার ঠিক নীচেকার অস্থির উপর চাপিয়া ধরা যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে।

(খ) **কনষ্ট্রিক্টিভ ব্যাণ্ডেজ (Constrictive Bandage)** : ইহা এক প্রকার সরু ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে দুইটি সরু কিতা লাগান থাকে। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অত্যন্ত সহজ। ক্ষতস্থানের চারিপাশ ঘিরিয়া খুব শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়, নতুবা রক্তক্ষরণ আরও বেশী হইবে। পনের মিনিট পর ব্যাণ্ডেজ আলগা করিয়া দেখিতে



কনষ্ট্রিক্টিভ ব্যাণ্ডেজ

হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আবার দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হইলে ব্যাণ্ডেজ ঢিলা করিয়া রাখিবে। কনষ্ট্রিক্টিভ ব্যাণ্ডেজের অভাবে সাধারণ ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমালে একটি গেরো দিয়া লইয়া কাজ চালান যাইতে পারে। গেরোটি প্রেসার পয়েন্টের উপর রাখিয়া রুমাল বা ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া নিয়া গ্রন্থি রচনা করিতে হয়।

**অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ :** কেবল যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, ছোরা ও গুলির আঘাত লাগিয়া কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেহস্থিত অস্থি ভাঙিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতেও রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। এই রক্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক ভিন্ন অপর ব্যক্তির নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দুই রকমের—প্রকাশ্য (visible) ও গুপ্ত (concealed)। প্রকাশ্য রক্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়া কিংবা মলমূত্রের সঙ্গে রক্ত বাহির হইয়া আসে। দেহের কোন্ অংশ হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রক্তের রং দেখিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের সুবিধার জন্ত নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল।

**ফুসফুস হইতে :** সন্দেশ রক্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আসে। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল।

**পাকস্থলী হইতে :** বমনের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিতে ককির গুড়ার মত।

অন্ত্রের উদ্ভাংশ হইতে : ক্ষরিত রক্তের বর্ণ আলকাতরার মত।

অন্ত্রের নিম্নাংশ হইতে : ক্ষরিত রক্তের বর্ণ স্বাভাবিক।

মূত্রগ্রন্থি হইতে : প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হয়। উহা ঘোঁয়াটে অথবা লাল বর্ণের। এইরূপ রক্তক্ষরণের সময় মূত্রগ্রন্থির চারিপাশে ব্যথা অনুভূত হয়।

মূত্রাশয় হইতে : রক্ত প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং প্রস্রাবে কষ্টবোধ হয়।

পরন্তু যকৃৎ (Liver), প্রীহা (Spleen) কিংবা অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে যে রক্তক্ষরণ হয় তাহা বাহির হইতে প্রকাশ পায় না (concealed bleeding)। চোখে দেখা যায় না বলিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে। অপ্রকাশিত বা গুপ্ত রক্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক।

### গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ

(১) রোগী দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার মাথা ঘুরিতে পারে, কখনও বা মুছা দেখা দেয়।

(২) মুখ ও চোঁট পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করে।

(৩) দেহচর্ম শীতল ও বিবর্ণ দেখায়।

(৪) ভীষণ তৃষ্ণাবোধ হইতে থাকে।

(৫) অস্থিরতা বাড়িয়া যায় এবং রোগী বেশী কথা বলিতে চেষ্টা করে।

(৬) নাড়ি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। কখন কখন উহার স্পন্দন অনুভব করা যায় না।

(৭) শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়। মাঝে মাঝে হাই ওঠে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

(৮) রোগী বায়ুর জ্ঞান ব্যাকুল হয় (Air hunger)।

(৯) অচেতন হইয়া পড়িতে পারে।

বায়ুর জ্ঞান ব্যাকুলতা, ভীষণ তৃষ্ণাবোধ এবং অস্থিরতা গুপ্ত রক্তক্ষরণ সূচনা করে। অত্যাগত লক্ষণগুলি স্নায়বিক আঘাতের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকে।

### প্রতিবিধান

(১) রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর।

(২) কোন খাদ্য বা পানীয় দিও না।

### কয়েকটি বিশেষ স্থান হইতে রক্তক্ষরণ

আমাদের গাওদেশ, জিহ্বা, মাড়ি, দাঁতের গর্ত, নাক ও কান প্রভৃতি স্থান হইতেও মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। এই সমস্ত রক্তক্ষরণকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বলিয়া ভুল করিও না।



গলার সম্মুখের অংশ কিংবা জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা তুলা দিয়া রক্তক্ষরণের স্থানটি চাপিয়া ধর। দাঁতের মাড়ি হইতে যদি রক্ত পড়ে তাহা হইলে অম্লরূপভাবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা কর।

দাঁতের গর্তে যদি রক্তক্ষরণ হয়, তবে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড বা তুলা দিয়া প্রথমে গর্ত বুজাইয়া দাও। তারপর গর্তের পরিমাণ এক টুকরা তুলা উহার উপর রাখিয়া রোগীকে দাঁত দিয়া স্থানটি চাপিয়া ধরিতে বল।

নাক হইতে রক্তক্ষরণ : (১) রোগীর মাথা সামনের দিকে বুকাইয়া রাখ এবং মুক্ত বায়ুতে রোগীকে বসাইয়া দাও।

(২) গায়ের আঁটসাঁট বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দাও।

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়া রাখিতে বল এবং মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতে বল।

(৪) রোগীর নাকের শক্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল।

(৫) রোগীর নাক ঝাড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না।

(৬) ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে বরফ আনিয়া রোগীর নাকে দাও অথবা খুব ঠাণ্ডা জল নাকের উপর ঢালিতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

### অচেতন রোগীর নাক দিয়া রক্তক্ষরণের প্রতিবিধান

(১) কাঁধ এবং মাথা উঁচু করিয়া রাখ।

(২) পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দাও এবং নাকের উপরিভাগে ধীরে ধীরে বরফ বুলাইতে থাক।

(৩) মুখ দিয়া বাহ্যতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইজন্য মুখ খুলিয়া রাখ।

(৪) যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরিতেছে ততক্ষণ জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া রাখ। নতুবা জিহ্বা গলার ভিতরে আটকাইয়া গিয়া রোগীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

### কান দিয়া রক্তক্ষরণ

(১) রোগীর মাথা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিয়া বেদিকে আঘাত লাগিয়াছে সেই দিকে হেলাইয়া রাখ।

(২) কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।

(৩) একটি শুকনো ড্রেসিং দিয়া কানের উপর আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ কর।

### করতল ( Palm ) হইতে রক্তক্ষরণ

কয়েকটি ধমনী আসিয়া করতলে মিশিয়াছে বলিয়া করতল হইতে রক্তক্ষরণ তীব্র হইতে পারে। করতলের ক্ষতে যদি কোন বাহিরের বস্তু না থাকে তবে ড্রেসিং ও প্যাড সরাইয়া আঙুল মুটবদ্ধ করিয়া দাও। এইবার একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহা বাঁধিয়া দাও।

### ক্ষীত ( Varicose ) শিরাসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ

ক্ষীত শিরা কাটিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হইতে পারে। তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা পায়ের শিরার রক্তক্ষরণই সবচেয়ে মারাত্মক। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে না পারিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

- (১) আহত ব্যক্তির পা যথাসম্ভব উঁচু করিয়া তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল।
- (২) একটি পরিষ্কার প্যাড দিয়া ক্ষতস্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও।
- (৩) পায়ের গাটার জাতীয় শক্ত কিছু বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেল।

বন্ধ বা উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে এবং শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

**দাহ ( Burning ) :** দাহের ফলে চর্ম লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চর্মে বিভিন্নরকার তন্তুগুলি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দহনের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধ ও জ্বালা দেখা দেয়। কোন ক্ষেত্রে স্নায়বিক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়।

দগ্ধস্থান জীবাগ্নিমুক্ত রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত ঐভাবে রাখিতে হইবে। দগ্ধস্থান জীবাগ্নিমুক্ত করিয়া রাখা ভাল এবং যতদূর সম্ভব উহা নাড়াচাড়া করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পুড়িয়া গেলেও উহা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবে।

কোন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া গেলে সাহায্যকারী ব্যক্তি আপনার আত্মরক্ষার জ্ঞান প্রস্তুত হইয়া আসিবে। সে তাহার সম্মুখে একটি কবল, কোট কিংবা পুরু টেবিল ঢাকনা লইয়া উঠাবারা জ্বলন্ত ব্যক্তিকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া ফেলিবে। একলা থাকিলে যদি আগুন লাগিয়া যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাহায্যের জ্ঞাত লোকজন ডাকিবে। দেহে আগুন লাগিলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মুক্ত স্থানে যাইতে নাই। তাহাতে আগুন আরও বেশি জলিয়া ওঠে।

### দাহ প্রতিবিধানের সাধারণ নিয়ম

- ১। দগ্ধস্থান অথবা নড়াচড়া করিও না।
- ২। দগ্ধস্থানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না।

৩। দধুপোশাক অপসারিত করিবে না এবং কোঁকা গালিয়া দিবে না।

৪। শুক জীবাণুশূন্য ড্রেসিং কিংবা পরিকার বস্ত্রখণ্ড দিয়া দধুস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে। কোঁকা থাকিলে ব্যাণ্ডেজ আলাগা রাখিবে।

৫। সামান্য পুড়িয়া গেলে চিনি দিয়া হাল্কা চা প্রভৃতি গরম পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৬। দহন যদি গুরুতর হয় সত্বর রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। আহত ব্যক্তিকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তাই মুখ দিয়া কিছু খাওয়াইবে না। যদি ঘণ্টা চারেকের মধ্যেও চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে লবণমিশ্রিত জল পান করিতে দিবে। দুই গ্রাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে আধ চামচ সোডি বাইকারবোনেট মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

### রাসায়নিক পদার্থে দধু হইলে উহার প্রতিবিধান

১। অম্লদ্রব্যে দধু হইলে :

(ক) দধু অঙ্গ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল কিংবা ডুবাইয়া রাখ।

(খ) এক পাইন্ট, গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ সোডি বাইকারবোনেট মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং উহা দ্বারা আহত স্থান ধুইয়া ফেল।

২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দধু হইলে :

(ক) চুনে পুড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল।

(খ) আহত স্থান প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল।

(গ) ভিনিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল।

(ঘ) দাহের চিকিৎসা চালাও।

বিজাতীয় বস্তু ( Foreign bodies ) :

দেহচর্মে কোন বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে : সূচ, পুরাতন ভাঙা লোহা বা কাচের টুকরা, মাছের কাঁটা ইত্যাদি বাহিরের কোন বস্তু চর্মে প্রবেশ করিলে আঘাতের স্থানটি স্থিতিশীল রাখিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্যে উহা অপসারণ করিবে।

চক্ষুর মধ্যে কিছু প্রবেশ করিলে : ধূলা, বালি, কয়লার গুঁড়া অথবা চোখের পাতার ছেঁড়া লোম ( eye lash ) চোখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি করে। বাহিরের কোন বস্তু চোখের তারায় গিয়া আটকাইলে গুরুতর বিপদ দেখা দৈয়। সূতরাং চোখের ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে উহা সত্বর অপসারণের ব্যবস্থা করা উচিত।

**প্রতিবিধান :** (১) আহত ব্যক্তিকে চোখ রগড়াইতে দিবে না। শিশুর ক্ষেত্রে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে নতুবা দেহের সঙ্গে হাত বাঁধিয়া রাখিবে।

(২) আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ করিয়া বসাও এবং তাহার নীচেকার পাতা টানিয়া ধর। (ক) যদি বিজাতীয় কোন পদার্থ নজরে পড়ে এবং যদি দেখা যায় উহা চক্ষুগোলকে আটকাইয়া যায় নাই তবে পরিষ্কার একটি বস্ত্রখণ্ড অথবা রুমালের কোণ পাকাইয়া জলে ভিজাইয়া বস্তুটি ধীরে ধীরে অপসারিত কর।

(খ) বস্তুটি চক্ষুগোলকে আটকাইয়া থাকিলে উহা অপসারণের চেষ্টা করিও না। আহত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করিয়া নরম তুলার প্যাড দিয়া চোখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও এবং চিকিৎসকের সাহায্য নাও।

(গ) চোখের ভিতর যদি কোন বিজাতীয় বস্তু দেখা না যায় কিন্তু উপরের পাতায় কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ থাকে তবে উপরের পাতাটি সম্মুখের দিকে টানিয়া ধর এবং নীচের পাতাটি উপরের পাতার নীচ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া ব্লাইয়া আন। নীচের পাতার লোমগুলি বুরুশের কাজ করিবে এবং কয়েকবার এইভাবে নীচের পাতা ব্লাইয়া আনিতে পদার্থটি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিবিধান কর :

আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাও এবং তাহার মাথা তোমার বুকের উপর চাপিয়া ধর। এইবার এক হাতে একটি দেশলাই-এর কাঠি উপরের পাতার উপর এক কিনারায় চাপিয়া ধর এবং অল্প হাত দিয়া উপরের পাতা উল্টাইয়া দাও। তারপর রুমালের কোণ জলে ভিজাইয়া বস্তুটি বাহির করিয়া আন।

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তুটি চলিয়া গেলেও চোখের ভিতর একটা দারুণ অস্বস্তি হইতে থাকে। এইরূপ অস্বস্তি বোধ করিলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ না দেখা গেলে চোখে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের বাপ্টা দাও।

(ঙ) চোখে এলকালি (Alkali) অথবা দাহক অ্যাসিড (corrosive acid) পড়িলেও চোখে ঠাণ্ডা জলের বাপ্টা দিতে হইবে। তারপর নরম তুলার প্যাড দিয়া চোখে আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়া আহত ব্যক্তিকে সম্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

**কানে কিছু প্রবেশ করিলে :** কোন কাঁটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা অলিত অয়েল, শ্রালাড অয়েল অথবা সার্জিক্যাল স্পিরিট ঢালিয়া দাও। ইহাতে পতঙ্গটি ভাসিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অল্প কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া আহত ব্যক্তিকে সম্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

**নাকের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে :** আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাইতে বলিবে এবং বাহ্য পদার্থটি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে সম্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর।

**পাকস্থলীর ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে :** অসাবধানতাবশতঃ টাকা, পয়সা, বোতাম, আলপিন, সূঁচ ইত্যাদি পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে পারে। রোগীকে তখন কোন কিছু খাইতে দিবে না এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবে। মন্থণ কোন পদার্থ গিলিয়া কেলিলে জ্ঞানহার কোন কারণ নাই। মলের সঙ্গে উহা বাহির হইয়া যাইবে।

**গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে :** গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। কখনও বা বমি হইতে পারে। মাছের কাঁটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

**খাসনালীর ভিতর বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে :** খাসনালীর ভিতর কোন খাণ্ডকণা কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু আটকাইয়া যাইতে পারে। দুর্ঘটনা গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে কারণ, বস্তুটি শীঘ্র বাহির হইয়া না আসিলে রোগী খাসরোধ হইয়া মারা যাইবে। তাই দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করিবে। আহত ব্যক্তি যদি শিশু হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার পূর্বে তাহার পা দুইখানি ধরিয়া মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়া দেখ বস্তুটি বাহির হইয়া আসে কিনা।

## জন্তু-জানোয়ার ও কীট-পতঙ্গের দংশন ( Bites and Stings )

কুকুর, শূগাল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের দংশন অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা এই সমস্ত পশু জলাতরু নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। জলাতরু রোগে আক্রান্ত কোন পশু মানুষকে দংশন করিলে দংশিত ব্যক্তিরও ঐ রোগ হইবে। উপরোক্ত সকল পশুরই জলাতরু রোগ ছড়াইবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্রবেই বেশী আসিয়া থাকে। তাই সাধারণতঃ কুকুরের দ্বারা মানুষের মধ্যে জলাতরু রোগ সংক্রামিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পালিত কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়, তবে শীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষ কামড়াইতে দেখা যায়। গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বিস থাকে। হুতরাং প্রত্যেক কুকুর-পালকেরই নিজ নিজ কুকুর সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

**কুকুরের দংশনের প্রতিবিধান :**

- (১) দংশিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে।
- (২) রক্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা কিন্তু কুকুরের দংশনের ফলে বিষ স্রাব্য বরাবর কেন্দ্রীয় স্নায়বিক প্রণালীতে চলিয়া যায়।
- (৩) দংশিত স্থান নীচু করিয়া রাখিবে।

(৪) পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধোঁত করিয়া দাও।

(৫) যদি শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে অবিলম্বে ক্ষতস্থান দধি করিয়া দিবে। তীব্র কার্বলিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডই ক্ষতস্থান দধি করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ঔষধ। দেশলাই-এর কাঠি বা অল্প কোন ছুঁচলো কাঠি অ্যাসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থানের চারিপাশে বুলাইয়া দিবে। ঘটনাস্থলে অ্যাসিড না পাওয়া গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়া দংশিত স্থান পোড়াইয়া দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে দংশনের পর আধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেলে আর দধি করিবার সার্থকতা নাই।

(৬) শুষ্কবস্ত্রখণ্ড দিয়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়া দাও।

### কুমীর, হাঙর ও সর্পের দংশনের প্রতিবিধান :

আমাদের দেশে কুমীর, হাঙর কিংবা সর্পের দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও হাঙরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে।

কুমীর ও হাঙরের দংশনে :

(১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।

(২) স্নায়বিক আঘাতের ( shock ) চিকিৎসা করিবে।

(৩) ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিয়া দিবে।

**সর্প দংশন :** পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে। উহাদের মধ্যে ৩৫০ শত রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বলিয়া গণ্য। বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। তাই বিষধর সাপ সাধারণতঃ লোকালয় বর্জন করিয়া চলে। যে সব সাপ সচরাচর আমরা দেখিতে পাই উহাদের দংশন মারাত্মক হয় না। তবে অত্যন্ত ভয় পাইবার ফলে দংশিত ব্যক্তির দেহে অনেক সময় স্নায়বিক আঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষাক্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

(১) সাপ কামড়াইলে উহার বিষ রক্ত সঞ্চালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়ে। তাই প্রথমেই রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার জগ্ন বাহু কিংবা উরুতে দংশিত স্থান ও হৃদযন্ত্রের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অগ্রবাহু বা পায়ের উপরে কখনো বাঁধিবে না। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত এই বন্ধন রাখিয়া এক মিনিট আলগা দিয়া পরক্ষণেই আবার টানিয়া বাঁধিয়া দিবে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত এইভাবে কাজ চালাইয়া যাও।

(২) চাপিয়া বাঁধিবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারম্যাঙ্গানেটমিশ্রিত জল দিয়া ধোঁত

করিয়া দিবে। তারপর দংশিত স্থানটির কাছাকাছি কোথাও তীব্র ছুরি, স্ক্রু, কিংবা ব্লেড দিয়া ঠু ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া ফেল এবং ঐ স্থানে পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের গুঁড়া ঘষিয়া দাও। যে ছুরি অথবা ব্লেড দিয়া ক্ষতস্থান চিরিবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া লইবে কিংবা কিছুক্ষণ স্পিরিটে ভিজাইয়া লইবে।

(৩) দংশিত ব্যক্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও।

(৪) গরম পানীয়। যথা—কড়া চা, ককি কিংবা দুধ খাইতে দাও। এই সময় মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই।

(৫) দংশিত ব্যক্তির মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভয় পাইলে তাহার স্নায়বিক আঘাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৬) যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আনিবে।

**রক্তশোষক জ্যৌক :** জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রক্তশোষক জ্যৌকের আশ্রয়। রক্ত খাইয়া ইহার ঝাঁচিয়া থাকে। স্বযোগ পাইলেই ইহার মাংস কিংবা জন্তু-জানোয়ারের দেহ এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

**প্রতিবিধান :** (১) দেহ হইতে জ্যৌক ছাড়াইবার জন্ত উহার শরীরে জলন্ত দেশলাই বা সিগারেট ঢাপিয়া ধর। লবণ, চুন, পেট্রোল অথবা পারাফিন ঢালিয়া দিলেও জ্যৌক ছাড়িয়া যায়।

(৩) বাই-কার্বোনেট অব বোডা, অ্যামোনিয়া অথবা কোন লোশন দিয়া জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা কর।

(৪) শুষ্ক ড্রেসিং প্রয়োগ কর।

**কীটপতঙ্গের হুল বিদ্ধ করা :** পিঁপড়া, গুঁয়োপোকা, বিষাক্ত মাকড়সা, মোমাছি, ভীমরুল, কাঁকড়া-বিছা ইত্যাদি কীট মাংসের দেহে হুল বিদ্ধ করে। এইসব কীট যে স্থানে হুল বিদ্ধ করে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং তখন স্নায়বিক আঘাতের সৃষ্টি করে। শিশুদের পক্ষে এইরূপ হুল মারাত্মক হয়। কাঁকড়া-বিছার কামড় অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের হুল হাতে পায় খিল ধরিতে পারে।

**প্রতিবিধান :** (১) যে স্থানে হুল বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কার্বোনেট অব সোডা, তরল অ্যামোনিয়া অথবা এন্টিহিস্টামাইন (antihistamine) লাগাও।

(২) কাঁকড়া-পিছা দংশন করিলে Scorpion antitoxin ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই ইহা দিতে পারেন।

(৩) স্নায়বিক আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা কর।

(৪) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ মধু কিংবা গোময় প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৫) গুঁয়োপোকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও।

তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে চাছিয়া ফেল। দেখিবে সমস্ত ছল উঠিয়া

## মুছাঁ ( Fits )

মুছাঁ যাইবার নানাবিধ কারণ আছে : মৃগীরোগ তাহাদের অত্যন্তম। মৃগীরোগ দুই ধরনের—সামান্য ( minor ) ও গুরুতর ( major )। সামান্য রকম মৃগী রোগে চোখের তারা স্থির হইয়া যায় এবং রোগী সাময়িকভাবে মুছাঁগ্রস্ত হয়। গুরুতর মৃগীরোগের মূছাঁ বহুক্ষণ ধরিয়া থাকে। বোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মুছাঁ যাইবে। রোগীর মাথাধরা, উত্তেজনা ও অবসাদ দেখা দেয়। নুর্দিত অবস্থায় রোগীর চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয় :

- (১) রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে চীংকার করিতে থাকে।
- (২) রোগী প্রথমে কক্ষ সেকেণ্ড ধরিয়া শব্দ হইয়া থাকে এবং তাহার মুখ রক্তবর্ণ পাবন করে।

(৩) অত্যন্ত তড়কা ( convulsion ) শুরু হয়। মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় এবং বোগী মলমূত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ বোগী আপনার জিহ্বা কামড়াইতে পারে এবং হাতের নিকট কোন বস্তু পাইলে তাহা দ্বারা নিজেকে আঘাত করিয়া বসিতে পারে।

৭। কিছুক্ষণ পরে তড়কা বন্ধ হইয়া গেলে বোগী গতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা ছুড়িতে থাকে।

মৃগীরোগ ব্যতীত কোন মানসিক উত্তেজনার ফলেও রোগীর কার্যকলাপ সাময়িকভাবে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারণতঃ দুর্বলচিত্ত লোকদের এইরূপ মানসিক আবেগে মুছাঁ যাইতে দেখা যায়। এই পরনের মুছাঁকে বলে হিষ্টিরিয়া। হিষ্টিরিয়া হইলে রোগীর হাত-পা শব্দ হইয়া যায় এবং বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। কখনও কখনও হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে তড়কা অর্থাৎ গিঁচুনিও দেখা দেয়।

**প্রতিবিধান :** মুছাঁগ্রস্ত বোগীর বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দিবে এবং ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দিবে। রোগীর হাতের কাছে সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিবে। সুবিধামত বোগীর দাঁতের মধ্যে চামড়ের হাতল প্রবেশ করাইয়া দিবে যাহাতে সে আপনার জিহ্বা কামড়াইয়া দিতে না পারে। রোগীর মুখের ফেনা পরিষ্কার করিয়া দাও।

রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর যদি হিষ্টিরিয়া বলিয়া বোধ হয় তবে রোগীর প্রতি সহায়ভূতি দেখাইবে না। তাহার সহিত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলিবে, তবে কোনরূপ শাসন করিবে না। রোগী যতক্ষণ না সুস্থ হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে পর্যবেক্ষণাধীন রাখ।



## অজ্ঞান অবস্থা ( Fainting )

অনেক সময় অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দুর্বলতাবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কমিয়া যায়। মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রক্তের চাপ কমিয়া গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ভয় পাইলে বা হঠাৎ দুঃসংবাদ শুনিলে অথবা দেহে কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইলে রক্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত বা বন্ধস্থানে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হইলেও লোকে অজ্ঞান হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মৃগী রোগেও অজ্ঞান অবস্থা দেখা যায়।

**অজ্ঞান অবস্থার লক্ষণসমূহ :** অজ্ঞান হইবার পূর্বে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পূর্বে মুখমণ্ডল সাধারণতঃ রক্তশূন্য ও পাণ্ডুর দেখায়। দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। নাড়ি দুর্বল ও মন্থর গতিতে চলে এবং শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

**প্রতিবিধান :** কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিলে তাহার মাথা দ্রুত নীচের দিকে নামাইয়া দিবে। রোগী যদি বসিয়া থাকে তবে হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া পা পর্যন্ত বুলাইয়া দিবে। শ্বেলিং সপ্ট প্রয়োগ করিবে। রোগীর গলা, বুক ও কোমরের কাপড় ঢিলা করিয়া দিবে এবং রোগীর মুখে কৃত্রিম দাঁত থাকিলে তাহাও খুলিয়া ফেলিবে। রোগী যাহাতে যথেষ্ট মুক্ত বায়ু পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। অত্যধিক ভিড়ের চাপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়া দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতেছে সেখানে নিয়া আসিবে। আরোগ্যলাভের পর রোগীকে গরম পানীয় দিবে।

রক্তক্ষরণ হেতু রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতনা ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# F. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী (Child Development and Guidance Programme)

### 1. শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন লওয়া :

(Study and care of children)

(a) সারা বছর ধরিয়া স্বাস্থ্যবান এবং আকর্ষণের বস্তু হইয়া থাকা।

মাতৃগর্ভে জন্মের মধ্যেই শিশুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় হইতে প্রত্যেক জননীকে দুইটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, শিশুর দৈনিক প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ, কিভাবে ঐ প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবান ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া তোলা যায়? সংক্ষেপে বলা যায় সন্তোজাত শিশুর প্রয়োজন পাঁচটি—খাদ্য, নীরবতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু ও উত্তাপ। শিশুর দৈনিক প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে খাদ্য।

### শিশুর খাদ্য

**ক্যালোরী :** বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের তাপের প্রয়োজন হয়। খাদ্যদ্রব্য হইতেই দেহে এই তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে। এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শারীরিক পরিশ্রম কেবলমাত্র হাত-পা নাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রম ঐ বয়সের শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য ঘটায় না। এইজন্য উহাদের দেহের ওজনের দ্বারা সর্বদা ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হটবার পর হইতেই প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে এবং ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য প্রায় ৫৫ হইতে ৬০ ক্যালোরী (১২০ ক্যালোরী প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য) তাপের প্রয়োজন হয়। শিশুর দেহে এই তাপ কিভাবে জোগান দেওয়া বাইতে পারে? তাপ উৎপাদক খাদ্যের মধ্যে ফ্যাট বা স্নেহহই হইতেছে প্রধান। কিন্তু শিশুর এই সময় স্নেহ হজম করিবার শক্তি কম থাকে। ফলে স্নেহপদার্থের পরিবর্তে

কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনই প্রধানতঃ শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্য এই সময় শিশুর খাণ্ডে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। খাণ্ডের প্রোটিন শিশুর দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ছাড়াও প্রধানতঃ তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**প্রোটিন :** প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ করিয়া উহার বৃদ্ধি সাধন করা। শিশুর দেহ এই সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং উহার খাণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। শিশুর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য গড়পড়তা প্রায় ১'৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পরিমাণ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করিয়াও দেহে তাপ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে। জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু এই প্রোটিন মাতৃ-দুগ্ধ হইতেই পাইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ল্যাক্টো অ্যালবুমিন বর্তমান। উহা সহজেই হজম হয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-দুগ্ধের প্রোটিন দেহের সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। এইজন্যই মাতৃ-দুগ্ধের সঙ্গে অগাধ প্রোটিনজাত খাদ্য শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ৩।৪ মাস বয়স হইতে শিশুকে গরুর দুধ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি খাওয়াইলে এই প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। গরুর দুধে প্রোটিনের পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা বেশী। তবে এই প্রোটিন (ক্যাসিন) মাতৃদুগ্ধের প্রোটিনের মত সহজপাচ্য নয়। এইজন্যই শিশুকে ধীরে ধীরে গরুর দুধ ধরাইতে হয়। তাহা না হইলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৭।৮ মাসের শিশুকে প্রোটিনের জন্য মাংসের সুপ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন না পাইলে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে।

**কার্বোহাইড্রেট :** কার্বোহাইড্রেট তাপ উৎপাদক খাদ্য। শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করাই উহার প্রধান কাজ। প্রতি পাউণ্ড দেহের জন্য শিশুর প্রতিদিন প্রায় ৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন হইয়া থাকে। জন্মের সময় শিশুর পরিপাক শক্তি দুর্বল থাকে। এইজন্য তখন সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। স্টার্ট ইত্যাদি কঠিনপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এই সময় শিশু হজম করিতে পারে না। মাতৃ-দুগ্ধের কার্বোহাইড্রেট (ল্যাক্টোজ) সহজপাচ্য। এইজন্য প্রথম ২।৩ মাস শিশুকে অন্য কোন কার্বোহাইড্রেট না দিয়া দুগ্ধই খাইতে দেওয়া উচিত। চিনিও একটি সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট। তবে ধীরে ধীরে ইহা ধরাইতে হয়। ৫।৬ মাসের শিশুকে আলু, ভাত ইত্যাদি স্টার্চজাতীয় কার্বোহাইড্রেটও হৃদয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ধীরে ধীরে সহজপাচ্য হইতে কঠিনপাচ্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে শিশুকে অভ্যস্ত করাইতে হয়। উপযুক্ত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট না পাইলে শিশু দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং উহার ওজন যথার্থ বৃদ্ধি পাইবে না।

**স্নেহ :** স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহে প্রধানতঃ তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। জন্ম হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে কতটুকু স্নেহপদার্থ থাকা দরকার তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় নাই। মাতৃদুগ্ধে স্নেহের পরিমাণও কম থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে সহজপাচ্য স্নেহ পদার্থ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া স্নেহ জাতীয় খাদ্যে সাধারণতঃ ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' দ্রবীভূত থাকে। ফলে স্নেহজাতীয় খাদ্যে যেমন ক্যালোরীর চাহিদা পূরণ হয় তেমনি ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'ও দেহে সরবরাহ করা হয়। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২।৩ ফোটা কডলিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। ৪।৫ মাসে শিশুকে একটু করিয়া মাখন ধরান যায়। তাছাড়া দুধের স্নেহতো আছেই। স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'র অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে শিশু পুষ্ট হইবে না এবং সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবে।

**ভাইটামিন :** দেহকে সুস্থ ও রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই ভাইটামিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভাইটামিন 'ডি' দেহের অস্থি বা হাড় গঠনে সহায়তা করে, এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুর হাড় ঠিকভাবে বাড়িতে পারিবে না এবং সে রিকেট রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ হইতে শিশু ইহা পায় না। সুতরাং জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই শিশুকে কডলিভার বা শার্কলিভার অয়েল দিতে হইবে। অপর একটি ভাইটামিনও মাতৃ-দুগ্ধে তেমন পাওয়া যায় না। ইহা হইতেছে ভাইটামিন 'সি'। এইজন্য কমলালেবুর রস, টমেটোর রস ইত্যাদি শিশুকে প্রথম হইতেই খাওয়াইয়া এই অভাব পূরণ করিতে হয়। 'এ' এবং 'বি' ভাইটামিনসমূহ সাধারণতঃ শিশু প্রথম প্রথম মাতৃ-দুগ্ধ হইতেই পায়। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৬।৭ মাসের শিশুকে সবুজ শাক-সবজির জুস খাইতে দিয়া এই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু দুর্বল, ক্যাশে ও দগ্ন হইবে।

**ধাতব লবণ :** দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং উহাকে সুস্থ রাখাই ধাতব লবণের কাজ। বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ জাতীয় ধাতব লবণই শিশুর পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি ও হাড়ের প্রধান উপাদান। সুতরাং শিশুর খাদ্যে এই সকল লবণের অভাব হইলে শিশুর হাড় পুষ্ট হইবে না এবং সে 'রিকেট' রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধে এবং গো-দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে। সুতরাং ঐ দুগ্ধ হইতেই শিশু তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাইতে পারে। এক বছর পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের প্রায় ০.৬ হইতে ০.৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম

খাকা প্রয়োজন। মাতৃ-দুগ্ধে লৌহেরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ মিলিগ্রাম লৌহ এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাণ্ডে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ লৌহ শিশু দুগ্ধ হইতে পায় না। ফলে ডিমের কুসুম ও শাক-সবজির জুস দিয়াই শিশুর লৌহের চাহিদা পূরণ করিতে হয়। ৪।৫ মাস বয়স হইতেই শিশুকে এই সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। লৌহজাতীয় খাদ্য দেহে রক্তপ্রস্রাবিত্তে সাহায্য করে। সুতরাং লৌহহীন খাদ্যের অভাব হইলে শিশুর দেহে রক্তাশ্রিততা দেখা দিবে ও সে 'অ্যাসিডিক' রোগাক্রান্ত হইবে।

**জল :** এছাড়া শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাওয়াইতে হইবে। প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১'৫ হইতে ২'৫ আউন্স জলের প্রয়োজন। জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে মাঝে মাঝে খাইতে দিবে। সর্বদাই ফুটান জল খাওয়ান উচিত কারণ জলে নানা প্রকার রোগজীবাণু থাকিতে পারে। জলের সর্হায্যে দেহের দূষিত পদার্থসমূহ বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায়। ফলে দেহ সুস্থ থাকে।

দেখা যাইতেছে সারা বছর খরিয়ান সুস্থ থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল খাদ্য।

উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশুর যথাযথ বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়াই তাহাকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রধান উপায়।

নিরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন। শিশুকে তাই একাকী বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পরিশ্রম বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল ভাল হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিশুর অত্যন্ত দৈহিক প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্নতার ফলেই আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল, তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন আরও বেশী।

বিসুদ্ধ বায়ু ও প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচিত। শীতকালে শিশুকে উপযুক্ত জামাকাপড় পরাইতে হয় এবং নিয়মিত রৌদ্র-স্নান দিতে হয়। তবে গ্রীষ্মকালে অনাবশ্যক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত বিধিগুলি পালন করিলেই সে স্বাস্থ্যে সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন

বাজিতে থাকিবে। তাহার ঘুমের, স্নানের, আহারের, আদরের এমন কি কোলে লইবারও নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক।

(b) জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ককাল : জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর ( Birth, infancy & maturation. The first dozen years )

জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এই জীবিতকালকে রুশো চারিটি স্থানির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শৈশব ( infancy ), পাঁচ হইতে বার বৎসর পর্যন্ত বাল্য ( childhood ); বার হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত প্রাক্কৈশোর ( Early adolescence ) এবং পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত কৈশোরোত্তর ( Late adolescence ) কাল। ডঃ আর্নেস্ট জোন্সও মানুষের জীবনকে চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। রুশোর মত তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তরকে শৈশব এবং বার বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরকে বাল্য আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তারপর তাঁহার মতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত তৃতীয় স্তরটি কৈশোর ও শেষের স্তরটি হইল প্রাপ্ত বয়স্ককাল। রুশো কিংবা ডঃ জোন্স কেহই জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভের অবস্থাতিকে জীবনকালের মধ্যে গণনা করেন নাই। কিন্তু মাতৃগর্ভ অবস্থানকালে শিশুর দেহের যতখানি পরিবর্তন সাধিত হয় জন্মের পর সারাজীবনেও ততখানি পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং মানবজীবনকে আমরা নিম্নরূপ পাঁচটি স্তরে ভাগ করিতে পারি :

- (১) মাতৃগর্ভে অবস্থিতি ;
- (২) জন্মের পর ৫ বৎসর শৈশবকাল ;
- (৩) ৫ হইতে ১২ বৎসর বাল্যকাল ;
- (৪) ১২ হইতে ২০ বৎসর কৈশোর—কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত—
- (ক) প্রাক্কৈশোর, (খ) কৈশোরোত্তর।
- (৫) প্রাপ্তবয়স্ককাল।

শৈশব : শিশুর ক্রমবিকাশকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—দৈহিক, মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্কোষিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ।\*

দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জন্মের পর এক মাসেই শিশু মাথা তুলিতে পারে, দুই মাসে মাথা খাড়া করিতে পারে, পাঁচ মাসের সময় কিছুতে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে, আট নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে, নয় দশ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, এক বছরের মধ্যেই হাঁটিতে শেখে, পনের মাসে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়াইতে পারে। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে মানসিক বিকাশ ও ভাষা শিকার পালা। জন্মকালনের মধ্য দিয়া তাহার ভাষা শিকার প্রথম পাঠ শুরু হয়।

\* শিশুর বিকাশ সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য (ষষ্ঠ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

তারপর প্রাক্কখন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় এক বৎসর বয়সে সে কথা বলিতে শুরু করে।

ইতর প্রাণীদের মত শিশু কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বশ। দেহের আনন্দ বেদনার অমুভূতিটাই তাহার প্রবল থাকে। শুধু ভাললাগা মন্দলাগার মাপকাঠি দিয়া সে তাহার অচেনা জগৎকে বিচার করে। তবে ইতর প্রাণী যেমন এই স্তরেই থাকিয়া যায়, মানব-শিশু যখন শিথিতে শুরু করে তখন তাহার এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়।

তিন চারি বৎসর বয়স হইতে শিশুর মনে আত্মপর বোধ জাগিয়া ওঠে এবং সে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। জগতের সব কিছু যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিতেছে, সে চায় সবাই কেবল তাহারই দিকে নজর দিক, সকলেই তাহার হুকুম পালন করুক। কোন রকমের ভাগীদার সে সহ্য করিতে পারে না। বাবা-মায়ের ভালবাসার উপর সে একাধিপত্য চায়, তাই ভাইবোন, বিশেষতঃ ছোট ভাইবোনদের উপর তাহার হিংসা আসে।

এই আত্মকেন্দ্রিকতার চরম পরিণতি আত্মপ্রেম। শিশু আপনার প্রেমে আপনি মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রবৃত্তিটির নাম দেওয়া হইয়াছে নার্শিসিজম (Narcissism)। গ্রীক গাথার এক আত্মপ্রেমমুগ্ধ নায়ক নার্শিসাসের কাহিনী হইতেই এই আত্মপ্রেমজনিত প্রবৃত্তিটির উক্ত নামকরণ হইয়াছে।

শিশু এই বয়সে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী থাকে। সে তখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চায় না। শিশুর মনে আত্মপ্রসারেচ্ছা খুব প্রবল থাকে কিন্তু বাহিরের জগৎ হইতে নিজেকে গুটাইয়া ফেলে এবং সে গিয়া কল্পনার জগতে গাঁই লয়। এই কল্পনারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং শিশু। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া সে মাকে বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করে; কখনো বা রামের মত বনবাসে যায়, কখন হয় বিড়াল ছানার কানাই মাষ্টার, কখনো বা গলির মুখের ফেরিওয়াল। শিশুর এই জাতীয় খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে কল্পনাবিলাসের খেলা (Make believe play)।

বছর তিনেক বয়সের শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরাবৃত্তি বা জানা পথে চলিবার প্রবৃত্তি। এই সময়ে শিশুরা একই ধরনের খেলা খেলিতে, একই স্বরের পুরান ছড়া বারবার আবৃত্তি করিতে ভালবাসে। বস্তুতঃ নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য শিশুমন তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাহার সব কিছুতেই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

তিন বছর পর্যন্ত অমুকরণ প্রবৃত্তিও খুব প্রবল থাকে। এই অমুকরণ প্রবৃত্তির

কলেই শিশু ভাষা শিক্ষা করে। খেলাধুলা, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে সমাজায়িত হইয়া ওঠে।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতূহল। সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতূহল বেশী দেখা যায়। শিশুরা এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাহার কৌতূহল হইতেই জ্ঞান পিপাসার গভীরতা, শিশুর মানসিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

**শিশুর যৌন চেতনা:** ফ্রেড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বড়দের মতই শিশুরও যৌনচেতনা রহিয়াছে। তবে শিশুর এই যৌনচেতনা প্রজননমূলক নয়। আপনার দেহের যে কোন স্থান বা প্রক্রিয়া হইতে যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাহাতেই নিযুক্ত হয়। শিশুর রতির আকাজ্জ্ব আপন দেহে আবদ্ধ বলিয়া মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর যৌন চেতনার নাম দিয়াছেন স্বরতিমূলক (auto-erotic) যৌনচেতনা। একটু বড় হইলে ছেলে-শিশুদের আসক্তির পাত্রী হন মা এবং মেয়ে-শিশুদের ক্ষেত্রে বাবা। ফ্রেডের মতে এই আসক্তি মূলতঃ যৌন এবং ফ্রেড ইহার নাম দিয়াছেন ইডিপাস\* কমপ্লেক্স (Oedipus complex)।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবই মানুষের শিক্ষার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়। এই সময় দেহের ও মনের শক্তিগুলি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল থাকে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া উহাদের ফিরান যায়। শৈশবই তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ গঠনের উপযুক্ত সময়।

**বাল্য:** শৈশবের সঙ্গে বাল্যের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষণীয়। শৈশবে সব কিছুই থাকে একটা অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। কি দৈহিক কি মানসিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুর একটা এলোমেলো বিপর্যস্ত ভাব দেখা যায়। কিন্তু বাল্যে উহার পরিবর্তে একটা অদ্বিত শৃঙ্খলা ও স্বায়ত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতই তাহার আচরণ ধীর, সুসংহত। এইজন্য আর্নেস্ট জেন্স বয়ঃপ্রাপ্তিকে বাল্যের পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন।

বাল্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যুথবদ্ধতা। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর মধ্যে সংঘচেতনা জাগিয়া ওঠে এবং সে দল গঠন করে। অন্তর্মুখী শিশু ধীরে ধীরে বহির্মুখী বালকে

\* গ্রীসের অন্তর্গত থীবসের রাজপুত্র। শৈশবে সে এক পাহাড়ে পরিত্যক্ত হইয়া এবং রাখালের গুহে পালিত হয়। বড় হইয়া সে নিজের দেশে আসিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করে এবং বীর জননীকে বিবাহ করে। এই কাহিনী হইতেই মায়ের প্রতি যৌন আসক্তির নামকরণ হইয়াছে ইডিপাস কমপ্লেক্স।



পরিণত হয়। পিতামাতা ও অত্যাগত বালকদের চেয়ে তাহার উপর দলের প্রভাব তখন বেশী। দলের নিন্দা, স্তুতি তাহার জীবনের মূল্য-বিচারের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়। বাল্যে আত্ম-প্রচারের স্পৃহা বড় হইয়া ওঠে। আত্মপ্রচার ত একা একা সম্ভব হয় না, তাই অহুরাগী দল চাই।

সংবশ্রিয়তা হইতে বালকের মনে গণমানসের অভ্যুদয় ঘটে। বালক গৃহে বাবামায়ের কর্তৃত্বাধীনে যে কাজ একা একা সমাধা করিতে পারে না, দলের সঙ্গে পড়িয়া উঠাই সে অনায়াসে সম্পাদন করে। “মিলেমিশে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ”—এই ভাবটি তখন প্রবল হইয়া ওঠে। এই প্রবৃত্তিকে তাই সংপথে পরিচালনা করিতে পারিলে বালক ধীরে ধীরে একটি সুস্থ সুন্দর নাগরিকে পরিণত হইতে পারে।

শৈশবের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও ধীরে ধীরে বালকের আয়ত্ত হয়। ঈর্ষা, ঘেঘ ইত্যাদি ভাবাবেগগুলি আর পূর্বের মত নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে না, ক্রমশঃ সেগুলির গতি উদ্ভ্রমুখী হয়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বালক ক্রমশঃ খাপ খাইতে শেখে।

#### (৫) যৌবনোদগম ও বৃদ্ধি ( Puberty & growth ) :

১২ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত সময়কে কৈশোর কাল আখ্যা দেওয়া হয়। কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত—প্রাককৈশোর ও কৈশোরোত্তর। প্রাককৈশোরেই মানুষের প্রথম যৌবনোদগম হয়।

মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের মধ্যে যৌবনোদগমের সময়টি হইল সবচেয়ে জটিল ও সমস্তামূলক। স্টানলে হল কৈশোরের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া উহার নাম দিয়াছেন ‘ঝঙ্কারবিহ্বল কাল’। বালক এতকাল যে পথ ধরিয়া চলিতেছিল অকস্মাৎ তাহার মোড় করে পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাভাবনা যেন এক ঝড়ের ঝাপটায় ওলটপালট হইয়া যায়। অপরিণত বালকজীবন এবং পূর্ণ যুবকজীবন—এই দুয়ের সন্ধিকাল এই কৈশোরকাল। এই সময়ের মনস্তত্ত্ব অতি জটিল, দেহ ও মনের পরিবর্তন সমস্তামূলক এবং চিন্তাভাবনা খাপছাড়া। এই বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে বালক অনেক সময় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারে না। ফলে বড়দের চোখে তাহাদের আচরণ ও কথাবার্তায় অনেক অসঙ্গতি, অশেষ ত্রুটি দরা পড়ে।

যৌবনোদগমে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

**দৈহিক পরিবর্তন :** প্রথম ঋতুর আগমন মেয়েদের দেহে যৌবন সূচনা করে। সাধারণতঃ বার হইতে মোল বৎসরের মধ্যে মেয়েদের প্রথম ঋতু হইয়া থাকে। তাই এই বয়সেই মেয়েদের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয়। মেয়েদের বেলা যেমন যৌবন সমাগমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ছেলেদের বেলা কিন্তু সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে

না। কতকগুলি বাহ্যিক পরিবর্তন হইতেই ছেলেদের যৌবন আগমন বোঝা যায়। যৌবন সমাগমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহে কতগুলি বাহ্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলিই বাহ্য পরিবর্তনের কারণ।

বাহ্য পরিবর্তনের মধ্যে ছেলেদের এই সময় দাড়ি-গোঁক দেখা যায়। বস্তি ও অন্ত্র প্রদেশে কেশোদগম হয়। গলার স্বর ভারি হয়, সমস্ত দেহে একটি স্বন্দর স্বভাব দেখা দেয় ও দেহ সৌন্দর্যে ভরিয়া ওঠে। মেয়েদের দেহেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় তাহাদের স্তন্যুগল বর্ধিত হয় এবং বস্তি ও অন্ত্র প্রদেশে কেশোদগম হইতে শুরু করে। তাহাদেরও গলার স্বর ভারি হয় এবং দেহ লাবণ্য ও শ্রীতে ভরিয়া ওঠে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় জননেন্দ্রিয় বর্ধিত ও গুপ্ত হইতে থাকে।

— **প্রধানত:** যৌন গ্রন্থিতেই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বেশী হইয়া থাকে। মেয়েদের প্রধান যৌনগ্রন্থি ডিম্বাধারে (Ovary) এই সময় ডিম্ব (Ovum) সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন এস্ট্রোজেন (Estrogen) মেয়েদের দেহে যৌবনের বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে। ইহারই প্রভাবে মেয়েদের স্তন্যুগল বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোদগম হইতে থাকে। এই হরমোনের প্রভাবেই জরায়ু (Uterus) ও জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্ট হয় এবং ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। ডিম্বাধার হইতে নিঃসৃত অপর হরমোনটি হইতেছে প্রজেষ্টেরন (Progesterone)। এই হরমোনের প্রভাবে গর্ভকালে নারীর ঋতুশ্রাব বন্ধ থাকে এবং স্তন্যুগলের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

পুরুষের প্রধান যৌনগ্রন্থি অণ্ডকোষ (Testes)। যৌবন সমাগমে এই অণ্ডকোষে স্রবের বা শুক্র-কীটের জন্ম হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রজনন শক্তি জন্মায়। মেয়েদের তায় ছেলেদের অণ্ডকোষেও হরমোন উৎপন্ন হয়। এইরূপ একটি হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosterone) অণ্ডকোষে শুক্রোৎপাদনে সহায়তা করে। অপর একটি হরমোন এণ্ড্রোস্টেরনের (Androsterone) প্রভাবে জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি ও দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোদগম হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় হরমোনটির প্রভাবেই যৌবনের বাহ্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে যৌনগ্রন্থি নিঃসৃত এই সকল হরমোনের সৃষ্টি ও ক্রিয়া পিটুইটারি-গ্রন্থি-নিঃসৃত অপর এক প্রকার হরমোনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং পিটুইটারি-গ্রন্থি-নিঃসৃত এই হরমোনও পরোক্ষ ভাবে মানুষের যৌবনবিকাশে সাহায্য করে।

**মানসিক পরিবর্তন:** কিশোর-কিশোরীদের দেহে বিপুল পরিবর্তন আসে বটে কিন্তু মনের পরিবর্তনের তুলনায় দেহের এই পরিবর্তন প্রায় নগণ্য বলিলেই চলে। এই সময় ছেলে মেয়েদের মনে যৌনচেতনার উন্মেষ হয় এবং ছেলে মেয়েরা পরস্পরের প্রতি

এক বিরাট আকর্ষণ অহুতব করিতে থাকে। হাণ্ডে কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে বার তের বছর বয়স হইতেই ছেলে মেয়েদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্দোল হইয়া ওঠে। ইহারই নাম কিশোরকাল। এই সময় জোয়ারের স্রোতের অহুকুলে যদি নবজীবনের যাত্রা শুরু করা যায় তবে জীবনতরী সৌভাগ্যের কুলে গিয়া ভিড়িতে পারিবে; তা নইলে নয়। বস্তুতঃ এই সময় কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকা দরকার। নতুবা কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেরা সহজেই বিপথগামী হইতে পারে।

কিশোর-কিশোরীরা এই সময় আবার শিশুদের মত অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে। বালক বয়সের সংঘর্ষাতি আবার কমিয়া আসে এবং সে আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসী ভাবুক হইয়া পড়ে। এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল দিবাস্বপ্ন। দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ফলে তাহার মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় সেগুলি বাস্তবে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে কিশোর সেগুলি তৃপ্ত করিতে দিবাস্বপ্নের সাহায্য নেয়। তাহাদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে দুই শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়—আত্ম-প্রতিষ্ঠাঘটিত এবং প্রণয়মূলক। কিশোরি স্বপ্ন দেখে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়াশুনা, খেলাধুলার সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে। আর স্বপ্ন দেখে যে তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িণীকে লাভ করিতেছে। অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই প্রকোচে শিক্ষিত থাকে এবং সাময়িকভাবে কিশোর-কিশোরীদের ভূষ্টি দেয়। ‘দিবাস্বপ্ন’ ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকখানি সাহায্য করে তবে অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস সূহ্ম ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বেশী অলসভাবে কালযাপন করিতে দিলে তাহাদের মনে নানারকম যৌনবিকার দেখা দিতে পারে। তাই মনোবিজ্ঞানীরা কিশোর-কিশোরীদের অবসর মুহূর্তগুলি নানারূপ নির্দোষ খেলাধুলা, গানবাজনা করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি আনন্দবর্ধক কাজের মধ্যে নিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। কিশোরকালই হইল দেহ গঠনের উপযুক্ত কাল। এইজন্মই এই বয়সে দেহকে শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ত কৃচ্ছ্রতা সাধন দরকার। পান, ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, পোশাক-পরিচ্ছদ কোন দিকেই কিশোর-কিশোরীদের যেন বেশী আরামপ্রিয় করিয়া তোলা না হয়। কিশোর বয়স চরিত্র গঠনের সময় জানিয়াই প্রাচীন ভারতে এই সময়টি গুরুগৃহে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কাটাইবার রীতি ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও অনেকেই কিশোরদের কৃচ্ছ্রসাধন সমর্থন করেন।

কৈশোরের আর একটি ধর্ম হইল বীরপূজা। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা মনে মনে তাহাদের রুচি অমুখ্যায়ী কোন আদর্শ বাছিয়া নেয় এবং সেই আদর্শ অমুখ্যায়ী নিজের জীবন গঠন করিতে চায়। কাহারো এই আদর্শ হয়ত দেশনেতা, ধর্মনেতা,

কাহারো বা প্রিয় খেলোয়াড় কিংবা চলচ্চিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী। এই আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে, কেহ ধর্ম জীবনযাপনের সম্বল গ্রহণ করে। কেহ বা আদর্শ অভিনেতা অভিনেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব অনুকরণ করিতে চায়। এই বয়সে যাহাদের আদর্শ যত বড় পরবর্তীকালে তাহাদের জীবন ততই সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া ওঠে। প্রবল নীতিবোধ ও পরার্থে আত্মবিসর্জন করার আকাঙ্ক্ষাও এই বয়সেই প্রবল থাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অনেক বীরই ছিলেন কিশোর। মোটের উপর আত্মরতি ও পরোপচিকীর্ষ এই দুই বিপরীতমুখী আবেগই কিশোর বয়সে প্রবল থাকে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কিশোরকাল অতিবাহিত না হইলে যে কোন একটা দিকে জীবনের মানদণ্ড ঝুঁকিয়া ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তাই সহানুভূতি ও দরদ সহকারে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অশুভ কলিকাগুলি যাহাতে ঘোঁবনে মুকুলিত হইয়া ওঠে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক অভিভাবকেরই কর্তব্য।

#### (d) কিশোর ও অপরাধপ্রবণদের সমস্যা

( Problems of adolescents and delinquents )

**কৈশোরের সমস্যা :** কিশোর বয়সে মনের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তির জীবনে কতকগুলি নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৈশোরের এই সমস্যাগুলির কথা যদি জানা থাকে তবে অপিকাংশ ক্ষেত্রে বড়দের সঙ্গে যে একটা সংঘাত অনিবার্য হইয়া ওঠে তাহা রোধ করা যায়। কৈশোরের সমস্যাপূর্ণ নিম্নরূপ :—

(১) **স্বাধীনতার সমস্যা :** যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া ওঠে। তাহার এতকালের পরনির্ভরতা কাটাওয়া উচিত চায় এবং নিজেকে সমাজের একজন বলিয়া ভাবিত শুরু করে। ফলে অভিভাবকদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। অভিভাবকদের উচিত এই সময় উপহাস না করিয়া তাহাদের বক্তব্য এবং ন্যায়মত শ্রদ্ধা সহকারে শোনা এবং কোনো কাজের দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া। এইরূপ কাজের ভার পাইলে কিশোরদের মনে দায়িত্ব বোধের সঞ্চার হয় এবং স্বাধীনতার চাহিদা তৃপ্ত হয়।

(২) **যৌন সমস্যা :** এই সময় যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটে বলিয়া ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে এবং অনেকেই প্রণয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের তখন নানা যৌন সমস্যা দেখা দেয়, অনেকের আবার যৌনবিকৃতি ঘটে। এই বয়সে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এবং নির্দোষ খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের ব্রতী করা উচিত।

(৩) **বৃত্তিনির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা :** এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বাছিয়া লইয়া স্বনির্ভর হইবার নানারূপ পরিকল্পনা করে। অভিভাবকরা সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছাটা ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। ফলে শিক্ষা এবং বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে একটা জবরদস্তি চলে এবং কিশোর-কিশোরীরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৈশোরের এই সমস্যাটির যাহাতে সুষ্ট সমাধান হয় তাহার জন্ত প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি স্বরণ রাখিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারিলে একদিকে যেমন মানসিক তৃপ্তি হইবে অন্যদিকে তেমন তাহাদের আত্মবিশ্বাস সূদৃঢ় হইবে এবং জীবনে তাহারা সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে।

(৪) **জীবনদর্শন সংক্রান্ত সমস্যা :** জীবনের অর্থ কি? ইহার সার্থকতাই বা কিসে? জীবন-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সকল কিশোর-কিশোরীদের মনেই জাগে। এই সময় একটি উচ্চ জীবন-দর্শন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে কিশোরের প্রাণচাঞ্চল্য অলস দিবা-স্বপ্নে অতিবাহিত হইতে পারে, এমন কি তাহারা অপরাধপ্রবণও হইয়া পড়ে। এইজন্ত প্রত্যেক অভিভাবকেরই উচিত কিশোরদের সম্মুখে একটি উচ্চতাবের আদর্শ স্থাপন করা যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অর্থময় করিয়া তুলিতে পারে।

কৈশোরের সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহার মনের বন্দ সামলাইয়া উঠিতে পারে না, শৈশবের মানসিক কাঠামোতে ফিরিয়া যায়, শৈশবের মাপকাঠি তাহার জীবনের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়, সে অববের মত আচরণ করে। সেই সময়কার দমিত ঘোঁ-প্রবৃত্তি, আত্মবিস্তার প্রবৃত্তি সমাজবিরোধী আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অচেতন মনের বন্দ হইতে অপরাধ জন্ম নেয়। সে জানিতে পারে না যে অত্যা কাজ করিতেছে। স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হইলে অভিভাবকদের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগে এবং উহা হইতে আসে চুরি ও গুণ্ডামী ইত্যাদি। অনেকই আবার বাস্তবের রাজ্য হইতে নিজেকে গুটাইয়া নিয়া দিবা-স্বপ্নের আশ্রয় নেয়। এইভাবে তাহার চরিত্রের সুষ্ট বিকাশ স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়।

অপরাধ প্রবণতা কৈশোরের ধর্ম নয়। অভিভাবকদের কিশোর মনস্তত্ত্বকে ভাল বুঝিবার ফলে এবং তাহার সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান খুঁজিয়া না পাইবার ফলেই কৈশোরে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। শান্তি দিয়া কৈশোরের এই সকল অপরাধ, বদধেয়াল কিংবা বেয়াড়াপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্ত চাই সুষ্ট পরিবেশ, দরদ এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজ হইবে কোঁতুল,

আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি জীবন-প্রয়াসী শক্তিশালীকে আবিষ্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়া জীবনকে তৃপ্ত করা।

**অপরাধপ্রবণতা :** কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অব্যাহিত আচরণ দেখিয়া থাকি। এইসব অব্যাহিত আচরণ যখন সমাজবিরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে অপরাধপ্রবণতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে অবাধ্যতা, ফেচ্ছাচারিতা, একগুয়েমি, অসৌজন্য, উদ্ধৃঙ্খলতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অনিয়মাহুর্বাতিতা, জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, ঘোঁন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা।

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা অভিভাবক ও মনস্তাত্ত্বিকদের সামনে একটি গুরুতর সমস্যা বিশেষ। বংশধারাবাদীরা এতকাল মনে করিতেন বংশগতিই অপরাধের মূল কারণ এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরন্তু পরিবেশবাদীদের যুক্তি ছিল পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বলিয়া এই দুইটি মতবাদটো আজ পরিত্যক্ত। সকলেই আজ একমত বংশগতি এবং পরিবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী সৃষ্টি হয়। এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা যাইতেছে।

**বংশগতির প্রভাব :** অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবনিতা ইত্যাদি ব্যক্তিদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বৃত্তিতে দীক্ষা দেয়। ফলে তাহারা অপরাধী ছাড়া আর কি হইতে পারে? মনস্তাত্ত্বিকরা কিন্তু বংশগতির চেয়ে পরিবেশেরই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার স্বত্রে পাওয়া নয় তবে অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারস্বত্রে পাইতে পারে। অতি শৈশবে গৃহের দূষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবর্তী জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে। এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও উগ্র হত্যাবই হইল প্রধান। তৃতীয়টি হইল উদ্বেগহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে শেবোক্তটি অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়।

**পরিবেশের প্রভাব :** পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি--  
(ক) গৃহ পরিবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ।

(ক) **গৃহ পরিবেশ :** গৃহ পরিবেশের মধ্যে প্রথমই পড়ে দারিদ্র্য। ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’ এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয়। তবে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে কিশোর মনে যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক

বেশী। সর্বাঙ্গ আলাবাসহীন বিভিন্ন বাড়িতে বাস, স্থানান্তর, অনাময় ব্যবহার ইত্যাদি, গৃহে দিবারাত্রি কলকলহ এ সমস্তই দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত এবং শিশু ও কিশোর মনে ইহাদের প্রতিক্রিয়া ভয়ানক।

দারিদ্র্যের সঙ্গে আরও কতগুলি পারিবারিক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন পৈশবে পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, পিতা প্রবাসে কিংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, জননী রুগ্ন কিংবা বাহিরে কর্মরত, কল্মে সন্তানরা মায়ের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত, বাপমায়ের অনুরূপী দাম্পত্য জীবন, বৈমাত্র্য ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শৃঙ্খলার একান্ত অভাব কিংবা কঠোর নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছল্য অনাদৃত অবহেলিত শিশুচিন্তের সমস্ত স্বকুমার বৃত্তি নষ্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, একগুয়ে, অনিয়মানুবর্তী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য অতিরিক্ত আদরেও এইসব দোষগুলি প্রকাশ পাইতে পারে।

**প্রতিকারের উপায় :** বাপমায়ের মেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গৃহপরিবেশ চাই। গৃহপরিবেশ উন্নত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সঙ্গত অভিজ্ঞাবকের তত্ত্বাবধানে বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত।

**বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ :** পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে (১) তাহার বিত্তা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র। (২) তাহার অবসর সময় উদ্‌যাপন এবং (৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব।

(১) **বিত্তাপ্রতিষ্ঠান :** অধিকাংশ বালক এবং কিশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, মেধাবী বালকদের আকাজ্ঞা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্রীণবুদ্ধি বালকদের আবার পড়াশুনার বোঝা বলিয়া মনে হয়। যেসব কিশোর পড়াশুনার পাঠ চুকাইয়া কাজে নামে তাহারা যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্তার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি একঘেয়ে ও যান্ত্রিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসে না। ফলে তাহারা অনেক সময় অপরাধকর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

**প্রতিকার :** বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতিসাধন করা দরকার। বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই। বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও বাস্তবিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধুলা, বিতর্ক, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(২) **অবসর সময় উদ্‌যাপন :** কিশোররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদ্‌যাপন করে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা সাধারণতঃ তাহাদের অলস মুহূর্তগুলিতেই নানারূপ সমাজবিরোধী কাজের পরিকল্পনা করে। অধিকাংশ কিশোরদের উপযুক্ত খেলাধুলা শরীরচর্চা কিংবা কোন

গঠনমূলক কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই। ফলে তাহারা অভিজ্ঞা দিয়া বাজে নাটক নভেল পড়িয়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায়।

**সিনেমার কুফল :** কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। সিনেমার প্রতি তাহারা অতিরিক্ত আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, বাড়িতে মিথ্যা কথা বলে এবং সিনেমা দেখার পরমা জোগাড় করিতে না পারিলে চুরি পর্যন্ত করে। অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কল্পনার জগতে বাস করে এবং বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। জীবনকে তাহার সস্তা, মজাদার এবং নাটকীয় বলিয়া মনে হয়। সমস্ত ছবিতেই আবার কিছু না কিছু প্রেমের গল্প থাকে। উহা তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপক্ক করিয়া তোলে। সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক এবং রোমান্স খুঁজিয়া বেড়ায়। বাস্তবের মুখামুখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দেখিয়া অনেকে আবার অপরাধ করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিত্রতারকাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং সাজপোশাক অঙ্করণ করে। ফলে তাহারা চপলমতি হয় এবং হাঙ্কা আমোদপ্রমোদ খুঁজিয়া বেড়ায়।

**প্রতিকার :** কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি নির্মিত হওয়া আবশ্যিক। উপযুক্ত খেলাধুলা, শরীর চর্চা, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে।

(৩) **সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব :** সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব। কুসঙ্গে পড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পর্যন্ত জুয়া খেলে, মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন ব্যভিচার করে এবং মেয়েরা পর্যন্ত বহুগামিনী হয়।

**প্রতিকার :** সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে বাপমার সর্বদা সাহায্য করিতে হয় এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নির্বাচন করে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিজেদেরও অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয়।

**দৈহিক দ্রুতি :** দৈহিক খুঁত শিশুদের মনে হীনমন্ত্রতার সৃষ্টি করে। বামন, বজ্র, কুস্ক লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পাত্র হইয়া থাকে। এইসব দৈহিক খুঁত থাকা সত্ত্বেও তাহারা কখন কখন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হইয়া থাকে। এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন প্রকার অপরাধ কর্মের মধ্য দিয়া আত্মহুপ্তিলাভের চেষ্টা করে।

**প্রতিকার :** শৈশবেই দৈহিক খুঁতগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার। তাছাড়া ছবি আঁকা, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলা অথবা অঙ্কুরূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্মহুপ্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত।

**বুজির প্রভাব :** ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক



পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্রীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা গভীর যোগ আছে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। তাহারা সাধারণ মানুষের মত গ্রায় অগ্রায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা দ্বিধা করে ক্রীণবুদ্ধি ব্যক্তির সহজেই সেসব কাজ করিতে পারে।

**প্রতিকার :** প্রথম হইতেই ক্রীণবুদ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার।

### (1) মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূলনীতি

( Mental hygiene and principles of child guidance )

**মানসিক স্বাস্থ্য :** স্বাস্থ্য বলিতে আমরা এতকাল দৈহিক সুস্থতাই বুঝিতাম। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উহার এক নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখে সুস্থ এবং মনে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি বলা যাইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য শব্দটির মধ্যে মানসিক সুস্থতাও নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজী health শব্দটি আসিয়াছে গ্রীক শব্দ হালথসন wholth শব্দ হইতে। wholth শব্দের অর্থ হইল পরিপূর্ণতা। দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পরিপূর্ণতা আসিতে পারে।

সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা মানসিক সুস্থতার উপর জোর দিতেছে। আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরদিনই উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগুলি বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায়—যেমন (১) মানসিক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যাইবে। (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তিনি সহজেই মিলিতে পারিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাহ্যিক অর্থাৎ সমাজের অনুমোদিত। (৪) সাধারণ ঈর্ষা, কুটিলতা, রোষ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার মনে অযথা জট পাকাইবে না।

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ছেলেবেলার ছাপ দিয়া। প্রত্যেকটি শিশুর যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সে স্নানগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথম হইতেই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিশুমঙ্গল উদ্দেশ্যে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে শিশুর প্রতি বাবা মা তথা পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) শিশুর জন্ম একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা, (২) শিশুর মধ্যে সামাজিক

মূল্যবোধ সঞ্চার করা, (৩) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা এবং (৪) তাকে মুক্তির আনন্দ দেওয়া।

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না। তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার প্রবণতা এবং সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায়। শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে বাবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য পরিজনদের সাঙ্গিধ্যে। আত্মকেন্দ্রিক শিশু ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে পরিবার। পরিবারকে তাই বলা হয় ‘The half way house between the ego and society.’

**শিশুর দাবী :** সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রহিয়াছে সন্তানেরও বাবামায়ের উপর অহরূপ কতকগুলি দাবী আছে। ঐ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর জীবন পরিচালিত করিতে হইবে।

**শিশুর প্রথম দাবী স্বাধীনতা।** তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে যে সে কতকগুলি জন্মগত বৃত্তির সমষ্টি আর এই বৃত্তিগুলি প্রতি মুহূর্তে বিকাশের রাস্তা খুঁজিতেছে। গৃহ এই রাস্তা খুলিয়া দিবে—তাহাতে তাহার দেহ এবং মন দুয়েরই বিকাশ হইবে, সে ছুটিবে, লাফাইবে, থেলিবে, ছুঁড়িবে, সে হৈ হৈ করিবে, ভাঙিবে, গড়িবে, সব কিছুতেই প্রস্রাব দিতে হইবে। শিশুর বাহাতে বিপদ না হয় বাবা মা এইটুকু খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্ত এমন কিছু করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে করিতে পারে। জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোশাক জিনিসপত্র নিজে গুছাইয়া রাখা—এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহার অর্থ তাহাকে জীবন নিয়া পরীক্ষা করিতে দেওয়া। ইহাতে যে স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষা হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের বড়বাপ্টায় উহা হইবে তাহার স্থায়ী সম্পদ। এই স্বাধীনতা তাহাকে শক্তিকরকারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বৃত্তির দমন কোথাও হইবে না। নিরর্থক রোধনের জালাও তাহাকে ভুগিতে হইবে না। ‘ক’রো না’ ‘ক’রো না’ এই কথার মত অকোজা জিনিস আর নাই।

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে **নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা**। শিশু চায় দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা। তাহার দৈহিক নিরাপত্তাবোধ বাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্ত মায়ের কর্তব্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটান।

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে মানসিক নিরাপত্তার সম্বন্ধে বেশী সজাগ। দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গৃহের পরিচিত পরিবেশই বেশী প্রিয়। নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাংশ শিশু মানসিক নিরাপত্তা হারায় নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে। গোড়ায় অভিরিচ ‘আমার সিন্ধা পরে যেন শিশুকে বেশী অনাদর করা না হয়। তাছাড়া বাবা মা বড়টো

বুঝাইয়া দিবেন যে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের জন। আর বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশী আহ্বান করা চলিবে না, তবেই শিশুর মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল স্বীকৃতি লাভ। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায়। শিশুকে শুধু আনন্দ দিবার জন্ত এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পরিবারের তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত সভ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। তাড়িয়ে বা পালিয়ে কোন বয়সেই নয়, সব সময়েই 'মিডবদাচরেন্'। বস্তুতঃ শিশু একটা শূন্যকুন্ত নয়। তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাকে সম্মান করিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে। তাহার অর্বাচীন কথা নিয়া হাসিঠাট্টা করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাহার অজস্র কেনেতে বিরক্ত হইবার উপায় নাই কারণ এগুলি শিশুর কাছে বাস্তব সমস্তা। কোশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়া শিশুর বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায়। শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে সম্মান করিতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে।

শিশু অতিশয় অমুকরণপ্রিয়। সে সর্বদাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল করিয়া চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দৃষ্টান্তের। ব্যক্তিত্বই শুধু ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে। যেসব নৈতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার মধ্যে রোপণ করিতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা করি, সেইসব উপদেশ দিয়া নয়, নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইতে আসিলে বাবা যদি বলিয়া পাঠান—'বলগে, বাবা বাড়ি নেই'—ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রোটচিয়াস বলিয়াছেন—'আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম' (Example is better than precept)। শিশুর ভাষা শিক্ষা যেমন অশ্রের দৃষ্টান্ত অমুকরণ করিয়া—কেতাব-বাকরণ হইতে এই শিক্ষা হয় না; তাহার নৈতিক শিক্ষাও তেমনি বয়স্কদের অমুকরণ করিয়া। বাবামায়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে শিশু মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মানুষ। তাঁহারা যাহা করেন তাহাই ভাল। তাঁহারা যদি এই মর্মান্দা না রাখেন তবে শিশু নিজের কাছে কোন আদর্শের কোন মর্মান্দা রাখিতে শিখিবে না। আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না বেশির ভাগ এই কারণে। বাবামার জীবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ কিছু পায় না।

মিথ্যাকথা ও চুরি : মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্ত বাবামা শিশুকে অনেক সময় শাসন করেন। শাসন করার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহার সূত্র কোথায়? বয়স্করা মিথ্যা কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে না। কোন কোন মিথ্যার

কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইজিয়াহুভূতি বা শ্বতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়া দেয়—যেমন ‘অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই’। কল্পনার আতিশয্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বলিবার প্রেরণা দেয়। কখন বাবামার দৃষ্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বলিতে শিক্ষায়। শিশু যদি বোঝে সত্য কথা বলিলে সুবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রবন্ধনা করিতে শেখে।

চুরিও তাই। অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দেয়—তাহা চুরি করে। শিশুর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অসুযায়ী কোন প্রাপ্য জ্ঞানসম্পন্ন ভাবে অর্জন করিতে না পারিলে সে চুরি করিতে শেখে।

শিশু-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শান্তি ও পুরুষারের ব্যবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচলিত। ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন :

- (1) জ্বরদস্তির তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।
- (2) চাপ দেওয়া স্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী। ইহাতে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়, অসন্তোষ জন্ম হয়। শান্তি ছাড়া অল্পকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং বিচারশীল করা যাইতে পারে।
- (3) শিশুকে যদি অগ্নায় কাজের জ্ঞান তিরস্কার করা হয় তবে ভাল কাজে যখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে তখন খেয়াল করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে হইবে।
- (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহার বদভ্যাসগুলি দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে।
- (5) বেশী বকাবকি করিলে গুণগুলি গা-সওয়া হইয়া যায়, পরে আর তাহাতে শিশু পরোয়া করে না।
- (6) সামান্য বিষয় নিয়া খুঁত ধরা কিংবা অন্তের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। ভদ্রতার নিয়ম শিশু ও বয়স্ক সমান মান্য।
- (7) বাবা-মা যে সম্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান তাঁহাদের নিকট সন্তানেরও প্রাপ্য।
- (8) শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা কঠোর সংযত রাখিবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকিবে।
- (9) সব সময় দেখিতে হইবে কাজটার উদ্দেশ্য কি? অগ্নায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদ্বৃত্তিকে আমরা মারিয়া ফেলি।
- (10) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন স্তরে আছে তাহা দেখিতে হইবে। সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া।
- (11) অনেক সময় বাবামায়ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবামা অনেক সময় আপন উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন। ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত খেলাধুলা সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে পারদর্শী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শৈশবের দাবী যৌবন ও বার্ষিক্যের দাবীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

**পুরস্কার :** শান্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে। অনেক সময়ই পুরস্কার হয় ঘুষের নামাস্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া তোলে। ‘লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে।’ ‘ফ্রকটা পর, একটা বিস্কুট দেব’—এগুলি ঘুষ। শিশু বুঝিল খাওয়া বা জামা পরা তাহার নিজের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তাহাকে দাম দিতেছেন। সে আরও শিখিল অগ্রাযভাবে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে এবং দর কষাকষি করিতে—‘একটা নয়, দুটো পয়সা’। ‘বিস্কুট নয়,’ ‘চকোলেট’ ইত্যাদি। ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে স্নেহের ঘুষ “আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষ্মীটির মত ঘুমাও।’ স্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে নাই, অস্ত্রের ইচ্ছার উপরে জোর দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহার নিজেরই প্রয়োজন—না করিলে সে প্রশংসা পাইবে না, করিলে পাইবে। এইটুকুই যথেষ্ট।

প্রতিকার—এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া হয় তবে বিশেষ কিছু প্রতিকার নাই। কোন দৈহিক ক্রটি বা অঙ্গহানির দরুনও তা দেখা দিতে পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিকিৎসা করা দরকার। এই অবস্থায় শুধু ধৈর্যশীল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেয়াড়ামীর জন্ম দায়ী গৃহ ও স্কুলের আবহাওয়া। দারিদ্র্য, শৈশবে পিতৃমাতৃ বিয়োগ, বাপমার তাচ্ছিল্য, কড়া শাসন—এইসব মনের স্বকুমার বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া অচেতন মনে ভট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা শিক্ষা। তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠ্যবস্তু তাহার কাঁধে চাপানো হইল। তারপর আসিল পরীক্ষার ভীতি, অল্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের নির্বাসন ও সকল আশার সমাধি। রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার এই দুর্দশার দিকে লক্ষ্য

করিয়া বলিয়াছিলেন, “শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তিধারা কষ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাধারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের স্থাপ্তি করা হইয়াছে” ( রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাসমগ্র ) । গৃহ-দমিত স্বপ্নের নিরসন ও বুদ্ধির উৎকর্ষণ এবং স্থূলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা—বেয়াড়া শিশুকে শোধরাইতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই ।

## **G. ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা :** ( Family life Education for Future Home-Makers )

### **ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশ্য :**

বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের একটা সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশী না বিরোধ বেশী তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে। আমাদের দেশে এককাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন ছিল সম্পূর্ণ গৃহকেন্দ্রিক। তাহাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য গৃহস্থের দানের সাহায্যে চলিত। দান যে কেবল ধনীরই কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল গৃহীকেই শ্রদ্ধা বিবাহ ইত্যাদি কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ নিজ সাধ্যমত দান করিতে হইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন। সমাজ যেখানে গৃহকেন্দ্রিক বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চলিতে দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে। এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ টেঁকে। বিবাহ ছিল তাই ভারতীয়দের কাছে এক মহাযজ্ঞস্বরূপ।

কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলে সকল মানুষকে সমানভাবে বাঁধা যায় না। মজুকে তাই গাভর, ব্রাহ্মণ, অহর ও পৈশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ইচ্ছা নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল। শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ ছিল চারি প্রকার--ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে। যে বর কন্যাকে নিজে প্রার্থনা করে সে তাহার সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবাহের ব্যাপারে এত কড়াকড়ির উদ্দেশ্য ছিল সৌজাত্য রক্ষা।

### **1. বিবাহের প্রস্তুতি**

( Preparation for marital life ) :

ভারতে বিবাহ একটা তপস্তার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল সুসন্তান লাভ, কবির ভাষায় কুমারসম্ভব। মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কৃতি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে।

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহুপূর্ব হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্তুতি শুরু হইয়া থাকে।

স্বামী নামক একটি ভাবে তাহার ভক্তি করিতে দেখে। নানা কাহিনী, ব্রত-পূজার কথা দিয়া এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাবপর বিবাহের পর তাহার যাহা পায় তাহা কোন ব্যক্তি নয় পায় একটি ভাব তাহার নাম স্বামী। এই ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর বিবাহের দিন নানা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়া তাকে বুঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পতিব্রতা হইয়া স্মৃগৃহিণী হয় এবং পতিব্রতের দৃঢ় থাকে।

পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলিও নানা উপদেশে ভরা। প্রথম মন্ত্রে কন্যাকে পাণিগ্রাহকেবং সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্ণনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয় কন্যা যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়, গৃহপালিত সমস্ত পশুগুলির পবিচরায় তাহার কল্যাণ হস্ত নিযুক্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে প্রতি যেন তাহার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। গর্ভাধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। পঞ্চম মন্ত্রটি অতি পবিত্র এবং গভীর। এই মন্ত্রে স্বামী পত্নীকে বলেন, 'প্রিয়তমে, তোমাকে কেবল আমার সেবা কিংবা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতা, দাদা ভগিনী সকলের সেবা নিযুক্ত থাকিবে।' সংসারের পাঁচজনের ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিবার মহান আদর্শ একমাত্র ভাবেই বর্তমান একথা বলা বাহুল্য। তাবপর স্বামীরই হৃদয়ের ঐক্যমাত্র এবং নিমিত্ত স্বামী বধূকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

যদেতচ্ছদয়ং তব তদন্তু হৃদয়ং মম

যদিদং হৃদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং তব।

হে দেবি। আজ হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক আর আমার এই হৃদয় তোমার হউক।

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তিনটি—

(১) স্বস্থ স্বন্দর গৃহবচনা, (২) স্ব-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পতির আত্মিক মিলন।

মেয়েবা যাহাতে উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া উঠিবে তাহা এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন গৃহবিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা। বিবাহের অন্ততম উদ্দেশ্য হইল স্বসন্তান লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাতৃত্বের একটা সাধনা রহিয়াছে। সে সাধনা সন্তান নয়, স্বসন্তান সৃষ্টির সাধনা। এই সাধনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মেয়েদের আপন স্বাস্থ্যটি হ্রাস করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সন্তান সন্তান সন্তান উপযুক্ত মা হইবার জন্য তাহাকে স্বাস্থ্যবৃত্তি এবং শিশু মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরাই যে কণ্ঠ দুর্বল অনেক সময় তাহান কাণ দাবিত্র্য নয়, জননীকে অজ্ঞতাই তাহাকে বল করিয়া তোলে। মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা শিশুকে ঠিক পথে



## ভাবী পুরুষের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা

পরিচালনা করিতে পারে না। অতিরিক্ত আদরে আচ্ছাদনে তাহাকে একেবারে 'নরী' পুতুল করিয়া কেলে নতুবা তাহার প্রাক্ষোভিক প্রয়োজন মিটাইতে 'না' পারিয়া তাহার মনে ঘৃণার স্রষ্টা করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে।

মাতৃরূপ ব্যতীত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রূপ প্রেমসীর। বোঁবনে পুরুষ নারীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে মেয়ে পুরুষ উভয়েরই বোঁবনশিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। উপযুক্ত বোঁবন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ সফল করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। তবে সফল বোঁবন জীবনই দাম্পত্যজীবনের শেষ কথা নয়। পরিণত বয়সে দম্পতি পরস্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তখনই নারী প্রকৃত প্রেমসী হইয়া ওঠে। বস্তুতঃ প্রেমসীরূপে নারীর সাধনা হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা। নারীর যে গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধুর্য বা আনন্দশক্তি। এই মাধুর্য কিন্তু মোহিনীশক্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু স্বস্থ, স্বন্দর, আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধুর্যের সঙ্গে চাই ধৈর্য, ত্যাগ, সংযম, চিন্তাশক্তি ও ব্যবহারে শ্রীর অনুশীলন। ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রস্তুতি।

## 2. পারিবারিক জীবন শুরু

( Beginning of a family )

বিবাহের পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুরু হইয়া যায়। এই জীবনের গুরুত্ব অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পূর্বরাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু তখন তাহা বা পরস্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুরু হইলে উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন দুই জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে। এই সময় দুজনে যদি দুজনের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্যজীবন সুখের হইতে পারে।

দাম্পত্য জীবনের কতকগুলি প্রতিকূল উপাদান আছে। প্রথম হইতেই এইসব প্রতিকূল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। এই উপাদানগুলি হইল :

(১) জনত্বসংসক্তি ( Parent Fixation ) : দাম্পত্য সুখের একটি প্রধান অন্তরায় হইতে পারে জনত্বসংসক্তি অর্থাৎ বরবধূর নিজ নিজ বাপমার প্রতি প্রবল আসক্তি। বিবাহের পরে বধু যদি আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের আঁচলধরা এবং একান্ত অন্তর্গত তখন একটা মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি প্রবল আসক্ত থাকিতে পারে। এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী কামনা করে। স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহারা যদি প্রতি পদে পিতার সহিত স্বামীর অবাস্তিত্ব তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ পিতার যে বয়স ও

অভিজ্ঞতা থাকে যুবক স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। দম্পতির প্রবল বাস্তববোধই এইসব সমস্তার সমাধান করিতে পারে।

(২) **চারিত্রিক দ্বন্দ্ব (Conflicting Personalities)** : স্বামী-স্ত্রীর চারিত্রিক দ্বন্দ্ব দাম্পত্য স্থূলের আরেকটি প্রধান অন্তরায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি অত্যন্ত জেদী কিংবা আত্মাভিমानी (egotistical) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানিতে একেবারে নারাজ থাকে তবে সংঘাত অনিবার্য। একরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রে নমনীয়তা গুণটির অল্পশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৩) **স্বস্ত্রমাতার উপস্থিতি** : আমাদের দেশে বধূ নিগীড়নের কাহিনী আজও শোনা যায়। স্বস্ত্রমাতারা পুত্রবধূকে অবাস্তিত অংশীদার মনে করিয়া নানারূপ জট পাকায়। এখানে স্বীর নম্রতা গুণ এবং স্বামীর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়মত হস্তক্ষেপ দরকার।

(৪) **নৈরাশ্র (Frustration)** : কল্লনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে নৈরাশ্র। বিবাহের পর প্রথম অনুরাগের পালা শেষ হইলে নতুন নতুন সমস্তা আসিতে থাকে। স্বাস্থ্য-স্বজনদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমস্তাত থাকেই তার উপর দেখা দেয় বাসগৃহের সমস্তা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে স্ত্রীভাবে সংসার চালাইবার সমস্তা ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদাও কিছু থাকে। সেগুলি না মিটিলে নৈরাশ্র আসিতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্র আসে।

কাহার কিসে নৈরাশ্র আসিবে বলা কঠিন। তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষত্রুটিগুলিকে লঘু করিয়া দেখার চেষ্টা, নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সদিচ্ছা লইয়া দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে ঐ জীবন স্থূলের হয়।

### ৩. জনিতাদের দায়িত্ব

(Responsibility of Parenthood)

সন্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দায়িত্ব দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সন্তানবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই সন্তানবনাকে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি সুস্থ সবল দেহ তাই সন্তানপালনে বাপ-মার প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বলিষ্ঠ শিশুর জন্মদান

শিশুকে স্বস্থ রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবেন অন্যদিকে তেমনি নিজেদের দেহকেও স্বস্থ, সবল ও নীরোগ রাখিবেন।

প্রাথমিক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা। শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। সব বাপ-মাই অবশ্য সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের ক্রটির ফলে শিশুর নিরাপত্তা বোধ বিঘ্নিত হয়। যেমন নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা অনেক সময় নবজাতককে লইয়া বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একটি সন্তানের সঙ্গে আরেকটির অবাহিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বল্পবুদ্ধি শিশুর মধ্যে হীনমন্ত্রতা দেখা দেয়; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের কথা নিয়া আলোচনা করেন। এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং শিশুর নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে।

শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইবার সবশ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাথমিক দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা। শিশু যদি অসুস্থত্ব করে যে সে পরিবারের একজন বাহ্যিক ব্যক্তি, গৃহে তাহারও একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তাহার সেই আসন আর কাহারো দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয়; একটি হয়ত লেখাপড়ায় ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাজে পটু। বাপ-মার কর্তব্য একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কাজে উৎসাহ দেওয়া। প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সবই গর্বের, আনন্দের এবং প্রশংসার। এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলে শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়।

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা অভিযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন দায়িত্ববোধ জাগে নাই। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা বাপ-মায়েরই কর্তব্য। সহযোগিতাই হইল পরিবার তথা সমাজজীবনের বনিয়াদ। শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে। পরিবারের সাধারণ সমস্যাগুলি যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মৰ্যাদা দিতে হইবে।

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অল্পকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাহাতে শিশুর হৃদয় মানসিক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের উপযোগী হইতে পারে। শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মৰ্যাদা রক্ষা করা প্রভৃতি কতকগুলি সদাচার ও সদগুণের অমূল্য লীনা হওয়া উচিত এবং ইহার জন্য চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। শিশুর বাপ-মা যদি পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার

করেন, বস্তুত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে ঐসব গুণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু অর্থকরী বিজ্ঞা আয়ত্ত করিতে হয়। বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সম্মানদের সামর্থ্য এবং ষোঁকটা উপলব্ধি করিতে চান না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ পিতারা আবার সম্মানকেও নিজের মতই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনো আবার নিজের বৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্ত ছেলেকে প্রস্তুত করান। তাহাদের ধারণা উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দ্বারা সম্মানের মধ্যে আপন প্রতিভার সঞ্চার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া একটা জোরজবরদস্তি চলে। বাপ-মার ভুলটা এই যে সম্মানকে এক তাল কাঁদা ভাবিয়া তাহারা নিজের কুসৃত্বকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কেবল শিশু উদ্ধারের মালি মাত্র। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত অমুকুল পরিবেশ রচনা করিয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ।

#### ৪. পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ( Interpersonal relationship in family life ) :—

ভারতের দুইখানি মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ পারিবারিক জীবনের চিত্র। পারিবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে। আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্ষা ও কলহে জর্জর হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে। পারিবারিক সম্ভাব কিংবা অ-সম্ভাবের উপর নির্ভর করে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, চরিত্রের বিকাশ, আর্থিক সমৃদ্ধি এমন কি তাহার উত্থান পতন পর্যন্ত। পারিবারিক লোকদের অসম্ভাবের ফলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী।

পরিবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যদি তাহার আপন জনের কাছে ভালবাসা পায় তবেই তাহার মনো নিরাপত্তার ভাব জাগে। শিশুর সব চাইতে আপন জন হইল তাহার মা এবং বাবা। প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্য নিজ নিজ সম্মানকে ভালবাসেন। তবে মা বাবার ভালবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চরিত্র বিকাশের জন্ত মা বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যদি দিনরাত কলহ করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে খিটিমিটি যদি লাগিয়াই থাকে তবে শিশু ( বালক ও কিশোররাও ) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে—মা বাবার মধ্যে কে ঠিক? সে কাহার পক্ষ লইবে? শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায় পরিণত

বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীক এবং দ্বিধাগ্রস্ত। পরিবারের লোকদের মধ্যে অসন্তোষের পরিণতি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহার কল আরও হৃদয়গ্রসারী।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া গৃহের অত্যন্ত সকলের মধ্যেও সন্তাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহের নিরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুণমাটি আবহাওয়া শিশুচিন্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর মারধর। বয়স্কদের মধ্যেও দেখে শুধু কলহ আর বিদ্বেষ। ঘরে এই শান্তির অভাব স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাড়ির বাহিরে ঠেলিয়া দেয়। শিশু ও বালকরা লেখা পড়ায় মনোযোগ দেয় না। অধিকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায়। কিশোররা আবার নানারকম কুসংসর্গে মেশে। বেণীর ভাগ বালকবালিকা ও কিশোর কিশোরীরা সিনেমায় যাতায়াত শুরু করে। সিনেমার খিল সাময়িক ভাবে তাহাদের দুঃখ ভূলাইয়া দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুলি শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে। মনস্তাত্ত্বিকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে থাকে শৈশবীয় নিরানন্দময় পরিবেশ।

শিশুর প্রকোভগুলির কোনটিই জয়গত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি এবং রাগ, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি অসদ্বৃত্তিগুলি উভয়ই তাহার অর্জিত। কাজেই শিশুর যদি বাড়ির লোকদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতি দেখিতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘৃণা করিতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে সদ্বৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদ্বৃত্তিগুলিকে আবার বড়দের অহুকরণ করিয়া তাহারা ঘৃণা করিতে শিখিবে। আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগরিক। শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে হুহু নাগরিক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিবারের লোকেরা স্বস্থ সম্পর্কের উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্তি, শৃঙ্খলা ও আর্থিক ত্রীবুদ্ধি নির্ভর করে। পরস্পরের মধ্যে সন্তাব থাকিলেই স্ত্রী স্বামীর জ্ঞান, পুত্র পিতার জ্ঞান, ভগ্নী ভ্রাতার জ্ঞান ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কষ্টোপার্জিত ধন পুত্র স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক জীবনের এই ভালবাসা ও সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিকলিত হয়। আমাদের জীবন গৃহকেন্দ্রিক। আমাদের দেশের পারিবারিক সঙ্কটগুলি যদি হ্রাস হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে হ্রাসরতর করিয়া তুলিতে পারিতাম, সাধারণের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না।

5. পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (Concept of family planning and personal health)

পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে?—পরিবার পরিকল্পনা কথাটি আজ আর

কাহারও অবিকিত নয়। শিকিত লোকমাজই এই কথাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ (birth control)। সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমান্বার যত রকম পদ্ধতি জানা আছে তাহার সবগুলিকেই বুঝায়। এই হিসাবে শিশু-হত্যা, ভ্রণ-হত্যা, বিলম্বে বিবাহ, ব্রহ্মচর্য পালন, যান্ত্রিক কিংবা রাসায়নিক উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয়। ইহার যেমন একটি নেতিবাচক (negative) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক (positive) দিকও আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর দিবার জ্ঞ ১৯২২ সালে আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটি উহার National Birth Control League নাম বদলাইয়া Planned Parenthood Federation of America নামকরণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনার প্রকৃত অর্থ হইল সুপরিকল্পিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বামীস্ত্রীর আর্থিক সক্তিত অনুযায়ী অল্পসংখ্যক সুস্থ ও সবল সন্তান উৎপাদন করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগমন সম্পূর্ণভাবে বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাক্তিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে অত্ৰদিকে তেমনি বাঙ্কিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে।

**পরিবার পরিকল্পনার উপায়—পূরাতন ও নব্য—**পরিবার পরিকল্পনাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রসঙ্গ কিন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে মজ্ঞ ছিল না। তাহার সাধারণতঃ শিকড় বাকড় বা মস্তপ্ত ঔষধের সাহায্যে অবাক্তিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তুলনায় অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে সম্পত্তির যে কোন একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার (sterilization) এবং যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে জন্মনিরোধ করাই প্রধান। ভ্রণের ধ্বংসাধনও (abortion) অত্ৰতম উপায় তবে ভ্রণহত্যা নরহত্যাৱই নামান্তর। গুরুকীট এবং বিকশিত ডিম্বাণুব মিলনেই ভ্রণের সৃষ্টি হয়। উহারা যদি একত্ৰ মিলিত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় গর্ভরোধ করা। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (conception control) বর্তমান রাষ্ট্রগুলি পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছে।

**পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা :** জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার প্রগতি ও ত্ৰাপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রসূতি মৃত্যুর ার ছিল খুব বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব ছিল প্রসূতি মৃত্যুর প্রধান কারণ। নারীর পক্ষে সন্তানধারণ মানেই নিজের

জীবনের উপর একটা ঝুঁকি লওয়া। তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সম্ভানধারণের কলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়ুসংক্রান্ত নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল। ইহার কারণ অসুস্থত্বের কলে দেখা গিয়াছে যে দুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশু-মৃত্যুর হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে। দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস করা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কোন কোন রোগ আবার, যেমন—যক্ষ্মা, সিকিলিস ও গণোরিয়া প্রভৃতি বাগ মা হইতে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ এই সকল রোগ সন্তান পরিবারের অশান্তির কারণ হয়, সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য দুর্বল করিয়া ফেলে। সুতরাং রোগ শিশুর জন্মদান বন্ধ করিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্থ্যের মান স্থির রাখা পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য।

পরিবার পরিকল্পনার একটি আর্থিক এবং একটি সামাজিক দিকও আছে। প্রত্যেক পরিবারের আর ও রোজগারের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঐ সীমিত আয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় গড়িয়া তুলিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাধিয়া দেওয়া ছাড়া পত্যন্তর নাই। পরিবারগুলি লইয়াই আবার একটি জাতি তথা রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুগনায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। বিপুল জনসংখ্যাই ভারতের মত শক্তশালিনী দেশের পক্ষেও বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান সংখ্যা বেশী হইলে মা বাবার পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান যত্ন লওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া পরিবারে খিটমিটি ও কলহ লাগিয়াই থাকে। অনাদৃত, অবহেলিত দারিদ্র্যজর্জর শিশুরা গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তারপর নানা কুসঙ্গে গড়িয়া বিভিন্ন অপরাধ করে এবং এইভাবে পরিবার তথা সমগ্র দেশের সমস্তাই দাঁড়ায়। পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্তা বহুলাংশে দূর করা যায়।

## অনুশীলনী

## A. প্রথম অধ্যায়

১। গৃহপরিচালনা কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় গৃহপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। গৃহপরিচালনায় গৃহপরিকল্পনা, নির্দেশনা ও সমীক্ষা কিভাবে অঙ্গাদী সম্বন্ধযুক্ত সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। গৃহপরিচালনা বলিতে কি বুঝ? স্ৰষ্টভাবে গৃহপরিচালনার জন্য গৃহকর্তার কি কি গুণ থাকা উচিত? [ H. S. 1972 ]

৪। মনুষ্যসম্পদ কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় মনুষ্যসম্পদের ভূমিকা নির্দেশ কর।

## B. দ্বিতীয় অধ্যায়

১। গৃহকর্তার ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? গৃহকর্তার প্রয়োজনীয় গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। একটি পরিবারে গৃহিণীর বিভিন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্ত ভূমিকার মধ্যে কোন্ ভূমিকাটি তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

৩। সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর। গৃহপরিচালনায় এইসব সম্পদ কিভাবে কাজে লাগান হয়?

৪। ‘মনুষ্যসম্পদ এবং পার্থিব সম্পদের স্ৰষ্ট ব্যবহার দ্বারা গৃহপরিচালনা সার্থক করিয়া তোলা যায়’—এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

৫। অর্থব্যয় সম্বন্ধে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে? ইহাদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি তোমার শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

## C. তৃতীয় অধ্যায়

১। পারিবারিক বাজেট কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর। [ S. F. 1966, 1967 ]

২। (ক) কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা বাজেট প্রভাবিত হয়?

(খ) কিভাবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের একটি বাজেট আরেকটি হইতে পৃথক করা যায়? [ S. F. 1962, 1965 ]



৩। পারিবারিক বাজেট তৈরী করিবার মূলনীতিগুলি কি ? দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মাসিক বাজেটের আনুমানিক হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

[ H. S. 1968 ]

৪। সাংসারিক বাজেট রচনার মূলনীতিগুলি কি ? এইরূপ বাজেট তৈরী করিতে কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার ?

[ S. F. 1965, 1668 ]

৫। গৃহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

[ S. F. 1969 Compartmental, S. F. 1971 ]

৬। বাজেট বলিতে কি বুঝায় ? তোমার ব্যক্তিগত খরচের হিসাব কিভাবে রাখিবে বর্ণনা কর।

[ S. F. 1968 ]

৭। পারিবারিক হিসাব কাহাকে বলে ? এইরূপ হিসাব রাখার সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। ঋণ কাহাকে বলে ? কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে মানুষ ঋণ করে ?

৯। ঋণের অপকারিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

১০। অর্থসঞ্চয়ের বিভিন্ন উপায় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখ। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কোন্ পদ্ধতি উপযুক্ত মনে কর ?

[ H. S. 1970 ]

১১। ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস হিসাবের পার্থক্য কি ? উহাদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

[ H. S. 1969 ]

১২। চেক কাহাকে বলে ? উহার সুবিধা কি ?

[ C. U. 1945 ]

১৩। চেক কি ? উহা কত প্রকারের ? উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

[ S. F. 1963 ]

১৪। জীবনবীমা প্রধানতঃ কয় প্রকারের। উহার বিবরণ দাও।

১৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ; (খ) জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা ; (গ) স্থায়ী আমানত ; (ঘ) ক্রেডিট চেক ; (ঙ) কোম্পানীর শেয়ার ; (চ) বাণিজ্য ও তাহার কার্যাবলী।

[ H. S. 1970 ]

## D. চতুর্থ অধ্যায়

১। তত্ত্ব চিনিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার সাহায্য লইবে ? পরীক্ষাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[ H. S. 1969 ]

২। রেশম তত্ত্ব সম্বন্ধে কি জান ? পশম তত্ত্ব সহিত উহার পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায় ?

- ৩। খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করা যায় ?  
 ৪। সূতি, লিনেন, রেশম ও পশম তন্তুর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।  
 ৫। পোশাক পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? গৃহিণীর পোশাক পরিকল্পনাসংক্রান্ত দায়িত্বগুলি বর্ণনা কর।

৬। শুক ধোলাইয়ের জন্তু কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ধোত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [ H. S. 1968 ]

৭। দাগ কয় প্রকার ও কি কি ? সব রকম দাগের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৮। কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার জন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করিবে ? বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় কোন্ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ? [ H. S. 1969 ]

৯। প্রাণিজ দাগ বলিতে কি বুঝ ? কমল হইতে রক্তের দাগ কিভাবে উঠাইবে ? [ H. S. 1972 ]

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) লোহার দাগ বা মরিচা উঠাইবার প্রণালী। [ H. S. 1969 ]

(খ) চায়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী। [ H. S. 1970 ]

(গ) কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী।

(ঘ) ঘাসের দাগ উঠাইবার প্রণালী।

(ঙ) রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী।

### E. পঞ্চম অধ্যায়

১। শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি কি ? [ S. F. 1967 ]

২। নিজের প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি ? [ S. F. 1968 ]

৩। শয়ান অবস্থায় কিভাবে একটি রোগীর শয্যা পরিবর্তন করিবে। রোগীর শয্যার জন্তু কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪। একটি আদর্শ রোগি-কক্ষের অবস্থান ও উহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। গর্ভবতী জননীর চিকিৎসাগত যত্নের জন্তু কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

৬। একটি শিশু উপযুক্ত চিকিৎসাগত যত্ন পাইতেছে কিনা কিভাবে বুঝিবে ? শিশুর চিকিৎসাগত যত্নের জন্তু কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

৭। শিশুদের দাঁত কিভাবে নষ্ট হয় ? কিভাবে শিশুর দাঁতের যত্ন লইবে ?

৮। অনাক্রম্যতা শক্তি কিভাবে অর্জন করা যায় ? শিশুর দেহে অনাক্রম্যতা শক্তি সঞ্চারের জন্তু কি কি ধরনের টিকা লওয়া উচিত ? :

৯। বৃদ্ধ ব্যক্তির যত্ন লইবার সময় কোন্ কোন্ বিষয় খেয়াল রাখিবে ?

১০। অস্থিভঙ্গ কয়প্রকার ও কি কি ? অস্থিভঙ্গের বিরূপ প্রতিবিধান দিবে ?

১১। গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণ কি ? গুপ্ত রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ?

১২। নাক দিয়া রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ?

১৩। চোখে, কানে এবং নাকের ভিতর কোন বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে কি প্রতিবিধান দিবে ?

১৪। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে :—

(ক) পাঁচ বছরের একটি বালিকা পয়সা গিলিয়া ফেলিয়াছে।

(খ) পাগলা কুকুরে দংশন করিয়াছে।

(গ) হাতে শুয়োপোকা লাগিয়াছে।

(ঘ) রাস্তায় এক ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

১। সারা বছর ধরিয়া একটি শিশুকে সুস্থ রাখার জ্ঞান কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ?

২। একটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক পরিপূষ্টির মূল প্রয়োজনগুলি বর্ণনা কর।

[ H. S. 1966 ]

৩। মানুষের জীবনের প্রধান স্তরগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেসব প্রধান প্রধান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলির উল্লেখ কর।

[ H. S. 1965 ]

৫। কৈশোরকালে বালিকাকে পরিচালিত করিতে গিয়া জনকজননী এবং অভিভাবকের কি কি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত ?

[ H. S. 1964 ]

৬। অপরাধপ্রবণতা কাহাকে বলে ? কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রবণতা দেখা যায় ? উহার প্রতিকার কি ?

৭। মানসিক স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝ ? দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে কোনটি তোমার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় ? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও।

৮। একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ?

### সপ্তম অধ্যায়

১। বিবাহের প্রস্তুতি কাহাকে বলে ? এইরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা কি ? বিবাহের প্রস্তুতির জ্ঞান একটি বালিকার কি কি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ?

২। জনিতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৩। “পারিবারিক জীবনে সকলের মধ্যে সম্ভাব না থাকিলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী”—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে? ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে আলোচনা কর।

---

## পরিশিষ্ট

খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান : পাচনতন্ত্র,

পরিপাক ও মেটাবলিজম :

( Utilization of food by the body : digestion,  
absorption and metabolism )

**পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া** ( Digestive system and digestion ) : বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রব্যই (যেমন গ্লুকোজ, খাতব লবণ ইত্যাদি) দেহ সরাসরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে। অবশিষ্ট অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। তাতের প্রধান অংশ খেতসার। কিন্তু এই খেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। খেতসার গ্লুকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঐ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিনে পরিণত হইলেই ঐ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে।

খাদ্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে **পাচনতন্ত্র** (Digestive system) বলে। মুখ-গহ্বর (mouth), অন্ন-নালী (oesophagus), পাকস্থলী (stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) এবং বৃহদন্ত্র (large intestine) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত। খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

**মুখ-গহ্বরে পরিপাক :** আমাদের মুখে সর্বদাই লাল নিঃসৃত হইতেছে। এই লাল প্যারটিড (parotid), সাব-লিংগুয়াল (sublingual) এবং সাব-ম্যাক্সিলারী (sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে। ইহার বেনীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও অ্যামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার জরক পদার্থ (enzyme), মিউসিন এবং কিছু খাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহা সাধারণতঃ মৃদু স্ফাবনীয়। দৈনিক প্রায় 1000 সি. সি. হইতে 1500 সি. সি. লাল একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয়।

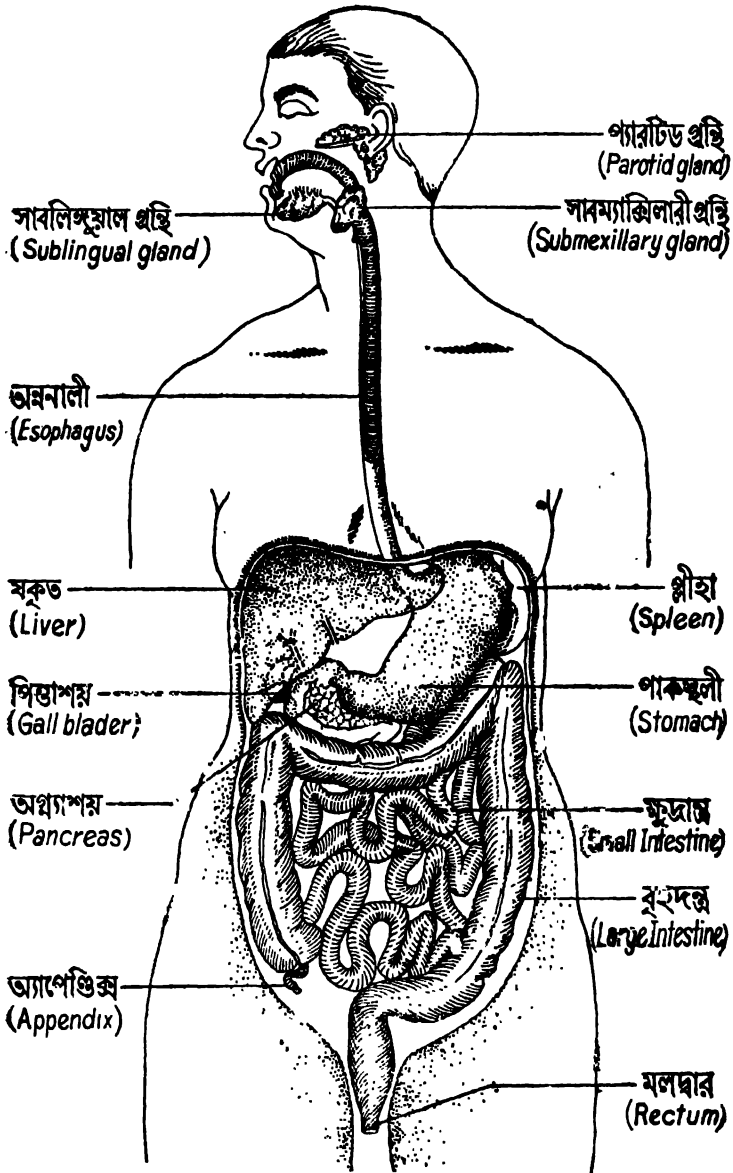
লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে দ্রবীভূত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত-দ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পৌঁছাইতে সাহায্য করে। অ্যামাইলেস বা টায়ালিন খাদ্যের খেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া মলটোজ-এ (maltose) পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই প্রথম শুরু হয়। খেতসার জাতীয় পদার্থ যাগাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে সেইজন্য খাদ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ খেতসার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা খেতসার (uncooked) জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না।

**পাকস্থলীতে পরিপাক :** মুখ-গহ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত খাদ্যদ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে পৌঁছে। অন্ন-নালী মুখ-গহ্বর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে। শুধু ভুক্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ই উগা খুলিয়া যায়। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (pylorus end) স্বারা ডিওডেনামের (deodenum) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 ইঞ্চি চওড়া। পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শৈল্পিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্র-গুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (gastric juice) বলে।

পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (fundus) বলে। খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায়  $\frac{1}{2}$  - 2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার টায়ালিন বা অ্যামাইলেস খাদ্যের খেতসার জাতীয় উপাদানের অরও কিছু অংশ মলটোজে পরিণত করিবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে খাদ্য-দ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকস্থলীর অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে

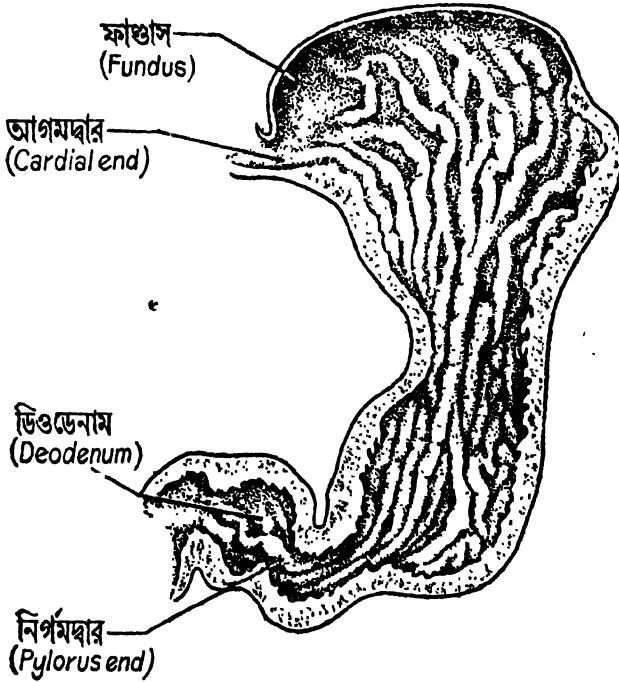
আমায়ন্য রসের সহিত (gastric juice) মিশ্রিত হইতে থাকে। আমায়ন্য রস প্রধানত: হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, প্রো-রেনিন (pro-renin), পেপ-



পাচনতন্ত্র

সিনোজেন ( pepsinogen ) এবং লাইপেস (lipase) দ্বারা গঠিত। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন ও

পেপসিন উৎপন্ন করে। রেনিন, পেপসিন এবং লাইপেস—এই তিনটি আমাশয় রসের জারক পদার্থ (enzyme)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্ত আমাশয় রসটি তীব্র অম্লিক (acidic)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১) খাওয়ার প্রোটিন নরম করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে। (২) ইহার সাহায্যে প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন এবং পেপসিন উৎপন্ন হয়। (৩) খাওয়ার ইন্ধু শর্করা (cane sugar) এই অ্যাসিডের সাহায্যে গ্লুকোজ এবং



পাকস্থলীর লম্বালম্বি কাটা অংশ

ফ্রুক্টোজে (fructose) পরিণত হয়। (৪) খাওয়া-দ্রব্যের সহিত কোন দূষিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা ঐ জীবাণু তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া (৫) নির্গমদ্বার (pylorus end) খুলিতে এবং (৬) খাওয়ার লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই অ্যাসিড সহায়তা করিয়া থাকে।

পাকস্থলীতে খাওয়া-দ্রব্য কতক্ষণ অবস্থান করিবে তাহা ইহার পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরল খাওয়া-দ্রব্য ১৫ মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান করে না। এইজন্যই তরল খাওয়া-দ্রব্য আমাদের তাড়াতাড়ি ক্ষুধার উদ্রেক হয়। স্নেহজাতীয় খাওয়া-দ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থান



করে। সাধারণত: 4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটোসো (proteoses) এবং পেপটোন (peptone) উৎপন্ন করে। যেনিন দ্বারা দুধ ছানায় পরিণত হয়। লাইপেস ভিন্ন এবং জীমের স্নেহপদার্থের সামান্য কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) এবং গ্লিসারিনে পরিণত করে। অধিকাংশ স্নেহপদার্থেরই পাকস্থলীতে কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন জারক রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের (chyme) আকার ধারণ করে। এই মণ্ড ধীরে ধীরে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং বিস্তারের ফলে নির্গমদ্বার দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) প্রবেশ করে।

**ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক :** খাদ্যের সর্বাঙ্গকে বেশী পরিবর্তন হয় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রায় 5 ঘণ্টাকাল খাদ্য-দ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় মোট পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।

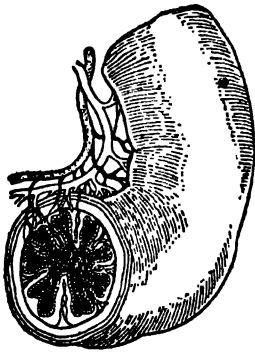
পাকস্থলীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (pancreas) আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত। খাদ্য-দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্রোম রস (pancreatic juice) বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্রোম রসে অ্যামাইলোপসিন (amylase), স্টিপসিন (steapsin), ট্রিপসিন (trypsin) এবং কাইমোট্রিপসিন (chymotrypsin) নামক প্রধান প্রধান চারটি জারক পদার্থ থাকে। ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রথমে ট্রিপসিনোজেন এবং কাইমোট্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের লৈঙ্গিক আবরণ হইতে এন্টারোকাইনেস (enterokinase) নামক এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা ট্রিপসিনোজেন হইতে ট্রিপসিন উৎপন্ন করে। এই ট্রিপসিন আবার কাইমোট্রিপসিনোজেন হইতে কাইমোট্রিপসিন প্রস্তুত করে। এই ক্রোম রস ক্ষারধর্মী (basic)। উহা খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব প্রশমিত করিয়া যুদ্ধ ক্ষারত্ব প্রদান করে।

অ্যামাইলোপসিন খাদ্যের অবশিষ্ট খেতসার মলটোজে (maltose) পরিণত করে। ইহা কাঁচা (uncooked) খেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে। স্টিপসিন স্নেহপদার্থ হইতে গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) উৎপন্ন করে। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন

হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন দ্বারা প্রধানতঃ প্রোটিনোস্ (proteoses) এবং পেপটোনে (peptone) পরিণত হয়।

কুদ্রাঙ্গের কাজে যকৃৎ (liver) সহায়তা করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস (bile) উৎপন্ন হইয়া পিত্তাশয়ে (gall bladder) সঞ্চিত হয়। একটি কুদ্রাঙ্গ নলের সাহায্যে এই পিত্তরস কুদ্রাঙ্গে প্রবাহিত হয়। ইহা স্নেহপদার্থ পরিপাকের সহায়তা করে।

কুদ্রাঙ্গের স্নায়বিক আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাক্কাস এন্টেরিকাস (succus entericus) বলে। এই রসে ইরেপসিন (erepsin), সুক্রেস (sucrase), মল্টেস্ (maltase) এবং ল্যাক্টেস্ (lactase) নামক চারিটি জারক পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া এন্টারোকাইনেস্ (enterokinase) নামক আরও একটি পদার্থ এই রসে দেখিতে পাওয়া যায়।



কুদ্রাঙ্গের গায়ে অসংখ্য কুদ্রাঙ্গ আঙুলের স্থায় একপ্রকার অভিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়

ইরেপসিন প্রোটিনোস্ (proteose) এবং পেপটোন (peptone) ভাঙিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acids) প্রস্তুত করে। সুক্রেস্ খাতের ইক্ষু শর্করা (cane sugar) হইতে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ (fructose) উৎপন্ন করে। মল্টেস্ এবং ল্যাক্টেস্ যথাক্রমে মল্টোজ (maltose) এবং দুগ্ধ শর্করা (lactose) ভাঙিয়া প্রথমটি গ্লুকোজ এবং শেষেরটি গ্যালা-

ক্টোজ (galactose) প্রস্তুত করে।

এইরূপে কুদ্রাঙ্গে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যসমূহ রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই শোষিত হইবার কাজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই কুদ্রাঙ্গে হইয়া থাকে। কুদ্রাঙ্গের গায়ে অসংখ্য কুদ্রাঙ্গ আঙুলের স্থায় একপ্রকার অভিক্ষেপ (projections) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে ভিলাই (villi) বলে। ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্তবাহনালী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

**বৃহদন্ত্রের কাজ :** ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে পরিচালিত হয়। বৃহদন্ত্র হইতে প্রধানতঃ খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোষিত হইয়া বাকী অংশ মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য। শাক-সব্জি ও তরিতরকারির দুপাচ্য সেলুলোজ পেশীর সংকোচনের সৃষ্টি করিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিষ্কাশিত করিতে সহায়তা করে। এইজন্যই খাদ্য-দ্রব্যে প্রচুর সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত।

## প্রোটিনের পরিপাক

খাদ্যের প্রোটিন সরাসরিভাবে আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রোটিন ভাঙিয়া যখন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় তখনই উহা শরীরের কাজে লাগে। পাচনতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যের প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভক্ত হওয়াকেই প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া (Protein digestion) বলে।

প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া প্রথমে পাকস্থলীতেই শুরু হয়। পাকস্থলীর গাত্র হইতে নিঃসৃত আমাশয় রসে (gastric juice) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপসিনোজেন থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেপসিনোজেন হইতে পেপসিন উৎপন্ন করে। তাছাড়া এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে প্রোটিন কিছুটা নরম হয়। এই নরম প্রোটিন পেপসিন এন্জাইমের সহায়তায় প্রোটায়োস (Proteoses) এবং পেপটোনে (Peptone) পরিণত হয়। সাধারণত 4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। ইহার পর খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র একটি সরু নলের দ্বারা অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) সহিত যুক্ত। অগ্ন্যাশয় হইতে ক্লোম রস (pancreatic juice) এই সরু নলের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্লোম রসটি ক্ষার জাতীয়, সুতরাং, ইহা পাকস্থলী হইতে আগত খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব দূর করিয়া মুক্ত ক্ষার প্রদান করে। ক্লোম রসের ট্রিপসিনোজেন ও কাইমোট্রিপসিনোজেন ক্ষুদ্রান্ত্রের লৈঙ্গিক আবরণ হইতে নিঃসৃত এন্টারোকাইনেসের (enterokinase) সহায়তায় যথাক্রমে ট্রিপসিন (trypsin) ও কাইমোট্রিপসিনে (chymo-trypsin) পরিণত হয়। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, সেই সকল প্রোটিন এখানে ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন এই দুইটি এন্জাইমের সাহায্যে প্রোটায়োস ও পেপটোনে রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের

গাত্র হইতে সাক্কাস এন্টেরিকাস (succus entericus) নামক একটি রস নিঃসৃত হয়। এই রসে ইরেপসিন (erepsine) নামক একটি এনজাইম থাকে। এই এনজাইম উৎপন্ন প্রোটিনোস ও পেপটোন ভাঙিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড (amino-acid) উৎপন্ন করে। এইরূপে প্রোটিনের পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতে আরম্ভ হইয়া ক্ষুদ্রাঙ্গে সম্পূর্ণ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ ক্ষুদ্রাঙ্গেই শোষণ ক্রিয়া (absorptions) আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্রাঙ্গের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের গ্রায় অভিক্ষেপ (projections) দেখা যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে ভিলাই (villi) বলে। (৬ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্ত বহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যে পরিপাকপ্রাপ্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে পরিচালিত হয়। এই রক্ত হইতে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রোটিন পরিপাকে যে সকল এনজাইম অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল :

এনজাইম	উৎপত্তিস্থল	বাহ্যার উপর ক্রিয়া করে	খাত্তের পরিণতি
(১) পেপসিন	পাকস্থলী	প্রোটিন	প্রোটিনোস ও পেপটোন
(২) ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিনোস ও পেপটোন
(৩) কাইমে-ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিনোস ও পেপটোন
(৪) ইরেপসিন	ক্ষুদ্রাঙ্গ	প্রোটিনোস ও পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড

## পৰিপাকের সহায়ক এনজাইমসমূহ ( Digestive Enzymes )

খাভের পৰিপাক কৰিতে যে সকল জ্বাকৰস ( enzyme ) অংশ গ্রহণ কৰিয়া থাকে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্ন দেওয়া হইল :

জ্বাকৰ পদার্থ ( Enzyme )	যে গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় (Secrered by)	যাহার উপর ক্রিয়া করে (Substance acted upon )	খাভের পৰিণতি (Products of Enzyme activity)
টায়ালিন বা অ্যামাইলেস	লালাগ্রন্থি	পৰিপক ( cooked ) খেতসার	মলটোজ
ৱেনিন	পাকস্থলীর গ্রন্থি	দুধের প্রোটিন	ছানা প্রস্তুতি
পেপসিন	" "	প্রোটিন	প্রোটায়োস এবং পেপটোন
লাইপেস	" "	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটায়োস এবং পেপটোন
কাইমো-ট্রিপসিন	"	প্রোটিন	প্রোটায়োস এবং পেপটোন
অ্যামাইলোপসিন	"	খেতসার	মলটোজ
স্ট্রিপসিন	"	স্নেহ	গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
এনটারোকাইনেস	ক্ষুদ্রান্ত্রের-ঐচ্ছিক আবরণ	ট্রিপসিনোজেন	ট্রিপসিন
ইরেপসিন	" "	প্রোটায়োস এবং পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড
স্ক্রেকস	" "	ইক্ষু শর্করা	মুকোজ এবং ক্রুক্টোজ
মলটেস	" "	মলটোজ	মুকোজ
ল্যাক্টেস	" "	দুগ্ধ-শর্করা	মুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ

## 7. পোশাকের যত্ন

উপযুক্ত সংরক্ষণ ও যত্নের উপরই গৃহের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। নিয়মিত দামী ও মহার্ষ পোশাক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যে দুই-এক প্রস্থ দামী ও মহার্ষ পোশাক আমাদের থাকে সেগুলিকে যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে বিবাহ ও উৎসবাদিতে পোশাকের অভাব হইবে না। উপযুক্ত যত্ন লইলে নিত্যব্যবহার্য পোশাকগুলিও বহুদিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে।

পোশাকের প্রধান শত্রু হইল আরসোলা, রূপালী পোকা ইত্যাদি। এইসব পোকাকার উপদ্রব হইতে পোশাক রক্ষার জন্য আলমারি ও ট্রাঙ্কে গ্রাপথালিন দিয়া রাখিতে হয়। জলীয় বাষ্প থাকিলে কাপড়ে ফাডাস জন্মিয়া mildew সৃষ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে। যেখানে ঐ ফাডাস লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগুলি ওড়াতাড়ি ফাঁসিয়া যায়। তাই কাপড় কাচা ও ইজি করার পরে পোশাক সর্বদা কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে এবং এইভাবে বায়ুচালিত করিয়া তুলিয়া রাখিবে। নিত্যব্যবহার্য পোশাকগুলি হাতের কাছে রাখা যায় তবে দামী সূতি ও সিল্কের পোশাক ও গরম বস্ত্রগুলি ব্যবহারের পর কাচিয়া ও বায়ুচালিত করিয়া লইবে। তারপর বাক্স অথবা আলমারিতে গ্রাপথালিন দিয়া সর্বদা সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে। তাছাড়া বছরে দুই একবার এইসব তোলা পোশাকগুলি রোদ্রে দিয়া লইতে হয়।

#### 4. শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান ( Factors of development )

দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অবস্থা শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা ও নকশাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর দৈহিক বিকাশের মূলে রহিয়াছে নানা উপাদান, যথা— খাদ্য, সাধারণ স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আবার স্থূলোক, উন্মুক্ত বায়ু ও আবহাওয়া প্রধান। পরন্তু সামাজিক সম্পর্ক ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী তাহার ব্যক্তিত্বের কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কোন একটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়, উপাদানগুলি আবার পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। শিশুর ক্রমবিকাশে উহাদের কোনটির ভূমিকা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। তবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব হিসাবে নিয়ে উহাদের আলোচনা করা হইল :—

(১) বুদ্ধি (Intelligence) : সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সহজাত বুদ্ধিই বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান শিশুর বিকাশের গতি দ্রুত এবং নিরেট শিশুদের গতি মন্থর হইয়া থাকে। হাঁটার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে খুব চালাক শিশুরা তের মাসে হাঁটে, মাঝামাঝিরা চৌদ্দ মাসে, অপেক্ষাকৃত নিরেট শিশুরা বাইশ মাসে এবং একেবারে বোকার দল (idiots) তিরিশ মাস বয়সে হাঁটে। কথা বলার ব্যাপারে খুব চালাক শিশুরা এগার মাসে, সাধারণ শিশুরা বোল মাসে, অল্পবুদ্ধি শিশুরা চৌত্রিশ এবং বোকারা একান্ন মাসে কথা বলা শুরু করে।

(২) যৌন পার্থক্য (Sex) : প্রাক-শৈশবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বুদ্ধির মাত্রা বেশী থাকে। কিন্তু তারপরে অন্ততঃ কথা বলার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আগাইয়া যায়। দৈহিক পুষ্টিও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগে ঘটে। তাই মেয়েদের মধ্যে যৌনবাসনা আগে জাগ্রত হয় এবং মনের বিকাশ ঘটে ছেলেদের চাইতে আগে।

(৩) অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থী (Glands of Internal secretion) : কতকগুলি গ্রন্থির অন্তঃস্রবণও শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কণ্ঠে অবস্থিত থাইরয়েডের (Thyroid)

নিকটবর্তী প্যারাথাইরয়েড ( Parathyroid ) গ্রন্থিসমূহ রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ধারিত করে। এই গ্রন্থিগুলির অভাব ( deficiency ) ঘটিলে অস্থির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মাংসপেশীর উত্তেজনা অতিশয় বৃদ্ধি ( hyperexcitability of the muscles ) পায়। থাইরয়েড গ্রন্থিজাত থাইরক্সিনও শিশুর শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাদের অভাবে 'ক্রেটিন' ( cretin ) বা বিকলাঙ্গ নিবোধ ( deformed idiot ) শিশুর সৃষ্টি হয়। বক্ষে অবস্থিত থাইমাস গ্রন্থি ( thymus ) কিংবা মস্তকের নিম্নভাগে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থিসমূহ ( pineal glands ) অতি-মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বাল্যাবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যৌনগ্রন্থিসমূহের অভাবে যৌনচেতনা ঘটিতে বিলম্ব ঘটে। পরন্তু উহারা সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর অকালে যৌনচেতনার উদগম হয়।

(৪) পুষ্টি ( Nutrition ) : ক্রমবিকাশের অন্ত্যন্ত উপাদান হইল পুষ্টি। পুষ্টি বলিতে শুধু খাদ্যের পরিমাণই বুঝায় না, উহার গুণাগুণও পুষ্টির অন্তর্গত। শৈশবের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে রিকেটস, দাঁতের রোগ এবং আরও হাজার রকমের গোলমাল দেখা দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যেকটি স্বস্থ ও সবল ব্যক্তি শৈশবে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়াছে।

(৫) উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক ( Fresh air and Sunlight ) : দৈনিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্যালোক একেবারে অপরিহার্য। তবে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে উহার দান কতখানি তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

(৬) আঘাত এবং রোগগীড়া ( Injuries and Diseases ) : শৈশবে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে কিংবা মস্তিষ্কে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। অনবরত রোগে ভুগিতে থাকিলে দৈনিক বিকাশও বিলম্বিত হইয়া থাকে।

(৭) পরিবারে শিশুর স্থান ( Position in the Family ) : পরিবারে শিশুর স্থানও শিশুর ক্রমবিকাশের গতি নির্ধারিত করে। দেখা গিয়াছে প্রথম সন্তানের চেয়ে পরবর্তী সন্তানদের ক্রমবিকাশের গতি দ্রুত। ইহার কারণ অবশ্য এই যে পরবর্তী শিশুরা অগ্রজদের অনুকরণের যে স্ববিধা পায় প্রথম শিশুটি সচরাচর সেই স্ববিধা হইতে বঞ্চিত থাকে। একই কারণে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ সন্তানটি যদি অগ্রজদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হয় তবে তাহারও



মানসিক বিকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে কারণ অসুস্থকরণ করিবার মত আদর্শ নমুনা তাহার সামনে থাকে না। তাই সে একেবারে শিশু বনিয়া যায়।

(৮) জাতি এবং সংস্কৃতি (Race and Culture): বিশেষজ্ঞদের মতে জাতি এবং সংস্কৃতির অবদানও শিশুর ক্রমবিকাশে কম নয়। উদাহরণ হিসাবে তাঁহারা খেতকায় জাতির সহিত কৃষকায় নিগ্রো সম্ভানদের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৃষকায় শিশুরা খেতশিশুর চেয়ে বুদ্ধিতে হীন। কিন্তু খেতজাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে কৃষকায় শিশুরা সেই সকল সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই জাতিগত তুলনা চলে না।

---









